অর্থনৈতিক উন্নয়ন
ও
ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

[*Economic Development and India's Five-year Plans*

বিশ্বনাথ ঘোষ
অধ্যাপক বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

ARTHANAITIK UNNYANO
BHARATER PANCHABARSHIK PARIKALPANA
Biswanath Ghosh

প্রকাশক :

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
আর্য ম্যানসন (নবম তল)
৬-এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলিকাতা ৭০০০১৩

মুদ্রক :
প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়
টাইপো·গ্রাফার্স অফ ইণ্ডিয়া
৩৬-এ, কে. জি. বোস সরণী
কলিকাতা ৭০০ ০৮৫

প্রচ্ছদ : প্রশান্ত হাজরা

Published by Prof. Dibyendu Hota Chief Executive Officer West Bengal State Book Board under the Centrally Sponsored Scheme of production of books and literature in regional languages at the University level launched by the Government of India, Ministry of Education and Social Welfare (Department of Culture), New Delhi.

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ পুস্তক পর্ষদ আমাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উপর স্নাতক ছাত্রছাত্রীদের জন্য (পাস কোর্স) পুস্তক রচনার দায়িত্ব অর্পণ করায় আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। বর্তমানে কলিকাতা, বর্ধমান ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরে উন্নয়নের অর্থনীতি পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে কিন্তু এই বিষয়ে বাংলা লেখা কোন পাঠ্য গ্রন্থ না থাকায় পর্ষদ এই ব্যাপারে অগ্রণী হয়। বর্তমান গ্রন্থটি প্রধানতঃ ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার প্রয়োজনের কথা মনে রাখিয়া রচনা করা হইয়াছে। গ্রন্থটির উন্নয়নকল্পে যে কোন পরামর্শ সাদরে গৃহীত হইবে।

অধ্যাপক ধীরেশ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক অলক ঘোষ, অধ্যাপক শান্তিকুমার ঘোষ এবং অধ্যাপক অমল কুমার বসুর ছাত্র হিসাবে আমি তাহাদের নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ দীপ্তিকুমার পাল ও বাগাটী কলেজের অধ্যাপক কালীপদ বসুর কাছ থেকে আমি নানারূপ সাহায্য পাইয়াছি। ইহা ব্যতীত পুস্তক পর্ষদের মুখ্য আধিকারিক অধ্যাপক দিব্যেন্দু হোতা ও পর্ষদ কর্মীদের সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতীত গ্রন্থটি প্রকাশ করা সম্ভব হইত না।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়,
বাণিজ্য বিভাগ

বিশ্বনাথ ঘোষ

বিষয়সূচী

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাধারণ উপাদান
(General Factors in Economic Development)

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এসিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলি একটার পর একটা স্বাধীনতা লাভ করিয়া অর্থনৈতিক উন্নয়নে আগ্রহী হইয়া উঠিলে উন্নয়নের তাত্ত্বিক আলোচনা অর্থনীতির পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়ায়। অবশ্য উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা নূতন কিছু নয়—এ্যাডাম স্মিথ হইতেই উহার সুরু। কিভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা যায় সেই প্রশ্ন এ্যাডাম স্মিথ হইতে সুরু করিয়া কার্ল মার্কস ও লর্ড কেন্‌স পর্যন্ত সকলেই করিয়াছেন। অবশ্য যাঁহাদের মৌলিক গবেষণা ও অবদানের দরুন অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্থনীতি-শাস্ত্রের একটি পৃথক এবং দ্রুত বর্ধমান শাখার মর্যাদা লাভ করিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে আছেন রয় হ্যারোড, ইভসে ডোমার, আর্থার লুইস, রেজেনার নার্কস, গানার মিরড্যাল, রোসেনস্টাইন রডান, হারভে লিবেনস্টাইন, হানস সিঙ্গার, হ্যারসম্যান, অমর্ত্য সেন ও আরো অনেকে। আজ সারা পৃথিবী জুড়িয়া উন্নয়নের প্রতিযোগিতা চলিয়াছে; হয় উন্নয়ন নয় ধ্বংস—অধোন্নত দেশের সম্মুখে আজ ইহাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

উৎপাদনের সংগঠন (Organisation of Production) **:** উন্নয়ন নির্ভর করে উৎপাদনের উপর। সাধারণ লোক উৎপাদন বলিতে বোঝে কোন বস্তু তৈয়ারী করা। এ্যাডাম স্মিথ উৎপাদনকে এই অর্থে গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। তিনি উৎপাদন বলিতে বস্তুগত উৎপাদন বুঝিতেন এবং তাঁহার মতে যে শ্রম বস্তুগত দ্রব্য উৎপাদন করে তাহাই উৎপাদনশীল শ্রম। এই যুক্তিতে ছুতার, বেহালা নির্মাতা, রাজমিস্ত্রি প্রভৃতির শ্রম উৎপাদনশীল, পক্ষান্তরে যে শ্রম অবস্তুগত সেবা উৎপাদন করে তাহা অনুৎপাদনশীল শ্রম, যেমন শিক্ষক, গায়ক, চিকিৎসক, অভিনেতা প্রভৃতি। কিন্তু বর্তমানে উৎপাদন সম্পর্কে এই অবৈজ্ঞানিক ধারণা পরিত্যক্ত হইয়াছে। বর্তমানে উৎপাদন বলিতে উপযোগ সৃষ্টি বা মূল্যসৃষ্টিকে বোঝান হয়। মোট কথা উপযোগ সৃষ্টি—তাহা বস্তুগতই হউক আর অবস্তুগতই হউক—উৎপাদনরূপে গণ্য হইবে। যেখানে

মানুষের কার্যাবলী সমাজের অভাবমোচনে নিযুক্ত রহিয়াছে বা কোন বস্তুর উপযোগ বৃদ্ধি করিতেছে সেখানেই উৎপাদন হইতেছে বলিয়া ধরিতে হইবে।

উন্নয়ন নির্ভর করে উৎপাদনের উপর আর উৎপাদন নির্ভর করে উহার উপাদানগুলির সঠিক সংগঠনের উপর। উৎপাদন বলিতে যে প্রক্রিয়া বোঝায় তাহার একপ্রান্তে রহিয়াছে উপাদানসমূহ, যথা প্রাকৃতিক সম্পদ, মানবিক সম্পদ ও মূলধন, ইহারা উৎপাদন প্রক্রিয়ার একপ্রান্ত দিয়া উহাতে প্রবেশ করিতেছে আর উৎপাদন প্রক্রিয়ার অপর প্রান্তে রহিয়াছে উৎপন্ন সামগ্রী, উহারা উৎপাদন প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত ফল। যাহার দ্বারা উৎপাদন কার্য সম্পন্ন করা হয় তাহাকে উপাদান (input) বলে আর যাহা প্রস্তুত করা হয় তাহাকে উৎপাদন (output) বলা হয়। উৎপাদন নির্ভর করে উপাদানসমূহ ও উৎপাদন পদ্ধতি—এই দুই বিষয়ের উপর। মোট উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে, হয় সকল উপাদানগুলির নিয়োগ বৃদ্ধি করিতে হইবে নতুবা উৎপাদন পদ্ধতি বা কৃৎকৌশলের উন্নয়ন করিতে হইবে। উপাদান ও উৎপাদনের মধ্যে যে ক্রিয়াগত সম্পর্ক রহিয়াছে তাহাকে উৎপাদন অপেক্ষক (production function) বলা হয়।

ধরা যাক কোন দেশের মোট উৎপাদন Z দ্বারা নির্দেশ করা হইতেছে এবং উৎপাদনে X ও Y—এই দুই প্রকার উপাদান ব্যবহৃত হয়। তাহা হইলে $Z=f(x,y)$; অন্যভাবে বলা যায় যে Z উৎপাদনের পরিমাণ X ও Y এর পরিমাণের উপর নির্ভর করে। X ও Y-এর নিয়োগের পরিমাণ জানা থাকিলে উৎপাদনের পরিমাণ জানা যাইবে আর X ও Y-এর নিয়োগের পরিমাণ পরিবর্তিত হইলে Z উৎপাদনের পরিমাণও নির্দিষ্টভাবে পরিবর্তিত হইবে। কি পরিমাণ X ও Y দ্বারা কতখানি Z উৎপাদন করা যাইবে তাহা নির্ভর করে কৃৎকৌশল ও কারিগরী জ্ঞানের উপর। উৎপাদন-উপাদানের কার্য সম্মিলন কিভাবে করা যাইবে তাহাই সংগঠকের প্রধান দায়িত্ব।

জনসংখ্যার বৃদ্ধি (Population Growth) : দেশের জনগণই উহার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ আর মানবিক সম্পদের উৎস। উৎপাদনের অন্যতম মৌলিক উপাদান হইল শ্রম বা শ্রমিক। শ্রমিককে উৎপাদনের সক্রিয় এজেন্ট বলা হয় কারণ মানুষের শ্রমের মাধ্যমেই প্রাকৃতিক সম্পদকে উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করা যায়। মানুষ তাহার শ্রমের সাহায্যে প্রাকৃতিক সম্পদকে নানাবিধ দ্রব্যে পরিণত করে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন হার শুধুমাত্র শ্রমিকের সংখ্যার উপর নির্ভর করে না, উহা শ্রমিকের দক্ষতার উপরও নির্ভর করে। অবশ্য দেশের জনসংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত হইলে উহা উন্নয়নের পথে এক বিরাট বাধার সৃষ্টি করে। দেশে যে পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ ও মূলধন রহিয়াছে উহাদের পরিপূর্ণ ব্যবহার করিয়া অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ত্বরান্বিত করিতে হইলে এক নির্দিষ্ট সংখ্যক জনসংখ্যা থাকা প্রয়োজন। এই জনসংখ্যাকে কাম্যজনসংখ্যা বলে কারণ ঐ জনসংখ্যার দ্বারাই জাতীয় আয় সর্বাধিক ও উৎপাদন ব্যয় ন্যূনতম হইবে। দেশের প্রকৃত জনসংখ্যা কাম্যজনসংখ্যা অপেক্ষা অধিক হইলে মাথাপিছু আয় কমিয়া যাইবে এবং দেশে জনসংখ্যা অতিরিক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে। আবার কাম্য জনসংখ্যা অপেক্ষা প্রকৃত জনসংখ্যা কম হইলে দেশটিকে জনবিরল বলা হইবে; এই অবস্থায়ও মাথাপিছু আয় ও জাতীয় আয় সর্বাধিক হইবে না।

কাম্য জনসংখ্যাকে একটি সূত্রের সাহায্যে সহজে প্রকাশ করা যায়। যদি A-দ্বারা প্রকৃত জনসংখ্যা, O দ্বারা কাম্য জনসংখ্যা এবং M দ্বারা অসামঞ্জস্য প্রকাশ করা হয় তাহা হইলে আমরা এই সমীকরণটি পাই

$$M = \frac{A-O}{O}$$

যদি M ধনাত্মক হয় তাহা হইলে দেশে জনাধিক্য দেখা দিবে, M যদি ঋণাত্মক হয় তাহা হইলে দেশে জনবিরলতা দেখা দিবে। M যদি শূন্য হয় তাহা হইলে দেশের জনসংখ্যাকে কাম্য বলিয়া অভিহিত করা যাইবে। মনে রাখা দরকার যে, কাম্য জনসংখ্যা কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নয়, দেশের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাম্য জনসংখ্যারও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।

জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। নূতন দেশে জনসংখ্যাবৃদ্ধি উহার অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করিয়া থাকে আবার জনসংখ্যা অতিরিক্ত হইয়া পড়িলে উহা উন্নয়নের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। অনুন্নত দেশে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি উহার উন্নয়নের সবচেয়ে বড় ধাপ। মাথাপিছু আয় স্বল্প ও মূলধন গঠনের হার কম বলিয়া এই সকল দেশে দ্রুত বর্ধমান জনসংখ্যা একটি সমস্যা হইয়া দেখা দিয়াছে। উন্নত কৃৎকৌশল নিয়োগ করিয়া যে উৎপাদন বৃদ্ধি হয় তাহা বাড়তি জনগণের খাদ্য সংগ্রহে নিঃশেষিত হওয়ায় জনগণের জীবনযাত্রার মানে কোনরূপ উন্নতি দেখা যায় না। দ্বিতীয়তঃ,

দ্রুত জনসংখ্যার দরুন দেশে মূলধন ঘাটতি আরও তীব্র আকারে দেখা দিবে কারণ যে সম্পদ বিনিয়োজিত হইতে পারিত তাহা জনগণের ভোগে ব্যবহৃত হইবে। তৃতীয়তঃ অর্ধোন্নত দেশে বালকবালিকা অনুপাতে ঘর বেশী, মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ-উহারা শুধুমাত্র ভোগ করে কিন্তু উৎপাদনে উহাদের কোন অবদান নাই।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য জনসম্পদ কাম্যভাবে ব্যবহার করিতে হইবে। প্রথমতঃ, জনসংখ্যার বিপুল বৃদ্ধি রোধ করিতে হইবে। জনসংখ্যার আয়তন নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আসিলে তবেই উহার সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হইবে। ইহার জন্য পরিবার পরিকল্পনার কার্যসূচী গ্রহণ ও কার্যকর করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষার মাধ্যমে শ্রমিকদের দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তন করিয়া উহাকে উন্নয়নমুখী করিয়া তুলিতে হইবে। আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে শ্রমের উৎপাদনশীলতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। শিক্ষাব্যবস্থা যাহাতে উৎপাদনমুখী হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তৃতীয়তঃ মানবিক মূলধন গঠন করিতে হইবে। উন্নয়নের উদ্দেশ্যে শিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিকশ্রেণী গড়িয়া তুলিতে হইবে। মানবিক মূলধন গঠন বলিতে বোঝায় জনগণের জ্ঞান, দক্ষতা এবং উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি করা। বিনিয়োগের অভাবে অনুন্নত দেশে জ্ঞান, দক্ষতা ও কারিগরী নৈপুণ্য কম হয়। এই অভাব পূরণ করিবার জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সেবাখাতে ব্যয় বৃদ্ধি করিয়া মানবিক মূলধন গঠনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করিতে হইবে।

প্রাকৃতিক সম্পদ (Natural Resources) : উৎপাদনকার্য পরিচালনা করিতে হইলে যে সকল উপাদানের প্রয়োজন হয় তাহার মধ্যে আছে প্রাকৃতিক সম্পদ। প্রাকৃতিক সম্পদকে মানুষ তাহার শ্রমের সাহায্যে অভাব মিটাইবার উপযোগী করিয়া তোলে। প্রাকৃতিক দান ব্যতীত উৎপাদন অসম্ভব। সুতরাং প্রাকৃতিক সম্পদই হইল উৎপাদনের অন্যতম মৌলিক উপাদান। অর্থনীতিতে ইহাকে 'জমি' বলিয়া অভিহিত করা হয়।

প্রকৃতি কোন দেশকে প্রভূত প্রাকৃতিক সম্পদ দিয়াছে আবার কোন দেশকে প্রাকৃতিক সম্পদের দিক হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। খনিজ সম্পদ না থাকিলে কোন দেশের পক্ষে মূল বা ভারী শিল্প গড়িয়া তোলা কঠিন।

যে দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের বিশেষ অভাব আছে সেখানে দ্রুত উন্নয়ন করা কঠিন কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ থাকিলে যে উন্নতি হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। সাধারণ ভাবে বলা যায় যে লৌহ আকরিক, কয়লা, ম্যাংগানিজ ও চুনাপাথর না থাকিলে কোন দেশের পক্ষে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়িয়া তোলা প্রায় দুঃসাধ্য। কিন্তু ব্যতিক্রমও আছে। জাপানে লৌহ আকরিক পাওয়া যায় না বলিলেই চলে তথাপি অন্য দেশ হইতে উহা আমদানী করিয়া জাপান তাহার ইস্পাত শিল্প গড়িয়া তুলিয়াছে। এইরূপ দুই একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে সাধারণভাবে বলা যায় যে প্রাকৃতিক সম্পদের অবস্থিতিই উন্নয়নের সহায়ক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য জার্মানী ও সোভিয়েত রাশিয়ার উন্নয়নে ওইসব দেশের খনিজ সম্পদ সাহায্য করিয়াছে। মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলির অভূতপূর্ব দ্রুত সমৃদ্ধির পিছনে রহিয়াছে তাহাদের তেলসম্পদ। ভারতের যথেষ্ট পরিমাণে খনিজ সম্পদ আছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে উহাদের ব্যবহার হইতেছে না।

মনে রাখিতে হইবে যে যথেষ্ট পরিমাণে প্রাকৃতিক সম্পদ থাকিলে উন্নতি হইবে এমন কোন কথা নেই—উহাদের ঠিকমত ব্যবহার করিতে জানা চাই। সম্পদ থাকা সত্ত্বেও যদি উহার ঠিকমত ব্যবহার না হয় তাহা হইলে দেশটি উন্নতি করিতে পারিবে না। প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারসম্পর্কে জনগণ উদাসীন থাকিলে দেশটি অনগ্রসর থাকিয়া যাইবে। ইউরোপের লোকেরা উত্তর আমেরিকায় বসতি স্থাপন করিবার পূর্বেও সেখানে প্রাকৃতিক সম্পদ ছিল কিন্তু আমেরিকার আদিম অধিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানগণ ওই সকল সম্পদ ব্যবহার সম্পর্কে কোন জ্ঞান না থাকায় তাহারা অনুন্নতই থাকিয়া গিয়াছিল। সুতরাং মনে রাখিতে হইবে যে প্রাকৃতিক সম্পদ উৎপাদনের উপাদান হিসাবে নিষ্ক্রিয়। প্রাকৃতিক সম্পদ থাকিলেও বিনা প্রয়াসে কোন দেশ ওই সকল সম্পদ হইতে কোন সুবিধা লাভ করিতে পারে না। ওই সকল সম্পদের ব্যবহার জানাও প্রয়োজন। সেইজন্য বলা যায় যে, প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার নির্ভর করে উন্নত জ্ঞান ও কৃৎকৌশলের উন্নত মানের উপর। উন্নত মানের কৃৎকৌশল আয়ত্তে না থাকিলে অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদও যে দেশের উন্নতির সহায়ক হয় না তাহা আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের দৃষ্টান্ত হইতেই উপলব্ধি করা যায়।

বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নানারূপ বিধিনিষেধ আরোপিত হওয়ায়

প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবাধ বাণিজ্যের স্বর্ণযুগে যথেষ্ট পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ না থাকিলেও বিদেশ হইতে কাঁচামাল আমদানী করিয়া দেশের উন্নতি করা সম্ভব ছিল। এইভাবেই যুক্তরাজ্য, জাপান ও অন্যান্য দেশ সমৃদ্ধির উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিল। কিন্তু বাণিজ্যে নানারূপ নিয়ন্ত্রণ চাপাইয়া ওইববনের বাণিজ্যেক সুবিধা ব্যাহত করা হইতেছে।

দেশের যত উন্নতি হইবে উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব তত হ্রাস পাইবে। উন্নয়নের সাথে সাথে মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে এবং কৃৎকৌশলের মান উন্নত হইবে। কৃৎকৌশলগত উন্নয়নের ফলে উৎপাদনে জমির অনুপাত হ্রাস পাইবে। জমির যোগান সীমাবদ্ধ কিন্তু অন্যান্য উপাদানের যোগান বৃদ্ধি করা সম্ভব। সুতরাং অন্যান্য অবস্থা একরূপ থাকিলে, দেশের উন্নতির সঙ্গে জমির আপেক্ষিক দুষ্প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পাইবে।

অধ্যাপক লুইস বলেন প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার নির্ভর উহার ব্যবহারের উপর আর সম্পদের ব্যবহার রুচির পরিবর্তন, কৃৎকৌশলের পরিবর্তন ও নূতন আবিষ্কারের দরুণ সর্বদা পরিবর্তিত হইতেছে।

মূল সঞ্চয় (Capital Accumulation) : উন্নয়নের তৃতীয় প্রয়োজনীয় উপাদান হইল মূলধন। মূলধন হইল পুনোরুৎপাদনযোগ্য উৎপাদনের উপাদান। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে মূলধনের যে পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাহাকে মূলধন গঠন বা মূলধন সঞ্চয় বলে। নার্কস বলেন, মূলধন গঠনের অর্থ হইল সমাজ আহার বর্তমান কর্মপ্রচেষ্টার সমস্তটাই বর্তমান ভোগ ও চাহিদা পূরণে ব্যয় না করিয়া উহার একাংশ মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োগ করে; মূলধনী দ্রব্য হইল যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, মেশিন ইত্যাদি। সুতরাং বলা যায় যে মূলধন গঠন হইল মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে বিনিয়োগ করিয়া মূলধন, জাতীয় আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধি করা। সুতরাং উন্নয়নের মূল উৎস হইল মূলধন গঠন।

অধ্যাপক লুইস বলিয়াছেন যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল সমস্যা হইল, যে দেশ তাহার জাতীয় আয়ের ৪ অথবা ৫ শতাংশ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ করিতেছে কি প্রক্রিয়ায় তাহাকে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি করিয়া উহাকে জাতীয় আয়ের ১২ হইতে ১৫ শতাংশে রূপান্তরিত করা যায়। ইহাই মূল সমস্যা কারণ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন মূলধন গঠন।

সাধারণ বৃদ্ধির সাহায্যে বোঝা যায় যে, সাধারণতঃ যে দেশে শ্রমিকপিছু অধিক মূলধন নিয়োগ করা হয় সেখানে মাথাপিছু আয়ও বেশী হয়। যে সব দেশে মূলধন গঠনের হার বেশী সেই সব দেশে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটিতেছে। অনগ্রসর এলাকার অনুন্নতির সবচেয়ে বড় কারণ হইল যে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করিবার মতো ইহাদের যথেষ্ট মূলধন নাই।

মোট জাতীয় আয় বৃদ্ধি অপেক্ষা মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিতে আমরা অধিক আগ্রহী বলিয়া যে সব কারণে উৎপাদন বৃদ্ধি তাহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুণ যদি মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে মাথাপিছু আয় নাও বাড়িতে পারে—এমন কি কমিয়া যাইতে পারে যদি উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধির অধীন হয়। কিন্তু অপরপক্ষে যদি মূলধন বৃদ্ধি অথবা কৃৎকৌশলতাও উন্নতির দরুণ উৎপাদন বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে মোট উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাথাপিছু আয়ও বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া মোট উৎপাদন বাড়াইলে যতখানি অর্থনৈতিক কল্যাণ বৃদ্ধি পাইবে শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া তাহা হইবে না।

মূলধন গঠন প্রক্রিয়ায় তিনটি পর্যায় আছে : প্রথমতঃ, প্রকৃত সঞ্চয় থাকিবে এবং উহা বৃদ্ধি পাইবে, দ্বিতীয়তঃ, ঋণদানকারী ও অর্থসরবরাহকারী সংস্থা থাকিবে যাহার সাহায্যে সঞ্চয় একত্রীভূত করিয়া সঠিক পথে চালিত করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ ওই সঞ্চয় মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে বিনিয়োগ করিতে হইবে।

মূলধন গঠনের দরুণ জাতীয় উৎপাদন নানাভাবে বৃদ্ধি পায়। অর্ধোন্নত দেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা পূরণের জন্য মূলধন গঠন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। মূলধনী খাতে বিনিয়োগ শুধুমাত্র উৎপাদনই বৃদ্ধি করে না, কর্মসংস্থানও বাড়ায়। মূলধন গঠনের ফলে কৃৎকৌশলগত উন্নতি ঘটে। কৃৎকৌশলগত উন্নতির দরুণ বিশেষীকরণ ঘটে এবং বৃহদায়তন উৎপাদনের জন্য ব্যয়সংকোচের সুবিধা পাওয়া যায়। মূলধন গঠনের সাহায্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক মাথাপিছু ধার্য ব্যয় (যেমন পরিবহন, বিদ্যুৎ, শিক্ষা ইত্যাদি) বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। মূলধন গঠন করিয়া প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করা সম্ভব হয়, শিল্পায়ন দ্রুততর ও বাজার সম্প্রসারিত হয় আর এইগুলি অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন।

জনবহুল অর্ধোন্নতদেশে মাথাপিছু উৎপাদন বৃদ্ধি মূলধন-শ্রম অনুপাত বৃদ্ধির সহিত জড়িত। যে দেশ মূলধন-শ্রম অনুপাত বৃদ্ধি করিতে আগ্রহী

তাহাদের দুইটি সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। প্রথমতঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত মূলধন-শ্রম অনুপাত হ্রাস পায়। এই মূলধন-শ্রম অনুপাত হ্রাস প্রতিরোধ করিতে হইলে অধিক পরিমাণে নীট বিনিয়োগ করা প্রয়োজন যাহা অর্ধোন্নত দেশে সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ দেশে জনসংখ্যা দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের জন্য যথেষ্ট সঞ্চয় সংগ্রহ করা কঠিন কারণ এই সব দেশে মাথাপিছু আয় খুবই কম। তবুও সঞ্চয়কে উৎসাহিত করিবার জন্য মূলধন গঠনের হার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

মূলধনের চাহিদা ও যোগান দ্বারা মূলধন গঠনের হার নির্ধারিত হয়। মূলধনের চাহিদা নির্ভর করে বিনিয়োগ করিবার প্রনোদনার উপর। মূলধনের যোগান নির্ভর করে সঞ্চয়ের ক্ষমতা ও ইচ্ছার উপর। অর্ধোন্নত দেশে মূলধনের চাহিদা ও যোগানের দিকে দুষ্টচক্র কাজ করিতেছে। যোগানের দিকে, আয় কম বলিয়া সঞ্চয়ের ক্ষমতাও কম। সঞ্চয় কম হওয়ায় মূলধন উৎপাদনও কম হয়। মূলধন কম হওয়ায় উৎপাদনক্ষমতা কম হয়, তাহার ফলে আয় কম হয় আর উহার দরুন সঞ্চয়ের ক্ষমতাও কম হয়। এইভাবে মূলধনের অভাব দুষ্টচক্রের সৃষ্টি করে। আবার চাহিদার দিকে, জনগণের ক্রয়ক্ষমতা কম বলিয়া বিনিয়োগের প্রণোদনার অভাব রহিয়াছে। আর এই জন্যে মূলধন উৎপাদনে আগ্রহের অভাব দেখা যায়। মূলধন কম বলিয়া উৎপাদন-ক্ষমতা ও আয় কম হয়। আয় কম বলিয়া ক্রয়ক্ষমতা কম হয়। এইজন্য এইজন্য অধ্যাপক নার্কস বলিয়াছিলেন অর্ধোন্নত দেশে দারিদ্র্যের যে দুষ্টচক্র মূলধন গঠনের মাধ্যমে উহাকে ভেদ করিতে হইবে।

অর্ধোন্নত দেশে বাণিজ্য ব্যালান্সের সমস্যা দেখা দেয় কারণ ইহারা প্রধানতঃ কাঁচামাল ও কৃষিজাত পণ্য রপ্তানী করে আর শিল্পজাত দ্রব্য আমদানী করে। দেশে মূলধন গঠন করিয়া বাণিজ্য ব্যালান্সের সমস্যার সুরাহা করা যায়। আমদানী-পরিবর্ত শিল্প গড়িয়া তুলিয়া শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানী কমান যায় আবার ভোগ্যপণ্য ও মূলধনীদ্রব্যের উৎপাদন বাড়াইয়া রপ্তানীর প্রকৃতি পরিবর্তন করা যায়। কৃষিজ পণ্যের সঙ্গে শিল্পজাত দ্রব্যও রপ্তানী করা যাইতে পারে। এইভাবে মূলধন গঠন বাণিজ্য-ব্যালান্স সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করে।

দ্রুতহারে মূলধন গঠিত হইলে বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন হ্রাস পাইবে। বস্তুতঃ মূলধন গঠন দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া বৈদেশিক ঋণের

ভার লাঘব করে। বিদেশ হইতে দীর্ঘকালীন ঋণ গ্রহণ করিলে ভবিষ্যৎ বংশধরদের উপর এক গুরুভার চাপান হয়। প্রতিটি ঋণ বাবদ সুদ দিন দিন বাড়িতে থাকে আর উহা পরিশোধ করিতে হইলে বেশী করিয়া কর ধার্য করিতে হইবে। করের ভার বাড়িতে থাকে এবং ঋণ পরিশোধের দরুণ দেশ হইতে অর্থ বিদেশে চলিয়া যায়। মূলধন গঠন করিয়া দেশকে বৈদেশিক সাহায্য হইতে মুক্ত করিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ করা যায়।

বিকাশমান দেশে মূলধন গঠনের হার বৃদ্ধি করিয়া মুদ্রাস্ফীতির চাপ যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করা সম্ভব। মূলধন গঠনের হার বৃদ্ধি পাইলে কৃষিজ পণ্য ও শিল্পজাত ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। অপর পক্ষে, মূলধন গঠনের ফলে আয় বৃদ্ধি পাইলে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। স্বল্পকালীন সময়ে, উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া বর্ধিত চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয় না বলিয়া দেশে মুদ্রাস্ফীতির চাপ বৃদ্ধি পায়। দীর্ঘকালীন সময়ে মূলধন গঠনের হার ক্রমাগত বৃদ্ধি করিতে পারিলে দ্রব্যসামগ্রীর যোগান বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং অর্থনীতির অস্থিরতা দূর হইবে।

মূলধন গঠন দেশের অর্থনৈতিক কল্যাণকে প্রভাবিত করে। মূলধনের সহায়তায় বিকাশমান দেশের বর্ধিত জনগণের সকল চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়। মূলধনের গঠনের ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং বিভিন্ন ধরনের শিল্প গঠিত হইলে আয়স্তর বৃদ্ধি পায় ও জনগণের নানাবিধ চাহিদার পূরণ হয়, তাহাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয় এবং অর্থনৈতিক কল্যাণ বর্ধিত হয়।

পরিশেষে, মূলধন গঠনের হার বৃদ্ধি পাইলে জাতীয় আয়স্তর বৃদ্ধি পাইবে। মূলধন গঠন জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে যাহার দরুণ জাতীয় আয়ের হার ও স্তর বৃদ্ধি পায়। সুতরাং জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ও স্তর নির্ভর করে মূলধন গঠনের হারের উপর। অতএব দেখা গেল যে অর্ধোন্নত দেশের জটিল সমস্যাসমূহের মূল সমাধান মূলধন গঠনের মধ্যে নিহিত আছে আর উহাই হইল উন্নয়নের চাবিকাঠি।

বিশেষীকরণ ও শ্রমবিভাগ (Specialisation and Division of Labour) ঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষীকরণ ও শ্রমবিভাগের এক বিশেষ ভূমিকা রহিয়াছে। বিশেষীকরণ ও শ্রমবিভাগের দরুন উৎপাদন ক্ষমতা

বৃদ্ধি পায়, আর উহার দরুন বৃহদায়তন উৎপাদনের সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি পায় যাহা শিল্পোন্নয়নে আরও সহায়তা করে। বিকাশমান দেশগুলিতে শিল্পগুলির আয়তন প্রধানতঃ ছোট বলিয়া উহারা শ্রমবিভাগ ও বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা লাভে অসমর্থ হয়। আর ইহার দরুন উন্নয়নের হার কমিয়া যায়।

এ্যাডাম স্মিথ অর্থনৈতিক উন্নয়নে শ্রমবিভাগের অবদান বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রমবিভাগের দরুন শ্রমিকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়। প্রতিটি শ্রমিক পূর্বের তুলনায় অধিকতর দক্ষ হয় ও উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু শ্রমবিভাগ নির্ভর করে বাজারের আয়তনের উপর আর বাজারের আয়তন নির্ভর করে অর্থনৈতিক উন্নতির উপর।

জুতা সেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ করিবার যোগ্যতা এরূপ ব্রাহ্মণকে উপন্যাসের আদর্শ নায়ক করা যাইতে পারে কিন্তু ব্রাহ্মণের কাজ হইল চণ্ডীপাঠ করা আর সে যদি তাহার কার্যাবলী উহার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে তাহা হইলে সমাজের কল্যাণ ও দেশের উন্নতি হইবে। আদিম সমাজেও শ্রমবিভাগ অজানা ছিল না; স্বর্গের নন্দনকাননে আদম ফলমূল আহরণ করিত আর ইভ কাপড় বুনিত। উৎপাদনের সমগ্র প্রক্রিয়াকে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক পর্যায়ের জন্য পৃথক পৃথক লোক নিযুক্ত করিলে সেই ব্যবস্থাকে শ্রমবিভাগ বলে। শ্রমবিভাগ প্রথমে পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তী কালে গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া অর্থনৈতিক জীবন বিবর্তিত হইলে এক একটি পরিবার এক একটি কাজে নিযুক্ত রহিল। আধুনিক কালে নগরকেন্দ্রিক সভ্যতায় শ্রমবিভাগ আরও জটিল আকার ধারণ করিল।

শ্রমবিভাগের দরুন উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে ও বর্তমানের উন্নত জীবনযাত্রার মান সম্ভব হইয়াছে। উৎপাদন বৃদ্ধির পিছনে যে সকল শক্তি কাজ করে আসলে তাহারা শ্রমবিভাগেরই সুবিধা। এ্যাডাম স্মিথ তাঁহার Wealth of Nations গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, একজন ব্যক্তি আলপিনের সুরু হইতে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি অংশ প্রস্তুত করিলে দিনে ২০টির বেশী আলপিন তৈয়ারী করিতে পারিবে না। কিন্তু যদি দশজন ব্যক্তির মধ্যে ঠিকমত শ্রমবিভাগ করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহারা দিনে ৪৮০০ আলপিন তৈয়ারী করিতে পারে শ্রমবিভাগ না থাকিলে প্রগতির পথ রুদ্ধ হইয়া যাইত।

অর্ধোন্নত দেশে জীবনযাত্রার মান নীচু হওয়ার কারণ এই যে এই দেশগুলিতে শ্রমবিভাগ বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই। এখনো দেশের বিরাট

অংশ জুড়িয়া আদিম ধরনের ছোট ছোট আয়তনের উৎপাদন ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রমবিভাগ এখনও এই দেশগুলির বিরাট অসংগঠিত ক্ষেত্রে ব্যবসায়গত বিভাগেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। কোন একটি দ্রব্যের উৎপাদনের প্রথম পর্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত যখন একজন শ্রমিক সম্পন্ন করে তখন তাহাকে ব্যবসায়গত শ্রমবিভাগ বলে। বিবর্তনের চূড়ান্ত পর্যায় আসিয়া শ্রমবিভাগ অতি সূক্ষ্ম হয়। উন্নয়নের চূড়ান্ত পর্যায়ে শ্রমবিভাগ একটি পর্যায়ের অসম্পূর্ণ শ্রমবিভাগের রূপ গ্রহণ করে। এই পর্যায়ে কোন ব্যক্তি উৎপাদনের কোন বিশেষ পর্যায় সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন করেনা।

উৎপাদনের বহর বড় হইলে তবেই শ্রমবিভাগ প্রসার লাভ করিতে পারে। বিকাশমান দেশগুলিতে উৎপাদন কেন্দ্রগুলি সাধারণতঃ ছোট আকারের বলিয়া ইহারা শ্রমবিভাগের পরিপূর্ণ সুযোগ-সুবিধা লাভ হইতে বঞ্চিত। শ্রম বিভাগ ও বিশেষীকরণের পরিপূর্ণ সুবিধা পাইতে হইলে উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বৃহদায়তন কলকারখানা স্থাপন করিতে হইবে।

বৃহদায়তন উৎপাদন(Large Scale Production) **:** বৃহদায়তন উৎপাদনই শিল্পবিপ্লব ঘটায় আর ওই সময় হইতে মানুষ বৃহদায়তন উৎপাদনের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে সুরু করে। বর্তমান যুগকে বৃহদায়তন উৎপাদনের যুগ বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। শ্রমবিভাগ ও যন্ত্রের ব্যবহার বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থাকে সম্ভব করিয়াছে। শ্রমবিভাগ ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে যেসকল সুযোগসুবিধা ও ব্যয়সংকোচ ভোগ করা যায় উহার সকল কিছুই বৃহদায়তন শিল্প ভোগ করিয়া থাকে। বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা-গুলিকে আয়তনবৃদ্ধিজনিত বা বহরবৃদ্ধিজনিত ব্যয়সংকোচ বলা হয়।

উৎপাদনের বহর বড় হইলে শ্রমবিভাগ প্রসার লাভ করিতে পারিবে আর শ্রমবিভাগ প্রসারলাভ করিলে দক্ষতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে, জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাইবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হইবে। উৎপাদনের আয়তন বড় করিতে হইলে প্রভূত মূলধনের প্রয়োজন। অর্ধোন্নত দেশগুলিতে মূলধনের বিশেষ অভাব থাকায় এই সব দেশে উৎপাদনের বহর প্রধানতঃ ছোট আকারের হয় আর সেইজন্য উৎপাদনও কম হয়।

উৎপাদনের বহর বৃদ্ধি পাইলে যে সকল সুবিধা পাওয়া যায় তাহাদের দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়—অভ্যন্তরীণ ব্যয়সংকোচনজনিত সুবিধা আর বাহ্যিক ব্যয়সংকোচনজনিত সুবিধা। কোন একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান নিজস্ব

উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া যে সকল সুবিধা লাভ করে তাহাদের অভ্যন্তরীন ব্যয় সংকোচন বলে। এই ধরনের ব্যয়সংকোচ প্রতিষ্ঠানটির অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। শিল্প প্রতিষ্ঠানের আয়তন বৃদ্ধির দরুন সংগঠন ও পরিচালনাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পায় ও সেই কারণে এই ধরনের ব্যয়সংকোচন দেখা দেয় এবং শিল্পসংস্থাটি এককভাবে উহা ভোগ করে। সাধারণভাবে শিল্প প্রসারের ফলে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান বাড়তি কতকগুলি সুযোগসুবিধা লাভ করিলে তাহাকে বাহ্যিক ব্যয়সংকোচন বলে। বাহ্যিক ব্যয়সংকোচনের উৎপত্তির কারণ শিল্পের একদেশতা। এই ধরনের ব্যয়সংকোচন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংগঠনের উপর নির্ভর করে না—উহা নির্ভর করে কতকগুলি বাহ্যিক কারণের উপর। এই ধরনের সুবিধা কোন একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান লাভ করে না—ওই শিল্পের অন্তর্গত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই ওই সুবিধা পাইয়া থাকে। প্রধান প্রধান অভ্যন্তরীণ সুবিধাগুলি নিম্নে বর্ণনা করা হইল :

১। **কৃৎকৌশলগত সুবিধা** (Technical Economies): বড় যন্ত্র ব্যবহার এবং বৈজ্ঞানিক উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণের ফলে যে সুবিধা পাওয়া যায় তাহাকে কৃৎকৌশলগত সুবিধা বলে। একমাত্র বড় বড় কারখানায় বড় যন্ত্র ব্যবহার করা যাইতে পারে। বড় যন্ত্র তৈয়ারী করিতে আনুপাতিক খরচ কম হয় আবার তুলনামূলকভাবে বড় যন্ত্র অধিক উৎপাদনক্ষম। কৃৎ-কৌশলগত সুবিধার প্রধান কারণ হইল উন্নত যন্ত্রকৌশলজনিত সুবিধা। এমন অনেক যন্ত্রপাতি আছে যাহা ছোট আকারে তৈয়ারী করা যায় না। কমপিউ-টার বড় কারখানায়ই নিয়োগ করা যায়, ক্ষুদ্র কারখানার কাজের পরিমাণ কম বলিয়া ওইরূপ যন্ত্র অপ্রয়োজনীয়। যে সংবাদপত্রের ব্যাপক চাহিদা আছে সেখানে রোটারী মেশিন ব্যবহার করা হয়।

কারখানার আয়তন যতই বাড়িতে থাকে ততই বিশেষীকরণ ও শ্রম-বিভাগের সুযোগ বৃদ্ধি পায়, ফলে উৎপাদনও বাড়ে। অবশ্য কৃৎকৌশলগত ব্যয় সংকোচের একটা সীমা আছে যাহা অতিক্রম করিয়া গেলে ব্যয়সংকোচের পরিবর্তে ব্যয়বৃদ্ধি ঘটিবে।

২। **পরিচালনাগত সুবিধা** (Managerial Economies): কারখানার আয়তন বাড়াইয়া অথবা কয়েকটি কারখানাকে একমালিকানায় আনিয়া অধিকতর দক্ষতার সহিত পরিচালনা করা যাইতে পারে। বড় প্রতিষ্ঠানে দুইটি কারণে পরিচালনাগত সুবিধা দেখা দেয়। প্রথমতঃ, খুঁটিনাটি কাজের

ভার অধস্তন কর্মচারীদের উপর ছাড়িয়া দিয়া পরিচালক সংগঠন ও পরিকল্পনার কঠিন কাজে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, বড় প্রতিষ্ঠানে পরিচালনারও বিশেষীকরণ সম্ভব হয়। ছোট কারবারের মালিককে সবকিছুই নিজে তদারক করিতে হয় বলিয়া বিশেষীকরণ হয় না কিন্তু বড় কারবারে একই পরিচালককে সবকিছু দেখাশোনা করিতে হয় না। এই ক্ষেত্রে পরিচালনার কাজকে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বিভাগের জন্যে একজন করিয়া বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা যাইতে পারে।

৩। **বাণিজ্যিক সুবিধা** (Marketing Economies) ঃ বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান ক্রয়বিক্রয়ের ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা পাইয়া থাকে। বড় কারখানা সুবিধা দরে কাঁচামাল কিনিতে পারে ; ছোট কারখানার মালিক একসঙ্গে কম মাল কেনে বলিয়া সে পাইকারী দামের সুবিধা পায় না। বড় কারবার দক্ষ সেলসম্যান, ক্যানভাসার, সেলস রিপ্রেজেনটেটিভ নিয়োগ করিতে পারে, বিজ্ঞাপন মারফৎ ব্যাপক প্রচার কার্য চালাইয়া নূতন নূতন বাজার সৃষ্টি করে এবং রেল ও জাহাজ কোম্পানীর কাছ থেকে ভাড়ার সুবিধা পাইয়া থাকে।

৪। **আর্থিক সুবিধা** (Financial Economies) ঃ বড় কারবারের পক্ষে অর্থ সংগ্রহের বিশেষ সুবিধা আছে। বড় কারবার সুবিধাজনক সর্তে ব্যাংক হইতে টাকা ধার করিতে পারে এবং কারবারের সুনামের দরুন শেয়ার বা ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া অনায়াসে মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে। ব্যাংক, বীমা কোম্পানী প্রভৃতি সংস্থা যত সহজ সর্তে বড় কারবারকে টাকা ধার দেয়, ছোট কারবারকে তাহা দেয় না।

৫। **ঝুঁকিবহনের সুবিধা** (Risk-bearing Economies) : বড় কারবারকে ছোট কারবার অপেক্ষা অনেক বেশী ঝুঁকি বহন করিতে হয়। একটিমাত্র গরু লইয়া ব্যবসায় করে এমন গোয়ালার গরু মরিলে তাহার সমস্ত ব্যবসাটাই নষ্ট হইয়া যাইবে কিন্তু যে ব্যক্তি অনেক গরু লইয়া ব্যবসায় করে একটি বা দুইটি গরুর মৃত্যুতে তাহার খুব বেশী ক্ষতি হয় না। বড় প্রতিষ্ঠান তিনটি পদ্ধতিতে ঝুঁকি কমাইতে পারে, প্রথমতঃ উৎপাদনের বিকেন্দ্রীকরণ : বড় প্রতিষ্ঠান একটিমাত্র দ্রব্য উৎপাদন না করিয়া যদি কয়েকটি সংশ্লিষ্ট দ্রব্য উৎপাদন করে তাহা হইলে একটি দ্রব্যের বাজারে মন্দা দেখা দিলে সে অপর দ্রব্য বিক্রয় করিয়া লোকসান পোষাইয়া লইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, **বাজারের বিকেন্দ্রীকরণ :** বড় প্রতিষ্ঠান সাধারণতঃ বিভিন্ন বাজারে তাহার দ্রব্য

বিক্রয় করে। একটি বাজারের উপর নির্ভরশীল থাকিলে যদি কোন কারণে সেই বাজারে মন্দা দেখা দেয় তাহা হইলে উৎপাদক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। তৃতীয়তঃ কাঁচামাল যোগানের বিকেন্দ্রীকরণ: বড় প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন উৎস হইতে কাঁচামাল সংগ্রহ করে ফলে কোনও কারণে একটি উৎস হইতে যোগান বন্ধ হইলেও উৎপাদন ব্যবস্থা চালু রাখা যায়।

বাহ্যিক সুবিধাগুলি মূলতঃ আঞ্চলিক উন্নয়নের সুবিধা। এই সুবিধাগুলি নিম্নে বর্ণনা করা হইল:

১। **কেন্দ্রীভবনজনিত সুবিধা** (Economies of Concentration): যখন কোনও একস্থানে কোন শিল্পের অন্তর্গত ফার্মগুলি কেন্দ্রীভূত হয় তখন প্রত্যেক কারখানাই কিছু কিছু সুবিধা ভোগ করে। দক্ষ শ্রমিকেরা কাজের প্রত্যাশায় এইসব অঞ্চলে আসিয়া বাস করে ফলে দক্ষ শ্রমিক পাইতে কোন প্রতিষ্ঠানের বেগ পাইতে হয় না। কোন স্থানে শিল্প কেন্দ্রীভূত হইলে রেল ও স্টীমার কোম্পানী পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করিবে ফলে সকল কারখানাই কম খরচে পণ্য পরিবহনের সুযোগ পাইবে। শিল্পের একদেশতা ঘটিলে সেই স্থানের সুনামের ভাগ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই পাইবে।

২। **তথ্য সংগ্রহের সুবিধা** (Economies of Information): বড় শিল্পের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানগুলি যুক্তভাবে গবেষণা কাজ চালাইতে পারে, ব্যবসায় পত্রিকা প্রকাশ করিতে পারে আর ইহার ফলে শিল্পসম্পর্কিত প্রয়োজনীয় সংবাদ পাওয়া যে কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই সহজ হয়।

৩। **বিয়োজনজনিত সুবিধা** (Economies of Disintegration): বৃহদায়তন শিল্পের অন্তর্গত বিভিন্ন ফার্ম বিভিন্ন শাখায় বিশেষীকরণ করিতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় বস্ত্রশিল্পের অন্তর্গত কোন প্রতিষ্ঠান শাড়ী তৈয়ারীতে এবং কোন প্রতিষ্ঠান ধুতি তৈয়ারীতে আত্মনিয়োগ করিতে পারে। এই ব্যবস্থার ফলে শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেরই গড় উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম হয়।

বৃহদায়তন উৎপাদনের উল্লিখিত সুবিধাগুলি মূলতঃ উৎপাদনের অবিভাজ্যতার সহিত জড়িত। বৃহদায়তন উৎপাদনের যে সুবিধা তাহার অনেকখানি উপাদান বাবদ ব্যয়ের অবিভাজ্যতার দরুন পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে কোন একটি পণ্যের উৎপাদনের আয়োজন করিতে হইলে প্রথম হইতেই কোন কোন অবিভাজ্য উপাদান ব্যবহার করার প্রয়োজন দেখা দেয় কিন্তু

অবিভাজ্য উপাদানের পরিপূর্ণ ব্যবহার হয় না, উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি করিলে অবিভাজ্য উপাদানটিকে আরও ভালোভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হয়, সেই কারণে ব্যয় বৃদ্ধির তুলনায় উৎপাদন বৃদ্ধি হয় বেশী অর্থাৎ ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের নিয়ম কার্যকর হয়। মূলধনী দ্রব্যের অবিভাজ্যতার দরুন প্রথম হইতেই বড় যন্ত্র স্থাপন করিতে হয় আর সেই ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে ব্যয় সংকোচ হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, অনেক সময় ছোট ও বড় আকারের যন্ত্র পাওয়া যায় কিন্তু উহাদের উৎপাদন ক্ষমতা এক নয়, তাই উৎপাদনের পরিমাণ অল্প হইলে যে যন্ত্রের ব্যবহার করা লাভজনক অধিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে তদপেক্ষা উন্নততর যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভব হয় বলিয়া মোট ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম হারে বৃদ্ধি পায়। অন্যভাবে বলা যায় যে উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি পাইলে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া উৎপাদন কৌশল উন্নত করা যায় ফলে গড় উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়।

ইহা ছাড়া, দীর্ঘকালে অন্যান্য উপাদানের পরিমাণ পরিবর্তন করা সম্ভব হইলেও কারখানার পরিচালনা প্রায় অবিভাজ্য তাই উৎপাদনের পরিমাণ যাহাই হোক না কেন পরিচালনা ব্যয় অনেকটা স্থির থাকে বলিয়া অধিকতর উৎপাদনে তাহার ব্যয়সংকোচ হইবে। এই সব কারণে উৎপাদন বৃদ্ধির হার অনুপাতে ব্যয় বৃদ্ধির হার কম হইবে।

সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা (Efficiency in the Use of Resources) **:** অর্ধোন্নত দেশ এরূপ একটি দেশ যাহার মানবিক ও প্রাকৃতিক সম্পদ যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলেও মূলধনের অভাবে উহাদের পরিপূর্ণ ও সুদক্ষ ব্যবহার হইতেছে না আর সেই কারণে দেশটি অনগ্রসর রহিয়া গিয়াছে। সম্পদের দক্ষ ও পূর্ণ ব্যবহার হইলে তবেই উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে এবং দেশের উন্নতি হইবে। ইউরোপবাসীরা আমেরিকায় যাইয়া বসতি স্থাপন করিবার পূর্বেও সেখানে অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ছিল। কিন্তু তাহারা উহার দক্ষ ব্যবহার না জানায় অনুন্নতির স্তরে থাকিয়া গিয়াছিল। ভারতেও যথেষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ আছে কিন্তু উহাদের সুদক্ষ ব্যবহার না হওয়ায় দেশটি অনুন্নত রহিয়া গিয়াছে।

প্রাকৃতিক সম্পদের মতো জনসম্পদের অবস্থিতিই দেশের অর্থনৈতিক প্রগতির পক্ষে যথেষ্ট নয়। বর্তমান যুগে অদক্ষ শ্রমিক কোন কাজে লাগে না—উহা দেশের সম্পদ নয়, দায়। শ্রম হইল উৎপাদনের সক্রিয় এজেন্ট

কারণ মানুষের শ্রমের মাধ্যমেই প্রাকৃতিক সম্পদ রূপান্তরিত হয়। শ্রমের যোগান নির্ভর করে শ্রমিক সংখ্যা এবং তাহাদের দক্ষতার উপর।

জনসম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য মানবিক সম্পদের উপর মূলধন বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। ভারতে লক্ষ লক্ষ লোক বেকার কিন্তু ইহাদের অধিকাংশেরই বিশেষ কোন দক্ষতা না থাকায় উহারা স্বনির্ভরশীল কোন পেশার উপর নির্ভর করিয়া কিছু উপার্জন করিতে পারে না। বর্তমান যুগ বিশেষীকরণের যুগ বলিয়া কোন বিশেষ ক্ষেত্রে দক্ষতা না থাকিলে সেই শ্রমিক কোন কাজে লাগে না। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় বৃদ্ধি করিয়া শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি করিতে হইবে।

উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে মূলধনের দক্ষতাও বিশেষ প্রয়োজন। শুধুমাত্র মূলধন বা যন্ত্রপাতির পরিমাণ বৃদ্ধি করিলেই চলিবে না, আধুনিক ও উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি উৎপাদনে প্রয়োগ করিলে উৎপাদনের অভূতপূর্ব বৃদ্ধি ঘটিবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিস্ময়কর উন্নতির মূলে আছে অতি উন্নত ও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ব্যবহার।

সভ্যতার অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য প্রয়োজন উৎপাদন বৃদ্ধি। আর উৎপাদন বৃদ্ধির মূলে রহিয়াছে মূলধনের অবদান। মূলধনের প্রধান কাজ হইল শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি করা। একজন ধীবর জাল খাটাইয়া মাছ ধরিবার চেষ্টা করিতেছে আর আন্দামানের এক অসভ্য মাড়োয়া শুধু হাতে বর্শার সাহায্যে মাছ ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। যে ব্যক্তি জালের সাহায্যে মাছ ধরে সে অধিক পরিমাণে মাছ ধরিবে আর যে ব্যক্তি খালি হাতে বা বর্শা লইয়া মাছ ধরে সে দুই একটি মাছ পাইবে। উৎপাদনে মূলধন নিয়োগ করিলে উহা শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করিয়া অধিক উৎপাদনে সহায়তা করে শ্রমের সহিত মূলধনের সংযোগ সাধিত হইলে উৎপাদনের উৎকর্ষ এবং পরিমাণ উভয়ই বৃদ্ধি পাইবে। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের সহিত মূলধন ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। দেশে মূলধন যত বৃদ্ধি পাইবে জাতীয় আয় ততই বৃদ্ধি পাইবে এবং দেশের দ্রুত উন্নতি ঘটিবে।

উৎপাদনে যত অধিক মূলধন ব্যবহৃত হইবে শ্রমবিভাগ ততই সূক্ষ্মতর হইবে এবং বিশেষীকরণের সুযোগ বৃদ্ধি পাইবে।

সম্পদসমূহের দক্ষতাসহকারে যথাযথ ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্যে বিকাশমান দেশগুলি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। এই ক্ষেত্রে পথিকৃৎ হইল সোভিয়েত

রাশিয়া। ভারতও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে তাহার সম্পদসমূহের সুদক্ষ ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি দিয়াছে।

কৃৎকৌশলগত উন্নতি (Technological Progress) **:** অর্ধোন্নত দেশে কৃৎকৌশলের স্তর খুবই অনগ্রসর। কৃৎকৌশলের উন্নতির সহিত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিশেষভাবে জড়িত। অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিশেষভাবে কৃৎকৌশলের উন্নতির উপর নির্ভরশীল। উন্নত দেশগুলির সর্বাধুনিক কৃৎকৌশল প্রয়োগ করিয়া উন্নতির চরম শিখরে পৌছাইয়াছে। অর্ধোন্নত দেশে কৃৎকৌশল অতি নিম্ন মানের হওয়ায় এই অসুবিধাগুলি দেখা দেয়ঃ (১) মজুরীহার কম হওয়া সত্ত্বেও গড় উৎপাদন-ব্যয় বেশী হয়, (২) শ্রম-উৎপাদন ও মূলধন উৎপাদন অনুপাত বেশী হয়; (৩) উৎপাদন ব্যবস্থায় অদক্ষ শ্রমিকের প্রাধান্য দেখা যায় এবং (৪) জাতীয় উৎপাদন কার্যে অপেক্ষাকৃত বেশী মূলধনের প্রয়োজন হয়। অর্ধোন্নত দেশগুলিতে মূলধনের বিশেষ অভাব থাকায় প্রাচীন অদক্ষ উৎপাদনকৌশল পরিত্যাগ করিয়া উন্নত কৃৎকৌশল গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। বিকাশমান দেশে উন্নত কৃৎকৌশল প্রসারের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হইল অজ্ঞতা ও শ্রমিকের দক্ষতার অভাব।

বিকাশমান দেশগুলিতে কৃৎকৌশলের দ্বৈত অবস্থা দেখা যায়; আধুনিক ও সংগঠিত ক্ষেত্রে উন্নত কৃৎকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ দেখা যায় কিন্তু কৃষি ও অসংগঠিত ক্ষেত্রে মান্ধাতা আমলের কৃৎকৌশল ব্যবহৃত হয়।

কৃৎকৌশলের পরিবর্তন বলিতে বোঝায় উৎপাদন অপেক্ষকের পরিবর্তন। কৃৎকৌশলগত পরিবর্তনের দরুন সমপরিমাণ উপাদানের সাহায্যে পূর্বাপেক্ষা বেশী উৎপাদন পাওয়া যাইবে অথবা কম পরিমাণ উৎপাদনের সাহায্যে সমপরিমাণ উৎপাদন পাওয়া যাইবে। কৃৎকৌশলের পরিবর্তন অর্থনৈতিক উন্নয়নের সর্বাপেক্ষা বড় উপাদান। কৃৎকৌশলের পরিবর্তন নির্ভর করে প্রযুক্তিবিদ্যার উপর আর উহা হইল বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল। উন্নত কৃৎকৌশল প্রয়োগ করিলে শ্রম, মূলধন ও উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

ব্যাপক অর্থে কৃৎকৌশলের উন্নতি বলিতে সেই সব পদ্ধতি বোঝায় যাহা জ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসার ঘটাইয়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে। উন্নত জ্ঞানের দরুন উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি, গবেষণালব্ধ আবিষ্কার, উৎপাদনের বহর বৃদ্ধি, কৃষিতে মূলধন প্রয়োগ, আমদানী পরিবর্তিতা প্রভৃতি

কুৎকৌশলের অন্তর্ভুক্ত। যাহার দ্বারা উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় তাহাকেই কুৎকৌশলগত উন্নতি বলে। সংকীর্ণ অর্থে, কুৎকৌশলগত উন্নতি বলিতে বোঝায় নূতন বা উন্নত উৎপাদন পদ্ধতির প্রয়োগ যার ফলে সমপরিমাণ উৎপাদনের জন্যে কমপরিমাণ উপাদান বা সস্তা বিকল্প উপাদান ব্যবহার করা সম্ভব হয়, নতুন পণ্য অথবা উন্নত পণ্য। উৎপাদনে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র অথবা কমপিউটারের ব্যবহার কুৎকৌশলগত উন্নতির আধুনিক দৃষ্টান্ত হিসাবে গণ্য করা যায়।

ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদেরা কুৎকৌশলের ধারণাটি সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে কুৎকৌশলের উন্নতি ঘটিবে যদি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ঘটে অথবা উৎপাদন বৃদ্ধির দরুণ যন্ত্রীকরণের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। কুৎকৌশল উন্নতির কারণ হিসাবে দক্ষ শ্রমিকের অবদান প্রশাসনিক নৈপুণ্য অথবা গবেষণাসংক্রান্ত কাজকে তাঁহারা বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন নাই।

গবেষণা, আবিষ্কার, নূতন উৎপাদনকৌশল প্রবর্তন, নূতন দ্রব্য সৃষ্টি কুৎকৌশলের উন্নতির কারণ। গবেষণা ও উদ্ভাবনা নূতন জ্ঞানের সৃষ্টি করে আর সেই জ্ঞান প্রযুক্তিবিদ্যার সহায়তায় উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। যদিও মূলতঃ এইগুলি অর্থনৈতিক কার্যাবলী, তথাপি ইহারা সম্পূর্ণরূপে অর্থনীতির ব্যাপার নয়। অর্থনীতিবিদ উন্নতি বা প্রগতির উৎস চিহ্নিত করিতে পারে কিন্তু উহা গ্রহণ করা বা না করা দেশের জনগণের উপর নির্ভর করে। যদি জনগণের দৃষ্টিভংগী উদার ও সংস্কারমুক্ত হয় তাহা হইলে তাহারা নূতন ও প্রগতিবাদী ধ্যানধারণা গ্রহণ করিবে, যুগজীর্ণ প্রথা ও সংস্কার কোন বাধার সৃষ্টি করিবে না।

কুৎকৌশলের প্রধান উৎস তিনটি : কুৎকৌশলগত উন্নতির প্রথম উৎস হইল দেশের লোকের আবিষ্কার ও প্রযুক্তিবিদ্যাসংক্রান্ত কার্যাবলী সবদেশেই উদ্ভাবন ও ঝুঁকি গ্রহণের কিছু লোক দেখা যায়। বিদেশ হইতে কুৎকৌশল আমদানী হইলে উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে কুৎকৌশলের উন্নতি এই শ্রেণীটির উপর করে। এই ধরনের লোকের সংখ্যা কম থাকায় অনেক দেশ পিছাইয়া রহিয়াছে। কোন কোন দেশ ও তাহার সাংস্কৃতিক পরিবেশ পরিবর্তনের অনুকূল আর তাহারাই বহুসংখ্যক উদ্যোক্তার সৃষ্টি করিয়াছে। এ কথা বলা হয় যে বৃটেনে শিল্পবিপ্লবের সময় এই উদ্যোক্তা শ্রেণীই উন্নয়নের প্রধান উৎস ছিল। ওই দেশের উন্নয়ন হার বৃদ্ধিতে আবিষ্কারক, বৈজ্ঞানিক, উদ্যোক্তা ও

ঝুঁকি বহনকারীরাই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল—মূলধনের সঞ্চয় দ্বিতীয় স্থান গ্রহণ করে।

দ্বিতীয়তঃ বদ্ধ অর্থনীতিতে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবনা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় হইলেও যথেষ্ট নয়। আবার খোলা অর্থনীতিতে উহা প্রয়োজনীয় নয় কারণ বিদেশ হইতে উন্নত ও আধুনিক কৃৎকৌশল আমদানী করা যায়। আমদানীকৃত নূতন পণ্য উন্নয়নের এক শক্তিশালী উপাদান হইতে পারে। বাণিজ্যিক আদানপ্রদানের সাহায্যে উন্নত কৃৎকৌশল ও নূতন ব্যবহারণা দেশে প্রবেশ করিতে পারে।

কৃৎকৌশলগত উন্নতির তৃতীয় পদ্ধতি হইল কাজ করিয়া শেখ ("learning by doing")। শ্রমিক, ম্যানেজার এবং মূলধনমালিক উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তাহা ভবিষ্যতে উৎপাদনের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

অনেক অর্থনীতিবিদ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মূলধন গঠনের উপর বিশেষ জোর দেন কিন্তু কৃৎকৌলের ভূমিকাকে অগ্রাহ্য করেন। কিন্তু ইহা ঠিক নয়। কৃৎকৌশলগত পরিবর্তন অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান উৎস।

অর্ধোন্নত দেশে কৃৎকৌশলের মান অতি নিচু স্তরের। এই সব দেশে উৎপাদনের সববৃহৎ ক্ষেত্র হইল কৃষি আর সেই কৃষি উৎপাদনে মান্ধাতা আমলের পদ্ধতিতে উৎপাদন করা হয়। অপর পক্ষে উন্নত দেশগুলিতে বিগত দুই শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার দ্রুত উন্নতি করিয়াছে। ইহার ফলে উন্নত দেশ ও অর্ধোন্নত দেশের মধ্যে কৃৎকৌশলগত দূরত্ব ক্রমশই গড়িয়া চলিয়াছে।

অর্ধোন্নত দেশগুলি উন্নতদেশ হইতে কৃৎকেশল আমদানী করিয়া দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করিতেছে। তবে মনে রাখিতে হইবে উন্নত দেশগুলির কৃৎকৌশল যে পরিবেশে গড়িয়া উঠিয়াছে অর্ধোন্নত দেশের পরিবেশ ভিন্ন হওয়ায় উহা এখানে ব্যবহার করিলে নূতন নূতন সমস্যা দেখা দিবে।

অনুশীলনী

১। উৎপাদন কিসের উপর নির্ভর করে? সংক্ষেপে উন্নয়নের উপাদান-গুলি বর্ণনা কর।

২। কোন কোন লেখক জনসংখ্যাকে অর্থনীতির উন্নয়নের অন্তরায় বলিয়া মনে করে আবার কোন কোন লেখক উহাকে উন্নয়নের সহায়ক বলিয়া মনে করেন। এ ব্যাপারে তোমার মতামত ব্যক্ত কর।

৩। অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাকৃতিক সম্পদের ভূমিকা আলোচনা কর।

৪। মূলধন গঠন কাহাকে বলে? অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপাদান হিসাবে মূলধন গঠনের গুরুত্ব আলোচনা কর।

৫। বিশেষীকরণ ও শ্রমবিভাগ কাহাকে বলে? উহার সুবিধাগুলি বর্ণনা কর।

৬। বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধাগুলি ব্যাখ্যা কর।

৭। কৃৎকৌশলের উন্নতি বলিতে কি বুঝ? কৃৎকৌশলের উৎসগুলি কি কি?

দ্বিতীয় অধ্যায়

অর্থনৈতিক উন্নয়নের পর্যায়সমূহ (Stages of Economic Growth)

প্রতিটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কয়েকটি পর্যায় আছে অর্থাৎ অর্থনৈতিক অগ্রগতি কয়েকটি স্তরের ভিতর দিয়া অগ্রসর হয়। প্রতিটি পর্যায়ের কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ আছে, সেই লক্ষণগুলি চিহ্নিত করিতে পারিলে উন্নয়নের পর্যায় সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা যাইবে। উন্নয়নের প্রতিটি স্তরে এমন কতকগুলি শক্তি কাজ করে যাহার ফলে দেশটি পরবর্তী স্তরে আসিয়া পৌছায়। উন্নয়নের পর্যায়ক্রম সম্পর্কে যে সকল লেখক বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে আছেন ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম স্মিথ, পরবর্তীকালে কার্ল মার্কস এবং বর্তমান যুগে রস্টো। এ্যাডাম স্মিথ তাঁহার আলোচনা ঐতিহাসিক বিবর্তনের তথ্যগত বিশ্লেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন; কার্ল মার্কস হেগেলের দ্বন্দ্ববাদ প্রয়োগ করিয়া অর্থনৈতিক বিবর্তন ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, অধ্যাপক রোস্ট প্রধানতঃ বিনিয়োগের কথা চিন্তা করিয়া উন্নয়নের পর্যায়সমূহ আলোচনা করিয়াছেন। কার্ল মার্কসের বিশ্লেষণ পরে আলোচনা করা হইয়াছে বলিয়া আমরা এখানে এ্যাডাম স্মিথের ও রস্টোর বিশ্লেষণ আলোচনা করিব।

1. শিকারের যুগ পশুপালনের যুগ, কৃষি-উৎপাদন যুগ এবং শিল্পবাণিজ্যের যুগ—এ্যাডাম স্মিথ সমাজ বিবর্তন তথা উন্নয়নের এই পর্যায়ক্রম লইয়া আলোচনা করিয়াছেন।

আদিম যুগের যে সমাজ তাহাকে আমরা শিকারী সমাজ বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। এই অবস্থায় মানব সমাজ ছিল প্রাকৃতিক-পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। জীবজন্তু শিকার কিংবা ফলমূল আহরণ করিয়া তখনকার মানুষ ক্ষুন্নিবৃত্তি করিত। শিকারী সমাজের সব চেয়ে বড় অসুবিধা ছিল শিকার-প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা। শিকার জুটিলেই আহার জুটিত নতুবা উপবাস। তখন মানুষ সঞ্চয় করিতে শেখে নাই আর সঞ্চয় করিবার কোন সুযোগও ছিল না। যাহা পাওয়া যাইত সকলে মিলিয়া সমানভাবে ভাগ করিয়া লইত। আধুনিক ধরনের শিকারী সমাজ আজ পৃথিবীর সভ্যতা-বিবর্জিত বহু অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়।

শিকারী সমাজে যে অসুবিধা তাহার হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য মানুষ পরবর্তীকালে যে সমাজ গড়িয়া তোলে তাহাকে পশুপালক সমাজ বলে। শিকারী সমাজের লোকেরা যখন বুঝিতে পারিল যে জন্তুজানোয়ার শিকার কিংবা বনজঙ্গল হইতে ফলমূল সংগ্রহ করা সব সময় সুবিধাজনক নয় তখন তাহারা পশুপালনের দিকে মনোনিবেশ করিল। কোন এক স্থানে দীর্ঘদিন ধরিয়া যথেষ্ট পরিমাণ শিকার পাইবার কোন নিশ্চয়তা না থাকায় শিকারী সমাজ যাযাবরের মতো এক স্থান হইতে অন্য স্থানে শিকার ও ফল-মূলের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইত। কিন্তু মানুষ যখন বন্য জীবজন্তুদের পোষ মানাইতে শিখিল তখন হইতেই তাহাদের জীবনযাত্রায় এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দিল। মেষ ও গরুগুলিকে হত্যা করিয়া উহাদের মাংসের দ্বারা সাময়িক ক্ষুন্নিবৃত্তি না করিয়া মানুষ উহাদের পালন করিতে আরম্ভ করিল। পশুপালন ও পশুচারণ করিয়া মানবজীবনকে সভ্যতার এক উন্নত পর্যায়ে লইয়া গেল প্রস্তরযুগের মানুষ। এখনও পৃথিবীর বহু স্থানে এইরূপ পশুপালক মানবসমাজ দেখিতে পাওয়া যায়।

পশুপালনের ফলে খাদ্যের যোগান অনেকটা নিয়মিত হইল। খাদ্যের জন্য ভাগ্যের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পাইল। গৃহপালিত গরুছাগলের নিকট হইতে মাংস ছাড়াও দুধ পাওয়া যাইত। আবার উহাদের চামড়া হইতে পোষাকপরিচ্ছদ ও তাঁবু নির্মিত হইত। পশুচারণ যুগেও মানুষ একস্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে শেখে নাই। কোন অঞ্চলের চারণ-ক্ষেত্র নিঃশেষিত হইলে চারণ ক্ষেত্রের অন্বেষণে জনগণ অন্যত্র চলিয়া যাইত। এই পর্যায়ে মানবসমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তিবোধের উদ্ভব হয়। পশুপালনের সঙ্গে মানুষ মাছ ধরিতেও শিখিল। মাছ ধরিয়া জীবিকা অর্জনের জন্য মানুষ নদী, সমুদ্র বা অন্য কোন জলাশয়ের নিকটবর্তী অঞ্চলে বসবাস করিতে আরম্ভ করিল।

সমাজ বিবর্তনের পরবর্তী পর্যায় হইল উদ্ভিদ পালন বা কৃষিকার্যের যুগ। কিভাবে কৃষিকার্যের উদ্ভব হইয়াছিল তাহা সঠিকভাবে জানা যায় না। অনেকেই অনুমান করে যে ইহা স্ত্রীলোকের আবিষ্কার। পুরুষেরা যখন শিকারের অন্বেষণে বাহিরে থাকিত তখন স্ত্রীলোকেরা গৃহে থাকিয়া ফলমূল রক্ষণাবেক্ষণ করিত অনেক সময় চুরি ডাকাতির আশংকায় তাহারা ফলমূল মাটির তলায় পুঁতিয়া রাখিত। কালক্রমে তাহারা দেখিল যে সংগৃহীত

ফলমূল বা পাকা শাকসব্জির বীজ হইতেই নূতন গাছ জন্মাইতেছে। এই ভাবেই মানুষ খাদ্যশস্য উৎপাদনের কৌশল আবিষ্কার করিল এবং কৃষিকার্যের সুরু হইল। কৃষি আবিষ্কারের ফলে মানুষের জীবনে খাদ্য সংগ্রহের অনিশ্চয়তা কাটিয়া গেল এবং মানুষ ভ্রাম্যমান জীবন পরিত্যাগ করিয়া একস্থানে স্থায়ী-ভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করিল। স্থায়ীভাবে বসবাস করার দরুন মানুষ গৃহ নির্মাণ করিতে শিখিল এবং ধীরে ধীরে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজ গড়িয়া উঠিল।

কৃষি যুগের পর আসিল বাণিজ্য ও শিল্পযুগ। শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন, শ্রমবিভাগের উদ্ভব, বাজারের বিস্তৃতি এবং অর্থ ও ঋণ ব্যবস্থা প্রসারের দরুণ সমাজে ব্যবসায়ী, মহাজন, উদ্যোক্তা, শিল্পশ্রমিক, ভূম্যধিকারী ও শিল্প-শ্রমিক দেখা দিল। আর এই সঙ্গে আধুনিক যুগের সূত্রপাত হইল বলা চলে। বৃহদায়তন উৎপাদন, বিক্রয়ের জন্য উৎপাদন, অর্থের মাধ্যমে বিনিময় ব্যবস্থার প্রসার এবং কৃষি ছাড়াও অন্যান্য উৎপাদনশীল কার্যের সাহায্যে জীবিকা অর্জন এই পর্যায়ের লক্ষণ।

2. অধ্যাপক রস্টো (W. W. Rostow) তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ *The Stages of Economic Growth* অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাঁচটি পর্যায়ক্রমের উল্লেখ করিয়াছেন। কার্ল মার্কস প্রদত্ত সামাজিক বিবর্তনের বিকল্প ব্যাখ্যা দিয়াছেন বলিয়া রস্টো তাঁহার ব্যাখ্যাকে অ-কম্যুনিষ্ট মেনিফেস্টো বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে পাঁচটি পর্যায়ের কথা রস্টো বলিয়াছেন নিম্নে তাহাদের আলোচনা করা হইল :

1) **সনাতন সমাজ** (The Traditional Society) : সনাতন সমাজ অনড়, অচল সমাজ যেখানে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা অনুপস্থিত। এই সমাজ প্রধানতঃ কৃষিপ্রধান এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান অতি নিম্নস্তরের। এই সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার ভিত্তি নিউটন-পূর্ব যুগের বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশল এবং বস্তুবিশ্ব সম্পর্কে দৃষ্টিভংগীও ছিল নিউটন-পূর্বযুগের। অবশ্য সেই সমাজ সম্পূর্ণভাবে অনড় ছিল, সেখানে কোনরূপ অর্থনৈতিক পরিবর্তন ছিলনা—একথা বলা যায় না। বস্তুতঃ জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও মাথাপিছু প্রকৃত আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর্ষিত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, বাণিজ্যের প্রসার ঘটে, শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং কৃষির উৎকর্ষ সাধিত হয়। কিন্তু এই সমাজে আধুনিক বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশলের নিয়মিত ব্যবহার না হওয়ায় মাথাপিছু

উৎপাদনের এক সর্বোচ্চ মাত্রা সৃষ্টি হয় যাহাকে অতিক্রম করা যায় না। এই সমাজে আবিষ্কার বা উদ্ভাবনা ঘটিলেও দৃষ্টিভংগী সম্পূর্ণ প্রাচীনপন্থী। কৃষির প্রাধান্য, যৌথ পরিবার, নিয়তিনির্ভরশীল জীবনদর্শন এবং রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা জমিদারশ্রেণীর কুক্ষিগত—এইগুলিই হইল এই সমাজের লক্ষণ।

2) **ঊর্ধ্বগমনের পূর্বাবস্থা** (Preconditions for Take-off) **:** এই পর্যায় হইল পরিবর্তন যুগ যে যুগে অব্যাহত উন্নয়নের সর্তগুলির আবির্ভাব ঘটিতে থাকে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ও ষোড়শ শতাব্দীর সুরু থেকে ইংলণ্ড ও পশ্চিম ইউরোপে আধুনিক যুগের সূত্রপাত হয় আর এই সময়ই ওই সকল দেশে ঊর্ধ্বগমনের পূর্বসর্তগুলি দেখা দিতে থাকে। রেনেশাঁ বা নব জাগরণ, নতুন রাজতন্ত্র, নতুন ধর্ম এবং নতুন জগৎ উন্নয়নের সর্তগুলিকে উৎসাহিত করিতে থাকে। মানুষের ধ্যানধারণায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দেয়। অন্ধ বিশ্বাসের পরিবর্তে যুক্তিবাদ ও সংশয়বাদ জন্ম নেয়, সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসাবশেষের উপর নতুন জাতীয় রাষ্ট্র গড়িয়া ওঠে, নতুন দুঃসাহসিক চেতনা নিত্য নতুন আবিষ্কারে প্রেরণা যোগায়। ধীরে ধীরে সামাজিক মনোভাব, প্রত্যাশা এবং মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটিতে থাকে।

উন্নয়নের এই স্তরে দেশটি আধুনিক বিজ্ঞানের সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে এবং ক্রমহ্রাসমান বিধিকে ঠেকাইয়া রাখে। জনগণ উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারে। শিক্ষা প্রসারলাভ করে, নতুন নতুন উদ্যোক্তা গড়িয়া ওঠে এবং ব্যাংকের পত্তন হয়। বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়, সামাজিক ধার্য মূলধন গঠন হয় এবং অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য প্রসার লাভ করে। দুই একটা করিয়া আধুনিক ধরনের শিল্প গড়িয়া ওঠে। সজীবতার লক্ষণ এবং আধুনিকতার সূচনা দেখা দিলেও সমাজ মূলতঃ সনাতনপন্থীই থাকে। অনেক সময় সনাতন সমাজ ও আধুনিক সমাজ পাশাপাশি অবস্থিত থাকে। পরিবর্তন শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে না—রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রেও উহা প্রসারিত হয় এবং ধীরে ধীরে কেন্দ্রীভূত শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্র গড়িয়া ওঠে।

3) **ঊর্ধ্বগমন** (Take off) **:** উন্নয়নের এই পর্যায় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এই স্তরে দেশটি অগ্রগমনের বাধাসমূহ অতিক্রম করিয়া উন্নয়নের অব্যাহত গতিধারাকে ঊর্ধ্বমুখী করিয়া রাখে। এই স্তরে দেশটি স্বয়ংনির্ভরশীল হইয়া নিজ শক্তিতেই অগ্রসর হইতে থাকে—বাহির হইতে কোনরূপ ধাক্কা দিবার

প্রয়োজন হয় না। শিল্পের দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটে, মুনাফা বৃদ্ধি পায় এবং উহার বড় অংশ শিল্পে পুনর্নিয়োজিত হয়। শিল্পের প্রসার ঘটায় মূলধনের চাহিদা বাড়ে এবং মূলধনী শিল্পের প্রসার ঘটে। মূলধনী শিল্পের প্রসার সাধারণ শিল্পপ্রসারকে ত্বরান্বিত করে। শিল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জনগণের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং সেইজন্য কৃষি ও শিল্পজাত পণ্যের চাহিদা বাড়ে। উদ্যোক্তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। নতুন কৃৎকৌশল কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি করে এবং কৃষি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। দুই দশকের মধ্যে দেশে এরূপ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে যে উহার দরুন দেশটি নিজ শক্তিতেই অগ্রসর হইতে পারে, বাহির হইতে কোনরূপ চাপ সৃষ্টির প্রয়োজন হয় না। সাধারণতঃ ঊর্ধ্বগমন পর্যায় ২০ বৎসর স্থায়ী হয়।

ঊর্ধ্বগমন বা মাটি ছাড়িয়া আকাশে উড্ডীয়মান অর্থনীতির লক্ষণগুলি এইরূপঃ (১) বিনিয়োগ হার জাতীয় আয়ের ৫ শতাংশ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১০ শতাংশ দাড়াইয়া যায়; (২) এই সময় দুই একটি মূল শিল্প গড়িয়া ওঠে; (৩) এরূপ সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো গড়িয়া উঠিবে যাহা আধুনিক ক্ষেত্র সম্প্রসারণে অনুপ্রেরণা দিবে এবং উন্নয়ন অবিরাম গতিতে চলিতে থাকিবে।

অন্যভাবে বলা যায় ঊর্ধ্বগমন হইল শিল্পবিপ্লব, উৎপাদন পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন এবং খুব কম সময়ের মধ্যে দেশে উহার ফলাফল দেখা দিবে।

বিভিন্ন দেশে কিভাবে ঊর্ধ্বগমন সুরু হইয়াছে সে সম্পর্কে রষ্টো ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। বৃটেন ফ্রান্স এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর সুরুতে ঘটে। জার্মানী, জাপান ও সুইডেনে উনিশ শতকের শেষ দিকে ঊর্ধ্বগমন দেখা দেয়; রাশিয়া ও ক্যানাডায় উহা ঘটে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ২০/২৫ বছর পূর্বে, ভারত ও চীন বর্তমান শতাব্দীর মধ্যভাগে ওই পর্যায়ে প্রবেশ করিয়াছে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন শিল্প উন্নয়নের প্রাথমিক গতিবেগ সৃষ্টি করিয়াছে। গ্রেট বৃটেনে কার্পাস শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া উন্নয়ন সুরু হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া এবং জার্মানীতে রেলপথের সম্প্রসারণ প্রগতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। রাশিয়া, জাপান ও জার্মানীতে সৈন্যবাহিনীর সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ ঊর্ধ্বগমনের ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট উপাদান ছিল। সুইডেনে কাষ্ঠশিল্প উন্নয়নের গতিবেগ

সৃষ্টি করে। অষ্ট্রেলিয়া এবং আর্জেন্টিনায় আমদানীকে সরাইয়া দেশে ভোগ্যপণ্যের উৎপাদনকারী শিল্প স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়নের গতিবেগ সঞ্চারিত হয়।

4) **উন্নত পর্যায়ের প্রতিচালনা** (Drive to Maturity) : উর্ধ্বগমনের পর সুদীর্ঘকাল উন্নয়ন অব্যাহত থাকে। জাতীয় আয়ের ১০ শতাংশ হইতে ২০ শতাংশ পুনর্বিনিয়োজিত হয় এবং উৎপাদন বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে অতিক্রম করিয়া যায়। আধুনিক কৃৎকৌশল অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়। উৎপাদনের গঠন ক্রমাগত পরিবর্তিত হইতে থাকে, নতুন শিল্প গড়িয়া ওঠে এবং পুরানো শিল্প সংকুচিত হয়। পূর্বে আমদানী হইত এরূপ পণ্য দেশেই উৎপাদিত হইতে থাকে। নতুন নতুন দ্রব্য বিদেশ থেকে আনিবার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং দেশটি বহু নতুন পণ্য রপ্তানী করিতে সুরু করে।

এই পর্যায়ে অর্থনীতির ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। সাধারণতঃ উর্ধ্বগমন সুরু হইবার ৬০ বছর পরে উন্নত পর্যায়ের প্রতিচালনার যুগ সুরু হয়। উর্ধ্বগমনের পর্যায়ে যে সব সরল শিল্প এবং কৃৎকৌশল দেখা যায় এই পযায়ে আসিয়া তাহারা জটিল রূপ গ্রহণ করিতে থাকে। দেশের সর্বত্র উন্নত কৃৎকৌশল এবং উৎপাদন পদ্ধতি প্রযুক্ত হয়। দেশটি কৃৎকৌশলগত এবং উদ্যোক্তাগত এরূপ দক্ষতা অর্জন করে যে, উহা যে দ্রব্য উৎপাদন করিতে ইচ্ছা করে তাহাই উৎপাদন করিতে পারে। কোন পণ্য উৎপাদিত না হইলে উহার কারণ কৃৎকৌশলগত সীমাবদ্ধতা নয়—উহার পিছনে থাকে রাষ্ট্রনৈতিক বিবেচনা।

5. **সুউচ্চ গণভোগ পর্যায়** (Age of Mass Consumption) : নগরাঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অটোমোবাইলের ব্যাপক ব্যবহার, এবং গৃহস্থালীর কাজে স্থায়ী ভোগ্যপণ্যের ব্যবহার এই সমাজের লক্ষণ। এই পর্যায়ে সমাজের দৃষ্টিভংগী যোগান হইতে চাহিদার প্রতি, উৎপাদন সমস্যা হইতে ভোগসমস্যার প্রতি এবং মূলতঃ সমাজকল্যাণের দিকে ধাবিত হয়। সুউচ্চ গণভোগ পর্যায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের চরম পর্যায়। মাথাপিছু আয় এমন এক স্তরে আসিয়া যায় যে বৃহত্তর জনসমষ্টির ভোগ খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া উহার উর্ধ্বে উঠিয়া যায়। কৃৎকৌশলগত উন্নতি লইয়া দেশটি আর মাথা ঘামায় না। জনগণ কর্তৃক স্থায়ী ভোগ্যপণ্যের ব্যবহার,

অব্যাহত পূর্ণ কর্মসংস্থান এবং ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তা বোধের দরুন জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বাড়িতে থাকে। এই পর্যায়ে তিন ধরনের শক্তির ক্রিয়ার দরুন সমাজ কল্যাণ বাড়িতে থাকে। প্রথমতঃ জাতীয় নীতি এরূপ ভাবে অনুসৃত হয় যাহাতে সারা বিশ্বে উহার প্রভাব বৃদ্ধি পায়; দ্বিতীয়ঃ এই পর্যায়ে আসিয়া সাধারণ রাষ্ট্র কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়; গতিশীল করের সাহায্যে ন্যায্য আয়-বণ্টণ সুনিশ্চিত করা হয়, সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসার ঘটে এবং জনগণ অবসর উপভোগ করিয়া থাকে, তৃতীয়তঃ সুলভ মোটরগাড়ী, বাসগৃহ এবং গৃহস্থালীর জন্য বিদ্যুৎচালিত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের দরুন নতুন বাণিজ্যিক কেন্দ্র ও শিল্পক্ষেত্র গড়িয়া ওঠে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিংশশতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে, গ্রেট বৃটেন তৃতীয় দশকে, জাপান ও পশ্চিম ইউরোপ পঞ্চম দশকে এবং সোভিয়েত রাশিয়া ষ্টালিনের মৃত্যুর পর সুউচ্চ গণভোগের পর্যায়ে আসিয়া পৌছাইয়াছে।

ক্ল্যাসিক্যাল উন্নয়ন তত্ত্ব (Classical Theory of Development) :

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশের বিভিন্ন ধারার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের জন্য নানা তত্ত্বের উদ্ভব হইয়াছে। ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণই প্রথম দীর্ঘকালীন উন্নয়নের কারণ আবিষ্কারের চেষ্টা ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ করেন। তাঁহারা অর্থব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে সম্পর্কের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং উন্নয়নের উপর উহার প্রভাব বিশ্লেষণ করেন। অর্থনীতির উপাদান সম্পর্কে তাহাদের ধারণা সংকীর্ণ ছিল। তাঁহারা মনে করিতেন যে জাতীয় আয় শুধুমাত্র মজুরী, খাজনা এবং মুনাফার সমষ্টিমাত্র। কৃষি এবং শিল্পকেই তাঁহারা শুধুমাত্র উৎপাদনশীল কাজ বলিয়া মনে করিতেন। যাহা হউক, এই সংকীর্ণ পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহারা উন্নয়নের গতিপথ বিশ্লেষণ ও উন্নয়নের গতিবেগ ত্বরান্বিত করিবার জন্য নীতি নির্ধারণ করেন। এ্যাডাম স্মিথ, ডেভিড রিকার্ডো, এবং টমাস রবার্ট ম্যালথাস হইলেন বিখ্যাত ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীবিদ। ইঁহাদের রচনায় যে উন্নয়ন তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতি ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হইল ব্যক্তিগত মালিকানা ও অবাধ লেনদেন। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কাজকর্ম ব্যক্তিগত উদ্যোগের

ভিত্তিতে চলে এবং লেনদেন কার্য অবাধে সম্পন্ন হয়। বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকার কর্মপ্রচেষ্টা যদি পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্ত না হয় তাহা হইলে অর্থনৈতিক জগতে চরম বিশৃংখলা দেখা দিবে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে কাজ করিতেছে, তাই বোধ হয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কোন শৃংখলা নাই। কিন্তু বিভিন্ন ব্যক্তির অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা বহুলাংশে স্বাধীন হইলেও পরস্পরের সহিত সম্পর্কশূন্য নয়। সম্পূর্ণ সুষ্ঠু না হইলেও ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিশৃংখলও নয়। এ্যাডাম স্মিথই প্রথম উপলব্ধি করেন যে, অর্থব্যবস্থায় একটা অন্তর্নিহিত শৃংখলা রহিয়াছে। এক "অদৃশ্য হাত" (invisible hand) যেন বিভিন্ন ব্যক্তির ব্যবহার ও কার্যাবলী সুসংবদ্ধ করিয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনা করিতেছে। এই অদৃশ্য হস্তের দ্বারাই বিভিন্ন বস্তুর উৎপাদন, উৎপাদন পদ্ধতি ও বণ্টন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয়। এ্যাডাম স্মিথই সর্বপ্রথম "অদৃশ্য হস্তের" নীতি ঘোষণা করেন। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ মঙ্গলসাধন করিতে গিয়া কোন এক অদৃশ্য হস্তের দ্বারা চালিত হইয়া সকলের মঙ্গল সাধন করিতেছে। এই অদৃশ্য হস্তের নাম দামব্যবস্থা (Price System)।

প্রত্যেক ব্যক্তির অর্থনৈতিক জীবন এই দামব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত হয়। ধনতান্ত্রিক সমাজে অবাধ ক্রয়বিক্রয় ও উৎপাদনের স্বাধীনতা থাকিলেও কেহ ইচ্ছামত ক্রয়বিক্রয় করিতে পারে না, প্রত্যেক পণ্যের দাম আছে। কোন পণ্য ক্রয় করিলে দাম দিতে হয় আর বিক্রয় করিলে দাম পাওয়া যায়। আবার বাজারে ক্রেতার ক্রয় ও বিক্রেতার বিক্রয় একই সঙ্গে সম্পাদিত হয়। সুতরাং বিভিন্ন ব্যক্তির ক্রয় ও বিক্রয়কার্য বাজারে দামের মাধ্যমে পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্ত হয়। এইভাবে দামব্যবস্থা বিভিন্ন ব্যক্তির আয় ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করিয়া অর্থনৈতিক জীবন পরিচালিত করে এবং তাহার মাধ্যমেই মূল অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধান হয়। উৎপাদনের পরিমাণ, উৎপাদনের পদ্ধতি এবং উৎপাদনের প্রকৃতি নির্ধারণ করাই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল কাজ। কি পণ্য উৎপাদিত হইবে, কিভাবে উৎপাদিত হইবে এবং কাহার জন্য উৎপাদিত হইবে এই মূল সমস্যাগুলির সমাধান দামব্যবস্থার মাধ্যমে কিভাবে হইবে তাহা দেখা যাক।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় কারবারীর মূল লক্ষ্য হইল মুনাফা অর্জন, তাই ব্যবসায়ী সেই সকল পণ্য উৎপাদন করিবে যাহাতে তাহার লাভ সর্বাধিক

হয়। কোন দ্রব্যের উৎপাদনে কত লাভ হইবে তাহা নির্ভর করে সেই দ্রব্যের চাহিদা ও উৎপাদন-ব্যয়ের উপর। যে দ্রব্যের চাহিদা বেশী তাহার উৎপাদন বেশী হইবে কারণ তাহাতে লাভ হইবে বেশী। তাই বলা যায় যে ক্রেতার চাহিদা অনুসারে উৎপাদনের প্রকৃতি ও পরিমাণ নির্ধারিত হয়। লোকে যদি রসগোল্লার পরিবর্তে সন্দেশ বেশী খাইতে আরম্ভ করে তবে সন্দেশ উৎপাদকের লাভ বেশী হইবে এবং রসগোল্লা বিক্রেতার লাভ কমিয়া যাইবে। তাই এই অবস্থায় কারবারীরা রসগোল্লা উৎপাদন কমাইয়া দিয়া সন্দেশ উৎপাদন বৃদ্ধি করিবে অর্থাৎ অধিক পরিমাণ উপকরণ সন্দেশ প্রস্তুত করিতে এবং কম পরিমাণ উপকরণ রসগোল্লা প্রস্তুত করিতে নিয়োজিত হইবে। এইভাবে ক্রেতাদের চাহিদা অনুসারে কোন বস্তু কতটা উৎপাদিত হইবে তাহা নির্ধারিত হয় এবং ক্রেতাদের এই চাহিদা উৎপাদকেরা দামব্যবস্থার মাধ্যমে জানিতে পারে।

কোন উৎপাদনপদ্ধতি উৎপাদকেরা গ্রহণ করিবে তাহা নির্ণয়েও দাম-ব্যবস্থার ভূমিকা রহিয়াছে। কি পদ্ধতিতে কোন দ্রব্য উৎপাদন করা যায় তাহা অবশ্য অর্থনীতির বিষয় নয়—ঐ সংবাদ পাওয়া যাইবে ইঞ্জিনিয়ারদের নিকট হইতে। যখন কোন পণ্য উৎপাদনের অনেকগুলি বিকল্প পদ্ধতি থাকে তখন উৎপাদক সেই পদ্ধতি গ্রহণ করিবে যাহাতে উৎপাদন-ব্যয় সর্বাপেক্ষা কম হয়, নতুবা তাহার মুনাফা কম হইবে। সুতরাং খরচ কমাবার জন্য উৎপাদক যে উপকরণের দাম বেশী তাহার ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কমাইয়া যে উপকরণের দাম কম তাহা অধিকতর ব্যবহার করিবে। উপাদানগুলি কি হারে ব্যবহার করিলে উৎপাদন-ব্যয় ন্যূনতম হইবে তাহা নির্ভর করে উপকরণগুলির আপেক্ষিক দামের উপর। এইভাবে দামব্যবস্থার মাধ্যমে সর্বশ্রেষ্ঠ উৎপাদন-পদ্ধতি ব্যবহারের দিকে প্রবণতা দেখা যাইবে।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় আয়ের বণ্টনও নির্ধারিত হয় প্রধানতঃ দামব্যবস্থার মাধ্যমে। এই সমাজব্যবস্থায় উপকরণের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত। ব্যক্তির আয় নির্ভর করে তাহার নিকটে কতটা উপকরণ আছে ও কি দামে সেই সব উপকরণ নিয়োজিত হইয়াছে তাহার উপর। দেশের অধিকাংশ লোকই শ্রমিক, তাহাদের আয় নির্ভর করে শ্রমের পরিমাণ ও মজুরীহারের উপর। ইহা ব্যতীত যদি কাহারও জমি বা মূলধন থাকে তাহা হইতেও আয় হইতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আয়ের বণ্টন নির্ভর

করিতেছে উৎপাদনে নিয়োজিত বিভিন্ন উপকরণগুলির মালিকানা ও তাহাদের ব্যবহারের দামের উপর। নিয়োজিত উপকরণগুলি প্রয়োজনীয় কারণ অব্যবহৃত উপকরণ হইতে কোন আয় হয় না, কোন ব্যক্তির আয় জানিতে হইলে তাহার উপকরণের প্রকৃতি, পরিমাণ ও উপকরণগুলির দাম জানিলেই চলিবে না। কতটা উপকরণ সে উৎপাদনব্যবস্থায় নিয়োগ করিতে পারিয়াছে তাহাও জানা আবশ্যক। তাই যতই লোক অধিকতর নিয়োজিত উপকরণের মালিক হইবে এবং যতই সেই উপকরণগুলির দাম অধিক হইবে ততই তাহার আয় অধিকতর হইবে। ইহা হইতেই বোঝা যায় যে সমাজে আয়বৈষম্যের কারণ দুইটি। প্রথমতঃ, নিয়োজিত উপকরণের মালিকানার বৈষম্য, দ্বিতীয়তঃ উপকরণের দামের বিভিন্নতা। যে আয়-বৈষম্য উপকরণের দাম-বৈষম্য হইতে উদ্ভূত তাহা অল্পস্থায়ী এবং তাহা প্রধানতঃ ঘটিয়া থাকে উপকরণের অদক্ষ নিয়োগের দরুন। কারণ সমদক্ষ উপকরণের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সমান দাম পাওয়া দরকার। অন্যথায় যেখানে দাম অধিক উপকরণের মালিক সেখানেই তাহার উপকরণ নিয়োগ করিতে চাহিবে এবং প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সমান উপকরণের সমান দাম হইবার দিকে প্রবণতা দেখা দিবে। সুতরাং স্বল্পকাল যদিও অদক্ষ নিয়োগহেতু উপকরণদামের বিভিন্নতার দরুন আয়-বৈষম্য থাকিতে পারে কিন্তু দীর্ঘকালীন সময়ে ইহার বিশেষ গুরুত্ব নাই। এই জন্য উপকরণের মালিকানার বৈষম্যই সমাজে আয় বৈষম্যের প্রধান কারণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ইহার অর্থ এই নয় যে আয় বণ্টনের ক্ষেত্রে দামব্যবস্থার কোন প্রভাব নাই কারণ উপকরণের মালিকানার বণ্টন দেওয়া থাকিলেও উপকরণগুলির আপেক্ষিক দামের পরিবর্তন হেতু আয়বণ্টনের পরিবর্তন ঘটিবে। একমাত্র প্রত্যেক লোকের উপকরণগুলির মালিকানা যখন সমান তখনই কেবল আপেক্ষিক উপকরণ দামের পরিবর্তনের জন্য আয়বণ্টনের পরিবর্তন হইবে না। কিন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ধনবৈষম্য। মূলধন মালিকের সংখ্যা মুষ্টিমেয়—শ্রমিকের সংখ্যাই অধিক। সুতরাং আপেক্ষিক আয়বণ্টনে দামব্যবস্থার গুরুত্ব খুবই বেশী।

এই আয়বণ্টনের সহিত আবার উৎপাদিত দ্রব্যের বণ্টন জড়িত। কে কোন্ দ্রব্য কতটা ভোগ করিবে অথবা উৎপাদিত দ্রব্যগুলি বিভিন্ন লোকের মধ্যে কিভাবে বণ্টিত হইবে তাহা নির্ভর করে ব্যক্তির আয়, উৎপন্ন দ্রব্যের দাম ও তাহার পছন্দের উপর। যে ব্যক্তির আয় বেশী সে বেশী দ্রব্যসামগ্রী ভোগ

করিতে পারিবে আর যাহার আয় কম সে কম পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ভোগ করিবে। আবার নির্দিষ্ট আয়ের ব্যক্তি কোন্ দ্রব্য কতটা ভোগ করিবে তাহা তাহার রুচি, পছন্দ ও বিভিন্ন দ্রব্যের দামের উপর নির্ভর করে। এইভাবে দামব্যবস্থার মাধ্যমে কোন্ দ্রব্য কতটা উৎপাদিত হইবে ও কিভাবে উৎপাদিত হইবে শুধুমাত্র তাহাই নয়, কে কতটা ভোগ করিবে তাহাও নির্ধারিত হইয়া থাকে।

উৎপাদনের পরিমাণ, প্রকৃতি ও বণ্টনের সঙ্গে মূলধন সৃষ্টিও জড়িত। মুনাফার উদ্দেশ্যেই উৎপাদন হইয়া থাকে এবং মূলধন সৃষ্টির মূলেও আছে লাভের প্রত্যাশা। উৎপাদনে মূলধন ব্যবহার করিলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ও অধিকতর লাভ হয়। অবশ্য অধিকাংশ মূলধনই দীর্ঘস্থায়ী বলিয়া ভবিষ্যৎ লাভের প্রত্যাশার সঙ্গে মূলধন নিয়োগ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সেইজন্য ব্যবসায়ী উৎপাদনে কতটা মূলধন নিয়োগ করিতে চাহিবে তাহা মূলধন নিয়োগ হেতু তাহাদের ভবিষ্যৎ লাভের আশা ও মূলধনের দামের উপর নির্ভর করে। অন্যান্য দ্রব্যের মতো মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদনও তাহাদের চাহিদা ও উৎপাদন ব্যয়ের উপর নির্ভর করে। দামব্যবস্থার মাধ্যমে যখন কোন্ দ্রব্য কতটা উৎপাদিত হইবে তাহা স্থির হয়, সেই সঙ্গে সমাজের মূলধন সৃষ্টির প্রকৃতি ও পরিমাণও নির্ধারিত হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কাজ-কারবার কোন বিশেষ ব্যক্তি বা ফার্ম (firm) দ্বারা পরিচালিত হয় না—ইহা অসংখ্য লোকের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর দ্বারা প্রভাবিত। এই সকল কার্যাবলী আবার দামব্যবস্থার মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সুসংবদ্ধ হইয়া উৎপাদনের পরিমাণ, প্রকৃতি, বণ্টন ও মূলধন সৃষ্টির মূল সমস্যাগুলির সমাধান করে।

এ্যাডাম স্মিথের উন্নয়ন তত্ত্ব (Adam Smith's Theory of Development): বৃটিশ অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম স্মিথ (১৭২৩-১৭৯০) ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতির জনক হিসাবে সুপরিচিত। ১৭৭৬ সালে তিনি "*An Enquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations*" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার উল্লিখিত গ্রন্থটিতে প্রধানতঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যা লইয়াই আলোচনা করা হয়। তিনি আরোহী (inductive method) পদ্ধতির প্রয়োগ করিয়া সার্বিক সিদ্ধান্তে উপনীত

হইবার প্রয়াস পান। এ্যাডাম স্মিথ অর্থব্যবস্থাকে সামগ্রিক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করিয়া উহার অন্তর্নিহিত কতকগুলি মূল নীতি আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। যদিও তিনি কোন সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন তত্ত্ব উদ্ভাবন করেননি, পরবর্তীকালে তাঁহার বিশ্লেষণকে ভিত্তি করিয়া উত্তরসূরিরা এক সুসম্বদ্ধ মতবাদ গড়িয়া তোলে। নিম্নে উহা ব্যাখ্যা করা হইল :

১। **প্রাকৃতিক নিয়ম** (Natural Law) : এ্যাডাম স্মিথ স্বাতন্ত্র্যনীতির (laissez-faire) সমর্থক ছিলেন কারণ তাঁহার মতে উহাই উন্নয়নের শ্রেষ্ঠ পন্থা। তিনি সবকিছুই "অদৃশ্য হস্তের" উপর ছেড়ে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। নিজ ব্যক্তিস্বার্থের অনুসরণে লোকেরা যে কাজ করিবে তাহাতে সমষ্টির বৃহত্তম অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধিত হইবে। ক্রয়বিক্রয়ের বাজার এবং পণ্য-মূল্যের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াই সমষ্টিকে এই লক্ষ্যে পৌছাইয়া দেয় এবং সমষ্টির বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাকৃতিক নিয়মতত্ত্ব এ্যাডাম স্মিথকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল এবং তিনি এই নিয়মটিকে অর্থনৈতিক জগতে প্রয়োগ করেন। তাঁহার মতে প্রত্যেক ব্যক্তিই তার নিজ স্বার্থের শ্রেষ্ঠ বিচারক এবং তাহাকে ছাড়িয়া দিলে সে তাহার চরম উন্নতি সাধন করিবে। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের মঙ্গল করিতে গিয়া কোন এক "অদৃশ্য হস্তের" দ্বারা চালিত হইয়া সকলের মঙ্গল সাধন করিতেছে। স্মিথ বলেন, আমরা যে রুটি পাই তাহা রুটিওয়ালার উপচিকীর্ষার দরুন নয়—তাহার ব্যক্তিস্বার্থের জন্য। এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার সম্পদ সর্বাধিক করিবার চেষ্টা করিবে ফলে সকল ব্যক্তির মোট সম্পদ সর্বাধিক হইবে। এ্যাডাম স্মিথ দেশের শিল্প এবং ব্যবসায় ও বাণিজ্যে ন্যূনতম রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের পক্ষপাতী ছিলেন।

২। **শ্রম বিভাগ** (Division of Labour) : শ্রম বিভাগ থেকেই এ্যাডাম স্মিথের উন্নয়ন তত্ত্বের সুরু। স্মিথ মনে করিতেন যে শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণ (specialisation) অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটায় কারণ উহা শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি করে। শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধির কারণ হইল তাহার দক্ষতা বৃদ্ধি। একটি কাজ নিয়মিতভাবে বারবার করার দরুন অনিবার্য-ভাবে ব্যক্তির দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বিতীয় কারণ হইল সময় ও শ্রমের অপচয় রোধ। তৃতীয়তঃ, শ্রমবিভাগের দরুন প্রত্যেকটি কাজ খুব সরল হইয়া পড়ে আর সেই কারণে যন্ত্রপাতির ব্যবহার বাড়িতে থাকে।

শ্রমবিভাগের ফলে নূতন নূতন যন্ত্রপাতির আবিষ্কার সম্ভবপর হয়। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির আর একটি কারণ হইল উৎকৃৎ কৌশল (technology)। উন্নত উৎকৃৎকৌশল শ্রমবিভাগ ঘটায় এবং বাজারের প্রসার করে। শ্রমবিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে বাজারের পরিধির উপর। বাজার যত বড় হইবে শ্রমবিভাগের সুযোগ তত বেশী হইবে এবং শ্রমবিভাগ উৎপাদন দক্ষতা যত বৃদ্ধি করিবে উৎপাদন ততই বৃদ্ধি পাইবে ও অর্থনৈতিক প্রগতির মাত্রাও বাড়িতে থাকিবে।

এ্যাডাম স্মিথ অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সমর্থক ছিলেন কারণ ইহা বাজারের আয়তন বৃদ্ধি করিয়া শ্রমবিভাগকে উৎসাহিত করিবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও পরিবহন ব্যবস্থার সম্প্রসারণের সাথে সাথে অধিকতর শ্রমবিভাগ ঘটিবে। এ্যাডাম স্মিথ দেখেছিলেন সমাজ যখন এগিয়ে চলে এবং বৃদ্ধি পাইতে থাকে তখন জনসংখ্যাও বাড়িতে থাকে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি সামাজিক প্রগতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

যান্ত্রিক শিল্পের তুলনায় কৃষিতে উন্নয়নের বেগ কম কারণ কৃষিতে শিল্পের তুলনায় শ্রমবিভাগের সুযোগ অনেক অল্প।

৩। **মূলধন গঠন** (Capital Accumulation): উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় মূলধনগঠনের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। উৎপাদন বৃদ্ধির হার বিনিয়োগ বৃদ্ধির হারের উপর নির্ভর করে। বিনিয়োগ যদি ধনাত্মক হয় তবেই উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। পরিমাণে যাহাই হউক না কেন, মূলধনের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকিলে অর্থনৈতিক অচলাবস্থা ঘটিবে। হ্রাসমান মূলধন অর্থনৈতিক পশ্চাৎগতির নিদর্শন। বিনিয়োগ হার নির্ভর করে সঞ্চয়ের উপর। মিতব্যয়িতার ফলে মূলধন বৃদ্ধি পায় আর অপব্যবহারের দরুন উহা হ্রাস পায়। সঞ্চয় সরাসরি বিনিয়োগে রূপান্তরিত হয়—সঞ্চয় হইতে ক্ষরণের (leakages) কোন সম্ভাবনা স্মিথ চিন্তা করেন নাই। আয়ের যে অংশ ধনী ব্যক্তি সঞ্চয় করে তাহা তৎক্ষণাৎ মূলধন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ক্ষমতা আয় দ্বারা সীমাবদ্ধ। সমস্ত সঞ্চয় মূলধন বিনিয়োগ অথবা জমির খাজনা হইতে উদ্ভূত হয় সেইজন্য শুধুমাত্র পুঁজিপতি এবং জমিদারই সঞ্চয় করিতে সক্ষম। শ্রমিকশ্রেণীর সঞ্চয়ের কোন ক্ষমতা নাই এই ধারণা মজুরীর লৌহ নিয়মের (Iron Law of Wages) উপর প্রতিষ্ঠিত। ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদেরা মজুরি তহবিল তত্ত্বেও (wages fund) বিশ্বাসী ছিলেন।

এই মতবাদের মূল কথা হইল মজুরী শ্রমিকদের জীবনধারণের ব্যয়ের সমান হইবে। যদি কোন সময়ে মোট মজুরী তহবিল শ্রমিকের জীবনযাত্রার ব্যয় অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে শ্রমিকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে, চাকুরীর জন্য শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা তীব্রতর হইবে এবং পরিশেষে মজুরী হ্রাস পাইয়া জীবনধারণের ব্যয়ের সমান হইবে। এই অবস্থায় কিছুসংখ্যক শ্রমিক জীবনধারণের অভ্যস্ত মান বজায় রাখিতে অসমর্থ হইবে। সুতরাং ইহারা বিবাহ করিতে বা সন্তানসন্ততি প্রতিপালন করিতে পারিবে না। শ্রমিকসংখ্যা হ্রাস পাইবে, শ্রমিক নিয়োগের জন্য পুঁজিপতিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা তীব্র হইবে ফলে মজুরীর হার বৃদ্ধি পাইবে।

৪। **উন্নয়নের সংঘটক** (Agents of Growth): এ্যাডাম স্মিথের মতে উৎপাদক, কৃষক, এবং ব্যবসায়ী হইল অর্থনৈতিক উন্নয়নের এজেণ্ট বা সংঘটক। অবাধ বাণিজ্য, উদ্যোগ এবং প্রতিযোগিতার দরুন উৎপাদক ও ব্যবসায়ীর বাজার বৃদ্ধি পায় আর বাজার বৃদ্ধি পাইলে উন্নয়ন ঘটে। কৃষির উন্নতি হইলে বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের দরুন কৃষি উদ্বৃত্ত দেখা দিবে ও সেই সঙ্গে বাণিজ্যিক কাজকারবার এবং পণ্য দ্রব্যের চাহিদা বাড়িবে; চাহিদা বৃদ্ধির দরুন নূতন নূতন শিল্প গড়িয়া উঠিবে। শিল্পায়নের ফলে উন্নত উৎকৃৎকৌশল উদ্ভাবিত হইবে এবং কৃষির ক্ষেত্রে উহা প্রযুক্ত হইয়া কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ আরও বাড়াইবে।

উন্নয়নপ্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়—ইহা একবার সুরু হইলে নিজস্ব গতিতে চলিতে থাকে। যথেষ্ট পরিমাণ মূলধন ও বাজার থাকিলে শ্রমবিভাগ প্রসারিত হইবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধি তথা অর্থনৈতিক প্রগতির এই প্রক্রিয়া সীমাহীন নয়। প্রাকৃতিক সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা অবশেষে উন্নয়নকে থামাইয়া দিবে।

৫। **স্থিতিশীল স্তর** (Stationary State): উন্নয়নের সঙ্কীয়মান প্রক্রিয়া অবশেষে স্থিতিশীল পর্যায়ে পৌছিয়া থামিয়া যাইবে; উন্নয়নের ইহাই ঊর্ধ্বসীমা। স্থিতিশীল স্তর কোন অর্থোন্নত অবস্থা নয়। এই স্তরে মাথাপিছু উৎপাদন স্থির থাকে, মজুরী জীবনযাত্রার মানের সমান এবং মুনাফা সর্বনিম্ন হয়। এই পর্যায়ে কোন নীট বিনিয়োগ হইবে না, জনসংখ্যা অপরিবর্তিত এবং মোট আয় সমান থাকিবে।

উপসংহার: যদিও সর্বত্র সুসংবদ্ধ এবং যুক্তিপূর্ণ নয়, তথাপি এ্যাডাম

স্মিথের বিশ্লেষণ পরবর্তী কালের অর্থনীতিবিদগণের উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। অর্থনৈতিক উন্নয়নে তিনি মূলধনের ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালের উন্নয়ন তত্ত্বে মূলধন একটি অপরিহার্য উপাদান হিসাবে বিবেচিত হইয়াছিল। অর্থনৈতিক অচলাবস্থার পর্যায় সম্পর্কে তাঁহার আলোচনা ক্ল্যাসিক্যাল লেখকদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। তাঁহার অবাধ স্বাতন্ত্র্য নীতি (policy of laissez faire) পরবর্তী কালে লেখকদের মধ্যে বিতর্কের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। উন্নয়ন সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট মতবাদ প্রতিষ্ঠিত না করিয়া এ্যাডাম স্মিথ কতকগুলি সাধারণ নীতির মাধ্যমে তাঁহার উন্নয়ন সংক্রান্ত চিন্তাধারা প্রকাশ করেন।

ডেভিড রিকার্ডো (David Ricardo) : ডেভিড রিকার্ডো (১৭৮২-১৮২৩) হইলেন ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতির একজন বিখ্যাত প্রবক্তা। এ্যাডাম স্মিথের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তাধারা অবলম্বন করিয়া রিকার্ডো কয়েকটি সুসমঞ্জস সূত্র গড়িয়া তোলেন যাহার মধ্যে আধুনিক অর্থনীতির আভাস পাওয়া যায়। এ্যাডাম স্মিথকে অনুসরণ করিয়া তিনি ক্ল্যাসিক্যাল উন্নয়ন তত্ত্ব আরও পরিমার্জিত করেন, কিন্তু রিকার্ডো মূল্য ও বণ্টন তত্ত্বে যতখানি আগ্রহী ছিলেন উন্নয়ন তত্ত্বে ততখানি আগ্রহী ছিলেন না। অধ্যাপক সুমপিটার বলিয়াছেন যে রিকার্ডো অর্থনীতি বলিতে বণ্টনতত্ত্বকেই বুঝিতেন এবং মোট উৎপাদন কোন্ নিয়মানুসারে নির্ধারিত হয় সে সম্পর্কে তিনি কিছুই বলেন নাই। উন্নয়ন সম্পর্কে রিকার্ডোর চিন্তাধারা তাঁহার গ্রন্থের সর্বত্র বিক্ষিপ্তভাবে ছড়াইয়া আছে। ইহা ছাড়া সমসাময়িক অন্যান্য অর্থনীতিবিদগণকে লেখা তাঁহার পত্রাবলীতে এসম্পর্কে কিছু আলোচনা আছে।

রিকার্ডোর উন্নয়ন মডেল দুইটি মূল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত—(১) ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি এবং (২) জনবৃদ্ধির নীতি। রিকার্ডোর উন্নয়ন তত্ত্ব বুঝিতে হইলে এই নীতি দুইটি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকা দরকার। নিম্নে উহাদের ব্যাখ্যা করা হইল :

১। **ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি** (Diminishing Returns) : ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে যখন কৃষিকার্য অপেক্ষাকৃত কম উর্বর জমিতে প্রসারিত হয় তখন সমপরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিলে কম পরিমাণ উৎপাদন পাওয়া যাইবে।

ধরা যাক, ১নং, ২নং এবং ৩নং এই তিন খণ্ড জমিতে সমপরিমাণ শ্রম

ও মূলধন প্রয়োগ করিয়া গেল যথাক্রমে ১০০ মন, ৯০ মন এবং ৮০ মন ফসল পাওয়া যায়। কোন নূতন দেশে যেখানে জনসংখ্যা কম এবং যথেষ্ট পরিমাণে উর্বর জমি আছে সেখানে শুধুমাত্র ১নং জমি চাষ করা হইবে এবং উৎপাদিত ফসলের সমগ্র অংশটাই কৃষকের প্রাপ্য হইবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুণ যখন ২নং জমি চাষ করার প্রয়োজন দেখা দিবে তখন ১নং জমিতে খাজনা দেখা দিবে।

অনুরূপভাবে, যদি একই জমিতে অধিক পরিমাণে শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা যায় তাহা হইলে উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

সাধারণভাবে ২নং, ৩নং, ৪নং অথবা ৫নং অর্থাৎ কম উর্বর জমি চাষ করিবার পূর্বে যে জমি চাষ করা হইতেছে সেখানে মূলধন লাভজনক ভাবে নিয়োগ করা যায়। ১নং জমিতে মোট মূলধন দ্বিগুণ করিলে উৎপাদন দ্বিগুণ না হইলেও উহা বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু ৩নং জমিতে মূলধন নিয়োগ করিলে যাহা পাওয়া যাইবে উহা তদপেক্ষা বেশী হইবে।

যাহাই করা হউক না কেন, জমি, শ্রম এবং মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাইবে। উন্নত উৎকৃৎকৌশলের সাহায্যে ক্রমহ্রাসমান হারকে নিয়ন্ত্রণ করা যাইতে পারে। শিল্পে উন্নত শিল্পকৌশলের প্রভাব ক্রমহ্রাসমান বিধির প্রভাব অপেক্ষা অনেক বেশী বলিয়া সেখানে ক্রমবর্ধমান নিয়ম কার্যকরী হয়। রিকার্ডো মনে করিতেন যে কৃষিতে উন্নত উৎকৃৎকৌশলের প্রভাব এতো ক্ষমতাশালী হবে না যে উহা ক্রমহ্রাসমান বিধির কার্যকারিতাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে। উন্নত কৃষি-কৌশলের প্রয়োগ ক্রমহ্রাসমান বিধিকে সাময়িকভাবে ঠেকাইয়া রাখিলেও কৃষি উৎপাদন ব্যয়ের উপর ইহার প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী নয়।

সমাজের প্রগতির সাথে সাথে শ্রমের স্বাভাবিক দাম বাড়িবার প্রবণতা দেখা দিবে কারণ খাদ্যের দাম বাড়িবে। খাদ্যমূল্যের দ্বারা শ্রমিকের স্বাভাবিক দাম নির্ধারিত হয় এবং ফসল উৎপাদনের ক্রমবর্ধমান অসুবিধার দরুণ খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। অবশ্য কৃষির উন্নতি, বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী, প্রভৃতি উপায়ে সাময়িকভাবে খাদ্যদ্রব্যের দাম বৃদ্ধি প্রতিহত করা যাইতে পারে। রিকার্ডোর ধারণা ছিল দীর্ঘকালীন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে দেখিলে খাদ্যের উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান বিধির আর শিল্পের উৎপাদন ক্রমবর্ধমান বিধির অধীন। কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন একত্রে ধরিলে কোন

নিয়ম কার্যকরী হইবে ? রিকার্ডোর মতে সকল জমি আবাদ হইবার পর কৃষির ক্রমহ্রাসমান বিধি শিল্পের ক্রমবর্ধমান বিধিকে অতিক্রম করিয়া যাইবে। এইজন্য কিছু সময়ের পর সম্প্রসারণশীল অর্থনীতিতে উৎপাদন বৃদ্ধির হার হ্রাস পাইবে। অনুকূল অবস্থায় যদিও উৎপাদন ক্ষমতা জনসংখ্যার ক্ষমতা অপেক্ষা অধিক কিন্তু ইহা দীর্ঘকাল চলিতে পারে না কারণ জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ এবং উর্বরতার তারতম্য হেতু জমিতে যত অধিক পরিমাণে মূলধন বিনিয়োগ করা হইবে ততই উৎপাদনের হার কমিবে কিন্তু জনসংখ্যার ক্ষমতা সমান থাকে। এ্যাডাম স্মিথের ধারণা ছিল যে অর্থনীতি দ্রুত হারে (accelerated rate) সম্প্রসারিত হইবে কিন্তু রিকার্ডো মনে করিতেন যে উন্নয়ন ক্রমহ্রাসমান হারে (declining rate) হইবে।

২। **জনসংখ্যা বৃদ্ধি** (Growth of Population): জমি বলিতে রিকার্ডো উহার মৌলিক এবং অবিনশ্বর ক্ষমতাকে বুঝিয়াছিলেন। জমির যোগান সীমাবদ্ধ। জনসংখ্যার বৃদ্ধি সম্পর্কে রিকার্ডোর ধারণা এ্যাডাম স্মিথের ধারণার অনুরূপ। স্মিথের মতো রিকার্ডোও শ্রমের বাজার দাম (market price) এবং স্বাভাবিক মজুরী (natural wage rate) হারের মধ্যে পার্থক্য করেন। শ্রমের স্বাভাবিক দাম হইল সেই দাম যাহা শ্রমিককে বাঁচিয়ে রাখে কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটিতে দেয় না। যদি শ্রমের বাজারদাম উহার স্বাভাবিক মজুরী অপেক্ষা বেশী হয় তাহা হইলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে আর যদি শ্রমের বাজারদাম উহার স্বাভাবিক মজুরী অপেক্ষা কম হয় তাহা হইলে জনসংখ্যা হ্রাস পাইবে।

যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে শ্রমের চাহিদা যদি তদপেক্ষা অধিক হারে বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে আর্থিক মজুরী বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা দিবে। নূতন দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে এইরূপ হইয়া থাকে। উর্বর জমির প্রাচুর্য থাকিলে শ্রমের উৎপাদন শক্তি সর্বাধিক হয়। এই পর্যায়ে মূলধন সঞ্চয় এত দ্রুতহারে হয় যে সেই হারে শ্রমিকের যোগান বৃদ্ধি পায় না। এই জন্য নূতন দেশে উপনিবেশ স্থাপনের প্রাক্কালে উন্নত দেশের জ্ঞান ও কৌশল প্রয়োগ করিলে মূলধন বৃদ্ধি জনবৃদ্ধি অপেক্ষা দ্রুত হারে ঘটিবার সম্ভাবনা বেশী।

স্বাভাবিক মজুরীর বৃদ্ধি পাইবার প্রবণতা আছে কারণ কৃষিতে ক্রমহ্রাসমান বিধির কার্যকারিতার দরুন খাদ্যদ্রব্যের আর্থিক এবং প্রকৃত মূল্য বৃদ্ধি পাইবে।

সামাজিক প্রগতির সাথে সাথে শ্রমের স্বাভাবিক দাম বৃদ্ধি পাইবার প্রবণতা দেখা দিবে কারণ একটি প্রধান দ্রব্য (খাদ্য) যাহা শ্রমের স্বাভাবিক দামকে নিয়ন্ত্রণ করে, উৎপাদনের অসুবিধার দরুন উহার দুষ্প্রাপ্যতা দেখা দিবে। ইহা ছাড়া জীবনধারণের স্তর নির্দিষ্ট নয়, উহা নির্ভর করে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির উপর। বর্তমানে সাধারণ ইংরেজ পরিবার যে সকল দ্রব্যসামগ্রীকে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করে পূর্ববর্তী যুগে উহাদের বিলাসদ্রব্য বলিয়া মনে করিত।

রিকার্ডোর মতে স্বাভাবিক মজুরী দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে—সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ এবং জমির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা। চাহিদা ও যোগানের দ্বারা মজুরীর বাজারদামে পরিবর্তন ঘটে। শ্রমিককে যে দাম দেওয়া হয় তাহাই হইল উহার বাজার দাম—উহা চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নির্ধারিত হয়। সমাজের মূলধন পরিবর্তনের অনুপাতে শ্রমের চাহিদা পরিবর্তিত হয়।

মজুরীর বাজার হার ও স্বাভাবিক হারের সমান হইবার প্রবণতা আছে। শ্রমের যোগানের তুলনায় উহার চাহিদা বেশী হইলে মজুরীর বাজার দাম বাড়িবে। বর্ধিত মজুরী জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করিবে এবং পরিণামে মজুরীর বাজার হার হ্রাস পাইবে। বিপরীত ভাবে, স্বল্প মজুরী জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে নিরুৎসাহিত করিবে এবং কালক্রমে প্রকৃত মজুরীহার বৃদ্ধি পাইয়া স্বাভাবিক মজুরীহারের সমান হইবে।

দীর্ঘকালীন সময়ে, শ্রমশক্তির বৃদ্ধি মূলধন বৃদ্ধির অনুপাতে হইবে। কিন্তু যদি স্বাভাবিক মজুরী হারের বৃদ্ধি ঘটে তাহা হইলে শ্রমের যোগান বৃদ্ধি উহার চাহিদার তুলনায় কম হইবে এবং জনসংখ্যা মূলধনের তুলনায় ধীরগতিতে বৃদ্ধি পাইবে; ইহার দরুন মজুরীর বাজারদাম বৃদ্ধি পাইবে এবং মূলধনের মুনাফা হ্রাস পাইবে। দ্রুত হারে যোগান বৃদ্ধি এবং ধীরগতিতে চাহিদা বৃদ্ধির মাধ্যমে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

কৃষিতে ক্রমহ্রাসমান বিধির কার্যকারিতার দরুণ স্বাভাবিক মজুরীহারে যে বৃদ্ধি ঘটে (আর্থিক ব্যয় বা প্রকৃত ব্যয়) তাহার দরুন শ্রমিকশ্রেণীর জীবনযাত্রার মানে নীট লাভ কিছুই হয় না। ইহা শুধুমাত্র উদ্যোক্তার মুনাফা খাইয়া ফেলে আর উহার দরুন মূলধন বৃদ্ধির ভবিষ্যৎ হার এবং দেশের উন্নয়ন হার শ্লথ হইয়া পড়ে। স্বাভাবিক মজুরী হারের বৃদ্ধির

দরুন কেহই লাভবান হয় না কিন্তু কতিপয় শ্রেণীর স্বার্থ ব্যাহত হয়। সুতরাং এইরূপ বৃদ্ধি সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের প্রতিকূল। কৃষিকৌশলের উন্নয়ন এবং খাদ্য আমদানীর মাধ্যমে স্বাভাবিক মজুরীহারের এইরূপ বৃদ্ধিকে সাময়িকভাবে প্রতিহত করা যায়। কিন্তু দীর্ঘকালীন সময়ে উহা কার্যকরী হইবে না। দীর্ঘকালীন সময়ে উৎপাদন জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত তাল রাখিয়া বাড়িতে পারে না বলিয়া জনসংখ্যা হ্রাস না পাইলে ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। ক্রমহ্রাসমান বিধির কার্যকারিতার দরুন স্বাভাবিক মজুরীহার বৃদ্ধি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে হ্রাস করিয়া উহার প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে।

শ্রমিকদের উচ্চতর জীবনযাত্রার মানের তাগিদে শ্রমের স্বাভাবিক মজুরীহারের বৃদ্ধি ঘটিলে সমাজের উপর উহার কল্যাণকর প্রভাব সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ হইবে। এই ক্ষেত্রে স্বাভাবিক মজুরী হারের বৃদ্ধির দরুন শ্রমিকদের জীবনধারণের মানের যথার্থ উন্নতি ঘটিবে।

৩। **মূলধন গঠন** (Capital Accumulation) : রিকার্ডো মূলধনের সংজ্ঞায় স্থির এবং চল্‌তি উভয় মূলধনকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। মূলধন হইল সম্পদের সেই অংশ যাহা উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় এবং উহা খাদ্য, বস্ত্র, যন্ত্রপাতি কাঁচামাল ইত্যাদি লইয়া গঠিত। চল্‌তি মূলধন দ্বারা মজুরী তহবিল গঠিত হয়। মূলধন-প্রগাঢ় যান্ত্রিক পরিবর্তন না ঘটিলে চল্‌তি মূলধন স্থির মূলধনের সমান অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। শ্রমের চাহিদার পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করে মজুরী তহবিল। সুতরাং মূলধনের পরিবর্তনের অনুপাতে শ্রমের চাহিদার পরিবর্তন হয়।

রিকার্ডোর মতে, দুইটি পদ্ধতিতে মূলধন বৃদ্ধি পায়—ভোগ-হ্রাস অথবা আয়-বৃদ্ধি। যাহা সঞ্চিত হয় তাহাই বিনিয়োজিত হয়—কোনরূপ মজুদ (hoarding) থাকে না। ইহার কারণ হইল মূলধনকে ফলপ্রসূ করিবার উদ্দেশ্যেই সঞ্চয় করা হয়।

মূলধন গঠনের হার দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে—(১) সঞ্চয়ের ক্ষমতা এবং (২) সঞ্চয়ের ইচ্ছা। প্রথমটি নির্ভর করে শ্রমিকের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় মোট উৎপাদনের অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত আয়তনের উপর অথবা রিকার্ডোর ভাষা ব্যবহার করিলে বলিতে হইবে "দেশের নীট আয়ের উপর।" এই উদ্বৃত্তের পরিমাণ যত বেশী হইবে, সঞ্চয়ের ক্ষমতা তত বেশী হইবে। রিকার্ডো বলিয়াছেন, "দুইটি রুটি থাকিলে আমি একটি সঞ্চয় করিতে পারি—চারটি রুটি থাকিলে আমি তিনটি রুটি সঞ্চয় করিতে পারি।" "নূতন আয়ের"

একাংশ স্বভাবতই পুঁজিপতি ও ভূস্বামীদের জীবনধারণের জন্য ব্যয়িত হয়। এই অংশের আয়তন নির্ভর করে মুনাফার হারের উপর। মুনাফার হার যত বেশী হইবে ব্যক্তির সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি তত বেশী হইবে। মুনাফার হার হ্রাস পাইলে ভোগের আকাঙ্খা বৃদ্ধি পাইবে।

রিকার্ডো মনে করিতেন যে মুনাফা হ্রাস পাইলে সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি হ্রাস পাইবে; মুনাফা যখন এতোই অল্প হইবে যে উহা উৎপাদনের ঝুঁকি বহনের পক্ষে যথেষ্ট নয় তখন সঞ্চয় একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে।

দুইটি বিষয় মূলধন গঠনকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দিতে পারে—(১) জীবনধারণের অতিরিক্ত উদ্বৃত্তের লোপ এবং (২) সর্বনিম্ন গ্রহণযোগ্য হারে মুনাফা হ্রাস। রিকার্ডো তত্ত্বে মূলধন গঠন গতিশীল পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করিতে হইলে দেশের নীট আয় এবং উহার মুনাফার হার জানিতে হইবে। "মুনাফা" ও "মজুরী" বলিতে রিকার্ডো প্রান্তিক স্তরে মজুরীর আপেক্ষিক অংশকে বুঝাইয়াছিলেন। কিন্তু প্রান্তিক পর্যায়ে কোন খাজনা দেওয়া হয় না বলিয়া মুনাফা শুধুমাত্র মজুরীর উপর নির্ভর করে। রিকার্ডো বলেন যে মজুরীর বৃদ্ধি ব্যতীত অন্য কিছুই মুনাফাকে প্রভাবিত করে না। বিভিন্ন দেশে মূলধন বৃদ্ধির প্রভাব ভিন্নরূপ হইবে এবং উহা প্রধানতঃ জমির উর্বরতার উপর নির্ভর করিবে।

দেশ যত বড়ই হউক না কেন, জমি নিকৃষ্ট স্তরের হইলে এবং খাদ্য আমদানী নিষিদ্ধ থাকিলে, পরিমিত মূলধন বৃদ্ধি পাইলে মুনাফার হার কম হইবে এবং খাজনা দ্রুত বৃদ্ধি পাইবে; অপরপক্ষে ছোট কিন্তু উর্বর দেশে যদি খাদ্য আমদানীর পথে কোন বাধা না থাকে তাহা হইলে মুনাফার হার হ্রাস না পাইলে বা জমির খাজনা না বাড়িলেও প্রভূত মূলধন বৃদ্ধি ঘটিবে।

বৃটেনে পর্যাপ্ত পরিমাণে উর্বর জমি না থাকায়, জনসংখ্যা বাড়িলে অনুর্বর জমি আবাদ হইবে। অন্য সকল অবস্থা একরূপ থাকিলে, কৃষিজ দ্রব্যের প্রকৃত দাম বাড়িবে কিন্তু শিল্পদ্রব্যের দাম কমিবে। উর্বর জমিতে খাজনা ও আর্থিক মজুরী বৃদ্ধি পাইবে। ইহার দরুন মুনাফা হ্রাস পাইবে ও সেই কারণে মূলধন গঠন এবং উন্নয়নের হার শ্লথ হইবে।

বৃটিশ অর্থনীতিকে রক্ষা করিতে হইলে উহাকে এরূপভাবে পুনর্গঠিত করিতে হইবে যাহাতে খাজনা বৃদ্ধি পাইবে না এবং মুনাফা হ্রাস হইবে না। কিভাবে এই উদ্দেশ্য সাধন করা যায় তাহা আপেক্ষিক সুবিধা তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে। ইহা দেখায় একটি দেশ কিভাবে দক্ষতার সহিত তাহার সম্পদকে বিভিন্ন হারে

সম্প্রসারিত শিল্পের মধ্যে বণ্টন করিবে। আপেক্ষিক সুবিধা তত্ত্ব দেখায় অবাধ বাণিজ্যনীতি গ্রহণ করিয়া আর্থিক মজুরী, খাজনা ও কৃষিজ দ্রব্যের দাম কম এবং মুনাফা ও প্রকৃত মজুরীকে উচ্চ রাখা যায়; এইভাবে উন্নতিশীল শিল্পে অধিক পরিমাণে বিনিয়োগ করা সম্ভব হইবে এবং কৃষি উৎপাদনেও উন্নতি ঘটিবে। এইভাবে ইংলণ্ডের মতো দেশে ধীর গতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে এবং প্রকৃত আয় বৃদ্ধি ঘটিবে।

যদি জমিদার, শ্রমিক এবং পুঁজিপতিদের মধ্যে আয়বণ্টন মূলধনের অনুকূলে যায় তবেই ক্রমাগত উন্নয়ন সম্ভব হইবে। রিকার্ডো মূলধন, মজুরী, কাঁচামাল এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর করধার্যের বিরোধিতা করেন; কারণ ইহার ফলে আর্থিক মজুরী বৃদ্ধি এবং মুনাফা হ্রাস পাইবে। আয়ের এইরূপ বণ্টন ভোগের সপক্ষে এবং বিনিয়োগের বিপক্ষে যাওয়ায় উন্নয়ন হার হ্রাস পাইবে এবং ধনী ও দরিদ্র উভয়ের অবস্থাই খারাপ হইবে। রিকার্ডো মনে করিতেন যে অতিরিক্ত শ্রমিকের খাদ্য যোগানোর অসুবিধা বাদ দিলে শিল্পে বিনিয়োগের অফুরন্ত সুযোগ আছে। বৈদেশিক বাণিজ্য ছাড়াই বিনিয়োগের সীমাহীন সুযোগ আছে। ইহা এ্যাডাম স্মিথের চিন্তাধারার বিপরীত।

রিকার্ডো শুল্ক প্রাচীরের বিরোধিতা করেন। বিভিন্ন দেশের মধ্যে উৎপাদন উপাদানের গতিশীলতা না থাকায় তিনি বলেন যে বাণিজ্যকারী দেশগুলি যে সব দ্রব্য উৎপাদনে আপেক্ষিক সুবিধা ভোগ করে তাহা উৎপাদন করিয়া উহারা তাহাদের আয় বাড়াইতে পারে। বিশ্বের সম্পদের সুদক্ষ ব্যবহার সম্ভব করিয়া অবাধ বাণিজ্য পৃথিবীর আয় বাড়াইবে।

মজুরী, মুনাফা এবং খাজনার আচরণ (Behaviour of Wages, Profits and Rent): অর্থনৈতিক উন্নয়ন কালে শ্রমিক, পুঁজিপতি এবং জমিদারের আপেক্ষিক আয় কিভাবে পরিবর্তিত হইবে রিকার্ডো তাহা বিশ্লেষণ করেন। সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটিলে কৃষিকার্য নিকৃষ্ট জমিতে প্রসারিত হইবে অথবা উৎকৃষ্ট জমিতে শ্রম ও মূলধন অধিক পরিমাণে নিয়োজিত হইবে; ইহার দরুন ক্রমহ্রাসমান বিধি কার্যকরী হইবে এবং খাজনা বৃদ্ধি পাইবে। সামাজিক প্রগতির সাথে সাথে মোট উৎপাদনে খাজনার অনুপাত বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু শিল্পে শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলেও ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনবিধি কার্যকরী হইবে না আর সেই কারণে শিল্পদ্রব্যের দাম বাড়িবে না। সুতরাং

সমাজের অগ্রগতি প্রগতি এবং সকল দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে শিল্পদ্রব্যের তুলনায় কৃষিজদ্রব্যের দাম বাড়িবে। কৃষি-উন্নয়ন সাময়িকভাবে খাজনা বৃদ্ধি স্থগিত রাখিতে পারে। রিকার্ডো কৃষি-উন্নয়নকে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন: (১) শ্রম-সঞ্চয়ী উন্নয়ন এবং (২) ভূমি-সঞ্চয়ী উন্নয়ন। ভূমি-সঞ্চয়ী উন্নয়ন ঘটিলে নির্দিষ্ট পরিমাণ কৃষি-উৎপাদনের জন্য কম পরিমাণ জমির প্রয়োজন হইবে। অপর পক্ষে, শ্রম-সঞ্চয়ী উন্নয়ন ঘটিলে নির্দিষ্ট পরিমাণ কৃষি-উৎপাদনের জন্য কম পরিমাণ শ্রমিক প্রয়োজন হইবে। এই ধরনের উন্নতির ফলে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়িবে কিন্তু জমির পরিমাণ সমান থাকিবে। প্রথম ধরনের উন্নয়ন আর্থিক খাজনা কমাইবে কিন্তু কৃষি-উৎপাদনের অংকে খাজনা নাও কমিতে পারে। দ্বিতীয় ধরনের উন্নয়ন হইলে টাকার অংকে এবং কৃষি উৎপাদনের অংকে খাজনা হ্রাস পাইবে। রিকার্ডো মনে করেন যে দীর্ঘকালীন সময়ে খাজনা এবং কৃষিজ পণ্যের দাম বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা দিবে কারণ কৃষি-উন্নয়ন জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং মূলধন গঠনের প্রভাবকে প্রতিহত করিবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে না।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটিলে প্রকৃত মজুরী সমান থাকিবে কিন্তু আর্থিক মজুরী বাড়িবে। দ্রুত মূলধন গঠনকালে প্রকৃত মজুরী জীবনধারণের মানের উর্ধ্বে উঠিতে পারে কিন্তু উহা জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে উৎসাহ দিবে যাহার দরুন মজুরী পুনরায় জীবনধারণের স্তরে নামিয়া আসিবে। উপরের আলোচনা হইতে দেখা গেল যে দেশের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিজ দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা দিবে। সুতরাং জীবনধারণের একই মান বজায় রাখার জন্য অধিক পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন দেখা দিবে। প্রকৃত মজুরী জীবনধারণের মানের নীচে নামিতে পারে না, বলিয়া দেশের উন্নতির সাথে সাথে আর্থিক মজুরী বাড়িবে।

দেশের উন্নতি ঘটিলে মুনাফার হ্রাস হইবার প্রবণতা দেখা দিবে কারণ জীবনধারণোপযোগী মজুরী হার বাড়িবে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং উন্নত যন্ত্রকৌশল প্রয়োগ করিয়া ক্রমহ্রাসমান বিধির কার্যকারিতা সাময়িকভাবে ব্যাহত করা যায়। ইহার দরুন প্রান্তিক চাষ পর্যায়ে মোট উৎপাদনে জীবনধারণোপযোগী মজুরীর অংশ হ্রাস পাইবে; এইরূপ সময়ে মুনাফা বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু যান্ত্রিক উন্নয়নও ক্রমহ্রাসমান বিধির অধীন বলিয়া দীর্ঘকালীন সময়ে মুনাফা নিম্নমুখী হইবে। ক্রমহ্রাসমান বিধির কার্যকারিতার দরুন প্রাথমিক পর্যায়ে যে

হারে মুনাফা হ্রাস পায় তাহা যথেষ্ট কম বলিয়া মোট উৎপাদনে মুনাফার অংশ বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং উন্নয়নের সুরুতে মূলধন বৃদ্ধি খুব দ্রুতহারে ঘটিবে। মুনাফার ক্ষীয়মান হার মূলধন বৃদ্ধির উপর যে নিম্নচাপ সৃষ্টি করে জীবনধারণোপযোগী বর্ধিত নীট উদ্বৃত্ত অপেক্ষা উর্ধ্বচাপ সৃষ্টি করে।

দেশে উন্নয়ন ক্রমাগত চলিতে থাকিলে মোট উৎপাদনে মুনাফার অংশ হ্রাস পাইবে আর সেইজন্য মূলধন বৃদ্ধির হার শ্লথ হইয়া আসিবে। পরিশেষে জনসংখ্যার চাপে নিকৃষ্ট জমি আবাদ হইবে, প্রান্তিক জমির উৎপাদনের বৃহত্তর অংশ মজুরীবাবদ ব্যয় হওয়ায় মুনাফা ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়া আসিবে। এই স্তরে আসিয়া মূলধন বৃদ্ধি শেষ হইবে, জনসংখ্যা আর বাড়িবে না এবং দেশ অচলাবস্থায় (Stationary state) পৌঁছাইবে।

মূলধন গঠনের অন্যান্য উৎস (Other Sources of Capital Accumulation) ঃ রিকার্ডোর মতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে উৎপাদন ও ভোগের পার্থক্যের উপর ; এই জন্যে তিনি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ভোগ কমাইবার উপর গুরুত্ব দেন। অবশ্য সুদক্ষ সংগঠন এবং যান্ত্রিক উন্নয়নের দরুন শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাইতে পারে। এই পদ্ধতিতেও মূলধন বৃদ্ধি পাইতে পারে। কিন্তু উৎপাদনে অধিক যন্ত্র ব্যবহৃত হইলে কম শ্রমিক প্রয়োজন হইবে ; ইহার দরুন বেকারত্ব দেখা দিবে এবং মজুরী হ্রাস পাইবে। অধিক যন্ত্র ব্যবহৃত হইলে শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থা খারাপ হইবে বলিয়া রিকার্ডো যন্ত্রকৌশল প্রদত্ত এবং অপরিবর্তিত ধরিয়া লইয়াছিলেন।

(ক) **কর** (Taxes) ঃ সরকারের নিকট কর হইল মূলধন গঠনের একটি উৎস। রিকার্ডোর মতে, শুধুমাত্র অপ্রয়োজনীয় ভোগ হ্রাস করিবার জন্য কর ধার্য করা উচিত। অন্যথায় পুঁজিপতি, জমিদার এবং শ্রমিকদের উপর কর ধার্য করা হইলে সম্পদ এই সকল শ্রেণীর নিকট হইতে সরকারের নিকট চলিয়া যাইবে। কিন্তু কর বিনিয়োগকে ব্যাহত করে। কর ধার্য করা হইলে আয়, মুনাফা এবং মূলধন বৃদ্ধি হ্রাস পাইবে বলিয়া রিকার্ডো উহা সমর্থন করেন নাই।

(খ) **সঞ্চয়** (Savings) ঃ রিকার্ডো সঞ্চয়ের মাধ্যমে মূলধন বৃদ্ধির জোর দিয়াছিলেন। ব্যয় কমাইয়া এবং উৎপাদন বাড়াইয়া সঞ্চয় বৃদ্ধি করা যায়। ইহা ছাড়া মুনাফার হার বাড়াইয়া এবং পণ্যের দাম হ্রাস করিয়াও সঞ্চয় বাড়ানো যায়। সঞ্চয় যত বেশী হইবে মূলধন বৃদ্ধি তত বেশী হইবে।

(গ) **অবাধ বাণিজ্য** (Free Trade) ঃ রিকার্ডো অবাধ বাণিজ্যের

সমর্থক ছিলেন। অবাধ বাণিজ্য দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি প্রয়োজনীয় সর্ত। খাদ্য আমদানী করিয়া মুনাফার হ্রাস হওয়ার প্রবণতা রোধ করা যাইবে এবং মূলধন বৃদ্ধি বেশী হইবে। অবাধ বাণিজ্যের দ্বারা এইভাবে পৃথিবীর সম্পদ দক্ষতার সহিত ব্যবহৃত হইবে। কিন্তু খাদ্য আমদানী হইলে শ্রমিকের চাহিদা হ্রাস পাইবে এবং তাহাদের অবস্থা খারাপ হইবে। অপর পক্ষে, বিদেশ হইতে সস্তায় খাদ্য আমদানী করা জমিদার এবং পুঁজিপতিরা ঠিক বলিয়া মনে করেন না ফলে তাহাদের মুনাফা হ্রাস পাইবে। জমিতে ক্রমহ্রাসমান বিধি কার্যকরী হওয়ার ইহার স্বাভাবিক কারণ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুন, ফসলের দাম এবং মজুরী বাড়িবে ও মুনাফার/হার হ্রাস পাইবে।

টমাস রবার্ট ম্যালথাস (১৭৬৬—১৮৩৪)ঃ অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে ম্যালথাসের চিন্তাধারা নৈরাশ্যজনক ও হতাশাব্যঞ্জক ছিল। ম্যালথাস দীর্ঘকালীন উন্নয়ন ব্যাপারে আদৌ আগ্রহী ছিলেন না। তিনি প্রধানতঃ স্বল্পকালীন সময়ে সম্পদ বৃদ্ধির কথাই ভাবিয়াছিলেন। ১৮২০ সালে ম্যালথাস Principles of Political Economy গ্রন্থটি রচনা করেন। এই গ্রন্থের On the Progress of Wealth অধ্যায়ে কোন্ কোন্ শক্তি উন্নয়নের অন্তরায় তাহা তিনি বিশ্লেষণ করিয়াছেন কিন্তু কিভাবে উন্নয়ন বৃদ্ধি করা যায় সে সম্পর্কে তিনি কোন আলোচনা করেন নাই। সুতরাং ম্যালথাসের উন্নয়ন তত্ত্ব ইতিবাচক নয়—নেতিবাচক।

ম্যালথাসের মতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটিলে সম্পদ বৃদ্ধি এবং মূল্যবৃদ্ধি পাইবে। দেশ উন্নত হইলে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর যোগান বৃদ্ধি করা দরকার। যে সকল দ্রব্যের ভোগকারীদের নিকট কোন উপযোগ নাই তাহা উৎপাদন করার কোন অর্থ হয় না। কোন দেশের সম্পদ দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে—উহা অংশতঃ নির্ভর করে শ্রম দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রীর পরিমাণের উপর এবং অংশত নির্ভর করে উহার দ্বারা দেশের জনগণের অভাব পূরণের উপর।

দেশের অর্থনৈতিক প্রগতি শুধুমাত্র উৎপাদন ক্ষমতার উপর নির্ভর করে না —উহা উৎপাদন বণ্টনের উপরও নির্ভর করে। উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায় আর উন্নত বণ্টনের মাধ্যমে উহাদের মূল্য বৃদ্ধি করা যায়।

উৎপাদন ও বণ্টন সম্পদের দুইটি প্রধান উপাদান; সঠিক অনুপাতে

মিশ্রিত হইলে অচিরকালের মধ্যেই উহারা জনসংখ্যা ও সম্পদকে সর্বোচ্চ সীমায় পৌছাইয়া দিবে। উহারা পৃথকভাবে অথবা ঠিকমত অনুপাতে মিশ্রিত না হইলে, হাজার হাজার বছর পরেও সামান্য সম্পদ এবং স্বল্প জনসংখ্যার সৃষ্টি করিবে।

মূলধন বৃদ্ধি (Accumulation of Capital) ঃ মূলধন বৃদ্ধি, জমির উর্বরতা এবং শ্রম-সঞ্চয়ী আবিষ্কার উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক। ইহারা উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস করে এবং সমান সংখ্যক শ্রমিক দ্বারা অধিক পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন সম্ভব করে।

ম্যালথাস অর্থনৈতিক উন্নয়নে মূলধনের ভূমিকা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। ইহা অবশ্যই সত্য যে স্থায়ী মূলধন বৃদ্ধি ব্যতীত স্থায়ী এবং ক্রমাগত সম্পদ বৃদ্ধি হইতে পারে না। ইহার পর তিনি আলোচনা করেন কোন্ অবস্থায় মূলধন বৃদ্ধি কার্যকরী হইবে এবং ক্রমাগত মূলধন ও সম্পদ বাড়াইবে। মূলধন বৃদ্ধি উৎপাদনশীল শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে আর উহার দরুন পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। অতিরিক্ত দ্রব্য যদি বিক্রিত হয় তবেই মূলধন বৃদ্ধি চলিতে পারে। ম্যালথাস মনে করিতেন যে অতিরিক্ত পণ্য ক্রেতা খুঁজিয়া পাইবে না আর সেইজন্য মূলধন বৃদ্ধি ক্রমাগত চলিতে পারে না।

উৎপাদনশীল শ্রমিকদের ভোগ ও চাহিদা মূলধন বৃদ্ধি ও নিয়োগের পক্ষে যথেষ্ট নয়। পুঁজিপতি, জমিদার ও অন্যান্য ধনী ব্যক্তিরা মিতব্যয়ী হওয়ায় তাহারা বিলাস ও আরামপ্রদ দ্রব্য ভোগ না করিয়া আয়ের একাংশ সঞ্চয় করিয়া মূলধনের পরিমাণ বাড়াইবে। এই অবস্থায় যদি দ্রব্যসামগ্রীর দাম কমান বা মুনাফা হ্রাস করা না হয় তাহা হইলে অতিরিক্ত উৎপাদিত দ্রব্য ক্রেতা খুঁজিয়া পাইবে না।

ফরাসী অর্থনীতিবিদ **জাঁ বাপতিস্ট সে** (১৭৬৭-১৮৫২) বাজার সংক্রান্ত একটি নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন ; উহা "সে-র নিয়ম" ("Say's Law") নামে খ্যাত। এই নিয়মানুসারে যোগান তাহার চাহিদা সৃষ্টি করে, এবং সামগ্রিকভাবে কার্যকরী চাহিদার ঘাটতি হইতে পারে না। ম্যালথাস "সে'র নিয়মের" সহিত কখনই একমত হন নাই এবং বহু ক্ষেত্রে এই নিয়মের বিরোধিতা করেন। সে-র নিয়মানুসারে দ্রব্যের সহিত দ্রব্যের বিনিময় হয়। ম্যালথাস বলেন যে শুধুমাত্র দ্রব্যের সহিত দ্রব্যের বিনিময় হয় না—দ্রব্যের সহিত শ্রমেরও বিনিময় হয় ; ইহার দরুন দ্রব্যের যোগান চাহিদার তুলনায় বেশী

হইতে পারে আর সেইজন্য শ্রমের অংকে দ্রব্যের দাম কম হইতে পারে। সে-র নিয়ম শুধুমাত্র দ্রব্যের পরিবর্তে দ্রব্য বিনিময়ের কথা চিন্তা করিয়াছে কিন্তু দ্রব্য ও ক্রেতার কথা উপেক্ষা করিয়াছেন। যদি আমরা দ্রব্য এবং উহার ভোগ-কারীর কথা ভাবি তাহা হইলে বাজারে চাহিদার তুলনায় যোগান বেশী হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিবে, যদি না দ্রব্যের যোগান বৃদ্ধির সঙ্গে ভোগকারীর চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ভোগকারীর চাহিদা বৃদ্ধি না পাইবার কারণ দুইটি—(১) স্থিতিশীল জনসংখ্যা এবং (২) মিতব্যায়িতার দরুন ধনীব্যক্তির চাহিদা হ্রাস। কিন্তু তখনও সমান অনুপাতে বিভিন্ন পণ্যের পারস্পরিক বিনিময় হইবে কিন্তু শ্রমের অংকে উহাদের দাম হ্রাস পাইবে, মুনাফা কমিবে এবং মূলধন বৃদ্ধি ও উন্নয়ন শ্লথ হইবে।

রিকার্ডো মনে করিতেন যে শ্রমের যোগান সম্পূর্ণরূপে স্থিতিস্থাপক। অতিরিক্ত দ্রব্যের চাহিদা সৃষ্টির জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু ম্যালথাস মনে করিতেন যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় মূলধনের যোগান দ্রুতহারে হইবে আর ইহার দরুন দ্রব্যের চাহিদার তুলনায় যোগান বাড়িবে।

যাঁহারা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে চাহিদা ও যোগানের সমতায় বিশ্বাস করেন তাঁহারা অলসতার প্রতি স্বাভাবিক মানবিক প্রবণতাকে উপেক্ষা করেন। তাহারা মনে করেন বিলাস দ্রব্যের চাহিদা সীমাহীন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা সত্য নয় এবং বহু ব্যক্তি আছেন যাঁহারা অতিরিক্ত ভোগের পরিবর্তে অবসর ও অলসতা অধিকতর পছন্দ করেন। এই ক্ষেত্রে বাজারে দ্রব্যের চাহিদার তুলনায় যোগান বেশী হইবে।

যদি কৃষিজীবীরা অধিক বিলাসদ্রব্য ভোগ করে এবং শিল্পপতিরা অধিক কৃষিজ দ্রব্য ভোগ করে তাহা হইলে দেশের উন্নয়ন সহজ গতিতে হইবে কিন্তু যদি ওই দুই শ্রেণী অতিরিক্ত ভোগ্য দ্রব্যের তুলনায় অবসর অধিকতর পছন্দ করে তাহা হইলে শিল্পপতিরা তাহাদের পণ্য বিক্রয়ের বাজার পাইবে না এবং বাজারে অতিরিক্ত যোগান ঘটিবে।

রিকার্ডোপন্থীরা মনে করেন যে ধনী ব্যক্তিরা বিলাস দ্রব্য ভোগ হইতে বিরত থাকিয়া তাহাদের সঞ্চয় উৎপাদনে বিনিয়োগ করিবে আর ইহার দরুন মূলধন বৃদ্ধি পাইয়া সক্রিয় চাহিদার সৃষ্টি হইবে। ধনী ব্যক্তিরা বিলাস দ্রব্য ভোগ না করিলে উহাদের সঞ্চয় ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে বিনিয়োজিত হইয়া উহার যোগান বৃদ্ধি করিবে। ইহার দরুন ভোগ্য পণ্যের উৎপাদন খুব বাড়িবে

উহার যোগান বাড়িবে, মুনাফা কমিবে এবং পরিশেষে মূলধনবৃদ্ধি হ্রাস পাইবে স্বল্পকালীন সময়ে মূলধন বৃদ্ধি জনসংখ্যা বাড়াইয়া চাহিদা বাড়াইতে পারে না।

রিকার্ডো, সে এবং জেম্‌স মিল্ অর্থকে নিছক বিনিময়ের মাধ্যম বলিয়া মনে করিতেন এবং সেইজন্য তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছিলেন টাকার দাম সর্বদা সমান থাকে। কিন্তু ম্যালথাস অর্থকে বিনিময় মাধ্যমের অতিরিক্ত কিছু বলিয়া মনে করিতেন, এবং তিনিই প্রথম বলিলেন যে টাকার মূল্য পরিবর্তন দেশের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

ফরাসী লেখক সে (Say) বলিয়াছিলেন যে সঞ্চয় আপনা আপনিই বিনিয়োজিত হইয়া যায়। কিন্তু ম্যালথাস তাহা মনে করেন না। তাঁহার মতে অব্যবহৃত ক্রয়ক্ষমতা কখনও কখনও মজুদ'(hoarding) হইতে পারে; অবশ্য ম্যালথাসের এই ধারণা খুব স্পষ্ট নয়।

অতিরিক্ত মিতব্যয়িতা সক্রিয় চাহিদা কমাইয়া মন্দা এবং বেকারত্ব সৃষ্টি করিবে। শুধুমাত্র জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্পদের ক্রমবৃদ্ধি ঘটাইতে পারিবে না। প্রয়োজনীয় এবং বিলাস দ্রব্যের জন্য অতিরিক্ত জনগণের শুধুমাত্র-আকাঙ্খা সক্রিয় চাহিদা সৃষ্টি করিতে পারে না; আমরা যখন কোন বস্তু আকাঙ্খা করি এবং সেই বস্তু ক্রয় করিবার জন্য টাকা খরচ করিতে প্রস্তুত থাকি তখনই আমরা তাহাকে সক্রিয় চাহিদা বলিব। জনসংখ্যা বাড়িলে শ্রমের যোগান বাড়িবে। অতিরিক্ত জনসংখ্যার দরুন সক্রিয় চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে যদি দ্রব্যসামগ্রীর মালিকের নিকট শ্রমিকের চাহিদা থাকে এবং সে শ্রমের বিনিময়ে দ্রব্য দিতে প্রস্তুত থাকে। যদি মজুরীর তুলনায় উৎপাদিত পণ্যের দাম বেশী হয় তবেই অতিরিক্ত শ্রমিকের চাহিদা হইবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি তখনই সক্রিয় চাহিদা সৃষ্টি করিতে পারিবে যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির পূর্বে পণ্যের চাহিদাও যোগান এরূপ হয় যে অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ করা প্রয়োজন।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে মজুরীর হার এবং উৎপাদন ব্যয় কমিবে এবং মুনাফা বৃদ্ধি পাইবে, ইহার দরুন উৎপাদন উৎসাহিত হইবে। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় যে পর্যন্ত উৎপাদন বাড়িবে তাহা সবই সীমিত। একটি ন্যূনতম পর্যায় আছে যাহার নীচে মজুরী নামিতে পারে না যদি না জনসংখ্যা বৃদ্ধি রুদ্ধ হয়। কিন্তু ন্যূনতম পর্যায়ে পৌঁছাইবার পূর্বে অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ করিয়া যে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে তাহা দ্রব্যের দাম এবং মুনাফা এতই কমাইবে যে অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ আর লাভজনক হইবে না।

সক্রিয় চাহিদা বৃদ্ধির পদ্ধতি (Methods of Increasing Effective Demand) : মূলধন বৃদ্ধি, ভূমির উর্বরতা এবং যন্ত্রের ব্যবহার দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন যথেষ্ট বাড়াইতে পারে কিন্তু ইহারা যদি সক্রিয় চাহিদা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় তবেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন হইবে। সক্রিয় চাহিদা বৃদ্ধি উৎপাদন বৃদ্ধির মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু উৎপাদন বাড়িলেই যে সক্রিয় চাহিদা বাড়িবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। ধন বণ্টনে অধিকতর সমতা প্রতিষ্ঠিত হইলে সক্রিয় চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। যথাযথভাবে ভূসম্পত্তি বন্টিত হইলে অর্থ ও সম্পদ বিকেন্দ্রীভূত হইয়া পড়িবে যাহার দরুন সক্রিয় চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। অসংখ্য দরিদ্রবেষ্টিত কতিপয় ধনীর তুলনায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আয়তন বাড়িলে সক্রিয় চাহিদা বেশী হইবে। যদিও তত্ত্বগতভাবে কতিপয় ধনী ব্যক্তি ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি করিতে সক্ষম কিন্তু বাস্তবে ইহা কখনও ঘটে নাই। ম্যালথাস বলেন যে, সম্পদ বণ্টনে অসাম্য যত কম হইবে উৎপাদন তত বেশী হইবে। অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে সম্পদ সৃষ্টি একই সঙ্গে সুসম সম্পদ বণ্টনের একটি ফল। অবশ্য তিনি একথাও উপলব্ধি করেছিলেন যে চরম সমতা দ্রব্য উৎপাদনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিবে।

অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য উভয়ই দেশের জন্য প্রয়োজনীয়। ইহারা বাজারেব আয়তন বৃদ্ধি কবিয়া মূলধন বৃদ্ধি এবং উন্নয়নেব সহায়ক হয়।

দেশে এবং বিদেশে সীমিত বাজার আছে এরূপ কোন দেশ প্রভূত মূলধন সঞ্চয় করিতে পারে না কারণ এরূপ বাজার অভাব এবং রুচি সৃষ্টি করিতে পারে না, দ্রব্যের দাম চড়া রাখিতে এবং মুনাফার হ্রাস রোধ করিতে ক্রেতার সক্রিয় চাহিদা একান্ত প্রয়োজন। অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করে। রিকার্ডোর মতে বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে দেশ সস্তা দরে জিনিস পাইবে। কিন্তু ম্যালথাস মনে করেন যে বৈদেশিক বাণিজ্যের সবচেয়ে বড় সুবিধা হইল যে কম প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বিনিময়ে অধিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাইবার ইহা একটি পদ্ধতি আর এইভাবে ইহা দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির সহায়ক। দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি করার তৃতীয় পদ্ধতি হইল বেকার লোককে ব্যক্তিগত সেবাকার্যে নিয়োগ করা অথবা যথেষ্ট অনুৎপাদনশীল ভোগকারীকে ধারণ করা। অনুৎপাদনশীল ভোগকারীরা অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য চাহিদা সৃষ্টি করিয়া মুনাফা হারের হ্রাস রোধ করিবে। উৎপাদনশীল ভোগকারীর যে অনুপাত সর্বাধিক উন্নয়ন হার সৃষ্টি করিবে তাহা কয়েকটি

বিষয়ের উপর নির্ভর করে মূলধন বৃদ্ধির হার। ভূমির উর্বরতা, যন্ত্র আবিষ্কারের ক্ষেত্রে অগ্রগতি, উৎপাদনশীল শ্রমিকের ভোগপ্রবণতা ইত্যাদি।

ম্যালথাস মনে করিতেন যে কোন একটি বিশেষ সীমার উর্ধ্বে জনসাধারণের বিলাস দ্রব্যের প্রতি আকাংখা থাকিবে না। সেইজন্য তিনি শিল্পায়নের সমর্থন করেন। তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে শিল্প ও বাণিজ্য দেশের সকল শ্রেণীর মধ্যে নূতন জীবন এবং কর্মচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিবে, ব্যক্তিগত যোগ্যতার দ্বারা সাধারণ লোকের উন্নতির সুযোগ করিয়া দিবে এবং প্রতিভার যোগ্য সমাদর করিবে। শিল্প ও বাণিজ্য আবিষ্কারকে উত্তেজিত করিবে, বিজ্ঞান ও প্রয়োজনীয় কলাবিদ্যাকে উৎসাহ দিবে, জ্ঞানকে প্রসারিত করিবে এবং আরামপ্রদ ও বিলাস দ্রব্যের জন্য আকাংখা ও রুচির সৃষ্টি করিবে। এই সঙ্গে ম্যালথাস সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যা যেন খুব বেশী না হয় কারণ উহা জাতির সুখ ও শান্তির অন্তরায়। শিল্পে পরিবর্তন সর্বদাই ঘটিতেছে তাই শিল্প-শ্রমিকের মজুরী তীব্রভাবে ওঠানামা করে আর স্বভাবতই উহা তাহাদের মনে অসন্তোষের সৃষ্টি করে। তিনি এই সিদ্ধান্ত করেন যে শিল্প এবং কৃষির সুষম উন্নয়ন দেশের পক্ষে সর্বাপেক্ষা হিতকর।

এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা না করিলেও ম্যালথাস দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অনার্থিক উপাদানসমূহের (non-economic factors) গুরুত্ব স্বীকার করেন।

জাতীয় সম্পদের উপর যে সকল বিষয় সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করে তাহারা হইল রাজনীতি এবং নীতিজ্ঞান। সম্পত্তির নিরাপত্তা না থাকিলে জনগণের মধ্যে পরিশ্রমের প্রতি আগ্রহ থাকিবে না। দেশের শাসনব্যবস্থা এবং আইন নিরাপত্তা প্রদান করিতে পারে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে ম্যালথাসের অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ সক্রিয় চাহিদার প্রয়োজনীয়তা তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেন। কেনস এবং ক্যালেকীর (Kalecki) মত আধুনিক অর্থনীতিবিদগণের কতকগুলি মূল ধারণার সূত্র তাঁহার লেখায়ই প্রথম পাওয়া যায়।

কার্লমার্কস (১৮১৮-১৮৮৩)ঃ কার্লমার্কস একজন ক্ষমতাশালী চিন্তানায়ক। তাঁহার চিন্তা মানুষের ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। মার্কস হইলেন এক "ক্রুদ্ধ প্রতিভার" প্রতীক। তিনি ধনতন্ত্রের অনিবার্য পতন

এবং উহার ধ্বংসাবশেষের উপর সমাজবাদের আবির্ভাবের ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছেন।

মার্কস রিকার্ডোর শ্রমভিত্তিক মূল্যদর্শনকে সংশোধিতভাবে গ্রহণ করিলেও অর্থনীতিক বিশ্লেষণে তিনি ক্ল্যাসিক্যাল ঐতিহ্য হইতে দূরে সরিয়া যান। ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণের সঙ্গে এ বিষয়ে তিনি একমত যে ধনতন্ত্রের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ক্ল্যাসিক্যাল লেখকেরা মনে করিতেন যে ধনতন্ত্র স্থিতিশীল অবস্থায় (stationary stage) পৌঁছাইয়া অচল হইয়া পড়িবে কিন্তু মার্কস বলিলেন উহা বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। ক্ল্যাসিক্যাল লেখকেরা মনে করিতেন যে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনবিধিই ধনতন্ত্রের পতনের কারণ। কিন্তু মার্কস মনে করিতেন যে ধনতন্ত্র চরম পর্যায়ে পৌঁছাইবার পর সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত হইয়া উহাকে ধ্বংস করিবে। বিশুদ্ধ অর্থনীতিবিদ (pure economist) বলিতে যাহা বোঝায় মার্কস তাহা নহেন। তাঁহার বিশ্লেষণ অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস ও দর্শনের এক সংমিশ্রিত রূপ।

উন্নয়নতত্ত্ব (Theory of Development): মানব সমাজ বর্তমানে যেমন অবস্থায় আছে তাহা কিভাবে সম্ভব হইল, কেন সমাজে পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে আর ভবিষ্যতে মানব ইতিহাসে কি কি পরিবর্তন দেখা দিবে—এই প্রশ্নগুলির উত্তর মার্কসীয় তত্ত্বে পাওয়া যাইবে। মার্কস বলেন, সামাজিক পরিবর্তনগুলি কোন আকস্মিক ব্যাপার নয়। প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ন্যায় সামাজিক পরিবর্তনও কতকগুলি নিয়মানুসারে ঘটিয়া থাকে।

মার্কসীয় দর্শনের ভিত্তি হইল হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদ। জাগতিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মার্কস দ্বন্দ্ববাদের প্রয়োগ করেন। দ্বন্দ্ববাদের মূলকথা হইল অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব বা বৈপরীত্যের (contradictions) পথ ধরিয়া মানবসভ্যতা অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই পরস্পরবিরোধী শক্তি রহিয়াছে এবং উহাদের সংঘাতের মধ্য দিয়া মানবসভ্যতার পরিবর্তনের ধারা বহিয়া চলিয়াছে।

হেগলের মতে সমাজ বিবর্তনের জন্য বস্তু অপেক্ষা ভাব (Idea) অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সমগ্র বিশ্বের মূলে রহিয়াছে বিশ্বচেতনা (World Spirit) বা পরম ভাব (Absolute Idea); প্রাকৃতিক জগতের সকল বস্তুই হইল এই বিশ্বচেতনার অভিব্যক্তি। হেগেল বলেন যে, ভাবের পরিবর্তনের ফলেই সমাজ

পরিবর্তিত হয়। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিকে অনুসরণ করিয়া মার্কস সমাজ বিবর্তনের তিনটি পর্যায়ের কথা বলিয়াছেন—আদিম সাম্যবাদী সমাজ ধনতান্ত্রিক সমাজ এবং উচ্চ পর্যায়ের সাম্যবাদী সমাজ (Higher Communism); এই তৃতীয় পর্যায়ে আদিম সাম্যবাদের সহিত ধনতান্ত্রিক সমাজের বিজ্ঞান ও কারিগরী জ্ঞানের সমন্বয় ঘটিবে। আদিম সাম্যবাদ হইতে ধনতান্ত্রিক সমাজের পরিবর্তন ধীর গতিতে হইবে কিন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজ হইতে সাম্যবাদী সমাজের রূপান্তর আকস্মিকভাবে এবং বৈপ্লবিক পদ্ধতিতে ঘটিবে।

মার্কসীয় চিন্তাধারার ভিত্তি হেগেলের দ্বন্দ্ববাদ হইলেও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। হেগেলের মতে মানব ইতিহাসের বিবর্তনের কারণ হইল ভাব (idea), অপর পক্ষে মার্কসের মতে মানব ইতিহাসের বিবর্তনের কারণ হইল জড় পদার্থ (matter)। সমাজব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে অর্থনীতি, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনই যুগে যুগে সমাজব্যবস্থাকে পরিবর্তিত করিয়াছে। হেগেলের নিকট ভাবই হইল এই বাস্তব জগতের স্রষ্টা এবং বাস্তব পৃথিবী ভাবেরই জাগতিক রূপ। মার্কসের মতে এই জড় জগতকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের চিন্তা ও ভাব গড়িয়া ওঠে, বস্তু হইতেই ভাবের বিবর্তন হয়।

মার্কসের মতে পরস্পরবিরোধী শ্রেণীগুলিই হইল সমাজ বিকাশের প্রধান চালক শক্তি। শ্রেণীদ্বন্দ্বের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের উন্নতি হইতে থাকে, প্রকৃতির উপর মানুষের অধিকার এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি উৎপন্ন করার ক্ষমতা বাড়িতে থাকে। শক্তিচালিত যন্ত্রের আবিষ্কার উৎপাদনের ক্ষেত্রে যুগান্তর আনয়ন করে, কিন্তু তাহার তাৎপর্য এইটুকু মাত্রই নয়। সেইসঙ্গে যেসব উৎপাদক চরকা ও হস্তচালিত তাঁতের দ্রব্য তৈয়ারী করিত তাহারা ধ্বংস হইল, কেন না শক্তিচালিত যন্ত্রের সাহায্যে একজন মজুর একদিনে যাহা করিত, হস্তচালিত যন্ত্রপাতির সাহায্যে একজন কারিগরের সেইজন্য এক সপ্তাহ পরিশ্রম করিতে হইত। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা চালানো কারিগরের পক্ষে সাধ্যাতীত ব্যাপার। আগে কারিগর নিজেই যন্ত্রপাতির মালিক ছিল এবং নিজেই সেগুলির সাহায্যে উৎপাদন করিত। এখন তাহার পরিবর্তে গড়িয়া উঠিল একদিকে পুঁজিপতি শ্রেণী, নূতন শক্তিচালিত যন্ত্রের মালিক, তাহারা কিন্তু নিজেরা সেই যন্ত্রকে চালায় না; আর অন্যদিকে আছে কারখানার শ্রমিকগণ, সর্বহারা শ্রেণী, উৎপাদনের উপাদানগুলির উপর তাহাদের কোন মালিকানা নাই—মজুরির বিনিময়ে তাহারা পুঁজিপতির অধীনে কাজ করে।

এই পরিবর্তন কাহারও দ্বারা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে সচেতনভাবে সাধিত হয় নাই। মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক নবলব্ধ জ্ঞানকে উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াছিল নিজেদের সুবিধার জন্যে। তাহাদের কাজের ফলে সমাজে কি পরিবর্তন দেখা দিবে সে সম্বন্ধে তাহাদের কোন ধারণাও ছিল না অথচ তাহারই ফলে ওই পরিবর্তন ঘটে। মার্কসের মতে মানব সমাজের সমস্ত পরিবর্তন সম্পর্কেই এই কথা খাটে। মানুষ তাহার জ্ঞানের পরিমাণ যতই বাড়াইতে থাকে ততই সেই নবলব্ধ জ্ঞানকে উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে; আর তাহারই ফলে সমাজে বিরাট পরিবর্তন হইতে থাকে। এই সব সামাজিক পরিবর্তনের পরিণতি হয় শ্রেণীদ্বন্দ্বে।

সামন্ত যুগের ব্যক্তিগত উৎপাদন হইতে পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রথার উৎপত্তি। সামন্ত উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রধান লক্ষণ ছিল স্থানীয় প্রয়োজন মিটাইবার জন্য উৎপাদন। পুঁজিবাদের মূল লক্ষণ হইল মুনাফার জন্য উৎপাদন। মুনাফার জন্য উৎপাদন চালাইতে প্রধানতঃ দুইটি জিনিস দরকার: (১) এমন একদল লোক যাহাদের হাতে উৎপাদনের উপাদান কিনিবার মতো যথেষ্ট অর্থ আছে; (২) আর একদল লোক যাহাদের হাতে উৎপাদনের কোন উপাদান নাই—যাহাদের বাঁচিবার একমাত্র উপায় পুঁজিপতিদের অধীনে কাজ করা।

পুঁজিপতি শ্রমিককে যথাসম্ভব কম মজুরী দিয়া শোষণ করিতে থাকে তাই পুঁজিপতি ও শ্রমিকের দ্বন্দ্ব বিরামহীন গতিতে চলে। শ্রমিকেরা ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করিয়া সংঘবদ্ধভাবে পুঁজিপতি শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। সেই সংগ্রামেরই চরম রূপ হইল বিপ্লব—পুঁজিপতি শ্রেণীকে ধ্বংস করিয়া নূতন উৎপাদন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, যেখানে শ্রমিকদের অন্য শ্রেণীর স্বার্থে কাজ করিতে হয় না। পুঁজিবাদের বিকাশের ব্যাপারে প্রধান বিষয় হইতেছে প্রতিযোগিতা।

ব্যক্তিগত পুঁজি এক যুগে মানবসমাজের উৎপাদিকাশক্তির উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে কিন্তু পরবর্তীকালে তাহার অগ্রগতির পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শ্রেণীতে শ্রেণীতে দ্বন্দ্বের ফলে উৎপাদন ব্যবস্থার অগ্রগতি হয়। যখন কোন বিপ্লব সাধিত হয় তাহার দরুণ উন্নততর উৎপাদন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

সমাজ বিকাশের কোন এক স্তরে যখনই সমসাময়িক উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে প্রচলিত সমাজ সম্বন্ধের বিরোধ হইয়াছে তখনই শ্রেণীসংঘাত বা বিপ্লবের মধ্য দিয়া ওই উৎপাদন-পদ্ধতির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নূতনতর সমাজসম্পর্ক ও প্রশাসন ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে। এইভাবেই দাসপ্রথার অবসানে সামন্ত

প্রথা, সামন্ত প্রথার অবসানে ধনতন্ত্র এবং ধনতন্ত্রের অবসানে সমাজতন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে।

বিপ্লবের ফলে নূতন শ্রেণী ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং সেই শ্রেণী নূতন উৎপাদন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। বিপ্লবের পর ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদের স্থান দখল করিবে যে নূতন সমাজব্যবস্থা তাহা হইল সমাজতান্ত্রিক সমাজ। সমাজতান্ত্রিক সমাজ পুঁজিবাদী সমাজের গর্ভ হইতে উদ্ভূত হইবে। বস্তুতঃ পুঁজিবাদী সমাজের অভ্যন্তরীণ অগ্রগতিই সমাজতন্ত্রের পথ সুগম করিয়া দেয়। ভাবী পরিবর্তনের প্রকৃতিও তাহার দ্বারা নির্ধারিত হয়। উৎপাদন ক্রমশই সামাজিক হইতে থাকে অর্থাৎ কোন একটি দ্রব্যের উৎপাদনের ব্যাপারে ক্রমশঃ বেশী লোক একত্রে কাজ করিতে পারে।

মার্কস ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়া বলিয়াছেন অর্থনৈতিক শক্তি অন্যান্য যে কোন শক্তি অপেক্ষা অধিকতর প্রভাবশালী। অর্থনীতিই সমাজ ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। সমাজের প্রচলিত ধর্ম, কলা, বিজ্ঞান, নীতিবোধ, সামাজিক রীতিনীতি সকল কিছুকেই অর্থনীতি প্রভাবিত করিয়া তোলে। আমেরিকায় দাসব্যবস্থার উচ্ছেদের কারণ মানবতাবোধ নয়, মার্কস ইহার অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দিবেন। উত্তরাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি কালক্রমে বুঝিতে পারিল যে দাস-শ্রমিক স্বাধীন শ্রমিক অপেক্ষা কম দক্ষ এবং ব্যয়বহুল তাই তাহারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া ক্রীতদাসদিগকে মুক্ত করিল। ধর্ম, নীতি, সংস্কৃতি এবং শিক্ষা ইহারা প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি। ক্রীতদাসের শ্রমশোষণের ভিত্তিতে গঠিত সমাজব্যবস্থা হইতে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার এবং উহা হইতে পুঁজিপতি সমাজব্যবস্থার আর পুঁজিপতি সমাজব্যবস্থা হইতে সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার জন্ম হইবে—ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা ইহাই নির্দেশ করে।

মার্কসের মতে আজ পর্যন্ত মানবসমাজের যে ইতিহাস তাহা মূলতঃ শ্রেণীসংগ্রামেরই ইতিহাস; শ্রেণীস্বার্থের ভিত্তিতে গঠিত সমাজব্যবস্থার অনিবার্য পরিণতি হইল শ্রেণীসংগ্রাম। যুগে যুগে সমাজে শোষক ও শোষিত, উৎপীড়নকারী এবং উৎপীড়িত, অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত—এই দুইটি শ্রেণী রহিয়াছে। উৎপাদন-ব্যবস্থার উপর যে শ্রেণী আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে সেই শ্রেণী রাষ্ট্রেরও উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া রাষ্ট্রকে শ্রেণীস্বার্থ কায়েম করার যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিয়াছে। শোষক শ্রেণীর শোষণ যখন চরম

আকার ধারণ করে তখন তখনই তাহার পতন দেখা দেয়। অগণিত শোষিত জনতা উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাইয়া নূতন সমাজ-ব্যবস্থা সৃষ্টি করে। শ্রেণীদ্বন্দ্ব অতি প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীন রোমে এইরূপ দুইটি শ্রেণীস্বার্থ হইল প্যাট্রিসিয়ান এবং প্লেবিয়ান; যাহারা সমাজে উৎপাদন উপকরণগুলির উপর আধিপত্য স্থাপন করিল তাহারা হইল অভিজাত-শ্রেণী (প্যাট্রিসিয়ান) আর শোষিত সম্প্রদায় হইল সাধারণ লোক (প্লেবিয়ান) সামন্ততান্ত্রিক যুগে ভূমির মালিকানাবলে ভূম্যধিকারীরা রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধীরে ধীরে করায়ত্ত করিয়া ভূমিহীন শ্রেণীকে (Serf) শোষণ করিয়াছে। বর্তমান সমাজে মূলধন উৎপাদন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী বলিয়া মূলধন-মালিক (Bourgeoisie) সমাজের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া রাষ্ট্রকে স্বীয় স্বার্থসাধনে নিয়োগ করিয়াছে। ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিপতিসমাজ পুঁজিপতি (Bourgois) এবং মজুর বা সর্বহারা (Proletariat) এই দুই পরস্পরবিরোধী শ্রেণীতে দ্বিধাবিভক্ত। মূলধন-মালিকদের লক্ষ্য মুনাফা সর্বাধিক করা। মজুরদের জীবনধারণোপযোগী মজুরী দিলে তবেই মালিকের মুনাফা সর্বাধিক হইবে। পুঁজিপতিদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় ছোট ছোট পুঁজিপতিগণ পরাভূত হইয়া সর্বহারায় পরিণত হইবে। এইভাবে একদিকে মূলধন মুষ্টিমেয় কয়েকটি লোকের হাতে আসিয়া কেন্দ্রীভূত হইবে আর অপর দিকে সর্বহারার সংখ্যা বাড়িতে থাকিবে। পরিশেষে, শোষণ চরমে উঠিলে সর্বহারাশ্রেণী বিপ্লব করিয়া পুঁজিপতি শ্রেণীকে উচ্ছেদ করিয়া শ্রেণীহীন সমাজ গঠন করিবে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদনের উদ্দেশ্য মুনাফা নয়—ব্যবহার। কাজেই সেখানে সুপরিকল্পিতভাবে উৎপাদন করা সম্ভব। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রবাদ বলিতে মার্কস বুঝিয়াছিলেন যে উৎপাদনের উপকরণগুলির মালিক হইবে সমগ্র সমাজ। উৎপাদিকা শক্তির দ্রুত উন্নতি হইবে এবং উৎপাদনের কাজ চলিবে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে। উৎপাদিকাশক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে অথচ অতিরিক্ত উৎপাদনের সংকট দেখা দিবে না। মোট উৎপন্ন জিনিষের যে অংশ ব্যবহারের জন্য পাওয়া যাইবে তাহা এই নীতি অনুসারে ভাগ হইবে— "প্রত্যেকের নিকট হইতে তাহার সামর্থ্য অনুসারে লওয়া হইবে, প্রত্যেককে তাহার প্রয়োজন অনুসারে দেওয়া হইবে।"

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মোট উৎপাদন যে হারে বাড়ে, মজুরী তদপেক্ষা কম হারে বাড়ে, কাজেই উৎপাদন অপেক্ষা চাহিদা কম হয়; ধনতান্ত্রিক সংকটের ইহাই মূল কারণ। এই ব্যবস্থায় দ্রব্যের বিক্রয়-মূল্য উহার উৎপাদনব্যয় অপেক্ষা অধিক। এই অতিরিক্ত মূল্য সৃষ্টির কৃতিত্ব শ্রমিকের কিন্তু উৎপাদন-ব্যবস্থা পরিচালনা করে পুঁজিপতি বলিয়া সে উহা আত্মসাৎ করে; অর্থাৎ শ্রমিক যে পরিমাণ উৎপাদন করে তাহা অপেক্ষা অনেক কম সে মজুরী হিসাবে পুঁজিপতির কাছ হইতে পায়। যে অতিরিক্ত মুনাফা শ্রমিকদেরই ন্যায্য পাওনা কিন্তু মালিকশ্রেণী তাহা অন্যায়ভাবে ভোগ করিতেছে উহাকেই মার্কস উদ্বৃত্তমূল্য (Surplus Value) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। উদ্বৃত্ত মূল্যের সূত্রটি এইভাবে প্রকাশ করা যায়, M—C—M′ পুঁজিপতি টাকা(M)লইয়া বাজারে গিয়া যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ও শ্রমিক ক্রয় করে। উহাদের সমন্বয়ে দ্রব্য (C) উৎপাদন করিয়া পুনরায় বাজারে লইয়া গিয়া অর্থের (M′) বিনিময়ে বিক্রয় করে; অর্থ-ই উৎপাদনের সুরু এবং শেষ। এখন প্রথম M এবং দ্বিতীয় M′-এর মধ্যে যে পার্থক্য তাহাকেই মার্কস উদ্বৃত্ত মূল্য বলিয়াছেন; পুঁজিপতি হিসাবে ইহাই মালিকের আয়।

মূল্যায়ন: মার্কসীয় অর্থনীতি মানুষের সনাতন চিন্তাধারার ভিত্তিমূল শিথিল করিয়াছে আবার নানাদিক হইতে তীব্রভাবে ইহার সমালোচনা করা হইয়াছে। মার্কস ইতিহাসের বিবর্তন ব্যাখ্যায় অর্থনৈতিক কারণগুলিকেই গুরুত্ব দিয়াছেন আর অর্থনৈতিক প্রভাব বহির্ভূত অন্যান্য বিষয়গুলিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণের সাহায্যে ইতিহাসের জটিল ধারাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। মানুষ শুধুমাত্র অর্থনীতির দ্বারাই পরিচালিত হয় না; দেশপ্রেম, ক্ষমতালিপ্সা, মানসিক পরিতৃপ্তি, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ও মানুষের কর্মপ্রেরণাকে প্রভাবিত করে। অর্থনীতি ইতিহাসের অগ্রগতিকে পরিপূর্ণভাবে নয়—বড় জোর আংশিকভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারে। মার্কস মতাদর্শের ভূমিকাকে বিশেষ গুরুত্ব দেন নাই কিন্তু দেখা যায় যে মানুষ যুগ যুগ ধরিয়া বাস্তব অপেক্ষা আদর্শের জন্যই সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছে। সুতরাং বলা যায় যে মার্কস প্রদত্ত ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা সঠিক নয় কারণ অন্যতমকে তিনি একমাত্র উপাদান বলিয়া নির্দেশ দিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ, বাট্রাণ্ড রাসেল বলেন, মার্কসের মতে উৎপাদনপদ্ধতিই ঐতিহাসিক পরিবর্তনের প্রধান কারণ কিন্তু উৎপাদন-পদ্ধতির কেমন করিয়া পরিবর্তন ঘটে তাহার ব্যাখ্যা মার্কসের মধ্যে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ উৎপাদন-পদ্ধতির পরিবর্তনের মূল উৎস হইতেছে জ্ঞান-মানস—বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবনা। মার্কসের মতে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবনা ঘটে অর্থনৈতিক কারণে যাহা ইতিহাস-সম্মত নয়। আর্কেমিডিসের সময় হইতে লিওনার্ডের কাল পর্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয় নাই কেন? অথচ আর্কেমিডিসের সময় হইতে পরবর্তী ছয় শতাব্দীকালের অর্থনৈতিক অবস্থা বৈজ্ঞানিক কাজের পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল ছিল। বস্তুতঃ রেনেসাঁর সময় হইতে যে বৈজ্ঞানিক চর্চার অগ্রগতি হয় তাহা হইতেই আধুনিক শিল্পের জন্ম হয়। অর্থনৈতিক পরিবর্তনের উপর জ্ঞান-মানসের প্রভাব মার্কস একেবারেই লক্ষ্য করেন নাই। ("This intellectual causation of economic process is not adequately recognised by Marx.")

তৃতীয়ত, মার্কসের প্রায় প্রতিটি ভবিষ্যৎবাণী ব্যর্থ হইয়াছে। মার্কসের একটি ভবিষ্যৎবাণী ছিল যে ধনতান্ত্রিক সমাজ তাহার কবর খুঁড়িতেছে এবং এই সমাজে ধনী অধিকতর ধনী ও দরিদ্র অধিকতর দরিদ্র হইবে। কিন্তু উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি সমৃদ্ধির পথে ক্রমাগত অগ্রসর হইতেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানী, গ্রেটবৃটেন প্রভৃতি দেশে ধনী অধিকতর ধনী হইলেও দরিদ্র জনগণের বর্ধমান দারিদ্র্য দেখা যায় নাই বরং তাহাদের অবস্থাও ক্রমশ উন্নত হইতেছে। সুতরাং সর্বহারা শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান দুঃখদুর্দশার যে ভবিষ্যৎবাণী মার্কস করিয়াছিলেন তাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। শ্রমিক সংগঠন, যৌথ দরাদরির ক্ষমতা (collective bargaining) এবং রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ফলে সর্বহারা শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান দুঃখদুর্দশার নিয়ম মিথ্যা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ধনতন্ত্র যে তাহার কবর রচনা করিতেছে ইহাও সত্য নয়।

মার্কস ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার চরম উন্নতির পর্যায়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দেখা দেবে। এই কারণে মার্কস ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন যে জার্মানী অথবা ইংলণ্ডের মতো শিল্পোন্নত দেশেই প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হইবে। কিন্তু কৃষিপ্রধান এবং অনুন্নত রাশিয়ায়

প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দেখা দেয়—যাহা মার্কসের কল্পনাতীত ছিল।

মার্কসের চিন্তাধারায় মৌলিকত্বের অভাব থাকিলেও এবং তাঁহার বিশ্লেষণ দুর্বল হইলেও তাঁহার সমন্বয় (synthesis) সম্পূর্ণ মৌলিক। মার্কসের ইতিহাসের ব্যাখ্যা হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্ব কিছু মৌলিক নয়, রডবারটাস (Rodbertus), ব্রে (Bray) এবং উইলিয়ম টম্পসনের (Thompson) লেখায় উনবিংশ শতকের সুরুতেই এই তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা, শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান দুঃখদুর্দশার নিয়ম এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পর্কে মার্কসের ভবিষ্যৎবাণী ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁহার অবদানও কম নয়। তিনি সমষ্টিগত অর্থনীতির (macro-economics) একজন পথিকৃত। অধ্যাপক বোল্ডিং-এর মতে মার্কসই সর্বপ্রথম তাঁহার Capital গ্রন্থে অর্থনীতিক ব্যবস্থার সামগ্রিক সমস্যা লইয়া আলোচনা করেন—অর্থনীতিক জীবন এবং সম্পর্কের একটি পূর্ণচিত্র দিবার প্রয়াস পান যাহা পূর্ববর্তী লেখকগণ উপেক্ষা করিয়াছেন। অধ্যাপক ডোমার (Domar) বলেন, মার্কস-ই প্রথম আধুনিক উন্নয়ন অর্থনীতির প্রয়োজন অনুভব করেন কারণ ধনতান্ত্রিক সমাজে উন্নয়ন প্রয়োজন এই ধারণার জনক কার্ল মার্কস।

মার্কসীয় তত্ত্ব সমালোচনার ঊর্ধ্বে না হইলেও মানুষেরচিন্তাধারায় মার্কসের আবির্ভাব অসাধারণ বলিলে কম বলা হয়—তিনি বিশ্বের বিস্ময়। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো হইতে সুরু করিয়া স্যার টমাস মূর পর্যন্ত বহু লেখক সাম্যবাদী সমাজের আদর্শ আমাদের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন কিন্তু এই সকল আলোচনাই ছিল অবাস্তব কল্পনা। মার্কস-ই প্রথম লেখক যিনি সমাজতন্ত্রের বৈজ্ঞানিক এবং বাস্তবানুগ ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করেন। সারা জীবন দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত মার্কস সমগ্র মানবজাতির অভাব হইতে মুক্তি তথা শোষণ হইতে মুক্তির মহান স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। মার্কসীয় মতবাদ সর্বজনীন মানবতার মতবাদ বলিয়া উহা বিশ্বজনের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে।

ছদ্ম বেকারীর সাহায্যে মূলধন গঠনঃ নার্ক্‌স তত্ত্ব (Capital Formation with Disguised Unemploymen—Nurksiant Thesis) :

ছদ্মবেশী বেকার শব্দটি সৃষ্টি করেন মিসেস জোয়ান রবিনসন কিন্তু অর্ধোন্নত দেশের উন্নয়ন তত্ত্বে উহার প্রথম ব্যবহার করেন রোসেনষ্টাইন রোডান এবং অধ্যাপক নার্কস উহাকে একটি বিশিষ্ট মতবাদের আকার দিবার চেষ্টা করেন।

উৎপাদন-কৌশল এবং সম্পদ প্রদত্ত ধরিয়া অগ্রসর হইলে বলা যায় যে জনাধিক্যপূর্ণ অর্ধোন্নত দেশে কৃষির অনেকখানি জুড়িয়া শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য। সুতরাং কৃষি-উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস না করিয়াই কৃষি হইতে উদ্বৃত্ত শ্রমিক সরাইয়া লওয়া সম্ভব। যেখানে বিকল্প কর্মসংস্থানের অভাবে প্রয়োজনাতিরিক্ত শ্রমিক কৃষিতে নিযুক্ত থাকে সেখানেই এইরূপ ছদ্ম-বেকারত্ব দেখা দেয়। যে জমিখণ্ড ৫ ব্যক্তিতে চাষ করিতে পারে সে ক্ষেত্রে যদি ৮ ব্যক্তি নিযুক্ত থাকে তাহা হইলে বলা যায় যে উহারা পরিপূর্ণভাবে কাজ করিতেছে না। যদি ৩ ব্যক্তিকে কৃষিকার্য হইতে সরাইয়া উহাদের কোন বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে কৃষি উৎপাদন হ্রাস পাইবে না। অন্যভাবে বলা যায় যে ৩ ব্যক্তি উৎপাদনে কিছুই যোগ করিতেছে না এবং তাহাদের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য।

অধ্যাপক অমর্ত সেন ছদ্মবেশী বেকারত্বের এই ব্যাখ্যার সহিত একমত নহেন। তিনি প্রশ্ন তুলিয়াছেন, যদি শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা অনেকখানি অংশে শূন্য হয় তাহা হইলে আদৌ শ্রমিক নিয়োগ করা হয় কেন? শ্রম এবং শ্রম-সময়ের (labour time) মধ্যে পার্থক্য করিতে না পারার ফলেই ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। অধ্যাপক সেন বলেন, উৎপাদন-পদ্ধতিতে যথেষ্ট পরিমাণে শ্রমিক নিয়োজিত হইতেছে কিন্তু যথেষ্ট শ্রম ব্যবহৃত হইতেছে না; সুতরাং মাথাপিছু কাজের সময় কম হইলেই ছদ্মবেশী বেকারীর সৃষ্টি হয়।

অধ্যাপক নার্কস জনাধিক্যপূর্ণ অর্ধোন্নত দেশে ছদ্মবেশী বেকারীর মধ্যে মূলধনগঠনের উৎস আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছেন। নার্কস মনে করেন ছদ্মবেশী বেকারীর মধ্যে গুপ্ত সঞ্চয়ক্ষমতা লুকাইয়া আছে। অর্ধোন্নত দেশ-গুলিতে প্রভূত পরিমাণে ছদ্মবেকারত্ব দেখা যায়। বর্তমান কৃৎকৌশলের সাহায্যেই কৃষিউৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস না করিয়া কৃষি হইতে উদ্বৃত্ত শ্রমিক সরাইয়া লওয়া যায়। যদি এই উদ্বৃত্ত শ্রমিককে জলসেচ, রাস্তা নির্মাণ, রেলপথ নির্মাণ, বাঁধ তৈয়ারী, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি মূলধনী প্রকল্পে নিয়োগ করা যায় তাহা হইলে ছদ্মবেকারের সাহায্যে মূলধন গঠন করা সম্ভব হইবে; এইভাবে গ্রামাঞ্চলের ছদ্মবেকারী মূলধন গঠনের উৎসে পরিণত হইবে।

ছদ্মবেকারীর সুপ্ত সঞ্চয়ক্ষমতাকে কিভাবে মূলধনগঠনের কাজে প্রয়োগ করা যায় সেই সমস্যাকে নার্কস দুইটি অংশে বিভক্ত করিয়া আলোচনা করিয়াছেন।

প্রথমতঃ যে সকল উদ্বৃত্ত শ্রমিককে কৃষি হইতে সরাইয়া অন্যান্য মূলধনী প্রকল্পে নিয়োগ করা হইল কিভাবে তাহাদের ভরণপোষণ চলিবে; দ্বিতীয়তঃ এই সকল নতুন শ্রমিকদের কাজের যন্ত্রপাতি কিভাবে যোগাড় হইবে।

প্রথম সমস্যাটির কিছু পরিমাণে স্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয়, কর এবং বৈদেশিক মূলধনের সাহায্যে সমাধান করা যায় কিন্তু ইহার পরিপূর্ণ সমাধান করিতে হইলে স্বয়ং-অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বর্তমানে উৎপাদনশীল শ্রমিক অনুৎপাদনশীল উদ্বৃত্ত শ্রমিকের ভরণপোষণ করিতেছে। উৎপাদনশীল শ্রমিকেরা যাহা উৎপাদন করিতেছে তদপেক্ষা কম ভোগ করিতেছে অর্থাৎ তাহারা "প্রচ্ছন্ন" সঞ্চয় করিতেছে। কিন্তু এই সঞ্চয় সত্যকার কোন প্রয়োজনে না লাগিয়া নষ্ট হইতেছে এই কারণে যে ইহা অনুৎপাদনশীল শ্রমিকদের ভরণপোষণের জন্য ব্যয় হইতেছে উৎপাদনে যাহাদের কোন অবদানই নাই। যদি জমিতে কর্মরত উৎপাদনশীল শ্রমিকেরা মূলধনী প্রকল্পে কর্মরত অনুৎপাদনশীল শ্রমিকদের পূর্বের ন্যায় ভরণপোষণ করিতে থাকে তাহা হইলে তাহাদের প্রচ্ছন্ন সঞ্চয় কার্যকরী সঞ্চয়ে পরিণত হইবে। যদি সুপ্ত সঞ্চয়ের সমস্তটাই একত্রীকরণ করা যায় তবেই উদ্বৃত্ত শ্রমিকের সাহায্যে মূলধনগঠন স্বয়ংনির্ভরশীল হইবে। কৃষিতে যে উদ্বৃত্ত খাদ্যের সৃষ্টি হইতেছে তাহাকে পুরোপুরিভাবে সংগ্রহ করিয়া অ-কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে; ইহা না করিতে পারিলে মূলধনগঠনের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

কৃষিক্ষেত্রে যে খাদ্যভাণ্ডারের সৃষ্টি হইতেছে তাহাকে সংগ্রহ করিয়া অকৃষিক্ষেত্রে নিয়োগ করিলে ছিদ্রপথে কিছু নষ্ট হইবার আশংকা থাকে। প্রথমতঃ, যে সকল কৃষিশ্রমিক অ-কৃষিগত কাজে প্রথম যোগদান করিবে তাহারা পূর্বাপেক্ষা বেশী খাদ্য খাইবে। দ্বিতীয়তঃ, যে সকল কৃষিশ্রমিক কৃষিক্ষেত্রেই থাকিয়া গেল তাহারাও পূর্বাপেক্ষা বেশী খাদ্য খাইতে পারে। তৃতীয়তঃ, কৃষিক্ষেত্র হইতে অ-কৃষিক্ষেত্রে খাদ্যদ্রব্য বহনের খরচ কিভাবে বহন করা হইবে সেই সমস্যা রহিয়াছে। যদিও এই ছিদ্রগুলি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা সম্ভব নয় তথাপি নার্ক্‌স মনে করেন যে অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিপূরক সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিয়া এবং সরকারী প্রচেষ্টার মাধ্যমে উদ্বৃত্ত খাদ্যভাণ্ডার অকৃষি-শ্রমিকদের ভরণপোষণের জন্য ব্যবহার করা যাইবে। কৃষকগণ ভোগ করে এইরূপ পণ্যের উপর পরোক্ষ কর স্থাপনের উপর তিনি জোর

দিয়াছেন। পণ্যের উপর কর, জমির মালিকদের উপর কর এবং খাজনার উপর কর স্থাপন করিয়া উদ্বৃত্ত খাদ্য সংগ্রহ করিতে হইবে। উদ্বৃত্ত খাদ্য সংগ্রহের জন্য যে ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হউক না কেন, ছদ্মবেশী বেকারীর মধ্যে সুপ্ত সঞ্চয় সংগ্রহের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক যৌথসঞ্চয় অপরিহার্য।

ছদ্মবেশী বেকারীর সাহায্যে মূলধন গঠনের দ্বিতীয় সমস্যাটি হইল কিভাবে নতুন অকৃষি শ্রমিকদের যন্ত্রপাতি যোগান দেওয়া হইবে। মূলধনীদ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানী করা যাইতে পারে তথাপি অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় প্রয়োজন। জনাকীর্ণ কৃষিপ্রধান দেশে আধাবেকারত্ব শুধুমাত্র শ্রমের ক্ষেত্রেই দেখা যায় না, মূলধনের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। জমি খণ্ড এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকার দরুন অনাবশ্যকভাবে বহু যন্ত্রপাতি কৃষিকার্যে ব্যবহৃত হয়। যদি এই সকল খণ্ড এবং বিক্ষিপ্ত জমিগুলিকে একত্র করিয়া কৃষিকার্য পরিচালনা করা হয় তাহা হইলে অনেক সরল যন্ত্রপাতি উদ্বৃত্ত হইয়া পড়িবে যেগুলি মূলধনী প্রকল্পে নিযুক্ত শ্রমিকগণ ব্যবহার করিতে পারে। আরও বলা যায় যে অকৃষিকার্যে নবনিযুক্ত শ্রমিকগণ যেসব যন্ত্রপাতি লইয়া কাজ করিবে তাহা নিজেরাই তৈয়ারী করিতে পারিবে। প্রয়োজন বোধ করিলে বিদেশে কৃষিজাত দ্রব্য রপ্তানী করিয়া তাহার পরিবর্তে বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি আমদানী করিবার সময় নজর রাখিতে হইবে যেন উহা সংশ্লিষ্ট দেশটির উপযোগী হয়।

মরিস ডবের (Maurice Dobb) ভাষায় ছদ্মবেশী বেকারীর মাধ্যমে মূলধনগঠন তত্ত্বটিকে সংক্ষেপে এইভাবে বলা যায়: "হাতগুলি" গ্রাম হইতে নতুন কর্মকেন্দ্রে স্থানান্তরিত হইবে; হাতের সঙ্গে মুখও যাইবে; গ্রামে খাইবার জন্য "মুখের" সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় গ্রাম হইতে শহরে খাদ্য পাঠাইবার সম্ভাবনার সৃষ্টি হইবে; যাহারা গ্রামে রইল তাহাদের ভোগ হ্রাস না করিয়া অ-কৃষি কাজে নিযুক্ত বিরাট শ্রমিকশ্রেণীর প্রয়োজন পূরণ করা সম্ভব হইবে। এইভাবে ছদ্মবেশী বেকারীর সাহায্যে উন্নয়ন প্রক্রিয়া সৃষ্টি করা সম্ভব হইবে। মার্ক্‌স এবং মরিস ডব মনে করেন যে ছদ্মবেশী বেকারত্বের মধ্যে যে লুক্কায়িত সঞ্চয় ক্ষমতা রহিয়াছে তাহাকে দেশে মূলধন গঠনের কাজে লাগানো যায়

ছদ্মবেশী বেকারের সাহায্যে মূলধন গঠনের মার্ক্‌সীয় তত্ত্বকে নানাদিক হইতে সমালোচনা করা হইয়াছে। যে সকল অনুন্নত দেশ গণতান্ত্রিক পরিকল্পনার সাহায্যে উন্নয়নে আগ্রহী সেই ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব কতখানি প্রযোজ্য সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে।

প্রথমতঃ, মার্ক্সীয় তত্ত্বে ইহা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে কৃষিশ্রমিক এবং অকৃষিক্ষেত্রে নবনিযুক্ত শ্রমিকের ভোগপ্রবণতা সমান থাকিবে। কিন্তু বাস্তবে ইহা সত্য নয়। অধ্যাপক কুরিহারা বলেন যে ছদ্মবেকারদের মূলধনী প্রকল্পে স্থানান্তরিত করিলে সারা দেশে জনগণের ভোগপ্রবণতা বৃদ্ধি পাইবে।

দ্বিতীয়তঃ, উদ্বৃত্ত খাদ্য সংগ্রহ এবং বণ্টনের ক্ষেত্রে যে সমস্যা দেখা দিবে মার্ক্স তাহার ব্যাখ্যা দেন নাই। কি পদ্ধতিতে কৃষিক্ষেত্র হইতে উদ্বৃত্ত খাদ্য সংগৃহীত হইবে আর কি পদ্ধতি উহা অকৃষি কর্মে নিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টিত হইবে সে সম্বন্ধে মার্ক্স কিছুই বলেন নাই। ইহা ছাড়া প্রতিটি খামার খাদ্যভাণ্ডারে কতোখানি যোগান দিবে? যদি কোন খামার-মালিক খাদ্য যোগান দিতে অস্বীকার করে তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে? মার্ক্সীয় তত্ত্বে এই সকল প্রশ্নের কোন উত্তর নাই।

তৃতীয়তঃ, ছদ্মবেশী বেকারদের একত্র করিয়া দূরে নতুন কোন মূলধনী প্রকল্পে কাজ করিতে পাঠান খুব সহজ নয়। এই ক্ষেত্রে যেসব সামাজিক বা মনস্তাত্ত্বিক বাধা আসিতে পারে মার্ক্স তাহা বিবেচনা করেন নাই। কৃষিপ্রধান সমাজে পরিবারের প্রতি ব্যক্তির আকর্ষণ এত তীব্র যে ছদ্মবেশী বেকারগণ অনেক সময় বাড়ী হইতে দূরে কাজ করিতে যাইতে অনিচ্ছুক থাকে।

পরিশেষে, মার্ক্স মনে করেন যে মূলধনী প্রকল্পে নবনিযুক্ত শ্রমিকদের মজুরী দেওয়ার কোন সমস্যা নাই কারণ এই পদ্ধতিতে মূলধন গঠনের সমগ্র প্রক্রিয়াটাই নিজে অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করিবে। কিন্তু ইহা অসম্ভব। যদি মজুরী দেওয়া না হয় তাহা হইলে শ্রমিকেরা নূতন প্রকল্পে কাজ করিবে না। শুধুমাত্র একনায়কতন্ত্রী দেশেই ইহা সম্ভব। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দুই পদ্ধতি কার্যকরী হইবে না। বস্তুতঃ, চীনে এই পদ্ধতিতে মূলধন গঠন করা হইয়াছিল। সেখানে জনগণকে জীবনধারণোপযোগী মজুরী প্রদান করিয়া মূলধন সৃষ্টিকারী প্রকল্পে কাজ করিতে বাধ্য করানো হইয়াছিল।

শ্রমের অসীম যোগান সম্পর্কে লুইসের মতবাদ : (Lewis' Model of Economic Development with Unlimited Supplies of Labour) :

দুই সেক্টর বিশিষ্ট অর্থনীতিতে উহার দুই অংশের মধ্যে শ্রমের সচলতার দরুন কিভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটিতে পারে সে সম্পর্কে অধ্যাপক লুইস এক মডেল সৃষ্টি করিয়াছেন। অর্ধোন্নত দেশে সাধারণতঃ দুইটি ক্ষেত্র বা সেক্টর দেখা যায় — একটি A-সেক্টর এবং অপরটি U-সেক্টর। A-সেক্টর এরূপ একটি

ক্ষেত্র যেখানে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য এবং শ্রমিকেরা জীবনধারণের উপযোগী মজুরী লইয়া কাজ করে। অপরপক্ষে U-সেক্টর আধুনিক ও উন্নত ক্ষেত্র এবং ইহা উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করে।

ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণের মতো লুইস মনে করেন যে বহু অর্ধোন্নত দেশে জীবনধারণোপযোগী মজুরীতে শ্রমের যোগান অসীম। দেশে এরূপ শ্রমিক আছে যাহাদের উৎপাদনশীলতা শূন্য অথবা নগণ্য ; কৃষি, ছোট ব্যবসায়. মাজার গৃহভৃত্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই ধরনের শ্রমিক দেখা যায়। যে সকল শ্রমিকের প্রান্তিক মজুরী শূন্য তাহারা শিল্পপতির কাছে শূন্য মজুরীতে কাজ করিতে রাজী হইবে না ; কিন্তু জীবনধারণোপযোগী মজুরীতে শ্রমিকের যোগান অসীম। জীবনধারণের উপযোগী মজুরী অপেক্ষা সামান্য বেশী মজুরী (Subsistence plus") প্রদান করিয়া শ্রমিকদের A-সেক্টর থেকে U-সেক্টরে স্থানান্তরিত করা যাইবে। শ্রমের যোগান অসীম বলিয়া প্রচলিত মজুরীহার প্রদান করিয়া নূতন শিল্প স্থাপন করা যাইবে অথবা প্রতিষ্ঠিত শিল্প সম্প্রসারণ করা যাইবে। U-সেক্টরে দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন, দক্ষ শ্রমিকের অভাব সাময়িক অসুবিধার সৃষ্টি করিতে পারে কিন্তু প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া উহা দূর করা যাইবে।

U-সেক্টরে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা প্রচলিত মজুরী হার অপেক্ষা বেশী বলিয়া মূলধন মালিকের উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হইবে। এই উদ্বৃত্ত মূলধন গঠনে ব্যবহৃত হইবে আর এইজন্য A-সেক্টরের বহু শ্রমিক U-সেক্টরে কর্মসংস্থান পাইবে। শিল্পপতি বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াইলে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাইবে ফলে শিল্পপতি ততক্ষণ পর্যন্ত শ্রমিক নিয়োগ করিয়া চলিবে যতক্ষণ পর্যন্ত শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা প্রচলিত মজুরীহার অপেক্ষা বেশী থাকে। যে বিন্দুতে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাইয়া প্রচলিত মজুরী হারের সমান হইবে শিল্পপতি সেইখানে আসিয়া থামিবে কারণ এইখানে শ্রমের যোগান অস্থিতিস্থাপক হইবে।

U-সেক্টরে কারিগরী উন্নতি জাতীয় আয়ে মুনাফার অংশ ততক্ষণ বাড়াইতে পারিবে যতক্ষণ উদ্বৃত্ত শ্রমিক বর্তমান থাকিবে। জাতীয় আয়ে মুনাফার অনুপাত বৃদ্ধি পাইবে দুইটি কারণে ; প্রথমতঃ, U-সেক্টরে মুনাফার অনুপাত বৃদ্ধি পাইবে আর দ্বিতীয়তঃ, U-সেক্টর সম্প্রসারিত হইবে ; এইভাবে মূলধন

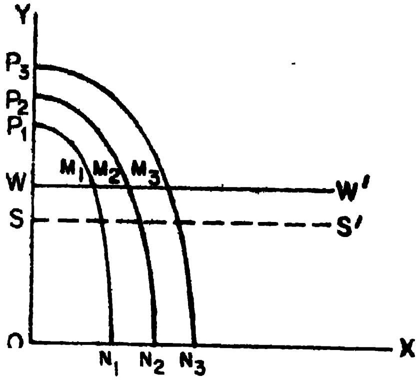
গঠন জাতীয় আয়ের ৪-৫ শতাংশ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১২-১৫ শতাংশে আসিয়া দাঁড়াইবে।

এখন প্রশ্ন হইল জীবনধারণোপযোগী মজুরী কিভাবে নির্ধারিত হয়? এই মজুরীহারে U-সেক্টরে শ্রমের যোগান অসীম। জীবনধারণোপযোগী বলিতে সেই ন্যূনতম আয়কে বোঝায় যাহা বাঁচিয়া থাকার জন্য অপরিহার্য। এই মজুরী A-সেক্টরে শ্রমিকের গড় উৎপাদন অপেক্ষা কম হইবে না। অবশ্য বাস্তবে U-সেক্টরে মজুরীর হার জীবনধারণোপযোগী মজুরীহার অপেক্ষা বেশী হইবে। ইহার প্রথম কারণ এই যে U-সেক্টরে মজুরীহার জীবনধারণোপযোগী মজুরী অপেক্ষা বেশী না হইলে শ্রমিকেরা কৃষি ছাড়িয়া শিল্পে আসিতে উৎসাহ বোধ করিবে না। দ্বিতীয়তঃ, কৃষিতে ছদ্মবেশী বেকারত্ব থাকায় উদ্বৃত্ত শ্রমিক U- সেক্টরে স্থানান্তরিত করিলে কৃষির উৎপাদন হ্রাস পাইবে না; ইহার দরুন যাহারা কৃষিতে নিযুক্ত থাকিবে তাহাদের গড উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। A-সেক্টরে নিযুক্ত শ্রমিকদের গড় উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে U-সেক্টরে শ্রমিকেরা অধিক মজুরী দাবী করিবে। তৃতীয়তঃ, U-সেক্টরে জীবনযাত্রার ব্যয় অধিক হওয়ায় তাহাদের মজুরীহারও A-সেক্টরের শ্রমিকদের মজুরীহার অপেক্ষা বেশী হইবে।

U-সেক্টরে যে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয় তাহারই উপর মূলধন গঠন তথা অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে। উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে মূলধন গঠন চলিতে থাকে এবং ক্রমাগত শ্রমিক A সেক্টর হইতে U-সেক্টরে নিযুক্ত হইতে থাকিবে। এই প্রক্রিয়া ততক্ষণ পর্যন্ত চলিবে যতক্ষণ মূলধন-শ্রম অনুপাত বৃদ্ধি পাইয়া শ্রমের যোগান অস্থিতিস্থাপক হয়।

অধ্যাপক লুইসের তত্ত্বকে একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। OX রেখার দ্বারা শ্রমের যোগান এবং OY রেখা দ্বারা মজুরী ও প্রান্তিক উৎপাদন পরিমাপ করা হইতেছে। W W′ রেখার সাহায্যে U-সেক্টরে মজুরী এবং S S′ রেখার দ্বারা জীবনধারণোপযোগী মজুরী নির্দেশ করা হইতেছে। P_1N_1, P_2N_2, P_3N_3 রেখাগুলির দ্বারা শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা পরিমাপ করা হইতেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে শ্রমের যোগান ON_1 হইলে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন হইবে P_1M_1 এবং WM_1P_1 হইবে মূলধনমালিকের উদ্বৃত্ত। এই উদ্বৃত্ত উৎপাদনে পুনর্বিনিয়োজিত হওয়ায় শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার রেখা ঊর্ধ্বে উঠিয়া P_2M_2

হইবে। মূলধন-মালিকের উদ্বৃত্ত হইবে WM_2P_2 এবং নিয়োগের পরিমাণ হইবে ON_2; এই ধারায় উদ্বৃত্ত এবং নিয়োগ বৃদ্ধি পাইয়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্প্রসারণ করিবে।



শ্রমের উত্তরোত্তর বিনিয়োগের দরুন উন্নয়ন কি অব্যাহত গতিতে চলিতে থাকিবে? U-সেক্টরে উন্নয়ন ততক্ষণ পর্যন্ত চলিবে যতক্ষণ পর্যন্ত উদ্বৃত্ত শ্রম পাওয়া যাইবে। পরিশেষে, এমন এক সময় আসিবে যখন শ্রমের যোগান সম্পূর্ণরূপে অস্থিতিস্থাপক হইয়া যাইবে। এই অবস্থায় মজুরী হার বাড়িবে এবং জাতীয় আয়ে মুনাফার অনুপাত হ্রাস পাইতে থাকিবে; মুনাফার অংশ কমিলে মূলধন মালিকের উদ্বৃত্ত তথা মুনাফা হ্রাস পাইবে এবং উন্নয়নের প্রসার রুদ্ধ হইয়া যাইবে।

কি পদ্ধতিতে দেশ তাহার সঞ্চয় ও বিনিয়োগ জাতীয় আয়ের ৪ বা ৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করিয়া ১২ বা ১৫ শতাংশ করে তাহাই হইল উন্নয়নের মূল সমস্যা। অর্ধোন্নত দেশে মাত্র ১০ শতাংশ ব্যক্তি সঞ্চয় করিয়া থাকে; ইহারা জাতীয় আয়ের ৪০ শতাংশ পাইয়া থাকে। মজুরী উপার্জনকারী শ্রেণী জাতীয় আয়ের ৩ শতাংশের মত সঞ্চয় করে। কিন্তু জমিদার, মহাজন, পুরোহিত, মন্ত্রী ইত্যাদি লইয়া যে প্রভাবশালী শ্রেণী গঠিত তাহা উৎপাদনশীল বিনিয়োগের পরিবর্তে অপচয়মূলক ভোগে অর্থ ব্যয় করে; সুতরাং রাষ্ট্র এবং বেসরকারী পুঁজিপতি মুনাফা হইতে মূলধন সৃষ্টি করে।

লুইস মডেলে শিল্পপতিদের মুনাফাকেই মূলধন গঠনের একমাত্র উৎস হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু মূলধন শুধুমাত্র মুনাফা থেকেই উদ্ভূত হয় না— ব্যাঙ্কঋণ থেকেও উহার সৃষ্টি হয়। অর্ধোন্নত দেশে যেখানে প্রভূত অব্যবহৃত সম্পদ এবং অপ্রচুর মূলধন আছে সেখানে ব্যাংক কর্তৃক ঋণ সৃষ্টির প্রভাব মূলধন গঠনের উপর মুনাফার অনুরূপ হইবে। ব্যাংকঋণ বৃদ্ধি পাইলে উৎপাদন

এবং নিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে। ঋণ সৃষ্টি করিয়া মূলধন বৃদ্ধি করিলে যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে তাহা সাময়িক ব্যাপার। ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে মূল্যস্তর পুনরায় হ্রাস পাইবে।

মূলধন গঠনের ধারা ক্রমাগত চলিতে থাকিলে উৎপাদন, কর্মসংস্থান এবং মুনাফা বাড়িয়া চলিবে। মুনাফা বাড়িলে সঞ্চয় বাড়িবে এবং এমন এক সময় আসিবে যেখানে সঞ্চয়ের পরিমাণ এতো বেশী হইবে যে ব্যাংক-ঋণ ব্যতিরেকেই বিনিয়োগ কর্ম চলিবে।

উন্নয়নের ধারা চিরকাল চলিবে না—এমন এক সময় আসিবে যখন উহা থামিয়া যাইবে। লুইসের মতে উন্নয়ন প্রবাহ থামিয়া যাইবার কারণগুলি নিম্নলিখিতরূপ : (১) মূলধন গঠন ক্রমাগত চলিতে থাকার দরুন সব উদ্বৃত্ত শ্রমিক নিঃশেষ হইলে উন্নয়ন বন্ধ হইয়া যাইবে ; (২) যদি U-সেক্টরে সম্প্রসারণ এরূপ দ্রুত হয় যে উহার দরুন A-সেক্টরে মোট জনসংখ্যা কমিয়া যায় এবং যাহার ফলে গড় উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ; এইরূপ হইলে U-সেক্টরে মজুরী বাড়িবে এবং উন্নয়ন থামিয়া যাইবে ; (৩) যদি A-সেক্টর উন্নত কৃৎকৌশল গ্রহণ করে তাহা হইলে U-সেক্টরে প্রকৃত মজুরী বৃদ্ধি পাইবে এবং উহার সংকোচন ঘটিবে ; (৪) যদি U-সেক্টরের শ্রমিকেরা শিল্পপতিদের উচ্চ জীবনযাত্রার মান অনুকরণ করিবার জন্য মজুরী বৃদ্ধির আন্দোলন করে এবং কৃতকার্য হয় তাহা হইলে শিল্পপতিদের উদ্বৃত্ত এবং মূলধন গঠনের হার হ্রাস পাইবে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন কোন কারণে ব্যাহত হইলেও মূলধনগঠন চলিতে পারে, যদি বিদেশ হইতে ব্যাপক হারে শ্রমিক আমদানী করা যায় অথবা বিদেশে মূলধন রপ্তানী করিয়া জীবনধারণের উপযোগী মজুরীকে কম রাখা যায়। অবশ্য লুইস এই দুই সম্ভাবনাকে নিজেই বাতিল করিয়া দিয়াছেন। ব্যাপক হারে বিদেশ হইতে শ্রমিক আমদানী করা হইলে স্থানীয় শ্রমিকদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবে এবং শ্রমিকসংঘ তীব্রভাবে বিরোধিতা করিবে। আবার মূলধন রপ্তানী করা হইলে আমদানীর পরিমাণ রপ্তানীর তুলনায় বেশী হইবে এবং বাণিজ্য-ব্যালান্স প্রতিকূল হইয়া সমস্যার সৃষ্টি করিবে।

মূল্যায়ন : অধ্যাপক লুইসের উন্নয়নতত্ত্বের মৌলিকতা সারা পৃথিবীর অর্থনীতিবিদগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। তাঁহার উন্নয়ন এবং পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনার মৌলিকতার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। তথাপি তাঁহার মতবাদ সমালোচনার ঊর্ধ্বে একথা বলা চলে

না। লুইসের উন্নয়নতত্ত্ব কতকগুলি অনুমানের (assumptions) উপর প্রতিষ্ঠিত সেগুলি সর্বদা সত্য নয়।

প্রথমতঃ, লুইসের তত্ত্বের মূল ভিত্তি হইল শ্রমের যোগান অসীম। কিন্তু ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা প্রভৃতি অর্ধোন্নত দেশ সম্পর্কে ইহা সত্য নয়; এই দেশগুলিতে জনসংখ্যা বিশেষভাবে কম।

দ্বিতীয়তঃ, লুইস মনে করেন অর্ধোন্নত দেশগুলিতে দক্ষ শ্রমিকের অভাব সাময়িক—প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া উহা দূর করা যাইবে। দক্ষতার প্রশ্নটিকে লুইস যত সহজে দেখিয়াছেন উহা তত সহজ ব্যাপার নয়। শুধু দক্ষতার অভাবে কোন দেশে উন্নয়ন বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। দক্ষতা-গঠন অর্ধোন্নত দেশের একটা বড় সমস্যা এবং দক্ষতা-গঠনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে সময় ও সম্পদের প্রয়োজন।

তৃতীয়তঃ, অর্ধোন্নত দেশে ঝুঁকিবহনকারী এক উদ্যোক্তাশ্রেণী আছে বলিয়া লুইস ধরিয়া লইয়াছেন। দেশে মূলধন গঠন নির্ভর করে এই শ্রেণীটির অস্তিত্বের উপর। প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ অর্ধোন্নত দেশে এই শ্রেণীটির বিশেষ অস্তিত্ব নাই।

চতুর্থতঃ, লুইসতত্ত্ব শ্রমের অবাধ গতিশীলতার উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এ্যাডাম স্মিথ যথার্থই বলিয়াছেন যে শ্রমিকের গতিশীলতা খুবই কম। U-সেক্টরে মজুরী বেশী হইলেই যে উদ্বৃত্ত শ্রমিক A-সেক্টর থেকে U-সেক্টরে চলিয়া যাইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। গ্রামের পরিচিত পরিবেশ পরিত্যাগ করিয়া শ্রমিক শহরের অপরিচিত অনিশ্চয়তার মধ্যে সহজে যাইতে চাহিবে না। শহরে জীবনধারণের উচ্চ ব্যয়, বাসস্থানের সমস্যা, সাংস্কৃতিক ব্যবধান শ্রমের গতিশীতার পথে প্রধান বাধা।

পঞ্চমতঃ, অধ্যাপক সুলজ (Schultz) মনে করেন না যে জনবহুল অর্ধোন্নত দেশে শ্রমের প্রান্তিক যোগান শূন্য। সুতরাং কতজন শ্রমিক উদ্বৃত্ত হইবে তাহার সংখ্যা হিসাব করিয়া বাহির করা কঠিন।

ষষ্ঠতঃ, লুইস বলিয়াছেন দেশের ১০ শতাংশ ব্যক্তি সঞ্চয় করে কিন্তু ইহা সত্য নয়। লুইস স্বীকার করিয়াছেন জাপানে দরিদ্র জনগণও যথেষ্ট সঞ্চয় করিয়াছে। এই সকল দরিদ্র দেশে দরিদ্রশ্রেণী সামাজিক কারণে সঞ্চয় করে কিন্তু ধনিক শ্রেণী প্রদর্শন প্রভাবের (demonstration effect) জন্য অধিক ব্যয় করে বলিয়া কম সঞ্চয় করে।

লুইস ধরিয়া লইয়াছেন যে মুদ্রাস্ফীতি পরিশেষে নিজেকে ধ্বংস করে। কিন্তু বিকাশমান দেশগুলিতে ভোগ্যপণ্যের তীব্র ঘাট্তি দেখিয়া লুইসের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন। সাংগঠনিক কাঠিন্যের দরুন ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। অপর দিকে জনগণের ভোগপ্রবণতা খুব বেশী যাহার দরুন আয় বাড়িলে মুদ্রাস্ফীতি বাড়িবে।

লুইসতত্ত্বের এই সকল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে ইহার সাহায্যে অতি সুন্দরভাবে অর্থনৈতিক বিকাশের ধারাটিকে ব্যাখ্যা করা যায়।

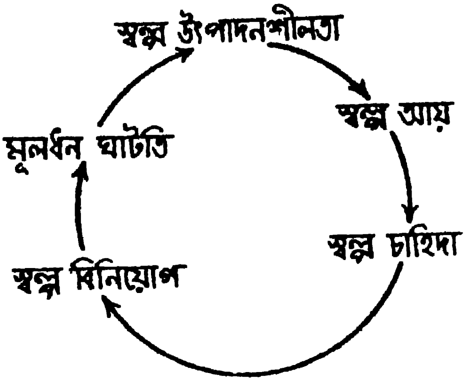
উন্নয়নের প্রতিবন্ধক (Obstacles to Growth) :

অর্ধোন্নত দেশে সকল দিকেই উন্নয়নের প্রতিবন্ধক রহিয়াছে। মূলধনের অভাব, দক্ষ কারিগরের অভাব, উৎপাদনের ভারসাম্যহীনতা, মান্ধাতা আমলের কৃষিপদ্ধতি, ব্যাপক দারিদ্র্য ও তাহার দরুন সক্রিয় চাহিদার স্বল্পতা—ইহারাই উন্নয়নের পথে বাধার সৃষ্টি করিতেছে। অর্ধোন্নত দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই উন্নয়নের প্রতিবন্ধকসমূহ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। আমরা এখানে প্রতিবন্ধকগুলিকে চিহ্নিত করিয়া পৃথকভাবে আলোচনা করিলাম।

১। **দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র** (Vicious Circles of Poverty) : উন্নয়নের প্রতিবন্ধকগুলি একই সঙ্গে দারিদ্র্যের কারণ এবং ফল। এই প্রতিবন্ধকগুলি আবার পরস্পরকে প্রভাবিত করে। চক্রাকারে ক্রিয়াশীল প্রতিবন্ধকগুলিকে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র বলা হয়। অর্ধোন্নত দেশে দারিদ্র্যই অনুন্নতির মূল কারণ। আয় কম বলিয়া চাহিদা কম, চাহিদা কম বলিয়া উৎপাদন কম এবং উৎপাদন কম বলিয়া মূলধনগঠনের হার কম—ইহাই মূল দুষ্টচক্র। উৎপাদন কম হওয়ায় প্রকৃত আয় কম হয় আর প্রকৃত আয় কম হওয়ায় সঞ্চয়ের পরিমাণ কম হয়। সঞ্চয়ের পরিমাণ কম বলিয়া বিনিয়োগের পরিমাণ কম হয় আর বিনিয়োগ কম হওয়ায় মূলধনের ঘাটতি দেখা দেয়। অধ্যাপক নার্ক্স যথার্থই বলিয়াছেন যে দারিদ্র্যই দারিদ্র্যের কারণ (A country is poor because it is poor).

মূলধনের ঘাটতি এবং স্বল্প উৎপাদনশীলতা ইংরেজ শাসনকালে ভারতে খুব স্পষ্ট হইয়াই দেখা দেয় এবং মূল দুষ্টচক্রের সৃষ্টি করে। অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহকারী দুষ্টচক্র মূল দুষ্টচক্রের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হইয়া উহার শক্তি বৃদ্ধি করে। আয়ের স্বল্পতা একই সঙ্গে স্বল্প চাহিদার কারণ ও ফল। আর একটি দুষ্টচক্র দেশের অব্যবহৃত সম্পদকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। ব্যাপক নিরক্ষরতা, দক্ষতার অভাব, উপাদানের গতিহীনতা

প্রেরণার অভাব—এইসব কারণের দরুন সম্পদের কাম্যব্যবহার সম্ভব হয় নাই। নিচের রেখাচিত্রে দুষ্টচক্রটি দেখান হইল :



২। মূলধন গঠনের শ্লথহার (Low Rate of Capital Formation): উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হইল মূলধনের স্বল্পতা। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র হইতে ইহার উদ্ভব। অর্ধোন্নত দেশে দারিদ্র্য স্বল্পহারে মূলধন গঠনের কারণ এবং ফল। মূলধন গঠন কিভাবে ব্যাহত হয় তাহা বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। সমাজের তিনটি শ্রেণীর নিকট হইতে বিনিয়োগযোগ্য সম্পদ পাওয়া যাইতে পারে—দরিদ্র জনগণ, মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং ধনিকগোষ্ঠী।

দেশের দরিদ্র শ্রেণী প্রধানতঃ অশিক্ষিত, অদক্ষ এবং উৎপাদনে মান্ধাতা আমলের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে; দেশের কৃষিজীবিরা এই শ্রেণীতে পড়ে। ইহারা জীবনধারণের জন্য জমি চাষ করে এবং বিনিয়োগযোগ্য কোন উদ্বৃত্তই সৃষ্টি করিতে পারে না। ইহাদের জীবন সনাতন পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা উচ্চ জীবনযাত্রার মানের জন্য ইহাদের কোন আকাঙ্ক্ষা নাই। প্রাথমিক স্তরের কৃষিজীবীদের উৎপাদনশীলতা খুব কম, স্বল্প উৎপাদনশীলতার দরুন আয় কম, সঞ্চয় কম, বিনিয়োগ কম এবং মূলধন গঠন কম। ইহাদের ভোগস্তর এতো কম যে উহা আরও সংকুচিত করিয়া মূলধন গঠনের হার বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়।

অর্ধোন্নত দেশের অধিকাংশ সঞ্চয়ই পাওয়া যায় ধনিকশ্রেণীর কাছ হইতে। এই ধনিকশ্রেণী সঞ্চয় ও বিনিয়োগ করিতে সমর্থ কিন্তু তাহারাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাদের সঞ্চয় উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে বিনিয়োগ না করিয়া সোনা, ভূসম্পত্তি ও বিলাসদ্রব্য ক্রয় করিয়া সম্পদের অপচয় করে। ধনিকশ্রেণীর

অধিকাংশই জমিদার যাহাদের মধ্যে বিনিয়োগ চেতনার বিশেষ অভাব দেখা যায়। যে পরিবেশে তাহারা বাস করে এবং তাহাদের সনাতন মনোভাব শিল্পে বিনিয়োগের উপযোগী নয়।

গরীব শ্রেণী ও ধনিক গোষ্ঠীর মাঝে আর একটি ক্ষুদ্র শ্রেণী আছে—মধ্যবিত্ত শ্রেণী। যে দেশে বিশেষ শিল্পায়ন ঘটে নাই সেই দেশে এই শ্রেণীটি খুবই ছোট। শিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রেণীটি বাড়িতে থাকিবে। যে সকল বিনিয়োগে ঝুঁকির পরিমাণ কম এই শ্রেণীটি প্রধানত: সেই সকল উদ্যোগ গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাদের ব্যক্তিগত সঞ্চয় বৃহদায়তন উৎপাদনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। টাকার বাজার সংগঠিত নয় বলিয়া বাজার হইতে অর্থ-সংগ্রহ করা বেশ কঠিন কাজ। ইহা ছাড়া শিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিক, ব্যবস্থাপক, উন্নত কৃৎকৌশল, প্রতিষ্ঠানগত ঋণ ইত্যাদির অভাব মূলধন গঠন ব্যাহত করিয়াছে।

৩। **বাজার-অসম্পূর্ণতা** (Market Imperfections) : উপাদানের নিশ্চলতা, দামের অনমনীয়তা, বাজার সম্পর্কে অজ্ঞতা, সামাজিক ব্যবস্থার কাঠিন্য, বিশেষীকরণের অভাব প্রভৃতি বাজার-অসম্পূর্ণতা সংঘর্ষের সৃষ্টি করিয়া সম্পদের কাম্য বণ্টন ব্যাহত করে। উৎপাদনশীল সম্পদ অব্যবহৃত থাকিয়া যায় এবং নিয়োগ অপেক্ষাকৃত কম দক্ষ উৎপাদনের প্রতি ধাবিত হয়। পূর্ণগতিশীলতার জগতে উৎপাদনের উপাদানগুলির একশিল্প হইতে আর এক শিল্পে স্থানান্তর চলিতে থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সকল শিল্পের প্রান্তিক উৎপাদন সমান হয়। অধোন্নত দেশে এরূপ বহু শ্রমিক আছে যাহাদের প্রান্তিক উৎপাদন প্রায় শূন্য তথাপি তাহারা অন্য শিল্পে যায় না যেখানে তাহাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাইবে ; এই সকল দেশে মূলধনও ঠিকভাবে বন্টিত হয় না। সনাতন প্রথা, সামাজিক আচার, অভ্যাস প্রভৃতি শক্তিগুলি বিকল্প নিয়োগে শ্রম ও মূলধনপ্রবাহে বাধার সৃষ্টি করে। শ্রমের গতিশীলতার পথে আর একটি বাধা হইল দারিদ্র্য। অধিকাংশ শ্রমিক এতই দরিদ্র যে স্থানান্তরে যাইবার ব্যয়ভার বহনে অক্ষম। বাজার-অসম্পূর্ণতার আর একটি কারণ হইল সুযোগ সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব। অন্যত্র উন্নত কর্মসংস্থানের কি সুযোগ আছে সে সম্পর্কে শ্রমিকেরা অবহিত নয় এবং উৎপাদকেরাও অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারের সম্ভাবনা সম্পর্কে অজ্ঞ। একচেটিয়ামূলক আচরণ আর এক ধরনের অসম্পূর্ণতার সৃষ্টি করে যাহার ফলে সম্পদের অসম-

বণ্টন ঘটে। এইরূপ অবস্থায় একটি অর্ধোন্নত দেশ মূলধন বা অন্যান্য সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি না করিয়া শুধুমাত্র বর্তমান সম্পদের দক্ষ বণ্টন করিয়া জাতীয় আয় বাড়াইতে পারে।

৪। **সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব** (Impact of Imperialism) : উনিশ শতকে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি এসিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার অনগ্রসর দেশগুলিতে কাঁচামালের প্রভূত সম্ভাবনা দেখিয়া তাহাদের উপর রাজনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তার করে; তাহারা এইসব দেশের শাসনব্যবস্থা করায়ত্ত করিয়া শোষণের পথ প্রশস্ত করে। অবশ্য বিদেশী সরকারই এই সকল দেশে প্রথম রেলপথ স্থাপন করে, জলসেচের ব্যবস্থা করে, রাস্তাঘাট তৈয়ারী করে এবং দুই একটি হাল্কা শিল্পও গঠন করে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ এই দেশগুলিকে তাহাদের কলোনী হিসাবে ব্যবহার করে। এই দেশগুলি ইউরোপে কাঁচামালের যোগান দেয় এবং উহাদের মাল বিক্রয়ের বাজারে পরিণত হয়। স্বার্থপর বৃটিশ বাণিজ্যনীতি ইংলণ্ডের শিল্প গঠনে উৎসাহ দিবার জন্য দেশীয় কারিগর ও শিল্পকে বাধা প্রদান করে। সৌভাগ্যের বিষয় যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি ধীরে ধীরে বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে। এসিয়া ও আফ্রিকার বহু পরাধীন দেশ স্বাধীনতা লাভ করিয়া দেশের দ্রুত উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেছে।

৫। **সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাধাসমূহ** (Socio-cultural Obstacles) : মূলধনের স্বল্পতা উন্নয়নের সবচেয়ে বড় বাধা হইলেও উহা একমাত্র বাধা নয়। অধ্যাপক নার্ক্‌স বলেন অর্থনৈতিক উন্নয়ন মানবিক সম্পদ, সামাজিক মনোভাব, রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা এবং ঐতিহাসিক আকস্মিক ঘটনার উপরও যথেষ্ট নির্ভরশীল। অর্ধোন্নত দেশে এরূপ বহু সামাজিক প্রথা, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ আছে যাহারা উন্নয়নের পথে বাধার সৃষ্টি করে। ভারতের জন্মগত জাতিভেদ প্রথা সামাজিক পরিবর্তনে বাধার সৃষ্টি করিয়াছে। মানবতার দিক থেকে এই ব্যবস্থা ঘৃণ্য, সামাজিক দিক থেকে অসহনীয়, অর্থনৈতিক দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ এবং যুগের অগ্রগতির দিক থেকে সামঞ্জস্যবিহীন। এই প্রথা শ্রমের গতিশীলতা সম্পূর্ণ ব্যাহত করিয়াছে। জন্মের দ্বারা বৃত্তি নির্ধারিত হইলে ব্যক্তির কর্মদক্ষতা হ্রাস পাইবার আশংকা থাকে। এই প্রথা বলবৎ থাকিলে একজন ছুতার মিস্ত্রির ছেলে অন্য কোন পেশা গ্রহণ করিতে পারিবে না, বিশেষ কোন বৃত্তিতে শ্রমিকের চাহিদা বেশী থাকিলেও অন্য জাতির লোক সেই

পেশা গ্রহণ করিতে পারিবে না। জাতিভেদ প্রথার জন্য হিন্দুসমাজের উচ্চজাতির লোকেরা নীচজাতির লোকদিগকে ঘৃণা করে, কায়িক পরিশ্রমের মর্যাদা দিতে শেখে নাই এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে সমবায় ও সহযোগিতা বৃদ্ধির পথ রুদ্ধ হইয়াছে। কৃষিপ্রধান দেশের একটি প্রধান সামাজিক বৈশিষ্ট্য হইল একান্নবর্তী পরিবার প্রথা। পাশ্চাত্যদেশে স্বামী-স্ত্রী লইয়া পরিবার গঠিত হয়, ভারতীয় সমাজে যে ধরনের একান্নবর্তী পরিবার দেখা যায় তাহা উন্নত দেশগুলিতে দেখা যায় না। এই ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি যে ইহা অলসতা ও কর্তব্যজ্ঞানহীনতাকে প্রশ্রয় দেয়। পরিবারের দুই একজন প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জন করিলে বাড়ীর অপর সকল ব্যক্তির কর্মোদ্যম হ্রাস পায়। যাহারা অর্থ উপার্জন করে তাহাদেরও সেই অর্থ স্বাধীনভাবে ব্যয় করিবার অধিকার থাকে না ফলে কাজে উৎসাহ থাকে না এবং অর্থনৈতিক প্রগতি রুদ্ধ হয়। ভারতে দ্রুত এবং ভয়াবহ জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হইল একান্নবর্তী পরিবার প্রথা। এই প্রথা থাকিবার দরুন সন্তানসন্ততিদিগের ভরণপোষণের দায়িত্ব প্রত্যেককে সমানভাবে বহন করিতে হয় আর সেই কারণে পিতা দায়িত্বজ্ঞানহীন ভাবে সন্তানের জন্ম দিয়াছে। এই ব্যবস্থার মারাত্মক ত্রুটি যে ইহা মূলধনগঠন ব্যাহত করে। সকলের উপার্জিত অর্থ প্রত্যেকের জন্য সমানভাবে ব্যয় হয়, ফলে যাহাদের উপার্জন বেশী তাহাদের আয় হইতে অসমর্থের ভরণপোষণ হয়, বিশেষ কিছুই সঞ্চয় হয় না এবং মূলধন গঠন ব্যাহত হয়। ভারতের উত্তরাধিকারসংক্রান্ত আইন অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপন্থী। হিন্দুদের উত্তরাধিকার আইন অনুসারে মৃতব্যক্তির সম্পত্তি সকল পুত্রই সমানভাবে পায়। এই ব্যবস্থার ফল জমির উপর অত্যন্ত ক্ষতিকারক। উত্তরাধিকার আইনের ফলে জমি খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়ে এবং উন্নত পদ্ধতিতে কৃষিকার্য পরিচালনার পথে বাধার সৃষ্টি করে। ইহা ব্যতীত ব্যক্তির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সম্পত্তি বিভক্ত হইয়া যায় বলিয়া বৃহদায়তন বিনিয়োগ সম্ভব হয় না।

অর্ধোন্নত দেশগুলিতে শিক্ষার প্রতি সামাজিক মনোভাব উন্নয়নের পথে বাধা। নিছক পুঁথিগত শিক্ষা, ব্যবহারিক জগতে যাহার বিশেষ কোন মূল্য নাই, যাহা কেবলমাত্র ব্যক্তিকে সরকারী চাকরী ও কেরাণীগিরির উপযোগী করে মাত্র তাহাকে পেশাগত বা কারিগরী শিক্ষা অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান বিবেচনা করা হয়। ব্যবহারিক শিক্ষার প্রতি যে অনীহা তাহার ফলে কারিগরী অনগ্রসরতা দেখা দেয়।

প্রাচ্য দেশে ধর্ম, সংস্কৃতি ও সামাজিক মূল্যবোধ তাহাদের অনগ্রসরতার জন্য কম দায়ী নয়। বৈদান্তিক হিন্দুধর্ম বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতাকে অস্বীকার করিতে এবং অভাব সংকোচ করিতে শেখায় ফলে উন্নয়নের পথে বাধার সৃষ্টি হয়। এদেশে ধর্ম বৈষয়িক কাজকারবারকে হীন মনে করিতে শিক্ষা দিয়াছে। ধর্মবোধই সমুদ্রযাত্রাকে বিরূপ দৃষ্টিতে দেখিতে শেখায় আর তাহার ফলে সামুদ্রিক বাণিজ্যের বিকাশ রুদ্ধ হইয়া যায়। প্রাচ্য সংস্কৃতি ব্যক্তিকে স্থিতধী হইতে এবং আধ্যাত্মিক প্রশান্তি লাভের পথ দেখাইয়াছে কিন্তু পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ব্যক্তিকে অগ্রসর হইতে এবং দুঃসাহসিক কাজ করিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছে।

৬। **আন্তর্জাতিক শক্তিগুলির পশ্চাৎআকর্ষণকারী প্রভাব (Backwash Effects of International Forces)**: বিগত দেড়শো বৎসরের অর্থনৈতিক ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে বাণিজ্য ও মূলধন প্রবাহের মাধ্যমে অর্থনৈতিক শক্তিগুলি পশ্চাৎ আকর্ষণকারী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও মূলধনপ্রবাহ ধনী দেশগুলিকে অধিকতর ধনী ও দরিদ্র দেশগুলিকে অধিকতর দরিদ্র করিয়াছে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্ধোন্নত দেশ হইতে কাঁচামাল ও কৃষিজ দ্রব্যের রপ্তানী বৃদ্ধি পায়। অনুন্নত দেশগুলি অধিক পরিমাণে অদক্ষ শ্রমিক নিয়োগ করিয়া কাঁচামালের উৎপাদন বৃদ্ধি করে এবং উন্নত দেশে সৃষ্ট বাণিজ্যচক্রের শীকার হইয়া পড়ে। তেজীর সময় কাঁচামালের দাম শিল্পজাত পণ্যের দাম অপেক্ষা বেশী বৃদ্ধি পাইলেও অর্ধোন্নত দেশগুলি উহার সুবিধা গ্রহণ করিতে পারে না। বাজার অসম্পূর্ণতা, কাঠামোগত সামঞ্জস্যহীনতা এবং মূলধন ঘাটতির দরুন বৈদেশিক মুদ্রা মূলধন গঠনে ব্যবহৃত না হইয়া ভোগ্যপণ্য আমদানীর মধ্যে অপচয় হইয়া যায়। মন্দার সময় অর্ধোন্নত দেশগুলি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় কারণ এই সময়ে কাঁচামালের দাম শিল্পজাত দ্রব্যের দাম অপেক্ষা অনেক হ্রাস পায়; ফলে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন তীব্রভাবে হ্রাস হয়। এই অবস্থায় বৈদেশিক মূলধনের অনুপ্রবেশ ব্যাহত এবং বাণিজ্য ব্যালান্স প্রতিকূল হয়। প্রত্যেক দেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস এই সাক্ষ্য দেয় যে কৃষিজ পণ্যের রপ্তানী সম্প্রসারিত হইলে প্রাকৃতিক সম্পদ দেশ হইতে বাহিরে চলিয়া যাইবে যদি বৈদেশিক মুদ্রা উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে বিনিয়োজিত না হয়।

স্বয়ং-নির্ভরশীল উন্নয়ন (Self-sustaining Growth) : প্রতিটি দরিদ্র দেশ আজ উন্নয়নমুখী। এসিয়া ও আফ্রিকার নবজাগ্রত দেশগুলি আজ উন্নয়নের উড়ন্ত চেতনায় উন্মুখর। উন্নয়নের উদ্দেশ্য হইল স্বয়ংনির্ভরশীলতা অর্জন করা। স্বয়ংনির্ভরশীল উন্নয়ন বলিতে আমরা বুঝি দেশটি উন্নয়নের এরূপ এক পর্যায়ে চলিয়া গিয়াছে যেখানে প্রয়োজনীয় উন্নয়ন হার নিজস্ব সম্পদের দ্বারাই সম্ভব হইবে। স্বয়ংনির্ভরশীল পর্যায় বা অধ্যাপক রোস্টর ভাষায় উর্ধ্বগমন পর্যায়ে দেশটি উপনীত হইলে বৈদেশিক সাহায্যের উপর উহার নির্ভরশীলতা হ্রাস পাইবে। স্বয়ংনির্ভরশীল উন্নয়নের জন্য উৎপাদনের হার বৃদ্ধি, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং মূল শিল্পের ভিত্তি সুদৃঢ় হওয়া প্রয়োজন। উন্নয়নের এই পর্যায়ে দেশটি আসিলে উহা যে পরিমাণ উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইবে তাহা উৎপাদনে পূর্ণবিনিয়োগ করিলেই উন্নয়ন হার অব্যাহত থাকিবে। উন্নয়নের এই পর্যায়ে আসিলে দেশটি জাতীয় আয়ের ১৪ শতাংশ বিনিয়োগ করিতে সক্ষম হইবে এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধির বাৎসরিক হার ৫ শতাংশ হইবে।

উন্নয়নকে স্বয়ংনির্ভরশীল পর্যায়ে উন্নীত করিতে হইলে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করিতে হইবে। বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা কমাইতে হইলে ইস্পাত, জ্বালানি, বিদ্যুৎশক্তি, রসায়ন, যন্ত্রপাতি নির্মাণ প্রভৃতি মূল ও ভারী শিল্পগুলিকে সম্প্রসারিত করিতে হইবে।

উন্নয়নের এই পর্যায়ে অর্থনীতির উপর বাহির হইতে কোনরূপ ধাক্কা দিবার বা চাপ সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন হয় না। অর্থনীতিতে যে ভরবেগের (momentum) সৃষ্টি হয় তাহার বলেই দেশটির অগ্রগতি সম্ভব হয়। সুতরাং এই পর্যায়ে দেশটি উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারসাম্য উন্নয়নকৌশল (balanced growth technique) গ্রহণ করিবে ইহাই স্বাভাবিক।

আমাদের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হইল স্বয়ংনির্ভরশীল সম্প্রসারণ। স্বয়ংনির্ভরশীল অর্থনৈতিক উন্নয়নের দ্বারা ৪৪ কোটি নরনারীর সুস্থ ও সুন্দর জীবনযাপনের সুযোগ দান করাই তৃতীয় পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। এই মূল আদর্শকে বাস্তবায়িত করিবার জন্য পাঁচটি মূলনীতি গ্রহণের উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, পরিকল্পনাকালে বৎসরে ৫ শতাংশ হারে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি সাধন করা এবং সেই পরিমাণ বিনিয়োগ করা যাহাতে পরবর্তী পরিকল্পনাগুলিতেও উন্নয়নের এই হার বজায় থাকে। দ্বিতীয়তঃ, খাদ্যে

স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা এবং শিল্প ও রপ্তানীর ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের মতো কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি করা। খাদ্যের উৎপাদন ব্যতীত অন্যান্য কৃষিজ পণ্যেরও উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন কারণ শিল্পের কাঁচামালের যোগান এবং রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য উহা প্রয়োজন।

স্বয়ংনির্ভরশীল উন্নয়নের তৃতীয় সর্ত হইল মূল ও ভারীশিল্পের সম্প্রসারণ। ইস্পাত, জ্বালানি, বিদ্যুৎ, রসায়ন প্রভৃতি মূল শিল্পগুলির সম্প্রসারণ করিয়া দেশে মূলধন ভিত্তিকে এরূপ সুদৃঢ় করিতে হইবে যাহাতে আগামী ২০ বৎসরের মধ্যেই দেশে নিজ শক্তিতে শিল্পায়ন সম্ভব হয়। চতুর্থতঃ, দেশের জনশক্তির পরিপূর্ণ ব্যবহার করিয়া নানাবিধ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যদি মানবিক শক্তির পূর্ণ ব্যবহার না হয় তাহা হইলে উন্নয়নের কোন অর্থই থাকে না। পঞ্চমতঃ, সুযোগ ও সুবিধাভোগের ব্যাপারে ক্রমান্বয়ে অধিকতর সমতা আনয়ন করিতে হইবে এবং আয়বৈষম্য ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন হ্রাস করিয়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করিতে হইবে।

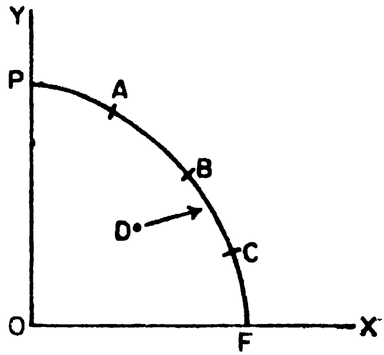
উন্নয়নের অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতা (Self-limiting Aspects of Growth) : সাধারণতঃ আশা করা হয় যে উন্নয়ন প্রক্রিয়া সুরু হইলে উহা ক্রমাগত চলিতে থাকিবে। উন্নয়নের সর্তগুলি যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ উন্নয়ন চলিতে থাকিবে। নিম্নলিখিত বাধাগুলির জন্য উন্নয়ন বন্ধ হইয়া যাইতে পারে।

প্রথমতঃ, প্রাকৃতিক সম্পদ অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি সর্ত। যে দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য আছে সেই দেশে উন্নয়নের অধিকতর সুযোগ আছে। অবশ্য ইহার অর্থ এই নয় যে প্রাকৃতিক সম্পদ না থাকিলে দেশটি উন্নয়নের উচ্চ স্তরে উন্নীত হইতে পারে না। প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও জাপান ও সুইজারল্যাণ্ড উন্নয়নের উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছাইয়াছে। অবশ্য দেশে যথেষ্ট পরিমাণে প্রাকৃতিক সম্পদ থাকিলে বিদেশের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পায় এবং উন্নয়ন কার্যসূচীকে সুনিশ্চিত করে।

দ্বিতীয়তঃ, বাজার অপূর্ণতা (market imperfection) উন্নয়নকে ব্যাহত করে। বাজার অপূর্ণতার দরুন উপাদান কম উৎপাদনশীল ক্ষেত্র হইতে অধিক উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে যাইতে পারে না। অপূর্ণতাজনিত বাধার দরুন বাজার প্রসারিত হইতে পারে না এবং উন্নয়ন ব্যাহত হয়; সুতরাং উন্নয়নের ধারা

অব্যাহত রাখিতে হইলে বাজারের অপূর্ণতা দূর করিতে হইবে এবং সেই উদ্দেশ্যে বিকল্প সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্থা গঠন করিতে হইবে। বর্তমান জ্ঞান ও সম্পদের ভিত্তিতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে। বাজারসংক্রান্ত জ্ঞান বৃদ্ধি পাইলে এবং নতুন কৃৎকৌশল সৃষ্টি হইলে বাজারের অপূর্ণতা হ্রাস পাইবে। একচেটিয়া প্রভাব খর্ব করা দরকার। মূলধন-বাজারের পরিধি বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও কারিগরদের ঋণের সুবিধা দিতে হইবে। উন্নয়নের প্রভাব অর্থনীতির সর্বক্ষেত্রে প্রসারিত করিতে হইলে বাজারের অপূর্ণতা দূর করিতে হইবে। যদি বাজারের অনমনীয়তা এবং কাঠিন্য দূর করা যায় তাহা হইলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রভাব দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে।

বাজার অপূর্ণতাজনিত অসুবিধা নিচের রেখাচিত্রে ব্যাখ্যা করা হইল। PF রেখাটি একটি উৎপাদন-সম্ভাব্যতা রেখা ; ধরা যাক দেশটি X এবং Y এই দুইটি দ্রব্য উৎপাদন করিতেছে।



PF রেখাটিকে উৎপাদন সীমান্ত-রেখা বলা হয় ; উহার সাহায্যে X ও Y এই দুইটি দ্রব্যের বিভিন্ন সমবায় দেখান হইল ; অর্ধোন্নত দেশে বাজার অপূর্ণতার দরুন উহা উৎপাদন-সীমান্ত রেখায় অবস্থিত A, B, C, বা অন্য কোন বিন্দুতে পৌছাইতে পারে না। প্রকৃত উৎপাদন ওই রেখার নিচে কোন বিন্দুতে থাকে, যেমন D ; উন্নয়নের উদ্দেশ্য হইল D বিন্দু হইতে উৎপাদন-সীমান্তরেখার কোন বিন্দুতে পৌছান এবং PF রেখাকে উর্ধ্বে তোলা।

তৃতীয়তঃ, উন্নয়নের জন্য মূলধন অপরিহার্য। মূলধনের স্বল্পতার দরুন অনুন্নত দেশগুলি দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। উন্নয়ন ও মূলধন গঠনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। উৎপাদন এবং আয় বৃদ্ধি মূলধনের পরিমাণ দ্বারা সীমাবদ্ধ। মূলধন গঠনের হার বৃদ্ধি পাইলে উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধি পাইবে। মূলধন হইল উৎপাদন ও ভোগের পার্থক্য। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে মূলধন সৃষ্টি, মূলধন একত্রীকরণ এবং উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মূলধনের সঠিক বণ্টনের উপর।

মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি নির্ভর করে তিনটি বিষয়ের উপর ; (১) অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি, (২) ব্যাংকব্যবস্থার সাহায্যে সঞ্চয় একত্রীকরণ এবং (৩) উদ্যোক্তাশ্রেণীর অস্তিত্ব যাহারা সঞ্চয়কে উৎপাদনশীল বিনিয়োগে প্রবাহিত করিবে।

চতুর্থতঃ, দ্বৈত অর্থব্যবস্থা উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অর্ধোন্নত দেশে সমগ্র অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে দুইটি অংশ দেখা যায়—সনাতন অংশ এবং আধুনিক অংশ বা উন্নত অংশ এবং অনুন্নত অংশ। এই অবস্থায় উন্নত অংশ অনুন্নত অংশের উন্নয়নে সাহায্য না করিয়া উহাকে আরও অনুন্নত করে। মিরডাল মনে করেন, যদি প্রসারণ প্রভাব (Spread Effect) পশ্চাৎ-আকর্ষণ প্রভাব (Backwash Effect) অপেক্ষা শক্তিশালী হয় তাহা হইলে উন্নয়ন দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে। অপরপক্ষে যদি পশ্চাৎ-আকর্ষণ প্রভাব প্রসারণ প্রভাব অপেক্ষা বেশী হয় তাহা হইলে একাংশের উন্নয়ন অপর অংশের উন্নয়নকে ব্যাহত করিবে।

পঞ্চমতঃ, প্রদর্শন প্রভাব (demonstration effect) অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ব্যাহত করিতে পারে। অনুন্নত দেশের জনগণ উন্নত দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান অনুকরণ করিবার চেষ্টা করে। ধনী দেশের লোকেরা দামী সিগারেট খায়, গরীব দেশের লোকেরাও উহার অনুকরণ করিয়া দামী সিগারেট খাইতে সুরু করে। কিন্তু গরীব দেশের লোক দামী সিগারেট খাইলে দেশটা ধনী দেশে পরিণত হয় না বরং উহার উন্নয়ন আরও মন্থর হয়। অনুকরণের দরুণ ভোগব্যয় বাড়ে, আমদানী বাড়ে, সঞ্চয় কম হয়, রপ্তানী কম হয় এবং বিনিয়োগ ও উন্নয়ন মন্থর হয়।

ষষ্ঠতঃ, হ্যারোড-ডোমার মডেলের ভাষায় বলা যায় যে G_n বা স্বাভাবিক উন্নয়নের হার (natural rate of growth) হইল উন্নয়নের সর্বোচ্চ হার। ইহা হইল উর্ধ্বসীমা যাহার উর্ধ্বে উন্নয়ন যাইতে পারে না। সুতরাং প্রকৃত উন্নয়ন হার কখনই স্বাভাবিক উন্নয়ন হারের বেশী হইতে পারিবে না।

সপ্তমতঃ, অধ্যাপক হিক্‌স বাণিজ্যচক্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধির একটি সর্বনিম্ন সীমা (floor) এবং একটি উর্ধ্বসীমা (ceiling) আছে। যখন উৎপাদন বৃদ্ধির আর কোন সম্ভাবনা নাই তখন সমাজে পূর্ণ কর্মসংস্থান উর্ধ্বসীমায় আসিয়া পৌছিবে। আবার উৎপাদন ও

আয় নামিয়া আসার যে সীমা আছে যাহার নীচে উহা আর নামিতে পারে না তাহাকে "মেঝে" বা নিম্নসীমা বলে।

সমাজে যে আয়স্তর আছে তাহা তিনটি উপাদানের উপর নির্ভর করে—স্বাধীন বিনিয়োগ, প্ররোচিত বিনিয়োগ এবং ভোগ্যবস্তুর উপর ব্যয়ের পরিমাণ। সমাজের অগ্রগতির সহিত স্বাধীন বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইয়া চলে। ধরা যাক, কোন কারণে স্বাধীন বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইল এবং ইহার দরুন উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাইবে। গুণক ও ত্বরণের মিলিত প্রতি-ক্রিয়ার ফলে উহা আরও অধিক আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করিবে। ব্যবসায়ী জগতে সমৃদ্ধির সূচনায় ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে। এই সকল মিলিত শক্তির প্রতিক্রিয়ায় দেশ এমন একস্থানে আসিয়া পড়িবে যখন আর অধিক উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে না।

পূর্ণ কর্মসংস্থান অবস্থায় পৌছাইবার পর উৎপাদন হ্রাস পাইবে কারণ শুধু মাত্র প্ররোচিত বিনিয়োগ উৎপাদনকে অত উঁচু পর্যায়ে রাখিতে পারে না। সরকার কর্তৃক পুনরায় স্বাধীন বিনিয়োগ না হইলে আয় এবং উৎপাদন হ্রাস পাইবে। উৎপাদন হ্রাস পাইলে ঋণাত্মক ত্বরণ এবং গুণকের প্রভাবে দ্রুত বিনিয়োগ হ্রাস ঘটিবে। উৎপাদন, কর্মসংস্থান এবং আয় দ্রুতগতিতে নীচের দিকে নামিয়া আসিবে। নীচে নামিতে নামিতে উহারা "মেঝেতে" আসিয়া ঠেকিবে।

অষ্টমতঃ, উন্নয়ন যতই চলিতে থাকিবে ততই শ্রমিক শিল্পক্ষেত্রে নিযুক্ত হইতে থাকিবে এবং দেশে "অনিচ্ছুক বেকারের" সংখ্যা কমিবে ; ইহার ফলে ট্রেড ইউনিয়নগুলি অধিকতর ক্ষমতাশালী হইতে থাকিবে এবং উহাদের যৌথ দরাদরির ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে। ইহার ফলে মজুরীহার বৃদ্ধি পাইবে এবং শ্রমিকগণ জাতীয় আয়ের অধিক অনুপাত মজুরীবাবদ পাইবে। জাতীয় আয়ে মজুরীর অংশ বৃদ্ধি পাইলে বিনিয়োগ কমিবে এবং উন্নয়নের হার হ্রাস পাইবে।

লুইস মডেলেও বলা হইয়াছে উন্নয়নের ধারা চিরকাল চলিবে না—এমন এক সময় আসিবে যখন উহা থামিয়া যাইবে। লুইসের মতে উন্নয়ন প্রবাহ থামিয়া যাইবার কয়েকটি কারণ আছে : (১) মূলধন গঠন ক্রমাগত চলিতে থাকার দরুন সব উদ্বৃত্ত শ্রমিক নিঃশেষ হইলে উন্নয়ন বন্ধ হইয়া যাইবে ; (২) লুইস দ্বৈত অর্থনীতির কথা চিন্তা করিয়া বলিয়াছেন যদি U-সেক্টরে সম্প্রসারণ

এরূপ ক্রুত হয় যে উহার দরুন A-সেক্টরে মোট জনসংখ্যা কমিয়া যায় এবং যাহার ফলে গড় উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এইরূপ হইলে U-সেক্টরে মজুরী বাড়িবে এবং উন্নয়ন থামিয়া যাইবে। (৩) যদি A-সেক্টর উন্নত উৎপাদনকৌশল গ্রহণ করে তাহা হইলে U-সেক্টরে প্রকৃত মজুরী বৃদ্ধি পাইবে এবং উহার সংকোচন ঘটিবে এবং (৪) যদি U-সেক্টরে শ্রমিকেরা শিল্পপতিদের উচ্চ জীবনযাত্রার মান অনুকরণ করিবার জন্য মজুরী বৃদ্ধির আন্দোলন করিয়া কৃতকার্য হয় তাহা হইলে শিল্পপতিদের উদ্বৃত্ত এবং মূলধন গঠনের হার হ্রাস পাইবে।

নবমতঃ, উন্নয়নের একটি স্বদেশীয় ভিত্তি থাকা প্রয়োজন। জনগণের মধ্যে উচ্চ জীবনযাত্রার মানের আকাংখা না থাকিলে উন্নয়ন ঘটিতে পারে না। উন্নয়নের প্রতি দেশবাসীর অদম্য আকাংখা থাকা চাই। বাহির হইতে উন্নয়ন রোপণ করা যায় না। বৈদেশিক সাহায্য উন্নয়নকে উৎসাহিত করিতে পারে কিন্তু উহাকে সংরক্ষণ করিতে পারে না। উন্নয়ন বেগ দেশের ভিতর হইতে স্বতস্ফূর্তভাবে না আসিলে উন্নয়ন ক্ষণস্থায়ী হইবে। অধ্যাপক কেয়ার্ন ক্রশ যথার্থই বলিয়াছেন, জনগণের মনে উন্নয়ন না ঘটিলে, দেশে উন্নয়ন হইতে পারে না। বৈদেশিক সাহায্যের উপর অধিক নির্ভরশীলতা উন্নয়ন প্রয়াসকে দুর্বল করে এবং দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ বিনষ্ট করিতে বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের যথেচ্ছ ক্ষমতা প্রদান করে। পল বারান (Paul Baran) মনে করেন যে বৈদেশিক সাহায্য অনুন্নত দেশের জনগণকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে প্রবেশে বিরত করে, সুতরাং যদি উন্নয়নের বেগকে দীর্ঘস্থায়ী করিতে হয় তাহা হইলে উহার ভিত্তিমূলকে দৃঢ়ভাবে নিজ অর্থনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

পরিশেষে, একটি মনস্তাত্বিক কারণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। তৃতীয় বিশ্বের প্রায় সকল দেশই উন্নয়নী প্রয়াস সুরু করিয়া দিয়াছে। বিভিন্ন দেশের আপেক্ষিক উন্নয়ন হার মনস্তাত্বিক বাধার সৃষ্টি করিতে পারে। যদি কোন দেশ উন্নয়ন প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে তাহা হইলে উহা দেশের জনগণের মনে এরূপ হতাশার সৃষ্টি করিবে যাহার দরুন প্রকৃত উন্নয়ন হার আরও কমিয়া যাইবে। একটি অর্ধসত্য প্রবাদ আছে যে ব্যর্থতা সাফল্যের স্তম্ভ। কিন্তু অর্থনীতিক জগতে ইহা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা; এই ক্ষেত্রে ব্যর্থতা অধিকতর ব্যর্থতার কারণ।

উন্নয়ন শুরুর সমস্যা (Problem of Getting Started) **:** ধনী-দরিদ্র প্রতিটি দেশ আজ উন্নয়নমুখী। অর্ধোন্নত দেশগুলিতে দারিদ্র্য, ব্যাধি এবং অজ্ঞতার বিরুদ্ধে জেহাদ সোচ্চার হইয়া উঠিয়াছে। দরিদ্র্যকে জয় করিবার সবচেয়ে বড় অস্ত্র হইল উন্নয়ন। উন্নত দেশগুলিও উন্নয়নে সমান আগ্রহী। উন্নয়ন তথা অগ্রগতির এই আন্দোলন মূলতঃ একটি সামাজিক বিপ্লব, মানুষের ইতিহাসে যাহার কোন নজির নাই। ক্রমবর্ধমান প্রত্যাশা হইতে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতির চেতনা জন্ম লাভ করিয়াছে ; গানার মিরডাল ইহাকে নবজাগ্রত তৃতীয় বিশ্বের ক্রমবর্ধমান প্রত্যাশার বিপ্লব (Revolution of Rising Expectations) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। উন্নয়নের বিপ্লব এই আশাবাদী ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে মানুষ এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর না হইয়া লাফ দিয়া আগাইয়া যাইতে পারিবে।

অর্ধোন্নত দেশগুলির সামনে মূল সমস্যা হইল ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও সীমিত উৎপাদন। এই দরিদ্র দেশগুলিতে যে হারে জনসংখ্যা বাড়িতেছে তদপেক্ষা অধিক হারে উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে নতুবা নিম্ন আয়স্তরে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইলে জনসংখ্যা আরও দ্রুতহারে বাড়িবে যাহার ফলে মাথাপিছু আয় হ্রাস পাইবে। লিবেনস্টাইন ইহাকে "নিম্নস্তরের ভারসাম্য ফাঁদ" ("low level equilibrivm trap") বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অর্ধোন্নত দেশে জনাধিক্য একটি ফাঁদ এবং দেশের পক্ষে ওই স্বল্প আয়ের ফাঁদ হইতে বাহির হইয়া আসা খুব কঠিন। মূলধন গঠনের এক অপবিহার্য ন্যূনতম প্রচেষ্টা বা এক রাম ধাক্কার সাহায্যে অর্থনীতিকে ওই স্তরের উর্ধ্বে তুলিতে হইবে। উত্তোলন পর্যায় (take off), রামধাক্কা জোর লাফ (great leap forward), বা অগ্রগতি (break through) প্রভৃতি ধারণায় বলা হইয়াছে যে উন্নয়নের প্রারম্ভে প্রভূত পরিমাণে বিনিয়োগ করিতে হইবে তবেই দেশটি দীর্ঘস্থায়ী দারিদ্র্য হইতে দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। উন্নয়ন শুরু করিতে হইবে বিরাট গর্জনের সঙ্গে—ফিস ফিস করিয়া নয় (Growth should begin with a bang and not with a whimper") নার্কস (Nurkse) বলেন বিভিন্ন শিল্পে একই সঙ্গে বিনিয়োগ করিলে তবেই দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্র ভেদ করা সম্ভব হইবে, তবেই দেশটি অনুন্নতির ফাঁদ হইতে বাহির

হইয়া আসিতে পারিবে। মার্কস সুসম উন্নয়নকে সমর্থন করিয়াছেন। অপরপক্ষে হিরসম্যান (Hirschman) অ-সম উন্নয়ন তত্ত্বকে সমর্থন করিয়া বলেন যে প্রাথমিক অবস্থায় দরিদ্র দেশে একসঙ্গে সকল শিল্পে প্রভূত বিনিয়োগ করা কার্যতঃ অসম্ভব; সেইজন্য এরূপ কতকগুলি শিল্প বাছিয়া লইতে হইবে যাহাতে বিনিয়োগ হইলে মাথাপিছু আয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইবে। কয়েকটি প্রধান প্রধান শিল্পে উন্নয়ন হার বৃদ্ধি পাইলে অন্যান্য শিল্পেও উন্নয়ন হার বৃদ্ধি পাইবে।

উন্নয়ন সুরু করিতে হইলে রামধাক্কার প্রয়োজন আছে। নীচে এই তত্ত্বটির বিষদ আলোচনা করা হইল :

১। **রামধাক্কার তত্ত্ব** (The Big Push Theory) : এই তত্ত্বটি অধ্যাপক পল রোসেনস্টাইন-রডানের (Rosenstein—Rodan) নামের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এই মতবাদের মূল কথা হইল যে উন্নয়নের বাধাগুলিকে অতিক্রম করিতে হইলে এক রামধাক্কার প্রয়োজন। এক প্রচণ্ড প্রাথমিক ধাক্কা অর্থাৎ যথেষ্ট পরিমাণ বিনিয়োগের মাধ্যমে এক ব্যাপক উন্নয়নী কার্যসূচী গ্রহণ করা হইলে তবেই অনুন্নত দেশ দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্র ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসিয়া উন্নয়নের পথে ক্রমাগত অগ্রসর হইতে পারিবে।

অর্ধোন্নত দেশে চাহিদা, যোগান ও সঞ্চয়ের অবিভাজ্যতার দরুন এক ন্যূনতম স্তরের বিনিয়োগ আছে যাহার কম বিনিয়োগ হইলে উহার সবটাই অপচয় হইবে। এই মতবাদ অনুসারে প্রাথমিক উন্নয়নী প্রয়াস অবশ্যই এক নির্দিষ্ট পরিমাণের হইবে—এক অপরিহার্য ন্যূনতম—তবেই অর্থনীতির অবিভাজ্যতা এবং বিচ্ছিন্নতা (discontinuities) দূর হইবে, উৎপাদন বহরের বিচ্ছিন্নতা অতিক্রম করা সম্ভব হইবে এবং উন্নয়নের পথে বাধাপ্রদানকারী শক্তিগুলি বিধ্বস্ত হইবে।

এই মতবাদ ব্যাখ্যা করিয়া বলা হইয়াছে যে এক ন্যূনতম পরিমাণ সম্পদ উন্নয়নী কার্যসূচীতে প্রয়োগ করিলে তবেই সাফল্য লাভের সম্ভাবনা আছে। মাটি হইতে শূন্যে উড়িবার জন্য এরোপ্লেনের যেমন একটা সর্বনিম্ন ধাক্কার প্রয়োজন হয় সেইরূপ এক অনুন্নত অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য প্রাথমিক বিনিয়োগের এক বিরাট ধাক্কার প্রয়োজন আছে। সামান্য সামান্য পরিমাণ বিনিয়োগ করিলে উহার যোগফলের দ্বারা যে সমষ্টি পাওয়া যাইবে উন্নয়নে

তাহার মোট প্রভাব দেখা যাইবে না। সাফল্যের প্রয়োজনীয় সর্ত হইল এক ন্যূনতম পরিমাণ বিনিয়োগ।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন এক অবিচ্ছিন্ন ঘটনাধারা নয়—উহার মাঝে মাঝে ছেদ আছে; এই বিচ্ছিন্নতার দরুন এক নির্দিষ্ট পরিমাণের কম বিনিয়োগ করা হইলে অর্থনীতিতে উহার কোন প্রভাব দেখা দিবে না।

নিম্নলিখিত তিন ধরনের অবিভাজ্যতার দরুন রামধাক্কার প্রয়োজন হয়;

(ক) **উৎপাদন অপেক্ষা অবিভাজ্যতা** (Indivisibilities in the Production Function) : রোসেনস্টাইন-রডানের মতে উপাদান, উৎপাদন অথবা প্রক্রিয়ার অবিভাজ্যতা ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের পথে বাধার সৃষ্টি করে। সামাজিক স্থির মূলধন (social overhead capital) যথা বিদ্যুৎ, পরিবহন, রাস্তাঘাট, শিক্ষা পরোক্ষভাবে অন্যান্য শিল্প গঠনে সাহায্য করে। এইক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে প্রারম্ভিক বিনিয়োগ প্রয়োজন হয়; ইহাদের আমদানী করা যায় না।

সামাজিক মূলধনের ক্ষেত্রে চার ধরনের অবিভাজ্যতা দেখা যায়। প্রথমতঃ, সময়ের দিক হইতে ইহারা অপরিবর্তনীয়। উৎপাদনে বিনিয়োজিত হইবার পূর্বেই ইহাদের সৃষ্টি আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ, ইহাদের এক ন্যূনতম স্থায়িত্বকাল আছে; তৃতীয়তঃ, ইহাদের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ এবং উৎপাদন সৃষ্টি দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার (gestation period); চতুর্থতঃ, বিভিন্ন শ্রেণীর সামাজিক উপযোগের ক্ষেত্রে ন্যূনতম শিল্পমিশ্রণ।

অর্ধোন্নত দেশে সামাজিক স্থির মূলধন যোগানে অবিভাজ্যতা উন্নয়নের বাধা। এইজন্য প্রারম্ভিক স্তরে উহাতে বৃহৎ আকারে বিনিয়োগ করা হইলে উহা অন্যান্য ক্ষেত্রে উৎপাদনশীল বিনিয়োগকে সহায়তা করিবে।

(খ) **চাহিদার অবিভাজ্যতা** (Indivisibility of Demand) : চাহিদার অবিভাজ্যতার জন্য জোর ধাক্কার প্রয়োজন আছে। চাহিদার অবিভাজ্যতার দরুন অর্ধোন্নত দেশে একসঙ্গে পারস্পরিক নির্ভরশীল শিল্পগুলি গঠন করিতে হইবে। মূল ধারণা হইল যে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ; কোন একটি দ্রব্য উৎপাদিত হইলে উৎপাদক তাহার পণ্যের জন্য বাজার পাইবে কিনা সে সম্পর্কে সে সম্পূর্ণরূপে অনিশ্চিত। চাহিদার অনিশ্চয়তা দূর করিতে হইলে একসঙ্গে একাধিক শিল্প স্থাপন করিতে হইবে। রোসেনস্টাইন রডান তাঁহার বক্তব্য ব্যাখ্যা করিবার জন্য একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়াছেন।

একটি বন্ধ (closed) অর্থনীতির কথা ধরা যাক; এইরূপ দেশে ১০০ জন ছদ্মবেশী বেকারকে একটি জুতা তৈয়ারীর কারখানায় নিযুক্ত করা হইল; যদি ওই ১০০ জন শ্রমিক তাহাদের মজুরীলব্ধ সমস্ত টাকাটা জুতা কিনিতে ব্যয় করে তাহা হইলে জুতার বাজারে নিয়মিত চাহিদা থাকিবে। কিন্তু যদি শ্রমিকগণ জুতা কিনিতে তাহাদের সমস্ত মজুরী ব্যয় না করে তাহা হইলে চাহিদার অভাবের দরুন নূতন কারখানাটি পরিত্যক্ত হইবে। কিন্তু যদি ১০০ জন শ্রমিক একটি জুতা তৈয়ারীর কারখানায় নিযুক্ত না হইয়া ১০,০০০ শ্রমিক ১০০টি বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনকারী কারখানায় নিযুক্ত হয় তাহা হইলে একে অপরের উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি করিবে। চাহিদার পরিপূরকতা বাজারের অনিশ্চয়তা দূর করিবে এবং বিনিয়োগে অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করিবে। অন্যভাবে বলা যায় যে চাহিদার অবিভাজ্যতার দরুন পরস্পর নির্ভরশীল শিল্পগুলিতে অধিক পরিমাণে বিনিয়োগ করিয়া বাজারের স্বল্প আয়তনজনিত অসুবিধা দূর করিয়া বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান করা হয়।

(গ) **সঞ্চয় যোগানে অবিভাজ্যতা** (Indivisibility in the Supply of Saving): রোসেনষ্টাইন-রডান: তত্ত্বের তৃতীয় অবিভাজ্যতা হইল সঞ্চয়ের উচ্চ আয়গত স্থিতিস্থাপকতা। বড় ধরনের ন্যূনতম পরিমাণ বিনিয়োগের জন্য প্রভূত পরিমাণ সঞ্চয়ের প্রয়োজন। দরিদ্র দেশে আয় কম বলিয়া এই অসুবিধা দূর করা সহজ নয়। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য ইহা প্রয়োজন যে বিনিয়োগ বৃদ্ধির দরুন আয় বৃদ্ধি পাইলে প্রান্তিক সঞ্চয়হার গড় সঞ্চয়হার অপেক্ষা অধিক হইবে। এই তিন ধরনের অবিভাজ্যতার দরুন অর্ধোন্নত দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রারম্ভিক বিনিয়োগের এক ধাক্কা-ধাক্কার প্রয়োজন। একটু একটু করিয়া বিচ্ছিন্ন প্রয়াসের মাধ্যমে অগ্রসর হইলে উহা উন্নয়নের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিবে না। অর্ধোন্নত দেশে উন্নয়নের অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টি করিতে হইলে যথেষ্ট পরিমাণে বিনিয়োগ করিতে হইবে।

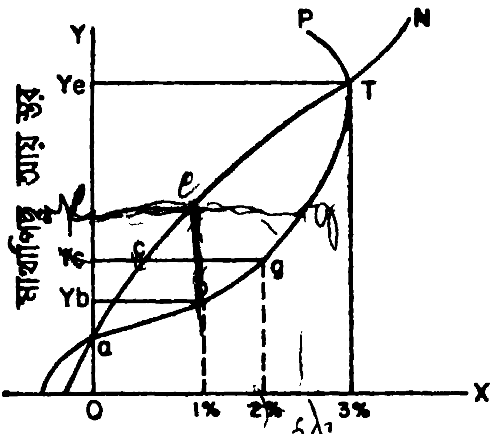
২। **অপরিহার্য ন্যূনতম প্রচেষ্টাতত্ত্ব** (Critical Minimum Effort Thesis): দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র এবং নিম্নআয়স্তরের ভারসাম্য ফাঁদে আবদ্ধ দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিভাবে ঘটিতে পারে সে সম্পর্কে অধ্যাপক হারভে লিবেনস্টাইন (Harvey Leibenstein) অপরিহার্য ন্যূনতম প্রচেষ্টাতত্ত্ব রচনা করিয়াছেন। এই অচলাবস্থা হইতে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন "অপরিহার্য

ন্যূনতম প্রচেষ্টা" যাহা মাথাপিছু আয়কে এমন এক পর্যায়ে উত্তোলন করিবে যেখানে উন্নয়নকে ধরিয়া রাখা যাইবে। অনগ্রসরতার স্তর হইতে উন্নত স্তর যেখানে স্থির দীর্ঘকালীন উন্নয়ন প্রত্যাশিত সেখানে পৌঁছাইতে হইলে কোন ন্যূনতম পরিমাণ অপেক্ষা অধিক উত্তেজনা বা উদ্দীপনার (stimulus) প্রয়োজন।

লিবেনস্টাইনের মতে প্রত্যেক অর্থনীতিতে দুই ধরনের শক্তির প্রতিক্রিয়া দেখা যায়—আঘাত দিবার শক্তি ("shocks") এবং উত্তেজনা বৃদ্ধির শক্তি ("stimulants"). আঘাত দিবার শক্তি মাথাপিছু আয়কে দাবাইয়া রাখে, আর উত্তেজনা বৃদ্ধির শক্তি মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করে। যদি আঘাত দেওয়ার শক্তিগুলির পরিমাণ উত্তেজনা বৃদ্ধির শক্তিসমূহের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে দেশটি অনুন্নত থাকিবে। যখন আয়বর্ধক শক্তিগুলি আয়দমনকারী শক্তিগুলি অপেক্ষা বেশী শক্তিশালী হইবে তখন দেশটি অপরিহার্য ন্যূনতম প্রচেষ্টার স্তরে পৌঁছাইবে এবং উহার উন্নয়ন চলিতে থাকিবে।

লিবেনষ্টাইন তত্ত্ব এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল। অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায়ের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। প্রথমে জীবনধারণের ভারসাম্য আয়স্তরে জন্মহার এবং মৃত্যুহার জনসংখ্যা টিকিয়া থাকার হারের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। যদি মাথাপিছু আয় জীবনধারণের ভারসাম্য স্তরের ঊর্ধ্বে যায় তাহা হইলে মৃত্যুহার হ্রাস পাইবে কিন্তু জন্মহার অপরিবর্তিত থাকিবে; ফলে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার বাড়িবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মাথাপিছু আয় বাড়িলে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির হার বাড়িবে। কিন্তু ইহা এক নির্দিষ্ট বিন্দু পর্যন্ত সত্য, যাহার ঊর্ধ্বে মাথাপিছু আয়বৃদ্ধি পাইলে জন্মহার কমিবে এবং উন্নয়ন যতই জোরদার হইবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ততই হ্রাস পাইবে। ব্যক্তির আয় কম হইলে সে অধিক সন্তান কামনা করে এই ধারণায় যে প্রত্যেক সন্তান কিছু কিছু আয় করিলে সে লাভবান হইবে। কিন্তু মাথাপিছু আয় বাড়িলে আয় বাড়াই-বার জন্য সন্তান লাভের আকাঙ্খা হ্রাস পাইবে। বর্তমান আয়স্তরে অধিকতর বিশেষীকরণ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক গতিশীলতার দরুন বড় পরিবার প্রতিপালন ব্যয়বহুল হইয়া পড়ে; সুতরাং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সমান হয় এবং পরে অর্থনীতি যতই উন্নয়নের পথে অগ্রসর হইতে থাকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ততই কমিতে থাকে। জাপান ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে

উন্নয়ন এই ভাবেই ঘটিয়াছে। লিবেনষ্টাইন মনে করেন জনসংখ্যা বৃদ্ধির সর্বোচ্চ হার ৩ হইতে ৪ শতাংশ; মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হারকে এমন ভাবে বাড়াইতে হইবে যাহার দরুন জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই কুঁজ (population hump) অতিক্রম করা সম্ভব হয়; অন্যভাবে বলা যায় যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই হারকে অতিক্রম করিতে হইলে অপরিহার্য ন্যূনতম বিনিয়োগ প্রচেষ্টার পরিমাণকে যথেষ্ট বড় করিতে হইবে। নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে ইহা আলোচনা করা হইল :



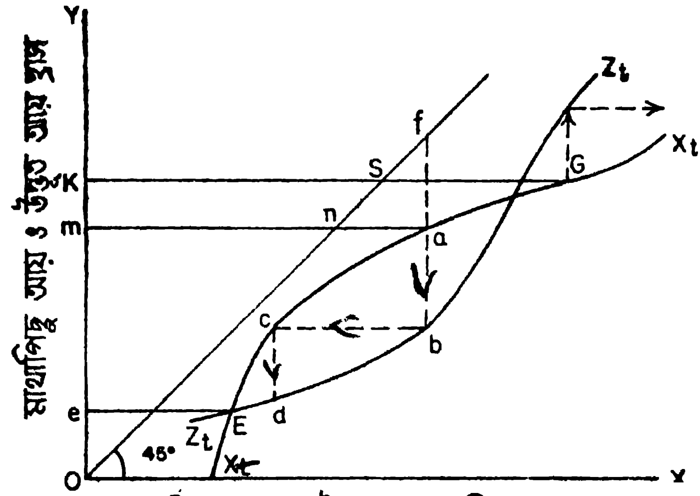
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অথবা আয় বৃদ্ধির হার

N-রেখার সাহায্যে মাথাপিছু আয়স্তর পরিমাপ করা হইতেছে; ইহা যে জাতীয় আয় বৃদ্ধি করিবে তাহা জনসংখ্যা বৃদ্ধিহারের সমান। মাথাপিছু আয়ের প্রতিটি স্তরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি কি হারে হইবে তাহা P রেখা দ্বারা দেখান হইতেছে। a হইল জীবনধারণের ভারসাম্য বিন্দু যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং আয়বৃদ্ধি নাই; a বিন্দু হইতে সুরু করিয়া Yb বিন্দুতে পৌঁছান গেল যেখানে আয়বৃদ্ধি এবং জনসংখ্যার হার ১ শতাংশ; Yc মাথাপিছু আয়স্তরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার অপেক্ষা বেশী অর্থাৎ Yc > YcC, প্রথমটি ২ শতাংশ কিন্তু দ্বিতীয়টি ১ শতাংশ। সুতরাং মাথাপিছু আয়স্তর এরূপভাবে উন্নত করিতে হইবে যাহাতে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার অপেক্ষা বেশী হয়। ইহা Ye মাথাপিছু আয়স্তরে সম্ভব কারণ ওই স্তরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পাইতে থাকে—জনসংখ্যা বৃদ্ধির সর্বোচ্চ বিন্দু হইল T— লিবেনস্টাইন. যাহাকে ৩ শতাংশ বলিয়া

ধরিয়াছেন। Ye হইল অপরিহার্য ন্যূনতম মাথাপিছু আয়স্তর যাহা অব্যাহত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন।

উল্লিখিত আলোচনায় মাথাপিছু আয় একটি আয়বৃদ্ধিকারী শক্তি কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি আয়দমনকারী শক্তি। অর্থনৈতিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখিতে হইলে প্রাথমিক বিনিয়োগ এরূপ একস্তরে উন্নীত করিতে হইবে যাহার ফলে মাথাপিছু আয়বৃদ্ধিকারী শক্তিসমূহ আয়দমনকারী শক্তিসমূহ অপেক্ষা শক্তিশালী। কোন এক বিশেষ সময়ে যে ন্যূনতম প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে এমন কোন কথা নাই ; বরং বিভিন্ন সময়ে ওই প্রচেষ্টা চালাইলে উহা অধিকতর ফলপ্রসূ হইবে। নিচের রেখাচিত্রে লিবেনস্টাইনের অপরিহার্য ন্যূনতম প্রচেষ্টাতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হইল :

৪৫° রেখাটির সাহায্যে উদ্ভূত আয়ের হ্রাস ও বৃদ্ধি পরিমাপ করা হইতেছে। X_t রেখার দ্বারা মাথাপিছু আয়বৃদ্ধিকারী শক্তিগুলি এবং Z_t রেখার দ্বারা আয় দমনকারী শক্তিগুলি নির্দেশ করা হইতেছে। যদি আয়বৃদ্ধিকারী শক্তিগুলি মাথাপিছু আয়কে ভারসাম্য স্তর Oe হইতে Om-এ উন্নীত করে তাহা হইলে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির পরিমাণ হইবে na। কিন্তু এই স্তরে আয়-



মাথাপিছু আয় ও উদ্ভূত আয় বৃদ্ধি

দমনকারী শক্তি bf আয়বৃদ্ধিকারী শক্তি af অপেক্ষা শক্তিশালী বলিয়া অর্থনীতিটি নিম্নগামী পথ abcd ধরিয়া নীচে নামিয়া যাইবে এবং পরিশেষে

B বিন্দুতে আসিয়া ঠেকিবে। যদি বিনিয়োগের দরুন মাথাপিছু আয় OK স্তরে উন্নীত হয় তাহা হইলে অর্থনীতি অব্যাহত প্রগতির পথে চলিবে। যদি কোন সময়ে মাথাপিছু আয় OK স্তরে পৌছায় তাহা হইলে যে আয়বৃদ্ধিকারী শক্তির সৃষ্টি হইবে তাহারা আয়কে GS স্তরে উন্নীত করিবে এবং অর্থনীতিটি উত্তরোত্তর উন্নয়নের পথে চলিতে থাকিবে। G-এর ঊর্ধ্বে তীরচিহ্নের সাহায্যে উহা দেখান হইল। মাথাপিছু আয়কে অন্তত: OK স্তরে উন্নত করা অথবা G বিন্দু অপরিহার্য ন্যূনতম প্রয়াস। ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে লিবেনস্টাইনের মতে এই অপরিহার্য ন্যূনতম প্রচেষ্টা হইল ন্যূনতম প্রচেষ্টা-সমূহের মধ্যে ন্যূনতম যাহার সাহায্যে একটি অর্থনীতির অব্যাহত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটিতে পারে ("The critical minimum effort as a minimum minimorum of all possible efforts that would lead to sustained real income growth").

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ছাড়াও আরও কতকগুলি কারণের জন্য অপরিহার্য ন্যূনতম প্রয়াসের প্রয়োজন। এইগুলি হইল উৎপাদন উপাদানের অবিভাজ্যতার দরুন অভ্যন্তরীণ ব্যয়সংকোচজনিত অসুবিধা, বহির্দেশীয় নির্ভরশীলতার দরুন বাহ্যিক ব্যয়সংকোচজনিত অসুবিধা, এবং সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বাধা। এই সকল আয়দমনকারী শক্তিগুলির প্রভাব হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে বড় ধরনের প্রাথমিক ন্যূনতম প্রয়াসের প্রয়োজন।

ন্যূনতম প্রয়াসতত্ত্ব ধরিয়া লয় যে কতকগুলি অনুকূল অর্থনৈতিক শক্তির অস্তিত্বের দরুন আয়বৃদ্ধিকারী শক্তিগুলি আয়হ্রাসকারী শক্তিগুলি অপেক্ষা অধিক হারে বৃদ্ধি পায়। উন্নয়ন সংঘটকদের (growth agents) সম্প্রসারণের ফলেই ইহা হয়; উদ্যোক্তা, বিনিয়োগকারী, সঞ্চয়কারী এবং উদ্ভাবক উন্নয়ন-সংঘটকদের অন্তর্গত।

অর্ধোন্নত দেশে দুই ধরনের প্রচেষ্টা দেখা যায়: (১) ফলহীন প্রচেষ্টা (zero-sum incentives) এবং (২) ফলপ্রসূ প্রচেষ্টা (positive-sum incentives); ফলহীন প্রচেষ্টায় সাহায্যে আয় বৃদ্ধি পায় না—উহার শুধুমাত্র বণ্টনগত দিক আছে; কিন্তু ফলপ্রসূ প্রচেষ্টার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঘটে। অর্ধোন্নত দেশে উদ্যোক্তাগণ প্রধানত: ফলহীন প্রচেষ্টার মধ্যে নিযুক্ত থাকে; সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি,

একচেটিয়া ক্ষমতা বৃদ্ধি, কটকাসংক্রান্ত কাজ-কারবার ফলহীন প্রচেষ্টার অন্তর্গত।

অর্ধোন্নত দেশে এমন কতকগুলি শক্তি কাজ করে যাহারা পরিবর্তনের বিরোধী এবং মাথাপিছু আয়কে দাবাইয়া রাখে; ইহাদের মধ্যে আছে, (১) উদ্যোক্তাদের ফলহীন প্রচেষ্টা, (২) শ্রমিকদের পরিবর্তনবিরোধী কার্যসমূহ, (৩) নূতন জ্ঞান ও চিন্তার প্রতি বাধা প্রদান করা এবং পুরাতন ধ্যান-ধারণাকে আঁকড়াইয়া থাকার প্রবণতা, (৪) অফলপ্রসূ বিলাস-দ্রব্যের ওপর ব্যয় যাহার দরুন অপচয় ঘটে, (৫) জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও তাহার ফলে শ্রমিকসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে মাথাপিছু মূলধনের পরিমাণ কম হইবে; এবং (৬) উচ্চ মূলধন-উৎপাদন অনুপাত।

এই শক্তিগুলির ক্রিয়ার দরুন অর্থনীতি অনগ্রসর থাকে; ইহাদের প্রভাব অতিক্রম করিতে হইলে ন্যূনতম প্রয়াসকে যথেষ্ট বড আকারের হইতে হইবে যাহার ফলপ্রসূ প্রচেষ্টাগুলির প্রভাব ফলহীন প্রচেষ্টাগুলির প্রভাব অপেক্ষা অধিক জোরদার হইবে। অপরিহার্য ন্যূনতম প্রচেষ্টার দরুন মাথাপিছু আয় বাড়িবে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বাড়িবে, উন্নয়ন সংঘটকের সংখ্যা ও আয়তন বাড়িবে, মূলধন-উৎপাদন অনুপাত হ্রাস পাইবে, উন্নয়নে বাধাদানকারী শক্তিগুলির প্রভাব খর্ব হইবে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক গতিশীলতা বৃদ্ধি পাইবে, অধিকতর বিশেষীকরণ সম্ভব হইবে এবং পরিশেষে এরূপ এক পরিবেশের সৃষ্টি হইবে যাহার ফলে জন্মহার হ্রাস পাইবে ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিতে থাকিবে।

লিবেনস্টাইন তাঁর মতবাদ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে তিনি তথ্যের সাহায্যে উন্নয়ন ধারার ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন—তিনি উন্নয়নের জন্য কোন ব্যবস্থাপত্র বা prescription দেন নাই। কিন্তু লিবেনস্টাইন-তত্ত্ব প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে উহা অর্থনীতিবিদগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং তাহারা মনে করেন লিবেনস্টাইন যে বিনিয়োগ কর্মসূচীর নির্দেশ দিয়াছেন তাহা গ্রহণ করিয়া অর্ধোন্নত দেশে উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। রোসেনস্টাইন-রডানের রামধাক্কার তত্ত্ব অপেক্ষা অপরিহার্য ন্যূনতম প্রচেষ্টা-তত্ত্ব শ্রেয় কারণ অর্ধোন্নত দেশে একসঙ্গে সকল শিল্পে প্রভূত বিনিয়োগ করা সম্ভব নয় কিন্তু ছোট ছোট প্রচেষ্টায় বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন সময়ে বিনিয়োগ করা সম্ভব। এই তত্ত্ব গণতান্ত্রিক পরিকল্পনার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও এই মতবাদ

সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। লা মিণ্ট (Hla Myint) মনে করেন মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির সহিত জনসংখ্যা বৃদ্ধির যে সম্পর্ক লিবেনস্টাইন নির্দেশ করিয়াছেন তাহা সর্বদা সত্য হইবে এমন কোন কথা নাই। লিবেনস্টাইন তাঁহার মতবাদে আয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের উপর বৈদেশিক মূলধন ও অন্যান্য বাহ্যিক শক্তির প্রভাব ব্যাখ্যা করেন নাই। জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধের ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা লিবেনস্টাইন তত্ত্বে আলোচিত হয় নাই। মাথাপিছু আয় অপরিহার্য ন্যূনতম পর্যায়ে আসিলে তবেই জন্মহার হ্রাস পাইবে কিন্তু ততদিন পর্যন্ত অর্ধোন্নত দেশগুলির পক্ষে অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। যদি পরিবার পরিকল্পনা কার্যসূচীর দরুন ন্যূনতম স্তরে পৌঁছাইবার পূর্বেই জন্মহার হ্রাসের ফলে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে লিবেনস্টাইন তত্ত্ব প্রযোজ্য হইবে না।

উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ এবং পরিদর্শন আর ইহাদের সহায়তায় সম্প্রসারণের গতিবেগ বৃদ্ধি পায়; কিন্তু উন্নত দেশে যে সম্প্রসারণ তাহা স্বতঃস্ফূর্ত—উহার জন্য পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন হয় না।

আর্থনীতিক উন্নয়ন বলিতে সহজভাবে আর্থনীতিক বৃদ্ধি বোঝায়—ইহা বর্তমান অর্থনীতির পরিমাণগত দিকটার উপর তত জোর দেয় না যত জোর দেয় সামাজিক ও অন্যান্য পরিবর্তন যাহার দরুণ আর্থনীতিক বৃদ্ধি ঘটে। অর্থনৈতিক বৃদ্ধি পরিমাপযোগ্য এবং বস্তুতান্ত্রিক; মূলধন বৃদ্ধি, শ্রমিকসংখ্যা বৃদ্ধি, ভোগ বা বিনিয়োগ বৃদ্ধি ইত্যাদির সাহায্যে ইহার বর্ণনা করা হয়; অপরপক্ষে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাহায্যে উন্নয়ন বৃদ্ধি নির্ধারণকারী শক্তিগুলিকে বোঝায়, যেমন কৃৎকৌশলের পরিবর্তন, সামাজিক দৃষ্টিভংগী ও মূল্যবোধের পরিবর্তন এবং পুরাতন সংস্থার পবিবর্তে নূতন ধরনের সংস্থা গঠন; এই সকল পরিবর্তন অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ঘটায়।

উন্নত ও অর্ধোন্নত দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক দূরত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবার কয়েকটি কারণ আছে; প্রথমতঃ অর্ধোন্নত দেশসমূহের তুলনায় উন্নত দেশগুলির মাথাপিছু আয় বহুগুণ বেশী; দ্বিতীয়তঃ উন্নত দেশগুলিতে উৎপাদন যে হারে বাড়িতেছে অনগ্রসর দেশগুলিতে সেই তুলনায় অনেক কম হারে বাড়িতেছে; ইহার প্রধান কারণ ধনী দেশগুলি যে উন্নত ধরনের কৃৎকৌশল ব্যবহার করে দরিদ্র দেশগুলির তাহা নাই; তৃতীয়তঃ উন্নত দেশগুলিতে জনসংখ্যা অতি ধীরগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে কিন্তু অনগ্রসর দেশগুলিতে

জনসংখ্যা অতি দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাইতেছে। চতুর্থতঃ, দরিদ্র দেশ হইতে মগজ বহিঃপ্রবাহ (brain drain) ধনী ও দরিদ্র দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবধান বাড়াইয়া দিতেছে। দরিদ্র দেশগুলি চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ সৃষ্টি করিবার জন্যে যে প্রভূত মূলধন বিনিয়োগ করিতেছে তাহার দরুন লাভবান হইতেছে উন্নত দেশগুলি। দরিদ্র দেশ বিনিয়োগ করিতেছে কিন্তু উহার প্রতিদান পাইতেছে ধনী দেশগুলি।

অনুশীলনী

১। অধ্যাপক রোস্টোকে অনুসরণ করিয়া উন্নয়নের পর্যায়গুলি বর্ণনা কর।

২। ক্ল্যাসিক্যাল আর্থনীতিবিদগণকে অনুসরণ করিয়া উন্নয়নের কারণ ও প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ কর।

৩। এ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) আর্থনীতিক উন্নয়নের যে নীতিগুলি আবিষ্কার করিয়াছেন সেগুলি ব্যাখ্যা কর।

৪। উন্নয়ন তত্ত্বে ডেভিড রিকার্ডোর অবদান ব্যাখ্যা কর।

৫। ডেভিড রিকার্ডো মূলধন গঠনের যে সকল উৎসের উল্লেখ করিয়াছেন সেগুলি ব্যাখ্যা কর।

৬। অর্থনৈতিক উন্নয়নতত্ত্বে ম্যালথাসের অবদান বিশ্লেষণ কর।

৭। মার্কসীয় উন্নয়নতত্ত্বের ব্যাখ্যা কর। এইতত্ত্ব কতোখানি গ্রহণযোগ্য?

৮। ছদ্মবেশী বেকার কাহাকে বলে? ছদ্মবেশী বেকারের সাহায্যে মূলধন গঠনের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

৯। অধ্যাপক লুইসের উন্নয়ন মডেল সমালোচনাসহ ব্যাখ্যা কর।

১০। অর্ধোন্নত দেশে উন্নয়নের প্রতিবন্ধকগুলি কি কি?

১১। উন্নয়নের অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতাগুলি কি কি? সংক্ষেপে উহাদের ব্যাখ্যা কর।

১২। উন্নয়ন কিভাবে সুরু করা যায়? এই প্রসঙ্গে রোসেনস্টাইন-রডানের রামধাক্কার তত্ত্বটি (The Big Push Theory) আলোচনা কর।

১৩। উন্নয়নপ্রক্রিয়া সুরু করিবার কি সমস্যা? এই প্রসঙ্গে ভারতে লিবেনস্টাইনের অপরিহার্য ন্যূনতম প্রচেষ্টাতত্ত্ব প্রয়োগের আলোচনা কর।

তৃতীয় অধ্যায়

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক বৃদ্ধি
(Economic Development and Economic Growth) :

সাধারণ কথাবার্তায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক বৃদ্ধি একই অর্থে ব্যবহার করা হইলেও উহারা সমার্থক নয়। ধারণা দুইটির মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। প্রথমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলিতে কি বোঝায় তাহা ব্যাখ্যা করিয়া ধারণা দুইটির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা হইবে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন হইল একটি নিরবচ্ছিন্ন বা সতত চলমান প্রক্রিয়া যাহার দরুন কোন দেশে দীর্ঘ সময়ান্তরে প্রকৃত জাতীয় ও মাথাপিছু আয়বৃদ্ধি ঘটে। এই সংজ্ঞায় ব্যবহৃত তিনটি শব্দ বিশেষভাবে লক্ষণীয়—প্রক্রিয়া, প্রকৃত জাতীয় আয় এবং দীর্ঘ সময়ান্তর। প্রক্রিয়া বলিতে কতকগুলি শক্তির ক্রিয়া বোঝায়—এই শক্তিসমূহ দীর্ঘকাল ধরিয়া পরস্পরের উপর প্রতিক্রিয়া করিয়া অর্থনীতিতে পরিবর্তন ঘটাইয়া নূতন গতিবেগের সঞ্চার করে। প্রকৃত জাতীয় আয় বলিতে দেশের দ্রব্য ও সেবার নীট উৎপাদন নির্দেশ করা হইতেছে—টাকার অংকে জাতীয় আয় বোঝান হইতেছে না। অর্থনৈতিক উন্নয়ন হইলে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হইবে; মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাইলে তবেই উহা সম্ভব। অতি স্বল্পকালীন সময়ে বাণিজ্যচক্রজনিত আয় পরিবর্তন উপেক্ষা করিয়া দীর্ঘ সময়ের হিসাবে জাতীয় আয় বৃদ্ধি হইলে তবেই উহাকে উন্নয়ন বলা যাইবে।

ঋণাত্মক পদ্ধতিতে উন্নয়নের ব্যাখ্যা করা অপেক্ষাকৃত সহজ। অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলিতে দেশের সর্বাত্মক উন্নয়ন বোঝায় না— অর্থনৈতিক উন্নয়ন হইল সাধারণ উন্নয়নের একটি দিক মাত্র। দ্বিতীয়তঃ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলিতে অনিবার্যভাবে "অর্থনৈতিক স্বাধীনতা" বা "শিল্পায়ন" বোঝায় না। আসলে ওইগুলি "অসন্তোষ অর্থনীতি"র (economics of discontent) বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

এসিয়া ও আফ্রিকার নবজাগ্রত দেশগুলি দীর্ঘদিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির অধীনে থাকিবার পর স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। তাই তাহারা বৈদেশিক মূলধন ও বিদেশী বাজারের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করিয়া স্বয়ংনির্ভরশীল হইবার

জন্য তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া এই প্রয়াসকে উন্নয়নী প্রয়াসের সঙ্গে গুলাইয়া ফেলিলে চলিবে না।

"অসন্তোষের অর্থনীতির" আর একটি দিক হইল যে কৃষিপ্রধান অর্ধোন্নত দেশগুলি প্রত্যেকেই শিল্পগঠনে তৎপর হইয়া উঠিয়াছে এই ভ্রান্ত ধারণায় যে ধনী দেশগুলির সমৃদ্ধির কারণ শিল্পায়ন আর তাহাদের দারিদ্র্যের জন্য দায়ী কৃষির প্রাধান্য। শিল্পায়ন ও উন্নয়ন সমার্থক নয় কারণ (১) কৃষির প্রাধান্য দারিদ্র্যের কারণ নয়—দারিদ্র্যের কারণ উৎপাদনের স্বল্পতা ; (২) শিল্প স্থাপন করিতে হইলেও কৃষিকে উন্নত করিতে হইবে ; কৃষি উন্নয়ন ব্যতিরেকে শিল্পায়ন সম্ভব নয় ; (৩) উন্নয়ন বলিতে শিল্পায়ন ছাড়াও অতিরিক্ত কিছু বোঝায়। সংক্ষেপে, উন্নয়ন হইল আধুনিকতার কতকগুলি আদর্শ উপলব্ধি করা যেমন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রগতি, আধুনিক জ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা, সাংগঠনিক সংস্থা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলিতে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও পরিবর্তন বোঝায় ; উন্নয়ন প্রক্রিয়ার কতকগুলি গুণগত দিক আছে, অর্থনীতির বৃদ্ধি ঘটিলেও উহাদের অভাব থাকিয়া যাইতে পারে। উন্নয়নের সাথে সাথে দৃষ্টিভংগী ও মূল্যবোধের পরিবর্তন হয় এবং নূতন ও উন্নত ধরনের সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

কোন কোন লেখক মনে করেন যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সমস্যা হইল অনগ্রসর জাতির সমস্যা, অপরপক্ষে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি হইল উন্নত দেশের সমস্যা। অধ্যাপক জোসেফ সুমপিটার বলেন যে উন্নয়ন বলিতে অচল অবস্থার স্বতঃস্ফূর্ত ও স্থায়ী পরিবর্তন বোঝায় এবং পূর্বে যে ভারসাম্যের অবস্থা ছিল এই পরিবর্তনের দরুন তাহা অপসারিত হইবে ; অপরপক্ষে, সঞ্চয়ের হার ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুন দীর্ঘকালীন সময়ে যে নিয়মিত পরিবর্তন দেখা দেয় তাহাকে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি বলে। শ্রীমতী উরসুলা হিক্স বলেন যে অব্যবহৃত সম্পদ ব্যবহার করিয়া অনগ্রসর দেশের সমস্যার সমাধান করিতে হইবে ; পক্ষান্তরে উন্নত দেশের সমস্যা সমাধান করিতে হইলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের বৃদ্ধি ঘটাইতে হইবে—এই সব দেশে যে সম্পদ আছে তাহাদের যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করিতে হইইবে।

অর্ধোন্নত দেশ কাহাকে বলে (Meaning of under development) : অর্ধোন্নত দেশ বা বিকাশমান বলিতে কি বোঝায় এ সম্পর্কে অর্থনীতিবিদগণের

মধ্যে মতভেদ দেখা যায় ; অর্ধোন্নত দেশের সঠিক সংজ্ঞা নির্দেশ করা বেশ কঠিন। সেইজন্য অধ্যাপক সিঙ্গার (Singer) বলেন যে, অর্ধোন্নত দেশের সংজ্ঞা নির্দেশের চেষ্টা করা নিছক সময়ের অপচয়। তিনি বলেন, অর্ধোন্নত দেশ একটা জিরাফের সঙ্গে তুলনীয়—বর্ণনা করা কঠিন কিন্তু যখন তুমি উহাকে দেখিবে তখনই উহাকে জানিতে পারিবে।

অনুন্নত দেশ (undeveloped economy) এমন একটি দেশ যাহার উন্নয়নের কোনরূপ সম্ভাবনা নাই কিন্তু অর্ধোন্নত দেশ হইল এরূপ একটি দেশ যাহার উন্নয়নের সম্ভাবনা আছে। পরিকল্পনার সাহায্যে অর্ধোন্নত দেশের দ্রুত বিকাশ সাধন করা যায়। অর্ধোন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করিলে উহার সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা যাইবে।

অর্ধোন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য (Features of an Underdeveloped Economy) : কোন একটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, তাহার সমস্যা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে সঠিক ধারণা করিতে হইলে সেই দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর গঠন ও বৈশিষ্ট্যগুলি জানা প্রয়োজন। পৃথিবীর সকল দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি সমান নয়। কতকগুলি দেশ উন্নত আর কতকগুলি দেশ অনুন্নত। অর্থনীতিবিদের কাছে পৃথিবী আজ দুইটি শিবিরে বিভক্ত—উন্নত ও অর্ধোন্নত দেশ। অর্ধোন্নত এই দেশগুলিকে "তৃতীয় বিশ্বের" (Third World) দেশ বলাও হয়। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাটিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশ অর্ধোন্নত। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ লোক অর্ধোন্নত পৃথিবীর অধিবাসী।

গানার মিরডালের যুগান্তকারী গ্রন্থ Asian Drama-র নায়ক ভারত এক দরিদ্র দেশ। অর্ধোন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যগুলি নিচে আলোচনা করা হইল :

১। উন্নয়নের যদি কোন ম্যাজিক ফরমূলা থাকে তবে উহা হইল মূলধন গঠন। মূলধনের পরিমাণ বাড়িতে পারে, সমান থাকিতে পারে অথবা হ্রাস পাইতে পারে ; এই দিক হইতে বিচার করিয়া বলা হয় যে দেশটি উন্নয়নমুখী (progressing), অচল (static) অথবা পশ্চাৎমুখী (retrogressing হইতে পারে। উন্নয়নমুখী অর্থনীতিতে উৎপাদনের তুলনায় ভোগ কম বলিয়া নীট বিনিয়োগ হয়। অচল অর্থনীতিতে উৎপাদন ও ভোগ সমান হয় বলিয়া মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না। পশ্চাৎমুখী অর্থনীতিতে উৎপাদনের তুলনায় ভোগের পরিমাণ বেশী বলিয়া ঋণাত্মক নীট বিনিয়োগ হয় অর্থাৎ মূলধনের

পরিমাণ হ্রাস পায়। পশ্চাৎপদ দেশগুলি অর্ধোন্নত হইলেও "অচল" নয়—ইহারা ধীরগতিতে অগ্রসর হইতেছে।

২। অর্ধোন্নত দেশের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য দেশের সকল সম্পদের অসম্পূর্ণ ব্যবহার। দেশের সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার না হইলে স্বভাবতই দেশটি অনগ্রসর থাকিবে। অর্ধোন্নত দেশ বলিতে সম্পদের অভাব বোঝায় না—বোঝায় উহার পূর্ণ বিকাশ এবং ব্যবহারের পথে বাধাবিঘ্ন। কোন দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ স্বল্প হইলে উহার পরিপূর্ণ ব্যবহার সত্ত্বেও মোট আয় ও মাথাপিছু আয় কম হইবে। মাথাপিছু আয় কম হইলেও এরূপ দেশকেই অর্ধোন্নত দেশ বলা হইবে; এইরূপ দেশে যথেষ্ট পরিমাণে প্রাকৃতিক সম্পদ আছে কিন্তু তাহাদের পূর্ণ ব্যবহার হয় নাই।

৩। মূলধনের অভাব অর্ধোন্নত দেশে উন্নয়নের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। জনগণের আয় কম বলিয়া সঞ্চয় কম এবং যেহেতু মূলধন সঞ্চয় হইতে উদ্ভূত হয় সেই কারণে বিনিয়োগ বা মূলধন গঠনও কম হয়। পরিকল্পনার দরুন আমাদের দেশে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৭৬-৭৭ সালে জাতীয় আয়ের ১৩·৯ শতাংশ হইয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে ইহা জাতীয় আয়ের মাত্র ৫·৫ শতাংশ ছিল। অপরপক্ষে ইংলণ্ডে বিনিয়োগের হার জাতীয় আয়ের ২০ শতাংশ। বিনিয়োগের পরিমাণ অল্প বলিয়া জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার এত কম। পরিকল্পনা কমিশনের মতে নিম্ন জীবনযাত্রার মান ও দ্রুত বর্ধমান জনসংখ্যা সমন্বিত অর্ধোন্নত দেশে দ্রুত উন্নয়নের জন্য মোট জাতীয় আয়ের ২০ শতাংশ বিনিয়োগ করা প্রয়োজন।

৪। অর্ধোন্নত দেশগুলিতে শিল্পের অনগ্রসরতার দরুন কৃষির উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা দেখা যায়। মোট জনসংখ্যার মধ্যে শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের অনুপাত যদি কৃষিতে নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যার অনুপাত অপেক্ষা কম হয় তবে দেশটিকে অর্ধোন্নত বলিয়া অভিহিত করিতে হইবে কারণ কৃষির তুলনায় শিল্প অধিকতর উৎপাদনশীল। অর্ধোন্নত দেশগুলি মূলতঃ কৃষি-প্রধান। ভারতের জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ লোক কৃষি নির্ভরশীল আর মাত্র ১৬ শতাংশ লোক শিল্পে নিযুক্ত আছে। অপরপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র ৪ শতাংশ লোক কৃষিজীবী।

৫। ছদ্মবেশী বেকারের অস্তিত্ব অর্ধোন্নত দেশের একটি বৈশিষ্ট্য। ছদ্মবেশী

বেকার ধারণার স্রষ্টা হইলেন শ্রীমতী জোয়ান রবিনসন। উৎপাদনে নিযুক্ত আছে কিন্তু প্রান্তিক উৎপাদনশূন্য এরূপ ব্যক্তিকে ছদ্মবেশী বেকার বলা হয়। ভারতীয় কৃষিতে এইরূপ ছদ্মবেশী বেকারের সংখ্যা খুবই বেশী। যে সব অর্ধোন্নত দেশে জনাধিক্য ঘটিয়াছে সেখানে এইরূপ ছদ্মবেশী বেকার দেখা যায় কিন্তু জনবিরল অর্ধোন্নত দেশে ইহা নাই।

৬। অর্ধোন্নত দেশে উৎকট ধনবৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। একদিকে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারের মধ্যে জীবন কাটাইতেছে আর অপরদিকে মুষ্টিমেয় লোক চরম ভোগবিলাসের মধ্যে বাস করিতেছে। ভারতে ৬০ শতাংশ লোক মোট জাতীয় আয়ের $\frac{1}{3}$ অংশ ভোগ করে আর অপরদিকে ৫ শতাংশ ধনী ব্যক্তি জাতীয় আয়ের $\frac{1}{3}$ অংশ ভোগ করে—বাকী অংশটি ভোগ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণী। ব্যক্তিগত ধনবৈষম্য ছাড়াও আঞ্চলিক ধনবৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষ করিয়া নগর ও গ্রামাঞ্চলের জনগণের মধ্যে তীব্র ধনবৈষম্য রহিয়াছে।

৭। অর্ধোন্নত দেশে বাণিজ্য মূলতঃ ঔপনিবেশিক ধরনের হয়। শিল্পের উন্নতি না হওয়ার দরুন এই দেশগুলি কৃষিজ পণ্য ও কাঁচামাল রপ্তানী এবং শিল্পজাত দ্রব্যাদি আমদানী করে। যে-সব কাঁচামাল স্বল্প মূল্যে এই দেশ হইতে রপ্তানী হইয়া বিদেশে যায় তাহার-ই আবার নানাবিধ শিল্পদ্রব্যে রূপান্তরিত হইয়া অধিক মূল্যে এই দেশে আমদানী হয়। এই সব দেশের বাণিজ্য হার (terms of trade) সাধারণতঃ প্রতিকূল হয়। ভারতীয় বহির্বাণিজ্যকে আর ঔপনিবেশিক বলা চলে না—উহা ধীরে উন্নত দেশের বাণিজ্যের রূপ গ্রহণ করিতেছে।

৮। অর্ধোন্নত দেশে মানবিক মূলধন (human capital) অতি নিম্নমানের, আর সেই সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে কারিগরী দক্ষতার অভাব। দেশের উন্নয়নের জন্য শুধুমাত্র প্রাকৃতিক সম্পদ ও মূলধনই যথেষ্ট নয়, উহাদের যথাযথভাবে উৎপাদনকার্যে প্রয়োগ করিবার জন্য দক্ষ শ্রমিক প্রয়োজন। অধিকাংশ অর্ধোন্নত দেশে নিরক্ষরতা ব্যাপক। নিরক্ষরতা উন্নয়নের পথে এক বিরাট বাধা। দক্ষতা অর্জন এবং সামাজিক সমস্যার স্বরূপ উপলব্ধির জন্য কিছু পরিমাণ সাধারণ শিক্ষা অপরিহার্য। অশিক্ষা হইতে জন্ম নেয় কুসংস্কার, রক্ষণশীলতা, সংকীর্ণতা এবং অদৃষ্টবাদ। কারিগরী দক্ষতার অভাব উন্নয়নের এক বড় প্রতিবন্ধক। যে-দেশে কারিগরী দক্ষতা অধিক সে-দেশে

উন্নত কৃৎকৌশল প্রয়োগ করিয়া উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি করা অপেক্ষাকৃত সহজ। ভারতে শিক্ষা বাবদ মাথাপিছু ব্যয় হয় ১৫ টাকা অপরপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ওই বাবদ ব্যয় হয় ২০০০ টাকা।

৯। বেকারসমস্যার তীব্রতা অর্ধোন্নত দেশের একটা বৈশিষ্ট্য। ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তানের মতো অর্ধোন্নত দেশে শুধু গ্রামাঞ্চলে ছদ্মবেশী বেকারই নয়, নগরাঞ্চলে "দৃশ্যমান" বা "খোলা" বেকারও ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে। উন্নত দেশগুলিতে উন্নয়ন হার বেশী বলিয়া বেকার সমস্যা কখনই অর্ধোন্নত দেশের মতো আশংকাজনক আকার ধারণ করে না।

১০। মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতা অর্ধোন্নত দেশের সার্বিক লক্ষণ। অর্ধোন্নত একটি আপেক্ষিক ধারণা। যে দেশে মাথাপিছু আয় উন্নত দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় অপেক্ষা কম তাহাকে অর্ধোন্নত দেশ বলা হয়। মাথাপিছু আয় কম হওয়ার দরুন লোকে দারিদ্র্যপ্রপীড়িত থাকে। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসা খুবই দুরূহ। মাথাপিছু আয় কম বলিয়া জনগণের সঞ্চয়ক্ষমতা কম এবং ভোগ্যবস্তু ক্রয় করিতেই স্বল্প আয়ের অধিকাংশ ব্যয় হইয়া যায়। উন্নত দেশগুলিতে জনগণের মোট খরচের এক-তৃতীয়াংশ ব্যয় হয় খাদ্যদ্রব্যের উপর কিন্তু ভারতে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে জনগণকে মোট আয়ের দুই-তৃতীয়াংশের মতো ব্যয় করিতে হয়। আয় অল্প বলিয়া জীবনযাত্রার মান নীচু আর সেই কারণে এইসব দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি দ্রুত গতিতে হয়।

পৃথিবীতে বর্তমানে ১৩০টি সার্বভৌম রাষ্ট্র আছে—ইহাদের মধ্যে ২৭টি ধনী এবং ৩৮টি অতি গরীব দেশ। ২৭টি ধনী দেশ বিশ্বের মোট সম্পদের ৭৫ শতাংশ ভোগ করিতেছে যদিও তাহারা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার মাত্র এক-চতুর্থাংশ।

চারশ্রেণীর অর্ধোন্নত দেশ (Four Categories of Underdeveloped Countries): অধ্যাপক বেঞ্জামিন হিগিন্‌স (Higgins) অর্ধোন্নত দেশগুলিকে চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথমতঃ, কতকগুলি দেশ আছে যেখানে মাথাপিছু আয় কম কিন্তু তাহাদের ব্যবহারযোগ্য যথেষ্ট অব্যবহৃত সম্পদ আছে এবং বর্তমানে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি হওয়ায় মাথাপিছু আয় উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আর্জেন্টিনা, ব্রেজিল, শ্রীলংকা, মেক্সিকো,

পেরু, তুরস্ক, ইতালী এবং ভেনেজুয়েলা এই শ্রেণীভুক্ত দেশ। এই সকল দেশের সমস্যা হইল উন্নয়নের বর্তমান হার বজায় রাখা, ছদ্মবেশী ও খোলা বেকারত্ব হ্রাস করা এবং উন্নয়নের সুফল সারা দেশে সমানভাবে বণ্টন করা।

দ্বিতীয়তঃ, কতকগুলি অর্ধোন্নত দেশ আছে যেখানে মাথাপিছু আয় বর্তমানে বিশেষভাবে কম (বার্ষিক ১০০ ডলারের কম) এবং দেশের জনসংখ্যার তুলনায় যথেষ্ট পরিমাণে সম্পদ না থাকিলেও উহাদের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। চীন, বার্মা, থাইল্যাণ্ড, পাকিস্থান ও ভারত এই শ্রেণীভুক্ত দেশ : এই দেশগুলির সমস্যা হইল উন্নয়নের হার ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করা।

তৃতীয়তঃ, কতকগুলি অর্ধোন্নত দেশ আছে যেগুলি অনড় ; যথেষ্ট সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তাহাদের জনগণের মাথাপিছু আয় বাড়িতেছে না। ইন্দোনেশিয়া এই শ্রেণীভুক্ত দেশ। এই সব দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করিয়া উন্নয়নের হার বাড়াইতে হইবে।

চতুর্থতঃ, কতকগুলি অর্ধোন্নত দেশ আছে যেখানে মাথাপিছু আয় কম, অর্থনীতি অচল আর সম্পদও সীমাবদ্ধ ; লিবিয়া, জর্ডন ও ইয়ামেন এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই শ্রেণীর দেশের উন্নয়নের জন্য বিশেষ ধরনের পরিকল্পনা প্রয়োজন। সাংগঠনিক পরিবর্তনের বদলে বর্তমান কাঠামোকে উন্নত করিয়া এই গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির উন্নতি করিতে হইবে।

ভারতে নীট বিনিয়োগ হওয়া সত্ত্বেও উন্নয়নের কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না বলিয়া ডাঃ ভি. কে. আর. ভি. রাও ভারতকে "উন্নয়নমুখী অচল অর্থনীতি" (a static economy in progress) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

উন্নয়নসংক্রান্ত নীতির সমস্যা (Issues in Development Policy) : উৎপাদন বৃদ্ধি তথা প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধি কিভাবে করা যায় তাহাই উন্নয়নের মূল সমস্যা। সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করিয়া পরিকল্পিত পদ্ধতি অনুসারে অগ্রসর হইলে উন্নয়নহার ত্বরান্বিত করা যায়। সঠিক ফিসক্যাল নীতি, আর্থিক নীতি, জননীতি এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টিকারী নীতি গ্রহণ করিয়া বিনিয়োগ হার বৃদ্ধি করিতে হইবে।

ফিসক্যাল নীতি সমাজের আয় বণ্টনে বৈষম্য হ্রাস, মুদ্রাস্ফীতি দমন ও মূলধন গঠনের হার বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করে। সরকার তাহার আয় ও

ব্যয় নীতি এরূপভাবে স্থির করিবে যাহাতে উহারা উন্নয়নমুখী হয়। কোন ক্ষেত্রে সরকারী ব্যয় হইলে সেই ক্ষেত্রে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হইবে আর কর ধার্য করা হইলে উহার বিপরীত প্রভাব দেখা দিবে। জমি ও সম্পত্তির উপর কর ধার্য করিয়া ভূমি-রাজস্বব্যবস্থাকে এরূপভাবে প্রভাবিত করিতে হইবে যাহাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। কর অব্যাহতির ব্যবস্থা করিয়া এবং অর্থ সাহায্য প্রদান করিয়া বিনিয়োগকে উৎসাহিত করিতে হইবে। কর সরকারের রাজস্ব আদায়ের একটি যন্ত্র মাত্র নহে, উহাকে এরূপভাবে ব্যবহার করিতে হইবে যাহাতে উহা উন্নয়নের একটি হাতিয়ার হইতে পারে।

সাধারণভাবে আর্থিক নীতির লক্ষ্য হইল অভ্যন্তরীণ মূল্যস্তর ও মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার স্থির রাখা। উন্নত দেশে আর্থিক নীতির প্রধান উদ্দেশ্য হইল মুদ্রাস্ফীতি ও মন্দা উভয়ই পরিহার করা। কিন্তু বিকাশমান দেশে আর্থিক নীতির প্রধান লক্ষ্য হইবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হার বৃদ্ধি করা। কার্যতঃ উন্নয়ন হার বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে অনেক সময়ই অর্ধোন্নত দেশগুলিকে টাকার অভ্যন্তরীণ ও বহির্মূল্যের স্থায়িত্ব বিসর্জন দিতে হইয়াছে।

যদি সুলভ মুদ্রানীতি অনুসরণ করা হয় তাহা হইলে সুদের হার হ্রাস পাইবে ও বিনিয়োগ উৎসাহিত হইবে। যদি বিনিয়োগ ঠিক পথে পরিচালিত না হয় তাহা হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্বাচনমূলক ঋণনিয়ন্ত্রণ নীতি প্রয়োগ করিয়া উহাকে নিয়ন্ত্রণ করিবে। বিকাশমান দেশগুলিতে বেসরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ কম হইবার সম্ভাবনা থাকায় ব্যাপক হারে সরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইবে। সুলভ মুদ্রানীতি সরকারী ঋণভার কমাইয়া বিনিয়োগকে উৎসাহিত করিবে।

কোন কোন লেখক এই অভিমত পোষণ করেন যে বিকাশমান দেশে সুদের হার খুব বেশী রাখা উচিত কারণ তাহা হইলে সীমিত মূলধন শুধুমাত্র সর্বাধিক উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইবে এবং উহার অপচয় রোধ হইবে। ইহা ব্যতীত এই নীতি সঞ্চয়কে উৎসাহিত করিয়া এবং অবাঞ্ছিত বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করিয়া মুদ্রাস্ফীতি রোধ করিবে। কিন্তু আমাদের মনে হয় না সুদের হার উচ্চ রাখার নীতি অর্ধোন্নত দেশের পক্ষে সুবিধাজনক। মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে সাধারণভাবে বিনিয়োগ সংকুচিত করা উচিত হইবে না। অবাঞ্ছিত বিনিয়োগ দমন করিবার জন্য নির্বাচিত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও মূলধনের উপর নিয়ন্ত্রণ অধিকতর কার্যকরী হইবে।

বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া আর্থিক নীতি উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করিতে পারে। আমরা অতীত অভিজ্ঞতা হইতে দেখিয়াছি যে দ্রুত বর্ধনশীল মূল্যান্তর সঞ্চয় সৃষ্টিতে বাধাপ্রদান করে অপরপক্ষে, মূল্যান্তর স্থির থাকিলে সঞ্চয় উৎসাহিত হইবে ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে।

উন্নয়নের জন্য উদ্যোক্তা অপরিহার্য। সুমপিটার তাঁহার উন্নয়ন তত্ত্বে উদ্যোক্তাকে উন্নয়নের চালকশক্তি হিসাবে দেখাইয়াছেন। উদ্যোক্তা ঝুঁকি গ্রহণ করে, নূতন নূতন দ্রব্য বাজারে উপস্থাপিত করে এবং কৃৎকৌশলগত পরিবর্তন আনয়ন করে। উদ্যোক্তাকে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করিবার নীতি গ্রহণ করিলে তবেই উন্নয়ন ত্বরান্বিত হইবে।

ধনতন্ত্র যখন তাহার উন্নতির চরম পর্যায়ে পৌছাইয়াছিল তখন তাহার নায়ক ছিল উদ্যোক্তা। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণা প্রসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে "ছাড়িয়া দেওয়ার" নীতি (laissez faire) পরিত্যক্ত হয় এবং রাষ্ট্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া উদ্যোক্তার ভূমিকা গ্রহণ করে; ফলে ব্যক্তিগত উদ্যোক্তার গুরুত্ব হ্রাস পাইয়াছে। পূর্ণ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে বেসরকারী উদ্যোক্তাদিগের আর করিবার কিছুই থাকিবে না। সমাজে স্থায়ী শান্তি সুনিশ্চিত হইলে সেনাপতির যে অবস্থা হয় উদ্যোক্তাদিগেরও তাহাই হইবে। পরিকল্পিত অর্থনীতিতে উদ্যোক্তা নয়, সরকারই উন্নয়নের দায়িত্ব বহন করে। উদ্যোক্তা ব্যক্তিগত প্রতিদান বা মুনাফা অর্জনেই আগ্রহী। অর্ধোন্নত দেশগুলিতে সামাজিক প্রতিদান ও ব্যক্তিগত প্রতিদানের মধ্যে পার্থক্য এতই ব্যাপক যে উদ্যোক্তাকে কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রদান করা যায় না। উন্নয়ন প্রয়াস সুরু করিতে হইলে প্রভূত পরিমাণ সামাজিক ধার্যব্যয় (social overheads) করা প্রয়োজন যাহা হইতে কোন রূপ সরাসরি প্রতিদান পাওয়া যায় না। এই কারণে বেসরকারী উদ্যোক্তা সামাজিক ধার্যব্যয় বহন করিতে উৎসাহী নয়। ভারতের মতো মিশ্র অর্থনীতিতে বেসরকারী উদ্যোক্তার ভূমিকা স্বীকৃত। গানার মিরডাল বলেন যে এসিয়ার দেশগুলিতে সঠিক মনোভাবসম্পন্ন উদ্যোক্তার বিশেষ অভাব আছে। এই ব্যাপারে জাপান বিশেষভাবে ভাগ্যবান—তাহার সামুরাই গোষ্ঠী শিল্পগঠনে বিশেষ উদ্যোগী হয়। বিংশ শতাব্দীর সুরুতে একদল চীনা ও ভারতীয় ভাগ্যান্বেষী দেশ ত্যাগ করিয়া মালয়, হংকং, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, বর্মা, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ

এবং পূর্ব আফ্রিকায় বহিরাগত উদ্যোক্তা হিসাবে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া শিল্প গঠন করে।

পরিশেষে, সঠিক জননীতি গ্রহণ করিলে তবেই উন্নয়ন ত্বরান্বিত হইবে। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি বড় অন্তরায়। জহরলাল বলিয়াছিলেন ভারতে জনসংখ্যা অর্ধেক হইলে উহার উন্নয়ন দ্বিগুণ হইত। অধিক জনসংখ্যা অধিক দারিদ্র্যের সৃষ্টি করে। অর্ধোন্নত দেশগুলিতে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত না হইলে উহা শুধুমাত্র উন্নয়নকেই ব্যাহত করিবে না – এক ভয়াবহ সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয় ঘটাইবে। দরিদ্র দেশগুলিকে পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সঠিক নীতি গ্রহণ করিতে হইবে।

পরিশেষে, উন্নয়নের অনুকূলে নূতন মূল্যবোধ ও মনোভাব সৃষ্টি করিতে হইবে। সামাজিক অথবা ধর্মীয় বিধিনিষেধ যাহাতে উন্নয়নের অন্তরায় না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। জনগণের মধ্যে উন্নয়নের উদগ্র আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করিতে হইবে এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা প্রসারের উপযোগী সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে ও সেইসঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থাকে উৎপাদন ও উন্নয়নমুখী করিয়া তুলিতে হইবে।

বিনিয়োগের গতিবেগ বৃদ্ধি (Raising the rate of investment) ঃ

দেশের উন্নয়ন নির্ভর করে উৎপাদনের উপর আর উৎপাদন নির্ভর করে বিনিয়োগের উপর। বিনিয়োগ হইল উৎপাদন ও ভোগের পার্থক্য। উৎপাদন বেশী হইলেই যে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই কারণ উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত যদি ভোগও বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে না। বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি করিতে হইলে উৎপাদন ও ভোগের পার্থক্য বাড়াইতে হইবে। উৎপাদন প্রদত্ত ধরিলে বিনিয়োগ বাড়াইবার উপায় হইল ভোগ হ্রাস করা। সোভিয়েত রাশিয়া তাহার পরিকল্পনার প্রথম যুগে ভোগকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করিয়া বিনিয়োগ হার বৃদ্ধি করিয়াছিল। কখনও কখনও মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করিয়া সম্পদ ভোগ হইতে সরাইয়া লইয়া বিনিয়োগ করা হয়।

বিনিয়োগের সাহায্যে কিভাবে উন্নয়নের গতিবেগ বৃদ্ধি করা যায় সে সম্পর্কে বৃটিশ অর্থনীতিবিদ রয় হ্যারোড (Roy Harrod) ও মার্কিন অর্থনীতি-

বিদ এভসে ডোমার (Evsey Domar) একটি মডেল প্রণয়ন করিয়াছেন। উন্নত দেশের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে হ্যারোড-ডোমার মডেল রচিত হইয়াছে। যদিও দুইজনের মতবাদে খুঁটিনাটির পার্থক্য আছে, তথাপি উভয়েই এক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

হ্যারোড-ডোমার মডেলে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বিনিয়োগ বৃদ্ধির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। লেখকদ্বয় বিনিয়োগের দ্বৈত প্রকৃতির উল্লেখ করিয়াছে: প্রথমত বিনিয়োগ আয় সৃষ্টি করে; দ্বিতীয়ত উহা মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া সমাজের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। যতক্ষণ পর্যন্ত নীট বিনিয়োগ চলিতে থাকিবে, প্রকৃত আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। পূর্ণ নিয়োগস্তরে ভারসাম্য বজায় রাখিতে হইলে প্রকৃত আয় ও উৎপাদন উভয়েই সেই হারে বাড়িবে যে হারে মূলধনের উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়িতেছে। প্রকৃত আয় বৃদ্ধির হারের সহিত মূলধনের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধির হারে সমতা না থাকিলে শিল্পে অতিরিক্ত উৎপাদন-ক্ষমতার সৃষ্টি হইবে, ফলে উদ্যোক্তা বিনিয়োগ হ্রাস করিতে বাধ্য হইবে। বিনিয়োগ সংকুচিত হইলে আয় ও কর্মসংস্থান হ্রাস পাইবে এবং উন্নয়ন ব্যাহত হইবে। সুতরাং যদি পূর্ণ নিয়োগ বজায় রাখিতে হয় তাহা হইলে নীট বিনিয়োগ ক্রমাগত বাড়াইয়া যাইতে হইবে। হ্যারোড-ডোমার মডেলের সরল রূপ নিম্নে বর্ণনা করা হইল:

ধরা যাক, y দ্বারা জাতীয় আয় এবং t দ্বারা সময় নির্দেশ করা হইতেছে। $_{t-1}$ এবং t এই দুই সময়ে জাতীয় আয় বৃদ্ধি হইতেছে y_t এবং y_{t-1} আর ইহাকে Δy দ্বারা দেখান হইতেছে। এখন আমরা এই অভেদ পাইতেছি

$$y_t - y_{t-1} = \Delta y$$

যদি I_t দিয়া t সময়ে নীট বিনিয়োগ নির্দেশ করা হয় এবং $\frac{C}{O}$ যদি মূলধন উৎপাদন অনুপাতের হার হয় তাহা হইলে আমরা পাই

$$\Delta y = I_t \times \frac{O}{C} \quad \cdots \quad \cdots \quad (1)$$

$\frac{O}{C}$ হইল উৎপাদনশীলতার অনুপাত এবং ইহা মূলধন-উৎপাদন অনুপাত

$\frac{C}{O}$-এর বিপরীত। দুইটি ভিন্ন সময়ে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি নীট্ বিনিয়োগ I_t এবং উৎপাদনশীলতার হারের সমান। এখন, এই সমীকরণের উভয় দিককে y_t দিয়া ভাগ করিলে আমরা পাই

$$\frac{\Delta y}{y_t} = \frac{1}{y_t} \times I_t \times \frac{O}{C}$$

$$= \frac{I_t}{y_t} \times \frac{O}{C} \quad \cdots \quad (2) \quad \cdots \quad \cdots$$

$\frac{\Delta y}{y_t}$ দেশে উৎপাদনের গতি নির্ধারণ করিতেছে—ইহাকে G দ্বারা দেখান যাইতে পারে ; অতএব দ্বিতীয় সমীকরণটিকে এইভাবে লিখিতে পারা যায়

$$G = \frac{I_t}{y_t} \times \frac{O}{C} \quad (3)$$

যেহেতু বিনিয়োগ (i_t) সর্বদাই সেই সময়ের সঞ্চয়ের (s_t) সমান, সুতরাং আমরা তৃতীয় সমীকরণটিকে এইভাবে লিখিতে পারি

$$G = \frac{s_t}{y_t} \times \frac{O}{C} \quad (4)$$

উল্লিখিত মডেল হইতে দেখা যাইতেছে যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন (G) সঞ্চয় আয়ের অনুপাত $\left(\frac{S_t}{y_t}\right)$ এবং উৎপাদনশীলতার অনুপাতের $\left(\frac{O}{C}\right)$ নির্ভরশীল। উৎপাদনশীলতার অনুপাত সমান থাকিলে (স্বল্পকালীন সময়ে উহা সমান থাকে) আয়ের তুলনায় সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হইবে।

মনে রাখা প্রয়োজন যে এই মডেলটি উন্নত দেশের সমস্যার কথা মনে রাখিয়া রচিত হইয়াছিল। উন্নত দেশে যে অচলাবস্থার আশংকা রহিয়াছে

কিভাবে তাহার মোকাবিলা করা যায় তাহাই এই তত্ত্বের মূল কথা। অর্ধোন্নত দেশে শিল্পায়ন কার্যসূচীকে নির্দেশ দানের উদ্দেশ্যে ইহা রচনা করা হয় নাই। দ্বিতীয়ত, এই তত্ত্ব নির্দেশিত উন্নয়ন হার বিকাশমান দেশে সাংগঠনিক ত্রুটির জন্য যে বেকারসমস্যা দেখা যায় তাহার সমাধান করিতে পারে না। সক্রিয় চাহিদার অভাবে যে বেকার সমস্যা দেখা দেয়, এই তত্ত্ব দ্বারা শুধুমাত্র তাহারই সমাধান হইতে পারে। অর্ধোন্নত দেশে মূলধন গঠনের তুলনায় জনসংখ্যা দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাইলে মূলধনের অভাবে সাংগঠনিক বেকারত্ব দেখা দিবে। তৃতীয়ত, এই তত্ত্ব পূর্ণ-নিয়োগ-অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত কিন্তু অর্ধোন্নত দেশে পূর্ণ-নিয়োগের অবস্থা দেখা যায় না—সব সময়ই সেখানে ছদ্মবেশী বেকারত্ব রহিয়াছে। চতুর্থত, এই তত্ত্বের আর একটি অনুমান হইল যে অর্থনৈতিক কাজকারবারে কোন সরকারী হস্তক্ষেপ নাই। কিন্তু বিকাশমান দেশগুলিতে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করিতে হইলে সরকারকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আগাইয়া আসিতে হইবে। পরিশেষে, এই মডেল যে কোন পরিকল্পনা-কৌশলের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না। যদি সমতাপূর্ণ পরিকল্পনা-কৌশল গ্রহণ করা হয় তাহা হইলেই শুধু হ্যারোড-ডোমার মডেল ব্যবহার করা যাইতে পারে কিন্তু সমতাহীন পরিকল্পনা-কৌশল গ্রহণ করা হইলে এই কৌশল প্রয়োগ করা সম্ভব নয়।

মূলধনের উৎস (Sources of Capital) : অভ্যন্তরীণ ঋণ, করলব্ধ আয়, বৈদেশিক বাণিজ্য হইতে লাভ, ঘাটতি ব্যয় এবং বৈদেশিক ঋণ এইগুলি হইল মূলধন গঠনের উৎস।

অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় সংগ্রহের দুইটি মূল পদ্ধতি—করধার্য ও ঋণগ্রহণ। উন্নয়নের জন্য সঞ্চয় সংগ্রহের সব কয়টি পদ্ধতির প্রয়োগ প্রয়োজনীয় হইলেও করধার্যের দ্বারা অর্থসংগ্রহ করা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রকৃষ্ট পদ্ধতি। করের সাহায্যে সম্পদ সংগ্রহ করিয়া উন্নয়নকে নিম্নলিখিত উপায়ে ত্বরান্বিত করা যায়: (১) ইহা অপ্রয়োজনীয় ভোগকে সংকুচিত করিয়া সম্পদকে ভোগ হইতে বিনিয়োগের দিকে প্রবাহিত করে ; (২) কর-সম্পদ জনগণের কাছ হইতে সরকারের হাতে স্থানান্তরিত করিয়া সরকার কর্তৃক মূলধন গঠন সুনিশ্চিত করে ; (৩) ইহা সঞ্চয় ও বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান করে। (৪) করব্যবস্থার মাধ্যমে ধনবৈষম্য হ্রাস করা যায় এবং (৫) ইহা সম্পদ একত্রিত করে।

ভোগ্যপণ্যের জন্য ক্রমবর্ধমান চাহিদা হ্রাস করিবার একটি পদ্ধতি হইল করব্যবস্থা। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধি পায় আর সেই কারণে ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বাড়িয়া যায়। প্রত্যক্ষ কর ধনীদের আয়ের একাংশ সরাইয়া লইয়া ভোগ হ্রাস করে আর পরোক্ষ কর ধনী ও দরিদ্র উভয় শ্রেণীর ভোগক্ষমতা হ্রাস করে। এইরূপে করব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পদ ব্যক্তিগত হইতে সরকারী বিনিয়োগে স্থানান্তরিত হয়। ইহা ব্যতীত করের সাহায্যে সরকার দেশে মুদ্রাস্ফীতির চাপ কমাইতে পারে। কর ব্যবস্থা বর্ধিত আয়ের একাংশকে বাজার হইতে বাহির করিয়া দিয়া মোট চাহিদাকে কমাইয়া মোট যোগানের সমান করে। বিকাশমান দেশে স্বল্প আয়, স্বল্প সঞ্চয়, এবং স্বল্প বিনিয়োগের দুষ্টচক্র ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসিবার উপায় হইল সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা। করের সাহায্যে সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করা যায়।

উন্নত দেশে করপদ্ধতির যে কার্যকারিতা বিকাশমান দেশে উহার সেই কার্যকারিতা নাই। প্রথমত, এইসব দেশের এক বিরাট অংশ আর্থিক লেনদেনের আওতায় আসে না বলিয়া উহা করধার্যের ক্ষেত্রের বাহিরে থাকিয়া যায়। দ্বিতীয়ত, এই সব দেশে জনগণের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নীচু বলিয়া করের সাহায্যে অধিক অর্থসংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব। তৃতীয়ত, কর ধার্যের একটা সীমা আছে যাহা অতিক্রম করিলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সংকুচিত হইবে এবং কর ফাঁকির প্রবণতা বৃদ্ধি পাইবে।

অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় সংগ্রহের দ্বিতীয় পদ্ধতি হইল ঋণ গ্রহণ। ঋণ গ্রহণ করিয়া অর্থসংগ্রহ করা ক্ষতিকারক নয় যদি সেই অর্থ উৎপাদনশীল প্রকল্পে বিনিয়োজিত হইয়া উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করে যাহা হইতে পরিশেষে মূলধন ও সুদের দাবী মিটানো যাইবে।

উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের পরিমাণ স্বভাবতই স্বল্প হইবে বলিয়া প্রাথমিক অবস্থায় অভ্যন্তরীণ ঋণগ্রহণের মাধ্যমে খুব বেশী পরিমাণ সঞ্চয় সংগ্রহ করা যায় না। অবশ্য সঞ্চয়ের প্রধান দুইটি উৎস-শিল্প ও কৃষির দ্রুত সম্প্রসারণের ফলে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ও আশু বৃদ্ধি পাইবে।

করধার্য বা ঋণগ্রহণ দুই-এরই উদ্দেশ্য ব্যক্তির আয়ের একাংশ সরাইয়া লওয়া যাহার ফলে ব্যক্তি তাহার বর্তমান ভোগ হ্রাস করিতে বাধ্য হইবে এবং কম পরিমাণ সম্পদ ভোগ্যবস্তু উৎপাদনে আর অধিক পরিমাণ সম্পদ

মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে বিনিয়োজিত হইবে। করধার্যের একটি সীমা আছে সেই সীমা অতিক্রম করিলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ হ্রাস পাইবে। সেইজন্য পুরোপুরি করের উপর নির্ভর না করিয়া ঋণগ্রহণ করাও প্রয়োজন হয়। জরুরী অবস্থায় স্বেচ্ছামূলক সঞ্চয় ছাড়াও বাধ্যতামূলক সঞ্চয় পরিকল্পনা প্রবর্তন করা যাইতে পারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় লর্ড কেন্‌স গ্রেট বৃটেনের জন্য এই বাধ্যতামূলক সঞ্চয় পরিকল্পনার সুপারিশ করিয়াছিলেন। এই ব্যবস্থা অনুসারে সরকার ব্যক্তির আয় হইতে একাংশ বাধ্যতামূলকভাবে কাটিয়া লইবে এবং যুদ্ধশেষে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিলে উহা ফেরৎ দিবে। ভারতে ১৯৬৩ সালে বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় কিন্তু পর বৎসর উহা তুলিয়া দেওয়া হয়। পুনরায় ১৯৭৪ সালে উহা সীমাবদ্ধ আকারে প্রবর্তন করা হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে যে উদ্বৃত্ত সঞ্চিত হয় তাহা উন্নয়নের একটি উৎস হইতে পারে। দেশটির বাণিজ্য-ব্যালান্স যদি অনুকূল হয় (অর্থাৎ আমদানী-মূল্যের তুলনায় রপ্তানী-মূল্য বেশী হয়) তবেই উহা হইতে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হইতে পারে। বৈদেশিক বাণিজ্য হইতে লাভ মূলধন গঠনের একটি উৎস হইলেও অর্থনৈতিক উন্নয়নে উহার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয় কারণ অধিকাংশ বিকাশমান দেশের বাণিজ্য-ব্যালান্স প্রতিকূল। দ্বিতীয়ত, এই সকল দেশে বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণও খুবই কম, উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে রপ্তানী বাণিজ্য ভারতের জাতীয় আয়ের মাত্র ৯ শতাংশ। আবার বৈদেশিক বাণিজ্য হইতে যে উদ্বৃত্ত পাওয়া যায় উহার দ্বারা সরাসরি যে দেশে মূলধন গঠন হইবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। বৈদেশিক বাণিজ্য হইতে প্রাপ্ত উদ্বৃত্তকে মূলধন গঠনের উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে নতুবা দেশে মূল্যস্তর ঊর্ধ্বগামী হইয়া মুদ্রাস্ফীতি ঘটাইবে।

উন্নয়নের জন্য মূলধন গঠনের সর্বাধুনিক পদ্ধতি হইল ঘাটতি-ব্যয়। মোট সরকারী ব্যয় মোট চলতি রাজস্ব অপেক্ষা বেশী হইলে বাজেটে ঘাটতি হইবে আর অতিরিক্ত নোট ছাপাইয়া ব্যয় মিটাইতে হইবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে ঘাটতি-ব্যয়ের ভূমিকা সম্পর্কে আধুনিক অর্থনীতিবিদেরা সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করেন। অনেক লেখক মনে করেন, যদি ঘাটতি-ব্যয় উৎপাদনশীল বিনিয়োগে ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে উন্নয়ন-হার বৃদ্ধি পাইবে। আবার কেউ

কেউ বলেন যে ঘাটতি-ব্যয় সঞ্চয় ও বিনিয়োগের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়া উন্নয়ন ব্যাহত করে। বিকাশমান দেশগুলিতে সীমিত সম্পদের কথা ভাবিলে ঘাটতি-ব্যয় না করিয়া উপায় নাই। ঘাটতি-ব্যয় যাহাতে ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি না ঘটায় সেদিকে সতর্ক নজর রাখিতে হইবে।

অর্ধোন্নত দেশের অভ্যন্তরীণ উৎসসমূহ হইতে যতই সঞ্চয় সংগৃহীত হউক না কেন, উহা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। সেই জন্য উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে বিদেশ হইতে ঋণ গ্রহণ করা অপরিহার্য হইয়া পড়ে।

বিকাশমান দেশ স্বল্প উৎপাদন, স্বল্প মূলধন ও স্বল্প আয়ের দুষ্টচক্রের মধ্যে আবর্তিত হইতেছে। বৈদেশিক মূলধন আমদানী করিয়া অনুন্নতির দুষ্টচক্রটি ভেদ করিয়া বাহিরে আসা যায়। অবশ্য বৈদেশিক মূলধন প্রারম্ভিক গতির সূচনা করিতে সক্ষম হইলেও অনুন্নতির দুষ্টচক্র ভেদ করিতে পারে না। বাহ্যিক শক্তির সাহায্যে অগ্রগতির স্থায়ী বেগ সৃষ্টি করা যায় না—উন্নয়নের গতিবেগ আসিবে অভ্যন্তরীণ প্রচেষ্টা হইতে।

বৈদেশিক মূলধন দেশে উন্নয়ন হার বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। বৈদেশিক মূলধন গঠনের সঙ্গে কারিগরী শিল্পজ্ঞানও দেশে আসে বলিয়া নৈপুণ্য গঠন ও (skill formation) ত্বরান্বিত হয়। জাতীয় উন্নয়নে বৈদেশিক মূলধনের ভূমিকা কি হইবে তাহা সংশ্লিষ্ট দেশটির নেতাদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড, জার্মানী ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ হইতে প্রভূত মূলধন গ্রহণ করিয়া বর্তমানে উন্নয়নের সর্বোচ্চ স্তরে আসিয়া পৌঁছাইয়াছে। উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে ক্যানাডায় বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল মোট বিনিয়োগের ৫০ শতাংশ। অপর পক্ষে সোভিয়েত রাশিয়া প্রায় কোনরূপ বৈদেশিক মূলধন গ্রহণ না করিয়াই তাহার অর্থনৈতিক বিকাশ সাধন করিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মার্কিন সাহায্য লাভ করিয়া যুদ্ধবিধ্বস্ত জাপান তাহার অর্থনৈতিক পুনর্গঠন করিয়াছে। ভারতের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ও মূলধন গঠনের হার মন্থর বলিয়া দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করিতে হইলে বৈদেশিক মূলধন গ্রহণ করা অপরিহার্য। আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির সম্পদ সংগ্রহের অন্যতম উৎস হইল বৈদেশিক ঋণ। প্রথম পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগের ১০ শতাংশ, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগের ১৭ শতাংশ, তৃতীয় পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগের ২৯ শতাংশ, চতুর্থ পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগের ১২ শতাংশ, পঞ্চম পরিকল্পনায়

মোট বিনিয়োগের ৪·৬ শতাংশ ও ষষ্ঠ পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগের ৫·৮ শতাংশ বৈদেশিক ঋণ বাবদ সংগৃহীত হইয়াছে।

সুষম ও অসম উন্নয়ন তত্ত্ব (Doctrine of Balanced and Unbalanced Growth):

অনুন্নত দেশকে স্বয়ংনির্ভরশীল অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করিতে হইলে উপযুক্ত উন্নয়ন-কৌশল গ্রহণ করা প্রয়োজন। অর্থনীতিবিদেরা দুই ধরনের উন্নয়ন-কৌশলের উল্লেখ করিয়াছেন। নার্কস ও রোসেনষ্টাইন রডান এই ধারণা পোষণ করেন যে বিনিয়োগ-পরিকল্পনা এরূপভাবে রচনা করিতে হইবে যাহাতে অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুষম উন্নয়ন হয়। অপরপক্ষে সিন্গার ও হারসম্যান (Singer and Hirsman) ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁহারা বলেন যে, সকল শিল্পে বিনিয়োগ না করিয়া যদি কয়েকটি মূল শিল্পে উহা করা যায় তাহা হইলে উন্নয়ন-হার ত্বরান্বিত হইবে। এই দুই উন্নয়ন কৌশল—সুষম উন্নয়ন-কৌশল ও অসম উন্নয়ন-কৌশল বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হইল।

সুষম উন্নয়নের অর্থ হইল যে অর্থনীতির বিভিন্ন অংশে সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া এরূপভাবে সম্প্রসারিত হইবে যে কোন ক্ষেত্রেই উদ্বৃত্ত অথবা ঘাটতি দেখা দিবে না। সুষম উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন যোগানের দিকে সমতা এবং চাহিদার দিকে সমতা। কৃষি ও শিল্প সমহারে বৃদ্ধি পাইবে—শিল্প কৃষিকে ছাড়াইয়া অনেক দূর চলিয়া যাইবে না। ভোগ্য শিল্প ও বিনিয়োগ শিল্পের প্রসারের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকিবে এবং স্থির সামাজিক মূলধন গঠন বা মৌল উপকাঠামো (Infrastructure) যথা বিদ্যুৎ, পরিবহন, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি শিল্প উন্নয়নের উপযোগী হইবে।

যদি শুধুমাত্র শিল্প উন্নয়নের ক্ষেত্রে মূলধন নিয়োগ করা হয় কিন্তু কৃষি অনড় অবস্থায় থাকে তাহা হইলে পরিশেষে চাহিদার অভাবে শিল্পক্ষেত্রে নৈরাশ্য-জনক অবস্থা দেখা দিবে। কিন্তু যদি শিল্প ও কৃষির ক্ষেত্রে সমান হারে বা সুষম উন্নয়ন হয়, কৃষির উৎপাদনশীলতাও শিল্পের সহিত তাল রাখিয়া বাড়িতে থাকে এবং শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে শিল্পে বিনিয়োগের সুযোগ ও সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইবে। ইহা ব্যতীত জনবহুল দেশে শিল্পায়ন

করিতে হইলে বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। উন্নয়নের গুপ্ত রহস্য হইল বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে ভারসাম্য সুনিশ্চিত করা।

অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও বৈদেশিক বাণিজ্যের মধ্যেও সমতা বজায় রাখা দরকার। রপ্তানীলব্ধ আয় উন্নয়নের জন্য অর্থ সংস্থানের একটি উৎস। উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সহিত আমদানী বাড়িতে থাকিবে। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানীর প্রয়োজন বৃদ্ধি পাইবে। লুইস বলেন, উন্নয়নী কার্যসূচী এরূপভাবে রচনা করিতে হইবে যাহাতে অর্থনীতির সকল ক্ষেত্র একই সঙ্গে প্রসারিত হয়; একদিকে কৃষি ও শিল্পের মধ্যে আর অপরদিকে অভ্যন্তরীণ ভোগ ও রপ্তানী দ্রব্য উৎপাদনের মধ্যে সামঞ্জস্য অব্যাহত রাখিতে হইবে।

১৯৪৩ সালে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে রোসেনষ্টাইন-রডান সর্বপ্রথম সুষম উন্নয়নের ধারণা প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি জুতা তৈরী কারখানার প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্তটির উল্লেখ করেন। কোন এক অঞ্চলে ২০,০০০ বেকার যুবক লইয়া একটি জুতা তৈয়ারীর কারখানা স্থাপিত হইল। এই কারখানার মজুরেরা যদি তাহাদের সমস্ত মজুরীর টাকাটাই জুতা কিনিতে ব্যয় করে তাহা হইলে জুতার বাজার সৃষ্টি হইবে। কিন্তু বস্তুতপক্ষে, ওই মজুরেরা জুতা কিনিতে তাহাদের উপার্জনের সমস্তটাই ব্যয় করিবে না। কিন্তু যদি ভোগ্য-পণ্য উৎপাদনকারী নানা ধরনের শিল্প গড়িয়া ওঠে যাহার উপর শ্রমিকরা তাহাদের মজুরী ব্যয় করে তাহা হইলে গুণক প্রক্রিয়ার প্রভাবে সকল শিল্প প্রসারিত হইবে। পরিকল্পিত পদ্ধতিতে পরিপূরক শিল্প গড়িয়া উঠিলে পণ্য বিক্রয় না হওয়ার ঝুঁকি কমিবে এবং পরিকল্পিত পদ্ধতিতে শিল্পায়ন গড়িয়া উঠিবে। অধ্যাপক নার্কস্ এই ধারণাকেই তাঁহার তত্ত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

নার্কস্ মনে করেন যে অনুন্নত দেশ দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের মধ্যে আবর্তিত হওয়ায় তাহার উন্নয়ন ব্যাহত হইতেছে। দারিদ্র্যের যে দুষ্টচক্র উন্নয়নের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে তাহাকে ভাঙিতে পারিলে উন্নয়ন জোর গতিতে সুরু হইয়া যাইবে। দুষ্টচক্রটি চাহিদা ও যোগান দুইদিকেই কাজ করে।

যোগানের দিকে, প্রকৃত আয় কম বলিয়া সঞ্চয়ের ক্ষমতাও কম হয়। মূলধন কম হওয়ায় উৎপাদনশীলতা কম হয় আর সেইজন্য আয়ও কম হয়।

সঞ্চয়ের ক্ষমতা কম বলিয়া মূলধনের স্বল্পতা দেখা দেয়। চাহিদার দিকে, চাহিদা কম বলিয়া বিনিয়োগের ইচ্ছা কম হয় আর আয় কম বলিয়া চাহিদা কম হয়। সুতরাং বিনিয়োগের প্ররোচনা বাজারের আয়তন দ্বারা সীমাবদ্ধ আর বাজারের আয়তন উৎপাদনশীলতার উপর নির্ভর করে কারণ কিনিবার ক্ষমতা বস্তুতপক্ষে নির্ভর করে উৎপাদন করিবার ক্ষমতার উপর। উৎপাদনে কি পরিমাণ মূলধন ব্যবহৃত হয় তাহার উপর উৎপাদনশীলতা নির্ভর করে। বাজারের আয়তন ছোট হওয়ায় উদ্যোক্তার পক্ষে উৎপাদনে অধিক মূলধন ব্যবহার করা সম্ভব হয় না; এইভাবেই দুষ্টচক্রটি সম্পূর্ণ হয়।

এখন প্রশ্ন হইল, কেমন করিয়া এই দুষ্টচক্রটি ভেদ করিয়া বাহিরে আসা যায়? ব্যক্তিগতভাবে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া এই সমস্যার সমাধান করা যাইতে পারে না। মূলধনের সাহায্যে কোন একটি নবগঠিত শিল্পের উৎপাদন তাহার নিজস্ব পণ্যের যথেষ্ট চাহিদা সৃষ্টি করিতে পারিবে না। মানুষের চাহিদা বিভিন্ন ধরনের হওয়ায় নতুন শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকেরা নিজেদের উৎপাদিত পণ্যের জন্য তাহাদের সমস্ত অর্থ খরচ করিবে না, ফলে নবগঠিত শিল্পটির উৎপাদিত পণ্যের জন্য যথেষ্ট চাহিদা হইবেনা। উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদার তুলনায় যোগান বেশী হইবে এবং পরিণামে শিল্পটি চাহিদার অভাবে বন্ধ হইয়া যাইবে।

এই অন্ধ গলি থেকে বহির্গমনের পথ কোথায়? কোন শিল্প এককভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে উহা টিঁকিবে না; কিন্তু যদি বহু শিল্পে একই সঙ্গে মূলধন বিনিয়োগ করা হয় তাহা হইলে চাহিদার কোন অভাব দেখা দিবে না। প্রত্যেক শিল্প একে অন্যের বাজার সৃষ্টি করিয়া পরস্পরকে সহায়তা করিবে। এইভাবে বাজার বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে অচলাবস্থা হইতে মুক্তি ঘটিবে; অনেক ভোগ্যপণ্য শিল্পে সমকালীন বিনিয়োগের দরুন প্রত্যেকটি শিল্পই লাভবান হইবে এবং উন্নয়ন অব্যাহত গতিতে চলিতে থাকিবে। দেহের বৃদ্ধির জন্য যেমন সুষম খাদ্যের প্রয়োজন সেইরূপ দেশের বৃদ্ধির জন্য সুষম উন্নয়ন প্রয়োজন।

নার্কস সে-র নিয়ম (Say's Law) থেকে সুষম উন্নয়ন ধারণার যুক্তি পাইয়াছেন। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি উহার চাহিদা সৃষ্টি করে। কিন্তু কোন বিশেষ উদ্যোক্তা কোন এক শিল্পে যথেষ্ট পরিমাণ বিনিয়োগ করিলেও বাজারের আয়তন ছোট হওয়ায় উহা লাভজনক হইবে না কিন্তু যদি একসঙ্গে

ভিন্ন ভিন্ন শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ করা যায় তাহা হইলে দক্ষতা বাড়িবে এবং বাজারের আয়তন বৃদ্ধি পাইবে। এইভাবে মুখোমুখি আক্রমণ করা—ভিন্ন ভিন্ন শিল্পে মূলধন বিনিয়োগের প্রভাব সৃষ্টি করাকেই নার্কস সুষম উন্নয়ন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

একসঙ্গে অনেক নূতন কারখানা স্থাপন করিয়া যোগানের দিকে বাহ্যিক ব্যয় সংকোচের সুবিধা গ্রহণ করিতে হইবে আর চাহিদারও কোন অভাব ঘটিবে না কারণ এক শিল্প অপর শিল্পের বাজার সৃষ্টি করিবে। বহু শিল্পে সমকালীন বিনিয়োগ হইলে শিল্পের উল্লম্ব এবং আনুভূমিক সংযোজন হইবে। শ্রমবিভাগ আরও ভালোভাবে ঘটিবে, বাজার বাড়িবে এবং মাথাপিছু সামাজিক ধার্য ব্যয় হ্রাস পাইবে। উৎপাদনশীল যন্ত্রে বিনিয়োগ এবং মানবিক মূলধন খাতে বিনিয়োগ একই সঙ্গে করিতে হইবে কারণ জনগণের দক্ষতা সৃষ্টি না হইলে তাহারা যন্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবে না। চাহিদা সৃষ্টির পূর্বেই সামাজিক ধার্য ব্যয় বা মৌল উপকাঠামো (infrastructure) সৃষ্টি করিতে হইবে যাহাতে অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্রুত সম্প্রসারিত হইতে পারে। অনুন্নত বেসরকারী উদ্যোগ বাহ্যিক ব্যয়সংকোচের সুবিধা গ্রহণ করিতে পারে না কারণ তাহারা একসঙ্গে বহু শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ করিতে অসমর্থ। নার্কসের ধারণা যে বেসরকারী উদ্যোগও যথেষ্ট প্রণোদনা (incentives) পাইলে বাঞ্ছিত প্রভাব সৃষ্টি করিতে পারে। সাধারণ দাম প্রণোদনার সাহায্যে সামান্য পরিমাণ সুষম উন্নয়ন ঘটানো যায়। যাহা হউক, বিভিন্ন শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ ঘটিলে প্রারম্ভিক বিনিয়োগের প্রভাবে সর্বাত্মক উন্নয়ন ঘটিবে।

সুষম উন্নয়নের জন্য অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখিয়া উন্নয়নের পথে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। কৃষি ও শিল্পের মধ্যে উপযুক্ত ভারসাম্য রাখিতে হইবে। শিল্প ও কৃষি পরস্পরের পরিপূরক। শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে কৃষি উৎপাদন বাড়াইতে হইবে। শিল্পক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাইলে খাদ্যশস্যের জন্য চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং খাদ্যের যোগান বৃদ্ধি পাইবে। ইহা ছাড়া, শিল্পপ্রসার ঘটিলে কাঁচামালের চাহিদা বাড়িবে। শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি উন্নয়ন না হইলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে।

সুষম উন্নয়নের প্রকৃতি হইতেই উহার সুবিধাসমূহ সম্পর্কে ধারণা করা যায়। প্রথমতঃ, একসঙ্গে বহু শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইলে বাজার বৃদ্ধি পাইবে, প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পাইবে এবং বিনিয়োগ করা লাভজনক হইবে। ইহাদের

সম্মিলিত প্রভাব অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হইবে দ্বিতীয়ত, সুষম উন্নয়নের দরুন একদিকে ঘাটতি ও যোগানে ক্ষীণতা (bottleneck) আর অপর দিকে উদ্বৃত্ত উৎপাদন ক্ষমতা পরিহার করা সম্ভব হইবে। ঘাটতি এবং যোগান ক্ষীণতার দরুন মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে; মুদ্রাস্ফীতি উন্নয়নের গতি ব্যাহত করে। যদি শিল্প কৃষির তুলনায় দ্রুতহারে বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্যের ঘাটতি দেখা দিবে। কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়িলে শিল্পোন্নয়ন ব্যাহত হইবে।

সুষম উন্নয়ন নির্ভর করে উৎপাদন উপাদানসমূহের যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর। অর্ধোন্নত দেশে উপাদানসমূহের যোগানের স্থিতিস্থাপকতার পরিমাণ কতখানি তাহা আলোচনা করা যাক। অর্ধোন্নত দেশগুলিতে বেকারত্ব ও আধা-বেকারত্ব ব্যাপক বলিয়া মনে হইতে পারে যে শ্রমের যোগান স্থিতিস্থাপক। কিন্তু এই সব কৃষিভিত্তিক সমাজের গঠন ও বেকারত্বের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাবে যে শ্রমের যোগান আপাতদৃষ্টিতে যতখানি স্থিতিস্থাপক বলিয়া মনে করা হয়, কার্যতঃ উহা ততখানি নয়। কৃষিক্ষেত্রে যে বেকারত্ব দেখা যায় সেটা অনেকখানিই ঋতুগত। কৃষি থেকে শিল্পে কয়েক মাসের জন্যে শ্রমিক স্থানান্তরিত করা যেতে পারে, স্থায়ীভাবে নয়। কর্ম-ব্যস্ততাকালে সমস্ত শ্রমিক কাজে নিযুক্ত থাকে কিন্তু কর্মস্বল্পতার সময়েই শুধু বেকারত্ব দেখা দেয়। এই সব দেশে কৃষির আর একটি বৈশিষ্ট্য যে শ্রমিকেরা কৃষিতে আংশিকভাবে নিযুক্ত থাকে। যদি কৃষি ও শিল্পে মজুরীহার সমান হয় তাহা হইলে শ্রমিকেরা শিল্পে না গিয়া কৃষিতেই কাজ করিবে। যদি কৃষির তুলনায় শিল্পে মজুরীহার বেশী হয় তাহা হইলে শ্রমিকদের কৃষি হইতে শিল্পে স্থানান্তরিত করার কোন সমস্যা হইবে না। কৃষি যন্ত্রীকরণ ও আধুনিকীকরণ করিয়া কৃষির যে উদ্বৃত্ত শ্রমিক শিল্পে পাওয়া যাইবে তাহারা অ-দক্ষ। দক্ষ শ্রমিকের যোগান অস্থিতিস্থাপক। প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া দক্ষ শ্রমিকের যোগান বাড়াইতে হইবে।

দ্বিতীয়ত, মূলধন; অর্ধোন্নত দেশে মূলধনের যোগান অস্থিতিস্থাপক। দেশে মূলধনের যোগান নির্ভর করে সঞ্চয় ক্ষমতার উপর। একথা ঠিক যে একসঙ্গে বহু শিল্পে বিনিয়োগ করা হইলে আয় বাড়িবে আর তার ফলে সঞ্চয়ের ক্ষমতা বাড়িবে কিন্তু ইহা ঘটিতে অনেক সময় লাগিবে। বর্তমান অবস্থায় উন্নত দেশ হইতে অর্ধোন্নত দেশে প্রভূত মূলধন পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই;

অধিকন্তু যদি বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগ করা হয় তাহা হইলে মুনাফার একাংশ তথা ক্রয়ক্ষমতা বিদেশে চলিয়া যাইবে ও সেই পরিমাণ দেশীয় বাজার বৃদ্ধি পাইবে না। বিদেশী মূলধনের সাহায্যে উন্নয়ন ঘটিলে উহা উন্নয়নের গতিবেগ সৃষ্টি করিবে না। যদি মূলধনের যোগান অস্থিতিস্থাপক হয় তাহা হইলে বহু শিল্পে সমকালীন বিনিয়োগ মূলধনের মূল্য (সুদের হার) বাড়াইয়া দিবে এবং বাহ্যিক ব্যয়সংকোচ কমাইবে, ফলে সুষম উন্নয়ন ব্যাহত হইবে। বিকাশমান দেশে উন্নয়নের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হইল মূলধনের অভাব। সীমিত মূলধন বহু শিল্পে কম পরিমাণ করিয়া নিয়োগ করিয়া শিল্পের বাহ্যিক ব্যয়সংকোচের সুবিধা পাওয়া যাইতে পারে। আবার ওই মূলধন বহু শিল্পে নিয়োগ না করিয়া যদি কয়েকটি শিল্পে অধিক পরিমাণে নিয়োগ করা যায় তাহা হইলে অভ্যন্তরীণ ব্যয়সংকোচের সুবিধা পাওয়া যাইবে। প্রাপ্ত মূলধন এরূপভাবে শিল্পে বণ্টন করা দরকার যে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ব্যয়সংকোচের মোট সুবিধা সর্বাধিক হয়।

পরিশেষে, উদ্যোক্তা: অর্ধোন্নত দেশে উদ্যোক্তার যোগান বিশেষভাবে অস্থিতিস্থাপক। স্বল্পকালীন সময়ে উহার যোগান বাড়ান সম্ভব নয়। শিল্প গঠন করিয়া ঝুঁকি বহন করিতে ইচ্ছুক এরূপ উদ্যোক্তা এদেশে বিরল। এখানকার লোকেরা শিল্পের পরিবর্তে ব্যবসায়ে (trade) বা ফট্‌কা কারবারে মূলধন বিনিয়োগ করিতেই বেশী আগ্রহী।

সমালোচনা (Criticism): হারসম্যান, সিন্‌গার, কুরিহারা ও অন্যান্য অর্থনীতিবিদেরা সুষম উন্নয়ন-তত্ত্বের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। প্রথমত, সুষম উন্নয়ন বিশেষভাবে ব্যয়বহুল। একসঙ্গে অনেক শিল্প গড়িয়া তুলিলে উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে এবং যথেষ্ট পরিমাণে মূলধন, দক্ষতা ও প্রয়োজনীয় কাঁচামাল না থাকিলে অর্থনৈতিক দিক হইতে উহা লাভজনক হইবে না। একসঙ্গে অনেক শিল্প গঠন করিতে হইলে যে পরিমাণ ব্যয় হইবে তাহা বহন করিবার ক্ষমতা বিকাশমান দেশগুলির নাই।

দ্বিতীয়ত, সুষম উন্নয়ন-তত্ত্বের মূলকথা হইল যে একসঙ্গে বহু শিল্প গড়িয়া উঠিলে চাহিদার কোন অভাব হইবে না। পল স্ট্রীটেন (Paul Streeten) ও অন্যান্য লেখকেরা মনে করেন যে অর্ধোন্নত দেশে চাহিদার স্বল্পতা কোন সমস্যা নয়। আমদানী হ্রাস করিয়া সহজেই চাহিদা বাড়ান যায়; এইসব দেশে ঝুঁকি গ্রহণেচ্ছু উদ্যোক্তার অভাবই উন্নয়নের একটি প্রধান অন্তরায়।

তৃতীয়ত, মূলধনের অভাব উন্নয়নের সবচেয়ে বড় অন্তরায়। দেশটি যদি সুষম উন্নয়ন গ্রহণের উপযোগী হয় তাহা হইলে প্রথম অবস্থায়ই উহা অনুন্নত থাকিত না। এই তত্ত্বটি উন্নত দেশ সম্পর্কে প্রযোজ্য—অর্ধোন্নত দেশ সম্পর্কে নয়।

চতুর্থত, হারসম্যান মনে করেন মতবাদ হিসাবে সুষম উন্নয়ন-তত্ত্ব সম্পূর্ণ ব্যর্থ। উন্নয়ন বলিতে দেশটির গুণগত পরিবর্তন বোঝায়—এক ধরনের অর্থ-ব্যবস্থা হইতে উন্নত ধরনের অর্থব্যবস্থার উত্তরণ। কিন্তু সুষম উন্নয়ন সেই ধরনের কোন পরিবর্তন নির্দেশ করে না—উহা হইল অচল অর্থনীতির উপর আধুনিক শিল্পক্ষেত্র চাপিয়ে দেওয়া। হারসম্যান বলেন, ইহা উন্নয়ন নয়, এমন কি পুরানোর উপর নতুন কিছু বসানোও নয়—ইহা সম্পূর্ণরূপে দ্বৈত ধরনের উন্নয়ন।

পঞ্চমত, সুষম উন্নয়ন অর্ধোন্নত দেশের ক্ষমতার বাইরে। এই মতবাদ অর্ধোন্নত দেশের যোগ্যতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবাস্তব প্রত্যাশা করে। একদিকে নেতারা দুঃখ করে যে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও সম্পদের অভাব; অপর দিকে সুষম উন্নয়নের সমর্থকেরা মনে করে যে সব [illegible] সর্বজ্ঞ হইয়া একটার পর একটা নূতন শিল্প স্থাপন করিবে। মনে হয়, সমস্ত মতবাদটাই স্ববিরোধী অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। খণ্ডিত আকারে যে কাজ করা সম্ভব হইতেছে না সেই ক্ষেত্রে সমগ্র কাজটা কি করিয়া সম্ভব হইবে তাহা অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়। যে ব্যক্তি একতলা বাড়ী তৈরী করতেই অসমর্থ তাকে দোতলা ও তিনতলা বাড়ী বানাতে পরামর্শ দেওয়ার মত ব্যাপারটা অর্থহীন বলিয়া মনে হয়।

ষষ্ঠত, এই মতবাদে সম্পদ-সমস্যার সমাধানের কোন ইঙ্গিত নেই। সুষম মতবাদ সে-র নিয়মের উপর দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু দ্রব্যের যোগান বলিতে উপাদানের চাহিদা বুঝায় যাহা তাহার যোগান সৃষ্টি করে না। যখন বহু নূতন শিল্পে বিনিয়োগ করা হয় তখন উপাদানের চাহিদা প্রতিযোগিতামূলক হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু অর্ধোন্নত দেশে উপাদানের যোগান অস্থিতিস্থাপক। এইভাবে এই মতবাদের মূল ভিত্তিই ভাঙ্গিয়া পড়ে। কিন্তু নার্কস্ মনে করেন যে নীট বিনিয়োগের জন্য সম্পদ পাওয়া যাইবে; কিন্তু তবুও মূলধন বণ্টনের সমস্যা থেকেই যায়। ডাঃ সিন্‌গার মনে করেন যে এরূপ

অবস্থায় অর্ধোন্নত দেশের পক্ষে সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ না হইয়া গেরিলা-যুদ্ধের কৌশল গ্রহণ করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। "বড় ভাবনা" (Think Big) অর্ধোন্নত দেশের পক্ষে নিঃসন্দেহে সুপরামর্শ কিন্তু "বড় কাজ" (Act Big) বলিতে যদি নিজস্ব সহায়-সম্বলের তুলনায় বড় কিছু করা বুঝায় তাহা অনৌচিত পরামর্শ।

পরিশেষে, সুষম উন্নয়ন-তত্ত্বে পরিকল্পনার কথা চিন্তা করা হয়নি। মার্কসীয় তত্ত্ব বেসরকারী অর্থনীতির কথা চিন্তা করিয়া রচনা করা হইয়াছিল যেখানে পরিকল্পনার কোন স্থান নাই। কিন্তু কার্যতঃ বহু শিল্পে সমকালীন বিনিয়োগ করিতে হইলে সরকার কর্তৃক পরিকল্পনা, নির্দেশনা এবং সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন। বিভিন্ন শিল্পের সুষম উন্নয়ন কিভাবে সর্বাত্মক পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে সে সম্পর্কে নার্কসীয় তত্ত্বে কোন ব্যাখ্যা নাই।

অসম উন্নয়ন তত্ত্ব (Theory of Unbalanced Growth): অসম উন্নয়ন-তত্ত্ব সুষম উন্নয়ন-তত্ত্বের ঠিক বিপরীত। এই তত্ত্ব অনুসারে সকল শিল্পে বিনিয়োগ না করিয়া কয়েকটি নির্বাচিত শিল্পে বিনিয়োগ করিতে হইবে। কোন অনুন্নত দেশে এতো অধিক পরিমাণ মূলধন নাই যে সকল শিল্পে বিনিয়োগ করা সম্ভব। সুতরাং দেশের দ্রুত উন্নয়নের জন্য কয়েকটি নির্বাচিত শিল্পে বিনিয়োগ করা হইবে আর উহা হইতে যে উদ্বৃত্ত পাওয়া যাইবে তাহা অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্যে ব্যবহার করা যাইবে; এইভাবে দেশটি অসম উন্নয়ন থেকে যাত্রা সুরু করিয়া অবশেষে সুষম উন্নয়নের দিকে ধাবিত হইবে। রোস্‌টো ও হারস্‌ম্যান এই মতবাদের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করিয়াছেন আর সিন্‌গার, কিন্‌ডালবার্জার (Kindleberger), ষ্ট্রীটেন (Streeten) ও অন্যান্য অর্থনীতিবিদেরা ইহা সমর্থন করিয়াছেন।

রোস্‌টোর মতে কোন দেশকে সনাতন সমাজের পর্যায় অতিক্রম করিয়া "উত্তোলন পর্যায়ে" (take-off stage) পৌছাইতে হইলে বিনিয়োগ ৫ শতাংশ হইতে বৃদ্ধি করিয়া অন্ততঃ ১০ শতাংশ করিতে হইবে। যদি দুই একটি বড় শিল্পকে বাছিয়া লওয়া হয় তবেই উহা সম্ভব; ইহার ফলে ওই শিল্পের উপর নির্ভরশীল অন্যান্য শিল্পগুলির উন্নয়ন ঘটিবে। বর্ধিত উৎপাদনের দরুন যে অতিরিক্ত মুনাফা পাওয়া যাইবে তাহা পুনর্নিয়োগ করা সম্ভব হইবে। বর্তমানের উন্নত দেশগুলিতে এই প্রক্রিয়ায় উন্নয়ন ঘটিয়াছে।

অসম উন্নয়ন-তত্ত্বটিকে জনপ্রিয় করিয়াছেন অধ্যাপক হারস্‌ম্যান তাঁহার

Strategy of Economic Development নামক বিখ্যাত গ্রন্থে। বিশেষ অবস্থায়, অসমতা উন্নয়নের প্রতিবন্ধক না হইয়া উহাকে ত্বরান্বিত করে হারস্‌ম্যান, বলেন উন্নয়নের শ্রেষ্ঠ কৌশল হইল অর্থনীতিতে স্বেচ্ছাকৃতভাবে ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি করা। অর্থনীতিতে যে অসমতার সৃষ্টি হইবে তাহা সংশোধন করিবার প্রচেষ্টাই দেশে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঘটাইবে। নির্দিষ্ট কয়েকটি শিল্পে বিনিয়োগ করিলে উন্নয়নের গতিবেগ বৃদ্ধি পাইবে। উন্নয়ন বস্তুতপক্ষে এই প্রক্রিয়ায়ই অগ্রসর হইয়াছে—নেতৃস্থানীয় শিল্প হইতে অনুসরণকারী শিল্পে—এক শিল্প হইতে অপর শিল্পে, এক কার্য হইতে অপর কার্যে। হারস্‌ম্যান মনে করেন উন্নয়ন হইল ভারসাম্যহীনতার এক বিরাট শিকল—উহা ভারসাম্যহীনতাকে উচ্ছেদ না করিয়া উহাকে বাঁচাইয়া রাখিবে—প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির লাভ ও ক্ষতি হইল উহার লক্ষণ। দীর্ঘস্থায়ী সমতা অর্থনীতির অচলাবস্থা নির্দেশ করে। ভারসাম্য অবস্থায় পৌছাইলে অর্থনৈতিক কাজের জন্য কোন অনুপ্রেরণা থাকিবে না। যদি অর্থনীতির বিকাশ ঘটাইতে হয় তাহা হইলে উন্নয়নী প্রয়াসের লক্ষ্য হইবে ক্রমাগত উত্তেজনা, বৈষম্য এবং ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি করিয়া যাওয়া।

অর্থনৈতিক অগ্রগতির ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে উন্নয়ন বস্তুতঃপক্ষে অসম প্রক্রিয়ায় ঘটিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে সকল ক্ষেত্রে সমহারে উন্নয়ন ঘটে নাই। অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে অসমতা দেখা দিয়াছিল তাহা সংশোধনের জন্য যে নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস তাহারই নীট প্রভাবে পরিশেষে বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

অতীতে উন্নয়ন অসম প্রক্রিয়ায় ঘটিয়াছে এই ঘটনা অসম উন্নয়নের সপক্ষে কোন যুক্তি হইতে পারে না। যদি পরিকল্পিত পদ্ধতিতে সুষম উন্নয়ন ঘটিত তাহা হইলে উন্নয়ন আরও দ্রুত হারে ঘটিতে পারিত। অতীতে উন্নয়ন অসম পদ্ধতিতে ঘটিয়াছিল কারণ তখন সুষম উন্নয়নের পরিকল্পনা-পদ্ধতি অজানা ছিল, উন্নয়নের দায়িত্ব বাজারী শক্তির উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল

সুষম উন্নয়ন একটি প্রক্রিয়া এবং উদ্দেশ্য হইতে পারে। মার্কস সুষম উন্নয়নকে দেশের বিকাশ দ্রুততর করিবার প্রক্রিয়া হিসাবে সমর্থন করিয়াছিলেন। অপরপক্ষে, অসম উন্নয়নের সমর্থকেরা সুষম উন্নয়নকে তাহাদের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করেন। অসমতার মধ্যে ক্রমাগত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া এই লক্ষ্যে পৌছাইতে হইবে।

অসম উন্নয়নের ফলে যে ঘাটতি ও যোগানক্ষীণতা দেখা দিবে তাহা উদ্ভাবনা ও আবিষ্কারে যথেষ্ট প্রণোদনা দিবে। শুধু প্রয়োজনই আবিষ্কারের মাতা নয়, আবিষ্কারও প্রয়োজনের মাতা। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের বড় বড় আবিষ্কারগুলি কোন আকস্মিক ঘটনা নয়—অর্থনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদে উহাদের উদ্ভব হইয়াছিল।

বৃহদায়তন উৎপাদন যে সুবিধার সৃষ্টি করে তাহার দরুন উৎপাদনব্যয় হ্রাস পায় এবং মুনাফা বৃদ্ধি করে। যদি মোট কার্যকরী চাহিদা কাম্য আয়তনের কার্ম গঠনের পক্ষে যথেষ্ট না হয় তাহা হইলে কয়েকটি শিল্পে সম্পদ বিনিয়োগ করাই লাভজনক। সুষম উন্নয়নের সুবিধা এবং অসম উন্নয়নের বহিরজনিত সুবিধার মধ্যে কোনটি বড় তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

গতিশীল সমাজে যেখানে চাহিদা ক্রমাগত বাড়িয়া চলিতেছে সেখানে সাময়িকভাবে চাহিদা যথেষ্ট না হইলেও বড় আয়তনের কারখানা তৈয়ারী করা লাভজনক। বৃহদায়তন উৎপাদনের বহিরজনিত যে সুবিধা তাহা সাময়িক অসুবিধা অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে।

গতিশীল সমাজে কারিগরীজ্ঞানের উন্নতির দরুণ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও ব্যয় হ্রাস সমানভাবে সব শিল্পে প্রসারিত হয় না। কারিগরী উন্নতি সব শিল্পে সমান হারে হয় না—কতক শিল্পে দ্রুতহারে আর কতক শিল্পে মৃদু হারে হয়। এই অবস্থায় মোট উৎপাদন বাড়াইতে হইলে সকল শিল্পে বিনিয়োগ না করিয়া কয়েকটি দক্ষ শিল্পে উহা করা উচিত। যে সকল শিল্পে সংযুক্তি-প্রভাব (linkage effect) সর্বাধিক সেই সকল শিল্পে বিনিয়োগ কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে। সংযুক্তি-প্রভাব দুই ধরনের হইতে পারে—অগ্রগামী সংযুক্তি-প্রভাব এবং পশ্চাৎগামী সংযুক্তি-প্রভাব। কোন বিশেষ শিল্পের সহিত অন্যান্য শিল্পের উৎপাদন সম্পর্ক থাকিলে সেই শিল্পের প্রসার ঘটিলে সংশ্লিষ্ট শিল্পে বিনিয়োগের জন্যে চাপ সৃষ্টি করিবে।

বদ্ধ অর্থনীতিতে (closed economy) প্রাপ্ত সম্পদ কয়েকটি দক্ষ শিল্পে বিনিয়োগ করিলে আপেক্ষিক দামের পরিবর্তন ঘটিবে। বৈদেশিক বাণিজ্যের পথ খোলা রাখিয়া আপেক্ষিক দামের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন তাহা প্রতিরোধ করা যায়। খোলা অর্থনীতিতে (open economy) পণ্যের দাম বিশ্বের চাহিদা ও যোগানের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়—কোন একটি দেশে উৎপাদনের পরিবর্তনের দ্বারা উহার দাম পরিবর্তিত হয় না। সুতরাং কোন দেশ

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করিয়া অসম উন্নয়নকে সুষম উন্নয়নে রূপান্তরিত করিতে পারে।

অসম উন্নয়ন ঘটাইলে যে সব পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে দেশে বাজারের অভাবে উহাদের বিদেশে রপ্তানী করিতে হইবে। এইভাবে বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীলতা দরুন অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পাইবে। অধিক আয়-জনিত সুবিধার সঙ্গে অনিশ্চয়তাজনিত ব্যয়ের হিসাব করিয়া যে বিন্দুতে সুবিধা ও ব্যয় সমান সেই পর্যন্ত শিল্পে বিনিয়োগ করা লাভজনক হইবে।

সমালোচনা (Criticism)ঃ অসম উন্নয়নের দরুন শিল্পে যে অতিরিক্ত উৎপাদনক্ষমতার সৃষ্টি হইবে তাহার ফলে যথেষ্ট অপচয় হইবে। যদি A-ক্ষেত্র তাহার পরিপূরক ক্ষেত্র অপেক্ষা অধিকতর দ্রুতহারে বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্যান্য ক্ষেত্রে সমান অগ্রগতি না হইতেছে ততদিন পর্যন্ত A-ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির পূর্ণ ব্যবহার হইবে না; একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাক; ধরা যাক, সুরুতে সড়ক নির্মাণ ও রেলপথ নির্মাণে মূলধন বিনিয়োগ করা হইল; কিন্তু যদি অন্যান্য শিল্পের বিকাশ না হয় তাহা হইলে সড়ক বা রেলপথের বিশেষ ব্যবহার হইবে না। অপরপক্ষে সুষম উন্নয়ন হইলে কোনরূপ অপচয় হইবে না।

দ্বিতীয়তঃ, পল ষ্ট্রিটেন বলেন, অসমতা সৃষ্টি করা হইবে কিনা তাহা চূড়ান্ত প্রশ্ন নয়—আসল প্রশ্ন হইল উন্নয়ন ত্বরান্বিত করিতে হইলে কি পরিমাণ অসমতা কাম্য, কোথায় উহার প্রয়োজন ও কতোখানি প্রয়োজন তাহা স্থির করিতে হইবে: 'অর্থনীতির বর্ধমান বিন্দুগুলি কোথায়, কোথায় বর্ষাফলক বিদ্ধ করিতে হইবে, কোন ধাপে তুষারপাত হিমবাহের আকার লইবে তাহা নির্ধারণ করিতে হইবে।' সুতরাং দেখা যাইতেছে যে অসম উন্নয়নের গঠন, প্রকৃতি এবং সময়ের প্রতি যথোচিত দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই।

তৃতীয়তঃ, অসম উন্নয়নের ফলে যে বিনিয়োগ প্রণোদনার সৃষ্টি হইবে তাহা পরিণামে অর্থনীতির উপর যে চাপ ও উত্তেজনার সৃষ্টি করিবে তাহা সহ্য করিবার ক্ষমতা অধোন্নত দেশগুলির নাই; সুতরাং উহা উন্নয়নের পদ্ধতিকে ব্যাহত করিতে পারে।

চতুর্থতঃ, ভারসাম্যহীনতার দরুন যে চাপ ও দুষ্প্রাপ্যতার সৃষ্টি হইবে তাহা মুদ্রাস্ফীতি ঘটাইবে। কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ কেন্দ্রীভূত

করা হইলে আয় বৃদ্ধি পাইবে এবং উহা ভোগ্যপণ্যের যোগানের তুলনায় অধিক চাহিদা সৃষ্টি করিবে। অর্ধোন্নত দেশে আর্থিক এবং ফিসক্যাল নীতি ঠিকমত কার্যকরী করা যায় না বলিয়া মূল্যস্তরের ঊর্ধ্বগতি রোধ করা খুবই কঠিন হইবে।

পঞ্চমতঃ, এই তত্ত্বে বিনিয়োগ-সিদ্ধান্ত কিভাবে সর্বাধিক করা যায় সেই সমস্যাই শুধুমাত্র ব্যাখ্যা করা হইয়াছে কিন্তু উন্নয়ন শুধুমাত্র বিনিয়োগের উপরই নির্ভর করে না—দক্ষ প্রশাসন এবং ব্যবস্থাপনাও সমান প্রয়োজন কিন্তু এই তত্ত্বে ইহার উপর দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই; অর্ধোন্নত দেশে দক্ষ প্রশাসনের বিশেষ অভাব আছে।

সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অসম উন্নয়ন অর্ধোন্নত দেশে উন্নয়নের একটি নূতন কৌশল হিসাবে স্বীকৃত। সোভিয়েত রাশিয়া দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এই কৌশল প্রথম অবলম্বন করিয়া দেশের দ্রুত বিকাশ সাধন করিয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে ভারতও এই কৌশল অবলম্বন করে। অবশ্য ভারতের পক্ষে যে এই চরম কৌশল গ্রহণ করা ঠিক হয় নাই তাহা উপলব্ধি করা যায় কারণ তখন থেকেই দেশে মূল্যস্তর ক্রমাগত বাড়িতে থাকে। যদি সরকার মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করিতে ব্যর্থ হয় তাহা হইলে অসম উন্নয়ন পদ্ধতির মাধ্যমে দেশটি স্বয়ংনির্ভরশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌছাইতে ব্যর্থ হইবে।

বিনিয়োগ নির্ধারণের মানদণ্ড (Investment Criteria) :

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ-যোগ্য সম্পদ (বা অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত) সৃষ্টি করিতে হইবে, সেই সম্পদ একত্রিকরণ করিতে হইবে এবং পরিশেষে সেই সম্পদ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এরূপভাবে বিনিয়োগ করিতে হইবে যাহাতে জাতীয় আয় সর্বাধিক করা যায়। বিনিয়োগ বিচারের কোন নীতি বা মানদণ্ড না থাকিলে সীমাবদ্ধ সম্পদের ঠিক ঠিক ব্যবহার সম্ভব হইবে না। বেসরকারী উদ্যোগ মূলতঃ মুনাফার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় বলিয়া উদ্যোক্তার বিনিয়োগ-সিদ্ধান্ত সব সময় অর্থনৈতিক উন্নয়নের অনুকূল হয় না।

দেশের সামগ্রিক স্বার্থ বিবেচনা করিয়া সরকারী কর্তৃপক্ষ বিনিয়োগ ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে এবং বেসরকারী বিনিয়োগকে উন্নয়নমুখী করিতে উৎসাহিত করিতে পারে। সরকারী পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের কাছে মূলধন-প্রগাঢ় অথবা শ্রম-প্রগাঢ় এই দুই বিকল্প কৃৎকৌশলের মধ্যে একটিকে গ্রহণ করিতে হইবে। কৃৎকৌশল নির্বাচনের প্রশ্নটি মূলতঃ বিনিয়োগ মানদণ্ড

নির্ধারণেরই একটি দিক। বিনিয়োগ বিচারের জন্যে অর্থনীতিবিদেরা যে সব মানদণ্ডের নির্দেশ দিয়াছেন তাহাদের আলোচনা করা হইল।

(1) সামাজিক প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার নীতি (Social Marginal Productivity Criterion) : সীমাবদ্ধ সম্পদ বণ্টনের মানদণ্ড হিসাবে সামাজিক প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার নীতি সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। এই নীতিটির আবিষ্কর্তা হইলেন অধ্যাপক কান (Kahn)। ১৯৫১ সালে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে কান এই নীতির উল্লেখ করেন। পরবর্তীকালে অধ্যাপক চেনারী (Chenery) বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিয়া এই নীতিটিকে জনপ্রিয় করিয়া তোলেন। মূলধন বিনিয়োগ হইতে বেসরকারী বিনিয়োগকারী যে প্রতিদান পাইবে শুধুমাত্র তাহা বিবেচনা না করিয়া জাতীয় উৎপাদনে উহার প্রতিদানের কথা বিবেচনা করিতে হইবে। সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ও সুদক্ষ বণ্টন হইলে জাতীয় উৎপাদনের মূল্য সর্বাধিক হইবে আর ইহা করিতে হইলে সম্পদ এরূপভাবে বণ্টন করিতে হইবে যাহাতে মূলধনের সামাজিক প্রান্তিক উৎপাদন প্রতিটি ব্যবহারে সর্বাধিক হয়। এইরূপ অবস্থার উদ্ভব হইলে কোন একটি উপাদানকে কোন এক ব্যবহার হইতে সরাইয়া অন্য কোন ব্যবহারে নিয়োগ করিলে উৎপাদন এতটুকু বাড়িবে না।

সামাজিক প্রান্তিক উৎপাদন (SMP) নীতিটি একটি সহজ সূত্রের দ্বারা প্রকাশ করা যায় $SMP = \dfrac{X+B-L-M-O}{K}$

এখানে X = বর্ধিত উৎপাদনের বাজার দাম

B = বাহ্যিক ব্যয়সংকোচের দরুন উৎপাদনের বর্ধিত মূল্য

L = শ্রমজনিত ব্যয়

M = কাঁচামালের ব্যয়

O = মাথাপিছু খার্চ ব্যয় (অপচয়জনিত ব্যয় ইহার অন্তর্গত)

K = বিনিয়োজিত মূলধন

তত্ত্বের দিক হইতে এই মানদণ্ড যুক্তিসঙ্গত হইলেও বাস্তবে ইহার প্রয়োগ হইলে নানা অসুবিধার সৃষ্টি করিবে। প্রথমতঃ, সামাজিক প্রান্তিক উৎপাদনের ধারণাটি সুস্পষ্ট নয়। 'সামাজিক' শব্দটির সাহায্যে কি নির্দেশ করা হইয়াছে তাহা ঠিক বোঝা যায় না। বিনিয়োগের সামাজিক প্রান্তিক উৎপাদন নির্ধারণ করিতে হইলে বিনিয়োগ হইতে উৎপাদনের বর্তমান মূল্য ও তাহার

ব্যয় বিবেচনা করিতে হইবে। ব্যয়ের কথা বিবেচনা করিবার সময় শুধুমাত্র উদ্যোক্তার ব্যয় বিবেচনা করিলেই চলিবে না, সামাজিক ব্যয়ও চিন্তা করিতে হইবে ; যে ব্যয় সমাজ বহন করে কিন্তু উদ্যোক্তা করে না তাহাই সামাজিক ব্যয়, যেমন কারখানার ধোঁয়াজনিত অসুবিধা, কারখানার পরিত্যক্ত আবর্জনায় জল দূষিতকরণ ইত্যাদি। অনুরূপভাবে, উৎপাদনের কথা বিবেচনা করিবার সময় উদ্যোক্তা যে উৎপাদন পাইতেছে শুধুমাত্র তাহা না ভাবিয়া বাহ্যিক ব্যয়-সংকোচের দরুন সমাজ যে সুবিধা পাইতেছে তাহাও ভাবিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, বর্তমান বিনিয়োগ প্রচেষ্টা হইতে মোট উৎপাদন সর্বাধিক করিবার উপর জোর দেয় সামাজিক প্রান্তিক উৎপাদনের নীতি। উৎপাদন-উপাদানের হার বৃদ্ধিতে সম্পদ বন্টনের উপর কি প্রভাব তাহা এই নীতি আলোচনা করে না অর্থাৎ উদ্যোক্তার সম্প্রসারণ, শ্রমিকের গুণগত বা পরিমাণগত বৃদ্ধি বা দক্ষতা বৃদ্ধির উপর বন্টনের পরোক্ষ প্রভাব নির্দেশ করে না ; ইহা ভবিষ্যৎ সঞ্চয়-অভ্যাস বা ভবিষ্যতে ভোগ-প্রকৃতির উপর বিনিয়োগ বণ্টনের প্রভাব দেখায় না। বিনিয়োগ বন্টন পরোক্ষভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে কিন্তু এই তত্ত্বে তাহার কোন উল্লেখ নাই। অর্ধোন্নত দেশে শুধুমাত্র বর্তমান উৎপাদন সর্বাধিক করিবার কথা বিবেচনা করিলেই চলিবে না—অর্থনীতির উন্নয়ন হারও চিন্তা করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, প্রান্তিক ইউনিট এক ব্যবহার হইতে অন্য ব্যবহারে স্থানান্তর করিয়া মোট উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব না হইলেও, বহু সম্পদ এক ব্যবহার হইতে অন্য ব্যবহারে স্থানান্তরিত করিয়া মোট উৎপাদন বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। অর্ধোন্নত দেশে সাংগঠনিক পরিবর্তন উন্নত দেশের তুলনায় অনেক বেশী প্রয়োজন। সুতরাং এই সব দেশে প্রান্তিক নীতি অপেক্ষা সামগ্রিক নীতি (total analysis) অনেক বেশী প্রযোজ্য। এইজন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বিশেষজ্ঞদিগের অভিমত এই যে প্রদত্ত বিনিয়োগ হইতে সর্বাধিক উৎপাদন পাইতে হইলে পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষকে নিশ্চিত হইতে হইবে যে এক ব্যবহার হইতে প্রান্তিক মূলধন অথবা বিরাট পরিমাণ মূলধন অন্য ব্যবহারে নিয়োগ করিয়া মোট উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়।

চতুর্থতঃ, সামাজিক প্রান্তিক উৎপাদনের নীতি আয়-বন্টনের উপর বিনিয়োগ বন্টনের প্রভাব উপেক্ষা করে। আয়-বন্টন শুধুমাত্র সামাজিক দিক হইতেই যে মূল্যবান তাহা নহে—অর্থনীতির উপর উহার সুদূরপ্রসারী

প্রভাব আছে বলিয়া উহা উন্নয়নকেও প্রভাবিত করে ; যেমন আয়-বণ্টন সঞ্চয়কে প্রভাবিত করিয়া বিনিয়োগ হারকেও নিয়ন্ত্রণ করে।

পঞ্চমতঃ, এই মানদণ্ড ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধির উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু অনেক শিল্পের ক্ষেত্রেই কিছুদূর পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের নীতি কার্যকর হয়।

ইহা ব্যতীত এই নীতিটি ধরিয়া লইয়াছে যে উৎপাদনের কৃৎকৌশল অপরিবর্তিত থাকে এবং অর্থনীতিটির সহিত অন্য দেশের লেনদেন নাই ; কিন্তু বাস্তবে এরূপ অবস্থা কদাচিৎ দেখা যায়।

2) প্রতিদান হারের নীতি (Rate of Turnover Criterion) ঃ

প্রতিদান হারের নীতিটি বিভিন্ন নামে পরিচিত যেমন, মূলধন-প্রতিদান হার, (capital turnover), প্রতি ইউনিট মূলধনের সর্বাধিক উৎপাদন (maximization of output per unit of capital) অথবা মূলধনউৎপাদন অনুপাত (ratio of output to capital) ; প্রতিদান হারের নীতির আবিষ্কর্তা হইলেন পোলক (J. J. Polak) এবং বুকানন (N. S. Buchanon)। এই নীতির মূল কথা হইল উৎপাদনের সেই সকল ক্ষেত্রে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিতে হইবে যেখানে বিনিয়োগের তুলনায় উৎপাদন-মূল্য সর্বাধিক। এই নীতির যৌক্তিকতা এই যে অর্ধোন্নত দেশে মূলধন স্বল্প থাকায় উহা সেই ধরনের কৃৎকৌশল গ্রহণ করিবে যেখানে প্রতি ইউনিট মূলধন হইতে সর্বাধিক উৎপাদন পাওয়া যাইবে। অন্যভাবে বলা যায় যে উৎপাদন সর্বাধিক করিতে হইলে সেই সকল বিনিয়োগ প্রকল্প নির্বাচন করিতে হইবে যেখানে মূলধনের প্রতিদান সর্বাধিক (বা মূলধন-উৎপাদন অনুপাত কম)। মূলধন-উৎপাদন অনুপাত সর্বনিম্ন এরূপ দ্রুত ফলপ্রসূ বিনিয়োগ প্রকল্প নির্বাচন করিলে সীমিত মূলধন অন্য প্রকল্পে পুনঃ বিনিয়োগের জন্য শীঘ্রই পাওয়া যাইবে। এই ধরনের প্রকল্প অর্ধোন্নত দেশে প্রতি ইউনিট মূলধন হইতে সর্বাধিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে।

সাধারণতঃ, মূলধন প্রতিদানের হার মূলধনী দ্রব্যের তুলনায় ভোগ্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে অনেক বেশী। এই নীতি অনুসারে বিনিয়োগ নির্ধারিত হইলে ভোগ্য পণ্য শিল্প মূলধনী শিল্পের তুলনায় অগ্রাধিকার পাইবে। কিন্তু ভোগ্য পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ কেন্দ্রীভূত করিলে প্রাথমিক অবস্থায় উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলেও ভবিষ্যতে উন্নয়ন হার শ্লথগতি হইবে।

কোন বিনিয়োগ প্রকল্পে মূলধন-উৎপাদন অনুপাত কম হইলেই যে সর্বদা মোট মূলধন-উৎপাদন অনুপাত কম হইবে ইহা সত্য নয়। অনুরূপভাবে, মূলধন-উৎপাদন অনুপাত বেশী হইলেই যে সর্বদা মোট মূলধন-উৎপাদন অনুপাত বেশী হইবে ইহাও সত্য নয়; উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে রেলপথ, বিদ্যুৎ, জলসেচ ইত্যাদি শিল্পখাতে মূলধন-উৎপাদন অনুপাত খুব বেশী কিন্তু এইসব শিল্পখাতে মূলধন বিনিয়োগ করা হইলে যে বাহ্যিক ব্যয়সংকোচ ঘটিবে তাহা অন্যান্য শিল্পে মূলধন-উৎপাদন অনুপাত কমাইবে। সুতরাং উচ্চ মূলধন-উৎপাদন অনুপাত শিল্পে বিনিয়োগ করা হইলে মোট মূলধন-উৎপাদন অনুপাত কম হইবে।

কখনও কখনও অধিক হারে অবক্ষয়ের (depreciation) দরুন প্রতিদান হার উচ্চ হইলেও নীট উৎপাদন খুব বেশী নাও হইতে পারে। নীতিটির এই ত্রুটি সংশোধন করিতে হইলে নীট প্রতিদানের হার বিবেচনা করিতে হইবে। শুধুমাত্র সুরুতে নয়—সমগ্র উৎপাদন কালে অতিরিক্ত বিনিয়োগ হইতে যে উৎপাদন লাভ করা যায় তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। দীর্ঘকালে মূলধন-প্রতিদান কম এমন যে সব শিল্প ক্রমহ্রাসমান বিধির অধীন তাহারা মূলধন-প্রতিদান বেশী এরূপ যে সব শিল্প ক্রমবর্ধমান বিধি বা সমহার বিধির অধীন তদপেক্ষা বেশী উৎপাদন করিতে পারে।

অধ্যাপক ক্লায়েন (Klien) অর্থনীতিকে সাধারণ জ্ঞানের জটিল রূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সাধারণ জ্ঞানের ভিত্তিতে বলা যায়, যে দেশে শ্রমিক সহজলভ্য কিন্তু মূলধন দুষ্প্রাপ্য সেখানে মূলধন-স্বল্প প্রকল্প গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত কিন্তু মৌল উপকাঠামো নির্মাণ করিয়া উন্নয়ন হারকে ত্বরান্বিত করিবার জন্য মূলধন-প্রগাঢ় প্রকল্প গ্রহণ করাও অপরিহার্য। উন্নয়ন পরিকল্পনায় ভারত ও অন্যান্য বিকাশমান দেশগুলিকে সঠিক দ্বৈত বিনিয়োগ নীতি গ্রহণ করিতে হইবে।

(3) **পুনর্বিনিয়োগ নীতি** (Reinvestment Criterion): এই নীতিটির প্রবক্তা হইলেন গ্যালেনসন্ (W. Galenson) এবং লিবেনষ্টাইন (H. Leibenstein)। পুনর্বিনিয়োগ নীতিটি সর্বাধিক উদ্বৃত্ত নীতি (Maximum Surplus). এবং প্রান্তিক মাথাপিছু বিনিয়োগ ভাগফল নীতিও (marginal per capita investment quotient) বলা হয়। শ্রমিক-পিছু নীট উৎপাদন হইতে শ্রমিক পিছু ভোগ বাদ দিলে প্রান্তিক মাথাপিছু বিনিয়োগ

ভাগফল পাওয়া যাইবে। গ্যালেনসন ও লিবেনষ্টাইন বর্তমানের পরিবর্তে ভবিষ্যতে মাথাপিছু উৎপাদন সর্বাধিক করিবার উপর জোর দিয়াছেন। যদি সঞ্চয় হার সর্বাধিক হয় এবং আয় পুনর্বিনিয়োজিত হয় তবেই ইহা সম্ভব হইবে। এই তত্ত্বে বলা হইয়াছে যে জাতীয় আয় মজুরী ও মুনাফার মধ্যে বন্টিত হয় এবং মজুরীলব্ধ আয় ভোগের জন্য ব্যয় হয় আর মুনাফা বিনিয়োগের জন্যে সঞ্চিত হয়। সুতরাং বলা যায় যে মুনাফার পরিমাণ যত বেশী হইবে সঞ্চয়ের হার তত বেশী হইবে; ইহার ফলে মাথাপিছু মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, উৎপাদনবৃদ্ধির হার উচ্চ হইবে এবং ভবিষ্যতে মাথাপিছু উৎপাদন সর্বাধিক হইবে। উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে একান্ত প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন প্রচেষ্টা প্রয়োজন যাহার দরুন জাতীয় আয়ে মুনাফার অনুপাত বৃদ্ধি পাইবে এবং মাথাপিছু ভোগ নিয়ন্ত্রণ করা যাইবে। ইহার দরুন সঞ্চয় বাড়িবে আর সেইসঙ্গে বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পাইবে। বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্ত নির্ধারণের জন্যে গ্যালেনসন ও লিবেনষ্টাইন এই সূত্রটি বাহির করিয়াছেন:

$$r = \frac{p - e.w}{c}$$

এখানে r = বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্ত হার

p = মেশিনপিছু উৎপাদন

e = মেশিনপিছু শ্রমিক সংখ্যা

w = প্রকৃত মজুরী হার

c = মেশিনবাবদ ব্যয়

r বৃদ্ধি করিতে হইলে p-কে বাড়াইতে হইবে এবং c-এর তুলনায় $e.w$-কে কমাইতে হইবে।

মূলধন হইতে মোট উৎপাদন, মাথাপিছু উৎপাদন এবং মাথাপিছু বিনিয়োগ-যোগ্য উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি করিতে হইলে—এমন কি যে দেশে মূলধন সীমিত এবং শ্রম অধিক সেখানেও—মূলধন-প্রগাঢ় কৃৎকৌশল প্রয়োগ করিতে হইবে। মূলধন-প্রগাঢ় কৃৎকৌশল গ্রহণ করিলে আয়ের অধিক অনুপাত মুনাফার ক্ষেত্রে প্রবাহিত হইবে আর কম অনুপাত মজুরীখাতে প্রবাহিত হইবে। সুতরাং প্রাথমিক আয়ের অধিক অনুপাত মুনাফার মাধ্যমে বিনিয়োজিত হইবে। যদিও শ্রম-প্রগাঢ় কৃৎকৌশল স্বল্পকালীন সময়ে কম শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে কিন্তু দীর্ঘকালীন সময়ে উহা অনেক বেশী শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করিবে এবং ওই সময়ে উন্নয়নহার দ্রুততর হইবে।

এই নীতির প্রবক্তাদের মতে মূলধন-শ্রমিক অনুপাত সর্বোচ্চ করিয়া পুনর্বিনিয়োগ হার সর্বাধিক করা যায়।

এই তত্ত্বটিকে নানাভাবে সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথমতঃ নীতিটি এই অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত যে সময়ান্তরে ভোগ সমান থাকে; কিন্তু বস্তুতঃ ইহা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। অধ্যাপক অমর্ত্য সেন বলেন যে, কর্মসংস্থান বাড়িলে ভোগও বাড়িবে এবং বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্ত কম হইবে, ফলে উন্নয়ন হার ব্যাহত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, এই তত্ত্বে অনুমান করা হইয়াছে যে মজুরীর সমস্তটাই ভোগ করা হয় আর মুনাফার সবটাই বিনিয়োগ করা হয় যাহা সর্বদা সত্য নয়। মজুরীহার বাড়িলে শ্রমিকদের অবস্থা ভালো হইবে ফলে তাহাদের পক্ষেও কিছু সঞ্চয় করা সম্ভব হইবে। আবার মুনাফার সমস্তটাই বিনিয়োজিত না হইয়া উহার কিয়দংশ বিলাসভোগে ব্যয়িত হইতে পারে। তৃতীয়তঃ, ইহা মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্ববিরোধী। মূলধনবিনিয়োগ ক্রমাগত বাড়িতে থাকিলে এমন একসময় আসিবে যখন উৎপাদন কমিতে থাকিবে; ইহার অর্থ হইল মাথাপিছু উৎপাদন এবং বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্ত হ্রাস পাইবে। চতুর্থতঃ, অটো একিস্টাইন (Otto Eckestein) বলেন যে পরিকল্পিত বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে পুনর্বিনিয়োগ নীতির উপর নির্ভর না করিয়া ফিসক্যাল পদ্ধতির সাহায্যে সঞ্চয়মুখী আয়বণ্টন সৃষ্টি করিয়া বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা শ্রেয়। পরিশেষে, এই নীতি সামঞ্জস্যহীন কারণ ইহা বিনিয়োগের উপর বাণিজ্য-ব্যালান্সের প্রভাব বিশ্লেষণ করে না। ইহা ভোগের গুরুত্ব অগ্রাহ্য করে এবং উহা কমাইবার সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে। কিন্তু ভবিষ্যতে ভোগের তুলনায় বর্তমান ভোগ অধিকতর প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে এবং সমাজের স্বার্থে বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্ত হ্রাস করা প্রয়োজন হইতে পারে। মূলধনী দ্রব্যের স্বার্থে ভোগ্য পণ্যের উৎপাদন উপেক্ষা করিলে পরিণামে উহার ফলাফল ক্ষতিকারক হইতে পারে; ইহার ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ঘাটতি, মুদ্রাস্ফীতি এবং সামাজিক অসন্তোষ ব্যাপক আকার ধারণ করিতে পারে।

(4) **কর্মসংস্থান বৃদ্ধির নীতি** (Employment Absorption Criterion): অর্ধোন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য হইল মূলধনের অভাব এবং উদ্বৃত্ত শ্রমিকের প্রাচুর্য। এই সকল দেশে প্রভূত বেকার ও আধাবেকার শ্রমিক থাকায় উদ্বৃত্ত জনশক্তির পরিপূর্ণ ব্যবহার করিয়া যথেষ্ট উৎপাদন বৃদ্ধির অবকাশ

আছে। কর্মসংস্থান বৃদ্ধির নীতি এরূপ এক কৃৎকৌশল গ্রহণ করিতে নির্দেশ দেয় যাহাতে অধিক শ্রমিক এবং কম মূলধন প্রয়োজন হয়।

শ্রম-প্রগাঢ় মূলধন-স্বল্প কৃৎকৌশল গ্রহণ করিলে উৎপাদন যে সর্বাধিক হইবে ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কখন কখন শ্রম-প্রগাঢ় কৃৎকৌশল মূলধন-প্রগাঢ় কৃৎকৌশল অপেক্ষা কম উৎপাদন সৃষ্টি করে। উৎপাদনের পরিমাণ উপেক্ষা করিয়া যদি কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করাই একমাত্র উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মানদণ্ড আদর্শ হইতে পারে। বস্তুতপক্ষে, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি স্বয়ং কোন উদ্দেশ্য নয়—উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যই উহার প্রয়োজন। শ্রম-প্রগাঢ় কৃৎকৌশল তখনই গ্রহণ করা যাইবে যখন উহা উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। মূলধন-সঞ্চয়ী শ্রম-প্রগাঢ় কৃৎকৌশল নির্বাচন করা হইলে শ্রমিকের উৎপাদন চিরকালই স্বল্প থাকিয়া যাইবে। অধিকন্তু বিনিয়োগহার সর্বাধিক করা হইলে অদূর ভবিষ্যতে অধিক শ্রমিকের কর্মসংস্থান হইতে পারে।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অধিকাংশ দেশের পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ বিনিয়োগ মানদণ্ড সম্পর্কে যে বিশাল সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টিপাত করে না এবং সাধারণ বুদ্ধি ও রাজনৈতিক অগ্রাধিকার বিবেচনা করিয়া বিনিয়োগ করে। ইহার কতকগুলি কারণ আছে। সম্পদ বণ্টনের মানদণ্ড সম্পর্কে সকলে একমত হয় না। বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন মানদণ্ড সমর্থন করায় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। পরিকল্পনা রচনার দায়িত্ব থাকে যেসব মন্ত্রীদের উপর প্রায় ক্ষেত্রে তাহাদের কোনরূপ প্রশিক্ষণ থাকে না, পড়িবার মত সময় বা মানসিকতা থাকে না। বিনিয়োগ বিচারের তাত্ত্বিক আলোচনায় টেকনিক্যাল শব্দ, অংকশাস্ত্রের ব্যবহার এবং উচ্চ পর্যায়ের বিমূর্ত বিশ্লেষণ প্রয়োগ করা হয়। বাস্তবে যে সব ব্যক্তি বা মন্ত্রী পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িত থাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এইসব তত্ত্ব তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধির উর্ধ্বে। ইহাছাড়া, অনেক সময় বিনিয়োগ মানদণ্ড রচনার সময় উহার প্রবক্তারা উহার বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব কিনা সে কথা চিন্তা করেন না। আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার বিশেষজ্ঞেরা যথার্থই বলিয়াছেন যে সাম্প্রতিক কালে অর্থনৈতিক সাহিত্যের পৃষ্ঠায় অনুন্নত দেশে বিনিয়োগ মানদণ্ড সম্পর্কে যে বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার ব্যবহারিক মূল্য বিশেষ কিছুই নাই। ইহা ব্যতীত বিনিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত সব সময়ে আর্থনীতিক মানদণ্ডের বিচারে হয় না—সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক বিষয়ও বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়।

কৃৎকৌশল নির্বাচন (Choice of Technique) :

দ্রুত উন্নয়নে আগ্রহী বিকাশমান দেশের সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল দুইটি—সীমিত সম্পদ উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিভাবে বিনিয়োগ করা হইবে আর কি ধরনের কৃৎকৌশল গ্রহণ করা হইবে। বিনিয়োগ বিচারের মানদণ্ড লইয়া পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে এখন আমরা দ্বিতীয় সমস্যাটির বিশ্লেষণ করিব।

ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদেরা মনে করিতেন যে অবাধ দামব্যবস্থার কার্যকারিতার দরুন বিভিন্ন ব্যবহারে সম্পদের কাম্য বণ্টন হইবে আর ইহার ফলে জাতীয় আয় সর্বোচ্চ হইবে। বিনিয়োগের উপর হস্তক্ষেপ করিলে উহা জাতীয় আয়ের কাম্য প্রসার ব্যাহত করিবে; কিন্তু বস্তুতপক্ষে ইহা সত্য নয়। অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে বিনিয়োগে হস্তক্ষেপ করিয়া যদি উহাকে সঠিক পথে পরিচালিত করা যায় তাহা হইলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে। অর্ধোন্নত দেশে শ্রমিকের যোগান বিশেষভাবে স্থিতিস্থাপক কিন্তু মূলধনের যোগান অস্থিতিস্থাপক। প্রাপ্ত সম্পদের কথা মনে রাখিয়া এরূপ এক কৃৎকৌশল গ্রহণ করিতে হইবে যাহাতে সম্পদের পরিপূর্ণ ও সর্বোত্তম ব্যবহার সম্ভব হয়।

কৃৎকৌশল নির্বাচন বলিতে বোঝায় উৎপাদন-উপকরণগুলির-শ্রম ও মূলধন—কিরূপ সংযোগসাধন হইবে। উৎপাদন কার্যে এক নির্দিষ্ট অনুপাতে শ্রম ও মূলধনের সংমিশ্রণকে কৃৎকৌশল বলে। প্রধানতঃ, দুই ধরণের কৃৎকৌশলের কথা আমরা চিন্তা করিতে পারি—শ্রম-প্রগাঢ় কৃৎকৌশল অথবা মূলধন-প্রগাঢ় কৃৎকৌশল। অর্ধোন্নত দেশগুলির সামনে প্রশ্ন হইল সঠিক কৃৎকৌশল নির্বাচন—অর্থাৎ এরূপ এক উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হইবে যাহা বিকল্প পদ্ধতি অপেক্ষা শ্রেয়। কৃৎকৌশল সুদক্ষ হইলে উৎপাদনব্যয় ন্যূনতম হইবে অথবা প্রদত্ত উপকরণ হইতে সর্বাধিক উৎপাদন পাওয়া যাইবে।

কৃৎকৌশল নির্বাচনের পূর্বে সম্পদ বণ্টনের চরম উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। সাধারণভাবে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলির কথা বলা হয় :

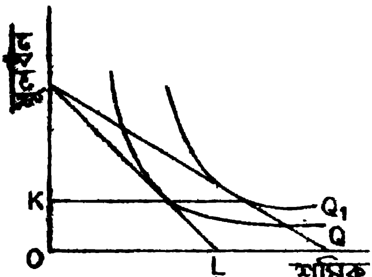
(১) মাথাপিছু উৎপাদন বা জাতীয় আয় সর্বাধিক করা,

(২) আয় ও সম্পদ বণ্টনে অসমতা হ্রাস করা।

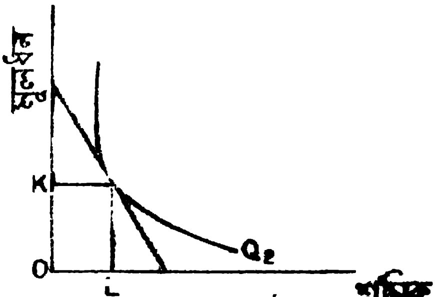
(৩) মাথাপিছু ভোগ সর্বাধিক করা।
(৪) কর্মসংস্থান সর্বাধিক করা।
(৫) বাণিজ্য ব্যালান্সে সমতা আনয়ন করা।

বিকাশমান দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনায় সীমিত মূলধন বন্টনের ব্যাপারে কয়েকটি প্রশ্ন দেখা দেয়—উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কি পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করা হইবে এবং কি ধরনের কৃৎকৌশল গ্রহণ করা হইবে। বিনিয়োগ বিচার করিবার জন্যে যে সকল মানদণ্ডের উদ্ভব হইয়াছে পূর্বেই তাহাদের আলোচনা করা হইয়াছে।

যে কৃৎকৌশল গ্রহণ করিয়া সমান মূলধন ব্যবহার করিয়া অধিক উৎপাদন পাওয়া যাইবে তাহাই উত্তম কারণ তাহা হইলেই মাথাপিছু উৎপাদন সর্বাধিক হইবে। নিচের রেখাচিত্রের সাহায্যে ইহা ব্যাখ্যা করা হইল :



শ্রমপ্রগাঢ় কৃৎকৌশল.



মূলধন-প্রগাঢ় কৃৎকৌশল

প্রাথমিক অবস্থায় Q সম-উৎপাদন রেখা (isoquant) দ্বারা উৎপাদন নির্দেশ করা হইতেছে ; OK পরিমাণ মূলধন এবং OL পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করিয়া যে উৎপাদন পাওয়া যাইতেছে তাহা সম-উৎপাদন রেখা Q দ্বারা দেখান হইতেছে। সমান মূলধন ও অধিক শ্রমিকের সংমিশ্রণ করিয়া আর একটি নূতন কৃৎকৌশল সৃষ্টি করা হইল এবং যে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইল তাহা Q_1 রেখার সাহায্যে দেখান হইল। দুইটি কৃৎকৌশলের মধ্যে প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টি অর্ধোন্নত দেশের পক্ষে উত্তম কারণ সমপরিমাণ মূলধন ব্যবহার করিয়া অধিক উৎপাদন ও অধিক শ্রমিকের কর্মসংস্থান করা সম্ভব হইতেছে।

বিকল্প কৃৎকৌশল হইল মূলধন-প্রগাঢ়। উন্নত ও আধুনিক কৃৎকৌশল মূলধন-প্রগাঢ় বলিয়া বিকাশমান দেশগুলি উহা গ্রহণ করিতে অসমর্থ। এই সকল দেশের পক্ষে সঠিক কৃৎকৌশল হইবে Q_1 নয়—Q ; কিন্তু উন্নত দেশ-

গুলিতে মূলধনের যোগান স্থিতিস্থাপক বলিয়া তাহারা (দ্বিতীয় রেখাচিত্রে প্রদর্শিত) Q_2 কৃৎকৌশল গ্রহণ করিবে। ইহা OL শ্রমিক ও OK মূলধন ব্যবহার করিবে। এই ক্ষেত্রে উৎপাদন Q_2— উহা Q_1 অপেক্ষা অধিক। (Q_2 রেখা Q_1 এই উর্ধে বলিয়া ধরা হইয়াছে)

শ্রম-প্রগাঢ় কৃৎকৌশলের সপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি দেখান হয়: প্রথমতঃ, কর্মসংস্থানের যুক্তি; অর্ধোন্নত দেশগুলিতে বিপুল পরিমাণ বেকার শ্রমিক দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রম-প্রগাঢ় কৃৎকৌশল গ্রহণ করিয়া অধিক-সংখ্যক বেকার শ্রমিকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রম-প্রগাঢ় কৃৎকৌশল গ্রহণ করিয়া কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা হইলে যে মোট আয় সৃষ্টি হইবে তাহা অধিক সংখ্যক জনগণের মধ্যে বন্টিত হইবে। ইহার দরুণ সামাজিক গঠন অধিকতর সমাজতান্ত্রিক হইবে।

তৃতীয়তঃ, শ্রম-প্রগাঢ় কৃৎকৌশল গ্রহণ করিলে সুপ্ত সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ ঘটিবে। অর্ধোন্নত দেশে মূলধন এবং ঝুঁকি গ্রহণেচ্ছু উদ্যোক্তার বিশেষ অভাব। সুতরাং যদি শ্রম-প্রগাঢ় কৃৎকৌশল গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে সীমিত সম্পদগুলির সর্বোত্তম ব্যবহার হইতে পারিবে।

চতুর্থতঃ, শ্রম-প্রগাঢ় কৃৎকৌশলের জন্য বিদেশ হইতে দামী যন্ত্রপাতি আমদানীর বিশেষ প্রয়োজন হয় না। এই ধরনের কৃৎকৌশলের জন্য যে সব সরল যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় সেগুলি দেশেই পাওয়া যায়, বাহির হইতে আমদানীর বিশেষ প্রয়োজন হয় না; সুতরাং এই পদ্ধতি গ্রহণ করিলে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হয়।

পঞ্চমতঃ, মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধে শ্রম-প্রগাঢ়-কৃৎকৌশল বিশেষ কার্যকর। শ্রম-প্রগাঢ় কৃৎকৌশল গ্রহণ করিয়া ভোগ্যপণ্যের যোগান দ্রুত বাড়াইয়া মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব খর্ব করা যায়।

ষষ্ঠতঃ, শ্রম-প্রগাঢ় কৃৎকৌশল হইতে বিকেন্দ্রীকরণের সুবিধা পাওয়া যায়। সাধারণতঃ গ্রাম ও ছোট ছোট শহরে উৎপাদন কাজে এই কৃৎকৌশল গ্রহণ করা হয়। অর্থ ও সম্পদ মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে কেন্দ্রীভূত না হইয়া সারা দেশে ছড়াইয়া পড়ে। এই ধরনের কৃৎকৌশলের সাহায্যে কারখানা ব্যবস্থার আনুষঙ্গিক অসুবিধা পরিহার করা যায়।

এইবার মূলধন-প্রগাঢ় কৃৎকৌশলের সুবিধাগুলি আলোচনা করা হইল।

অধিকাংশ অর্থনীতিবিদই শ্রম-প্রগাঢ় কৃৎকৌশলের পরিবর্তে মূলধন-প্রগাঢ়

আধুনিক কৃৎকৌশলের সমর্থক। গ্যালেনসন ও লাইবেনস্টাইন বলেন, অর্থোন্নত দেশে সার্থক অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে আধুনিক কৃৎকৌশল কতোদুর পর্যন্ত গ্রহণ করা যায় তাহার উপর। আধুনিক কৃৎকৌশলের সুবিধাগুলি নিম্নলিখিতরূপঃ

প্রথমতঃ, উৎপাদনে মূলধন-প্রগাঢ় কৃৎকৌশল গ্রহণ করা হইলে যে আয় উদ্ভূত হইবে তাহার অধিক অনুপাত উদ্যোক্তা পাইবে আর শ্রমিক পাইবে কম অনুপাত। উদ্যোক্তাদিগের সঞ্চয়প্রবণতা অধিক বলিয়া, সঞ্চয় ও সেই সঙ্গে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে; এইভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুততর হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, মূলধন-প্রগাঢ় কৃৎকৌশল গ্রহণ করিলে উন্নয়ন হার দ্রুততর হইবে আর সেই কারণে দীর্ঘকালীন সময়ে অধিক পরিমাণ শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হইবে।

তৃতীয়তঃ, অধিকাংশ অর্থোন্নত দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খুব উচ্চ বলিয়া মূলধন-শ্রম অনুপাত উচ্চ না হইলে মাথাপিছু উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে না। জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চ হাব মূলধন গঠনের হারকে ব্যাহত করে। উন্নয়নের হার বৃদ্ধি করিতে হইলে মূলধন-প্রগাঢ় কৃৎকৌশল গ্রহণ করা অপরিহার্য।

চতুর্থতঃ, অর্থোন্নত দেশগুলিতে মূলধনের পরিমাণ কম বলিয়া তাহার অবক্ষয় ও অকেজো হওয়ার দরুণ উহার অপচয় বরদাস্ত করিতে পারে না; মূলধন-প্রগাঢ় কৃৎকৌশল খুব তাড়াতাড়ি অকেজো হয় না বলিয়া এই ধরনের কৃৎকৌশলই অর্থোন্নত দেশের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

পঞ্চমতঃ, মূলধন-প্রগাঢ়-উৎপাদন পদ্ধতি শ্রম-প্রগাঢ় উৎপাদন-পদ্ধতি অপেক্ষা অধিকতর লাভজনক কারণ মূলধন-প্রগাঢ় পদ্ধতির ক্ষেত্রে ব্যয়ের তুলনায় উৎপাদন অতি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। উৎপাদনের বহরজনিত ব্যয়-সংকোচের জন্য ইহা ঘটিয়া থাকে।

ষষ্ঠতঃ, মূলধন-প্রগাঢ় কৃৎকৌশল ব্যবহার করিলে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাইবে ও সেইসঙ্গে উৎপাদিত পণ্যের উৎকর্ষ সাধিত হইবে। ব্যয় হ্রাস পাইলে দাম কমিবে আর উহার দরুণ জীবনযাত্রার মান উন্নত হইবে।

সপ্তমতঃ, মূলধন-প্রগাঢ় কৃৎকৌশল অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। বহু-সংখ্যক শ্রম-প্রগাঢ় প্রকল্প অর্থনীতির উপর যে প্রভাব বিস্তার করে কয়েকটি মূলধন-প্রগাঢ় প্রকল্পের সামগ্রিক প্রভাব তাপেক্ষা অনেক বেশী। সরকার যখন একটি বিশাল ইস্পাত কারখানা বা জলবিদ্যুৎ

কেন্দ্র স্থাপন করে তখন যাহাতে এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ না হয় সে সম্পর্কে সে বিশেষ ভাবে সতর্ক থাকে। কিন্তু যদি ওই পরিমাণ মূলধনই বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হয় তখন তাহার সেই সতর্কতা থাকে না।

পরিশেষে, হারস্‌ম্যান বলেন যে মূলধন-প্রগাঢ় কৃৎকৌশল দক্ষতা বৃদ্ধিতে এবং ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণের সহায়তা করে। অন্যভাবে বলা যায় দক্ষতা গঠনে উন্নত কৃৎকৌশলের অবদান কম নয়। অর্ধোন্নত দেশে মৌল উপকাঠামো গঠনের জন্য প্রভূত মূলধন বিনিয়োগ অপরিহার্য।

দুই ধরনের কৃৎকৌশলের সুবিধা বিশ্লেষণ করিয়া অর্ধোন্নত দেশে কি ধরনের কৃৎকৌশল গ্রহণযোগ্য তাহা নির্ধারণ করা কঠিন। আসলে কৃৎকৌশল দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের নয়। শ্রম-প্রগাঢ় কৃৎকৌশল দেশে অচিরে উৎপাদন এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করিবে, অপরপক্ষে, মূলধন-প্রগাঢ় কৃৎকৌশল মূলধন গঠনের হার বৃদ্ধি করিয়া দীর্ঘকালীন সময়ে কর্মসংস্থান ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবে। অর্ধোন্নত দেশে শ্রম-প্রগাঢ় কৃৎকৌশল নির্বাচনের সময় অন্য অনেক বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে, যেমন উভয় পদ্ধতির তুলনামূলক ব্যয়, বিভিন্ন সময়ে কর্মসংস্থান, আয়, সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের উপর কৃৎকৌশলের প্রভাব, বাণিজ্য-ব্যালান্স, মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদি। শ্রম-প্রগাঢ় কৃৎকৌশল গ্রহণ করিলে পণ্যের উৎপাদন ব্যয় মূলধন-প্রগাঢ় কৃৎকৌশলের তুলনায় বেশী হইবে কারণ প্রথম পদ্ধতির ক্ষেত্রে বহরজনিত বিশেষ সুবিধা পাওয়া যাইবে না। অবশ্য এই যুক্তিতে পরিকল্পনা রচয়িতারা শ্রম-প্রগাঢ় কৃৎকৌশল অগ্রাহ্য করিতে পারে না কারণ এইক্ষেত্রে সীমিত মূলধনের সর্বোত্তম ব্যবহার সম্ভব হইবে। শ্রম-প্রগাঢ় পদ্ধতি কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে, ভোগ্যপণ্যের যোগান বাড়াইয়া মুদ্রাস্ফীতিকে দমন করে, বিদেশ হইতে খাদ্য, যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানীর বিশেষ প্রয়োজন না হওয়ায় বাণিজ্য-ব্যালান্স অনুকূল থাকে। কিন্তু এই পদ্ধতির অসুবিধা এই যে মূলধন-প্রগাঢ় পদ্ধতির ন্যায় ইহা অতি দ্রুত হারে উন্নয়ন করিতে পারে না। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে শ্রম-প্রগাঢ় কৃৎকৌশল এবং মূলধনী দ্রব্যের ক্ষেত্রে মূলধন-প্রগাঢ় কৃৎ-কৌশল গ্রহণ করাই অর্ধোন্নত দেশের পক্ষে সুবিধাজনক।

অনুশীলনী

১। অর্ধোন্নত দেশ বলিতে কি বুঝ? উহার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

২। অর্ধোন্নত দেশের উন্নয়নসংক্রান্ত সমস্যাগুলি কি কি?

৩। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে মূলধন প্রয়োজন তাহার উৎসগুলি কি কি?

৪। অর্ধোন্নত দেশে দ্রুত উন্নয়নের জন্য তুমি সুষম অথবা অসম উন্নয়ন কৌশলের কোনটি গ্রহণ করিবে?

৫। উন্নয়নের জন্য যে বিনিয়োগ করা হইবে তাহা বিচারের জন্য তুমি কোন মানদণ্ড গ্রহণ করিবে?

৬। অর্ধোন্নত দেশে সীমিত সম্পদের সুষম বণ্টনের জন্য কোন্ কৃৎ-কৌশল (Choice of Technique) গ্রহণ করা উচিত বলিয়া তুমি মনে কর?

৭। শ্রম-প্রগাঢ় অথবা মূলধন-প্রগাঢ় কৃৎকৌশলের কোন্‌টি গ্রহণ করিলে ভারতের উন্নয়ন দ্রুততর করা যাইবে?

৮। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে শ্রম-প্রগাঢ় কৃৎকৌশল মূলধন-প্রগাঢ় কৃৎকৌশলের তুলনায় অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলিয়া তুমি মনে কর।

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন

(Planned Economic Development in India)

পরিকল্পনা কি ? (What is

'পরিকল্পনা' শব্দটি বর্তমানে বিশেষভাবে জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে এবং পৃথিবীর সর্বত্র ইহার অনুকূলে জনমত গড়িয়া উঠিতেছে। আজ জাতীয় পরিকল্পনা জাতীয় সঙ্গীত ও জাতীয় পতাকার মতো রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা ও আধুনিকতার অভ্রান্ত প্রতীক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আধ্যাত্মিক জগতে ঈশ্বরের যে স্থান, অর্থনৈতিক জগতে পরিকল্পনার সেই স্থান।

উনবিংশ শতকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা মনে করিতেন যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জন এবং অবাধ প্রতিযোগিতার দরুন সমাজের সর্বাধিক জনসমষ্টির সর্বাধিক মঙ্গল হইবে। অবিমিশ্র ধনতন্ত্রের সমর্থকগণ পরিকল্পনায় আস্থাশীল নন কারণ পরিকল্পনা অবাধ প্রতিযোগিতার পথে বাধার সৃষ্টি করে। অধ্যাপক হ্যারিস বলিয়াছেন যে অবিমিশ্র ধনতন্ত্রে পরিকল্পনার কোন স্থান নাই কারণ ক্রেতার সার্বভৌমত্ব, দামব্যবস্থার প্রভুত্ব এবং মুনাফার সন্ধানধ—নতন্ত্রের এই ত্রিবিধ নীতিকে পরিকল্পনা অস্বীকার করে। অবশ্য বর্তমান পৃথিবীতে কোথাও অবিমিশ্র ধনতন্ত্র নাই। সর্বত্রই ধনতন্ত্রকে সংস্কার করিয়া মিশ্র অর্থব্যবস্থা (mixed economy) গঠনের প্রবণতা দেখিতে পাওয়া যায়। ধনতন্ত্র, সমাজ-তন্ত্র অথবা ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রে পরিকল্পনার স্থান আছে।

পূর্বনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অর্থনৈতিক কার্যে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপই হইল পরিকল্পনা। পূর্ব হইতে উপায় ও অপায় চিন্তা করিয়া কাজ করিলে তবেই দ্রুত লক্ষ্যস্থলে পৌছানো যায়। অধ্যাপক ডিকিনসন বলেন সমগ্র অর্থব্যবস্থা সামগ্রিক ভাবে পর্যালোচনা করিয়া নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কতখানি উৎপাদন হইবে, কি উৎপাদন হইবে এবং কাহার জন্য উৎপাদন হইবে এ সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই হইল অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। হেইক (Hayek) বলেন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা হইল কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্থনৈতিক কার্যাবলীর পরিচালনা। শ্রীমতী বার্বারা উটন (Wooton) বলেন পরিকল্পনা হইল কোন

সরকারী কর্তৃপক্ষের দ্বারা স্বেচ্ছায় এবং সচেতনভাবে অর্থনৈতিক কাজগুলির মধ্যে কতকগুলিকে বাছিয়া লইয়া অগ্রাধিকার প্রদান করা। রবিনসনের মতে উৎপাদন এবং বিনিময়-সংক্রান্ত বেসরকারী কার্যাবলীর উপর যৌথ বা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের নামই পরিকল্পনা। শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের উপর ব্যবসাবাণিজ্যের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছাড়িয়া দিয়া সরকার যদি নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকে তাহা হইলে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়ার কোন আশা নাই। সুনির্দিষ্ট কার্যসূচী অনুসারে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্থনৈতিক কার্যাবলী পরিচালনা করিয়া অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানবিক উন্নতি সাধন করাই হইল পরিকল্পনার লক্ষ্য।

কেন পরিকল্পনা করা হয়? (Why Plan) : বর্তমান যুগ পরিকল্পনার যুগ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, বিশেষ করিয়া ভারতের মতো অর্ধোন্নত দেশ পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের চেষ্টা করিতেছে। অধ্যাপক লুইস যথার্থই বলিয়াছেন যে মুষ্টিমেয় উন্মাদপ্রকৃতির লোক ব্যতীত আজ আর কেহই পরিকল্পনার বিরোধিতা করে না। পরিকল্পনাসংক্রান্ত আলোচনায় পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা আজ আর বিতর্কের বিষয় নয়—উহা কি আকার গ্রহণ করিবে তাহাই মুখ্য আলোচনার বিষয়। ইউরোপ ও আমেরিকার উন্নত দেশের যে সকল লেখক নিজ দেশে পরিকল্পনার তীব্র সমালোচনা করেন তাঁহারাই অর্ধোন্নত দেশের জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। অধ্যাপক জ্যাকব ভাইনার বলেন, যে দেশে জনসাধারণ দরিদ্র, অশিক্ষিত এবং নিয়তি-নির্ভর জীবনদর্শনে আস্থাশীল হওয়ার দরুণ স্বীয় প্রচেষ্টায় অবস্থার পরিবর্তনে বিশ্বাস করে না সেই দেশে সরকারকে উদ্যোগী হইতে হইবে এবং উপর হইতে পরিকল্পনা চাপাইতে হইবে। পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য সমর্থন করা হয়।

প্রথমতঃ, অনিয়ন্ত্রিত ধনতন্ত্রের কুফল দূর করিবার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। উনবিংশ শতকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মূল নীতি ছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বাদ। এই মতবাদের মূল কথা হইল রাষ্ট্র শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃংখলা রক্ষা করিবে এবং বহিঃশত্রুর হাত হইতে দেশকে রক্ষা করিবে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবে না, সর্বত্র অবাধ প্রতিযোগিতা চলিবে। প্রতিযোগিতার দরুন স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে চাহিদা ও যোগানের ঘাত প্রতিঘাতে সকল শক্তিসমূহ এক আদর্শ ভারসাম্য অবস্থায় আসিবে এবং এই অবস্থায়

সমাজের সর্বাধিক জনসংখ্যার মহত্তম কল্যাণ সাধিত হইবে। ব্যক্তিগত মালিকানার প্রসারে একদিকে যেমন ব্যক্তির কল্যাণ সাধিত হইবে অপর দিকে সেইরূপ সমাজের কল্যাণ সাধিত হইবে।

কিন্তু আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে ব্যক্তিগত মালিকানা ও অবাধ প্রতিযোগিতার দরুন সমাজের সর্বাধিক কল্যাণ সাধিত হয় নাই। এই ব্যবস্থায় মুনাফা অর্জনই মুখ্য উদ্দেশ্য—সমাজকল্যাণ গৌণ। নিয়ন্ত্রণ ব্যতিরেকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ভারসাম্যে উপনীত হইবে বলিয়া দাবী করা হয় বাস্তব জীবনে তাহা অলীক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। অপরিকল্পিত অর্থব্যবস্থার কুফল আজ সর্বজনবিদিত। আর্থনীতিক ব্যবস্থা যে আপনা আপনি পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে ভারসাম্যে উপনীত হয় না তাহা বাস্তব ঘটনা। অনিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতার দরুন এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির উৎপাদন কর্মসূচীর সংবাদ রাখে না বলিয়া কোথাও প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপাদন হয় আবার কোথাও প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদন কম হয়। চাহিদা ও যোগানের শক্তির উপর অর্থব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিলে উহাদের অবাধ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে উৎপাদনের উপাদানগুলির কাম্য বণ্টন বা ব্যবহার হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। এই অবস্থায় ধনসম্পদ ধনীলোকের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে বলিয়া বিলাস-সামগ্রীর উৎপাদনে দেশের সম্পদ নিযুক্ত হয় এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদিত হইতে পারে না। বাণিজ্যচক্রের আবর্তনে অর্থনৈতিক বনিয়াদ বারবার বিপর্যস্ত হয়। পরিকল্পনার মাধ্যমে সমাজে ধনবৈষম্য হ্রাস করিয়া অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখা যায়।

দ্বিতীয়তঃ, ধনতান্ত্রিক দেশগুলি অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সুদীর্ঘকালে যে অগ্রগতি করিতে সক্ষম হয় নাই, সোভিয়েত রাশিয়া অতি অল্পকালে পরিকল্পনার সহায়তায় তাহা করিতে সক্ষম হইয়াছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়ার বিস্ময়কর সাফল্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশকে পরিকল্পনা গ্রহণে অনুপ্রাণিত করিয়াছে।

তৃতীয়তঃ, এসিয়া ও আফ্রিকায় সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত অর্ধোন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করিবার উদ্দেশ্যেও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই সকল দেশে বেসরকারী উদ্যোগের হাতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের দায়িত্বভার ছাড়িয়া দিলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দ্রুত বা কাম্য উন্নয়ন সম্ভব হইবে না।

অর্ধোন্নত দেশ, অনগ্রসর জাতি এবং পশ্চাৎপদ শ্রেণীর উন্নতিই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য।

চতুর্থতঃ, বর্তমানে উন্নত এবং অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক দূরত্ব ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিয়াছে। উন্নত দেশগুলি অধিকতর উন্নত হইতেছে অপরপক্ষে দরিদ্র দেশগুলির অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হইতেছে। উন্নত দেশগুলির তুলনায় অনুন্নত দেশগুলির উন্নয়নের হার অনেক কম। অনুন্নত দেশগুলির উন্নয়নের হার বৃদ্ধি করিতে হইলে স্বাভাবিক শক্তিসমূহের উপর নির্ভর না করিয়া পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পঞ্চমতঃ, পরিকল্পনার মাধ্যমে বিনিয়োগ-আয় অনুপাত বৃদ্ধি করা অপেক্ষাকৃত সহজ। জাতীয় আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে সেই বর্ধিত আয়ের অধিক অংশ যদি বিনিয়োগ না করা যায় তাহা হইলে দেশের উৎপাদন শক্তি বাড়িবে না। জাতীয় আয়ের ২০ শতাংশ বিনিয়োগ করিতে পারিলে তবেই উন্নত অর্থনীতির স্তরে পৌছান সম্ভবপর হইবে।

পরিশেষে, পরিকল্পনার ফলে সীমাবদ্ধ সম্পদের কাম্য ব্যবহার সম্ভব হইতে পারে। সম্পদের পরিমাণ সীমাবদ্ধ বলিয়া উহার সুষ্ঠু বণ্টনের জন্য পরিকল্পনা কমিশন চিন্তা করিবে কোন লক্ষ্যের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। বিকাশমান দেশগুলিতে বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি রহিয়াছে। দুষ্প্রাপ্য বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করিয়া বিলাস দ্রব্য অথবা মূলধনী দ্রব্য দেশে আমদানী করা যায়। সমাজের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করিয়া পরিকল্পনার মাধ্যমে অপ্রচুর সম্পদের কাম্য ব্যবহার করিতে হইবে।

ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যৌক্তিকতা (Rationale of Planning in India): পূর্বে পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যে সাধারণ আলোচনা করা হইয়াছে তাহাতে ভারতের মতো অর্ধোন্নত দেশে পরিকল্পনার যৌক্তিকতা সহজেই অনুধাবন করা যায়। বর্তমানে পৃথিবীর সকল দেশেই পরিকল্পনার জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। পরিকল্পনাকে অর্থনৈতিক চিন্তাধারায় সমাজতন্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান বলা হয়। বর্তমান যুগ পরিকল্পনার যুগ, তাই এই যুগের মূলমন্ত্র হইল, 'হয় পরিকল্পনা নয় ধ্বংস' (Plan or Perish)। আয় ও সম্পদের দ্রুত ও সুষম উন্নয়নের জন্য বহুকাল হইতেই ভারতে পরিকল্পনার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। ভারত অর্ধোন্নত দেশ হইলেও তাহার অর্থনৈতিক সম্পদের পরিমাণ কম নয়।

পরিকল্পিত পদ্ধতিতে অগ্রসর হইলে অব্যবহৃত সম্পদ কাজে লাগানো যাইবে, জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে এবং জনগণের দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব হইবে। ১৯৩১ সালে স্যার আর্থার সলটার বলেন যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া জনগণের দুর্গতি ও দারিদ্র্য দূর করিতে হইবে। ১৯৩৫ সালে রবার্টসন ও বাওলে এই দেশের উন্নতির জন্য পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দেন। ১৯৩৮ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু, জহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি (National Planning Committee) গঠন করেন কিন্তু এই সময় "ভারত ছাড়" আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করায় বহু জাতীয়তাবাদী নেতা কারারুদ্ধ হওয়ায় এই কমিটির কাজ আর অগ্রসর হইতে পারে নাই।

কার্ল মার্কসের মতবাদের উপর ভিত্তি করিয়া সমাজতন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। মার্কসের অভিমত এই যে শোষণমুক্ত সমাজ গঠন করিতে হইলে উৎপাদন উপাদানের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ করিতে হইবে। তাঁহার মতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইল সকল সামাজিক কুফলের কারণ। মার্কসতত্ত্বে বিশ্বাসী বলশেভিকগণ ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা দখল করিয়া মার্কস ও সহযোগী লেখক এঙ্গেলের চিন্তাধারাকে কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টায় ব্রতী হন। রাশিয়ায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের পন্থা হিসাবে পরিপূর্ণ জাতীয়করণের ভিত্তিতে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে রাশিয়ানরাই পরিকল্পনার আবিষ্কর্তা। অতি অল্প সময়ে সোভিয়েত রাশিয়ার দ্রুত অগ্রগতি ধনতান্ত্রিক দেশগুলির নেতৃবৃন্দকে হতচকিত ও বিস্মিত করে। যদিও এই সকল দেশ ব্যক্তিগত সম্পত্তির যৌক্তিকতার উপর আস্থা হারায় নাই তথাপি ইহারা মনে করে যে দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং অজ্ঞতা দূরীকরণে রাষ্ট্র প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে। অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে দামব্যবস্থার মাধ্যমে সকল কিছু স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে কাম্য ভারসাম্য অবস্থায় উপনীত হয় না। লর্ড কেনসের গ্রন্থ End of Laissez-faire এবং তাঁহার সরকারী কার্যসূচী (Public Works Programme) রাষ্ট্রনায়কদের চিন্তাধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। ওই গ্রন্থে কেনস ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমাধি রচনা করিয়া অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে রাষ্ট্রের ভূমিকার যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করেন। বাণিজ্যচক্রের

তেজী ও মন্দাবিরোধী নীতি গ্রহণের জন্য উন্নত দেশগুলি চক্রবিরোধী কার্যসূচী প্রণয়ন করেন।

কিন্তু ভারতের ন্যায় বিকাশমান দেশের সমস্যা সম্পূর্ণ ভিন্ন। সমস্যা অনেক গভীর বলিয়া বাণিজ্যচক্র নিয়ন্ত্রণ যথেষ্ট নয়। স্বাধীনতা লাভের পর নেতারা উপলব্ধি করিলেন দেশ নানারূপ সমস্যাভাবে জর্জরিত। গণদারিদ্র্যের অবসান, বেকারত্বের উচ্ছেদ, কৃষির উন্নতি, শিল্পের অগ্রগতি—এক কথায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়; ভারতের নেতারা সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার সাফল্যে প্রভাবিত হইয়া সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি হইতে সমাজবাদের ধারণা গ্রহণ করিয়াছে কিন্তু সেই সঙ্গে ব্যক্তিত্ববিকাশের জন্য অপরিহার্য বিবেচনায় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকেও পরিত্যাগ করে নাই। সংক্ষেপে ভারতে পরিকল্পনা গ্রহণের যুক্তিগুলি উল্লেখ করা হইল:

১। দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মূলধন গঠন বৃদ্ধি: ইহা সত্য যে পরিকল্পনা ছাড়াও অর্থনৈতিক উন্নয়ন হইতে পারে। গ্রেটবৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বাভাবিক ভাবেই উন্নয়ন ঘটিয়াছে, উহার জন্য কোন সচেষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় নাই। কিন্তু গ্রেটবৃটেনের উন্নয়নের জন্য ১০০ বৎসর এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উন্নতির জন্য ৭৫ বৎসর লাগিয়াছিল। অর্ধোন্নত দেশগুলি অনেক দেরীতে উন্নয়নের কাজ হাতে লইয়াছে বলিয়া স্বাভাবিক শক্তিসমূহের দ্বারা উন্নয়নের জন্য এত দীর্ঘ সময় তাহাদের অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। পরিকল্পনার মাধ্যমে মূলধন গঠনের হার ত্বরান্বিত করিয়া দ্রুত উন্নতি করা যায়। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা না থাকিলে দ্রুত আর্থিক উন্নয়ন অসম্ভব।

২। উন্নত ও অনুন্নত দেশসমূহের মধ্যে ব্যবধানহ্রাস: বর্তমানে উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক দূরত্ব ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে এবং উহা হ্রাস করিবার জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজন। অনুন্নত দেশগুলি কৃষিপ্রধান এবং শিল্পের তুলনায় কৃষির উৎপাদনশীলতা কম বলিয়া জনগণের আয় কম ও জীবনযাত্রার মান নীচু হয়। আয় তথা ক্রয়শক্তি কম বলিয়া চাহিদাও কম তাই উদ্যোক্তাগণ শিল্পস্থাপনে আগ্রহী হয় না। এইরূপ পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রকে স্বয়ং উদ্যোক্তার ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে এবং নূতন ও ভারী শিল্প স্থাপন করিতে হইবে। অর্থনীতির কোন ক্ষেত্রে উন্নয়ন দেখা দিলে উহার প্রভাব সকল ক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়িবে।

বর্তমানে উন্নত দেশগুলি অধিকতর উন্নত হইতেছে, কিন্তু অপর দিকে

অনুন্নত দেশগুলি অধিকতর দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে। শিল্প-প্রধান দেশগুলির জাতীয় উৎপাদন গড়ে ৪.৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাইতেছে, অপর পক্ষে বিকাশমান বা অর্ধোন্নত দেশগুলির গড় উৎপাদন বৃদ্ধির হার ২.৫ শতাংশ। এইরূপ অবস্থায় উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করিতে হইলে রাষ্ট্রকে পরিকল্পিত পদ্ধতিতে অগ্রসর হইতে হইবে।

৩। সীমাবদ্ধ সম্পদের কাম্য ব্যবহার : পরিকল্পনা না থাকিলে সীমাবদ্ধ সম্পদের কাম্য ব্যবহার হইতে পারে না। পরিকল্পনার ফলেই সীমাবদ্ধ সম্পদের কাম্য ব্যবহার হইতে পারে। বিকাশমান দেশগুলিতে মূলধন ও বৈদেশিক মুদ্রার ঘাট্‌তি রহিয়াছে। দেশের সামগ্রিক স্বার্থ বিবেচনা করিয়া মূলধন সেই সকল শিল্পে বিনিয়োগ করিতে হইবে যাহা হইতে সর্বাধিক সামাজিক কল্যাণ (social welfare) লাভ করা যায়। আবার সীমাবদ্ধ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করিয়া বিলাসদ্রব্য অথবা মূলধনী দ্রব্য আমদানী করা যায়। সমাজের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করিয়া পরিকল্পনার মাধ্যমে অপ্রচুর সম্পদের কাম্য ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

৪। ধনবৈষম্য হ্রাস : শুধুমাত্র উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যসূচী গ্রহণ করা হইলে উহা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির আয় বাড়াইবে কিন্তু জনগণের দারিদ্র্যের কিছুমাত্র লাঘব হইবে না। ধনবৈষম্য হ্রাস করিবার জন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে যেন আর্থিক সম্পদ মুষ্টিমেয় কয়েক ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত না হয়। পরিকল্পিত অর্থনীতিতে উৎপাদন, বিনিয়োগ, এবং বণ্টনের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকায় ধনসম্পদের ক্ষেত্রে অধিকতর সমতা প্রতিষ্ঠিত করা যায়। একদিকে জমিদারী উচ্ছেদ, MRTP আইনের দ্বারা একচেটিয়া ক্ষমতা রোধ করিয়া ধনিক শ্রেণী ও শিল্পগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা হইতেছে অপরদিকে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, ন্যূনতম প্রয়োজন কার্যসূচী গ্রহণ এবং ক্ষুদ্রশিল্প গঠনে উৎসাহ প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়া ধনবৈষম্য হ্রাসের নিরন্তর প্রয়াস চালান হইতেছে।

৫। বেকারসমস্যা সমাধান : অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় জনসংখ্যার এক বিরাট অংশকে কর্মহীন অবস্থায় জীবনযাপন করিতে হয়। অপরপক্ষে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে রাষ্ট্র উৎপাদন ব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করায় সেই সকল দেশ হইতে বেকারত্ব অন্তর্হিত হইয়াছে। রাষ্ট্র পরিকল্পিত পদ্ধতিতে জনকল্যাণমূলক কার্যাবলী প্রসার

(Public works), একচেটিয়া কারবার নিয়ন্ত্রণ ও আয় বণ্টনে কাম্য পরিবর্তন আনিয়া বেকার সমস্যা সমাধান করিতে চেষ্টা করে।

৬। সুষম শিল্পবণ্টন : পরিকল্পনা না থাকিলে শিল্পগুলি সারা দেশে না ছড়াইয়া মাত্র কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হয়। ইহার ফলে সারা দেশ শিল্পোন্নয়নের সুযোগ ও সুবিধা লাভে বঞ্চিত হয়। কোন শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনা না থাকার দরুন আমাদের দেশে বোম্বাই, কানপুর, আমেদাবাদ ও কলকাতাকে কেন্দ্র করিয়া শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে কিন্তু দেশের অন্যান্য অঞ্চল অনুন্নত রহিয়া গিয়াছে। পরিকল্পনায় দেশে সুষম শিল্প গঠনের দায়িত্ব স্বীকার করিয়া অনগ্রসর অঞ্চলগুলিকে শিল্পস্থাপনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা হইয়াছে।

৭। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা : সমাজের নিচুতলার মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিয়া সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ভারতের পঞ্চম পরিকল্পনায় সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে।

১৯৩৪ সালে স্যার এম বিশ্বেশ্বরায় (M. Visvesvaraya) রচিত Planned Economy of India নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সম্ভবতঃ ভারতে পরিকল্পনা রচনার ইহাই প্রথম পদক্ষেপ। ১৯৩৭ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস তদানীন্তন সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্যোগে জহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করে এবং ১৯৩৮ সালে কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ১৯৪৩ সালে বোম্বাই-এর আটজন বিশিষ্ট শিল্পপতি মিলিয়া ১০,০০০ কোটি টাকার এক পরিকল্পনা রচনা করেন; ইহাই বোম্বাই পরিকল্পনা (Bombay Plan) নামে অভিহিত। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল আগামী ১৫ বৎসরে মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ করা। প্রায় একই সময়ে মানবেন্দ্র নাথ রায় রচিত "জনগণের পরিকল্পনা" (People's Plan) প্রকাশিত হয়। ইহার পর শ্রী এস, এন আগরওয়ালা ৩৫০০ কোটি টাকার গান্ধীবাদী পরিকল্পনা (Gandhian Plan) রচনা করেন।

১৯৪৪ সালে ভারত সরকার "পরিকল্পনা ও উন্নয়ন" নামে একটি বিভাগ খুলিয়া বোম্বাই পরিকল্পনার অন্যতম রচয়িতা স্যার আর্দেশীর দালালকে এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য নিযুক্ত করেন। এই বিভাগ দুইটি স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা রচনা করে। স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল দেশে যুদ্ধপূর্ব

স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনা। অবশেষে, ১৯৫০ সালে জহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে ভারতীয় পরিকল্পনা কমিশন (Indian Planning Commission) গঠন করা হয় এবং ১৯৫১ সালে পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া প্রকাশিত হয়।

পরিকল্পনার প্রকারভেদ (Types of Planning): উন্নত ও অর্ধোন্নত উভয় শ্রেণীর দেশেই পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে কিন্তু উন্নত ও অর্ধোন্নত দেশে পরিকল্পনার প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কতকগুলি ধনতান্ত্রিক দেশ আছে যাহারা বর্তমানে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছে—উৎপাদন, বিনিয়োগ সঞ্চয় ও জাতীয় আয় চরম কাম্য আকার ধারণ করিয়াছে। এই সকল দেশে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হইল সংরক্ষণ (maintenance)—জাতীয় আয় ও উৎপাদনের বর্তমান হার বজায় রাখা, কিন্তু অর্ধোন্নত দেশগুলিতে জাতীয় আয় ও উৎপাদন কম, সেই কারণে এই সকল দেশে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হইল উন্নয়ন (development)—জাতীয় আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা। সুতরাং উদ্দেশ্য বিচারে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা দুই ধরনের হইতে পারে—সংরক্ষণ পরিকল্পনা (maintenance planning) এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা (development planning)।

পরিমাণ ভেদে (degrees of planning) পরিকল্পনা দুই ধরনের হইতে পারে—সামগ্রিক পরিকল্পনা ও আংশিক পরিকল্পনা। বেসরকারী উদ্যোগকে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করিয়া অর্থনৈতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের মালিকানা প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করা হইলে তাহাকে সামগ্রিক পরিকল্পনা (total planning) বলা হয়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে এই ধরনের পরিকল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়। সোভিয়েত রাশিয়ার পরিকল্পনা সামগ্রিক পরিকল্পনার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই সকল দেশে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশন সরকারের রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া পরিকল্পনা রচনা করে। সাধারণতঃ এই ধরনের সর্বাত্মক পরিকল্পনা গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে দেখা যায় না।

সর্বাত্মক সাম্যবাদী পরিকল্পনার বিকল্প হইল গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা। গণতান্ত্রিক পরিকল্পনাগুলিকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। যদি কোন সাময়িক বিপর্যয়ের দরুন অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয় তবে জনগণের মঙ্গলের জন্য কোন ব্যাপক পরিবর্তন না আনিয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রয়োজনমত মেরামত করিয়া কাজ চালানো যায় তাহা হইলে ইহা একপ্রকার

গণতন্ত্রসম্মত পরিকল্পনা বলিয়া গণ্য হইবে। ১৯৩০-এর বিশ্বব্যাপী মন্দার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী যুগে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য বৃটেন এই পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও বৃটেনে পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক সম্পদের পুনর্বিন্যাস করা হয়; পরিকল্পনা অবাধ প্রতিযোগিতা ও বেসরকারী উদ্যোগের উপর প্রতিষ্ঠিত স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির পরিপূরক হয়। এই ধরনের গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা কোনরূপ সামাজিক জটিলতা অথবা গণ-অসন্তোষের সৃষ্টি না করিয়া জনগণের অবস্থার উন্নতি সাধন করে। গণতান্ত্রিক পরিকল্পনায় জনগণের কল্যাণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা হয়। এইরূপ গণতান্ত্রিক পরিকল্পনার সাহায্যে ভারত অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে অগ্রসর হইতেছে। সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করিয়া অর্থব্যবস্থার উন্নয়ন দ্বারা কোটি কোটি নরনারীর কল্যাণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলি রচনা করা হইয়াছে। অবশ্য সেইসঙ্গে ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং খোলা বাজার পদ্ধতি ভারতের উন্নতিতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিবে। পরিকল্পনার দরুন ভারতে এক নতুন অর্থ-ব্যবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে—উহাকে "মিশ্র অর্থব্যবস্থা" (Mixed Economy) বলে। ইহাতে ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ পাশাপাশি স্থান পাইয়াছে।

পরিকল্পনা কৌশল (Planning Techniques): পরিকল্পনা রচনার প্রথম পদক্ষেপ হইল কতকগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা। দ্বিতীয়তঃ, দেখিতে হইবে লক্ষ্যগুলি যেন চরম কাম্য আকারের (optimum) হয়। পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্ধারিত হইবার পর ওই সকল লক্ষ্য পূরণের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। পরিকল্পনাকে দক্ষতার সহিত বাস্তবে রূপান্তরিত করিতে হইলে উহাতে দুই ধরনের ভারসাম্য থাকিবে—আড়াআড়ি ভারসাম্য (crosswise balance) এবং পশ্চাৎপদ ভারসাম্য (backward balance); উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা এবং সম্ভাব্য উপকরণের মধ্যে সমতা নির্ধারণ করাকে আড়াআড়ি ভারসাম্য বলে। ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্যতম ত্রুটি যে উৎপাদন লক্ষ্য এবং সম্ভাব্য শ্রমশক্তির মধ্যে সঠিক আড়াআড়ি ভারসাম্য সৃষ্টি করা হয় নাই। উৎপাদিত সামগ্রী এবং উহাদের উপাদানের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করাকে পশ্চাৎপদ ভারসাম্য বলে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় যে বাই সাইকেল ফ্রেম উৎপাদনের সংখ্যার সহিত সাইকেল

টায়ার উৎপাদনের সঙ্গতি থাকা চাই। যদি টায়ার নির্মাণের সংখ্যা সাইকেল ফ্রেম নির্মাণের সংখ্যা অপেক্ষা কম হয় তাহা হইলে টায়ারের অভাবে সাইকেল ফ্রেম দ্বারা সম্পূর্ণ সাইকেল তৈয়ারী করা যাইবে না।

পরিকল্পনাকে সফল করিবার আর একটি সর্ত হইল উহাকে নিম্নপর্যায় হইতে প্রস্তুত (Planning from Below) করা। প্রতিটি অর্থনৈতিক কাজকর্ম অন্যান্য কাজের উপর নির্ভরশীল বলিয়া উৎপাদনের সর্বনিম্ন পর্যায় হইতে পরিকল্পনা সুরু না করিলে উহার উচ্চপর্যায় সফল হইতে পারে না। ইহা ব্যতীত, পরিকল্পনা নিম্ন পর্যায় হইতে সুরু করিলে জনগণের সহযোগিতা পাওয়া যায়, পরিকল্পনা সফল করিবার জন্য জনসমর্থন অপরিহার্য। ভারতের পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় এই নিম্ন পর্যায় হইতে পরিকল্পনা সুরু করিবার প্রবণতা দেখা যায়। সমাজোন্নয়ন এবং জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা নিম্নপর্যায়ের পরিকল্পনার উদাহরণ।

পরিশেষে, উন্নয়ন গতির দৃষ্টিকোণ হইতে পরিকল্পনা-কৌশল দুই ধরনের হইতে পারে—ভারসাম্য পরিকল্পনা পদ্ধতি (Planning with balanced growth) এবং সমতাহীন পরিকল্পনা পদ্ধতি (Planning with unbalanced growth)। ভারসাম্য সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ভোগ, বিনিয়োগ ও আয় সমান হারে বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে সমতাহীন সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে মূল ও ভারী শিল্প যে হারে বৃদ্ধি পায় অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রে সেই হারে বৃদ্ধি ঘটে না। ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমতাহীন সম্প্রসারণের পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়।

অর্ধোন্নত দেশের পরিকল্পনা পদ্ধতি (Planning Technique in Backward areas) : অর্ধোন্নত দেশের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা অপরিহার্য। অর্ধোন্নত দেশ, অনগ্রসর জাতি এবং পশ্চাৎপদ শ্রেণীর উন্নতিই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। স্বল্প আয় ও উৎপাদনশীলতা অনগ্রসর দেশের বৈশিষ্ট্য। শুধুমাত্র বর্তমান প্রয়োজন পূরণের জন্যই নয়, ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির জন্যও পরিকল্পনার মাধ্যমে আয় ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করিতে হইবে। স্বয়ং নির্ভরশীল উন্নয়নের জন্য প্রারম্ভিক মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ পর্যাপ্ত হওয়া চাই। মূল শিল্পগঠন, পরিবহন, রাস্তাঘাট নির্মাণ প্রভৃতি কাজের জন্য প্রভূত মূলধন বিনিয়োগ প্রয়োজন। এইসকল কার্যে আশু মুনাকা অর্জনের কোন সম্ভাবনা নাই বলিয়া বেসরকারী উদ্যোগ এই ধরনের বিনিয়োগে উৎসাহ

পাইবে না, সুতরাং রাষ্ট্রকেই এই সকল কার্যে অগ্রসর হইতে হইবে। বস্তুতঃ, যে কোন দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাফল্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে: (১) প্রারম্ভিক রাষ্ট্রীয় ব্যয়; (২) মূলধন গঠন ও নূতন বিনিয়োগ এবং (৩) গণ সহযোগিতা।

যে স্তরে পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনীতিকে অচলাবস্থা হইতে উত্তোলন করিয়া উহাতে গতিবেগ সঞ্চার করা হয় তাহাকে ঊর্ধ্বগমন পর্যায় (take-off stage) বলে। ঊর্ধ্বগমন পর্যায়ে উন্নয়ন দ্রুত হওয়া প্রয়োজন কারণ ইহা এমন এক গতিবেগ সৃষ্টি করিবে যাহাতে বিকাশমান দেশে স্বাভাবিক, স্বয়ংনির্ভরশীল, নিরবচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক উন্নয়ন হইতে পারে; বিনিয়োগের জন্য পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হইলেই ইহা সম্ভব হইবে। অধ্যাপক রোস্ট-র (Rostow) মতে ঊর্ধ্বগমন পর্যায় ১৫ হইতে ২৫ বৎসর কাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়; অবশ্য অর্ধোন্নত দেশ সঠিক উন্নয়নী কার্যসূচী গ্রহণ করিয়া এই পর্যায়কে সংক্ষেপ করিতে পারে। ঊর্ধ্বগমন পর্যায়ের পর স্বয়ং-নির্ভরশীল সম্প্রসারণ (self-sustaining growth) পর্যায় আসিবে। অর্ধোন্নত দেশের প্রকৃতি এরূপ যে, সামান্য পরিমাণ বিনিয়োগ দ্রুত অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ ঘটাইতে পারে। বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিবহন ও রাস্তাঘাট সম্প্রসারণ এবং মূল ও ভারী শিল্পের উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত মূলধন বিনিয়োজিত হইলে তবেই দেশ অচলাবস্থা হইতে উঠিতে পারে। এই ধরনের প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ ঘটাইয়া অর্ধোন্নত দেশে "ঊর্ধ্বগমন পর্যায়" সংক্ষেপ করা যায়। সুতরাং পরিকল্পনা রচয়িতাগণ এমন এক পরিকল্পনা-কৌশল গ্রহণ করিবেন যাহাতে ভারী ও মূল শিল্প, পরিবহন এবং বিদ্যুতের দ্রুত উন্নতি হয়। এই ধরনের বিনিয়োগের দরুন আশু মুনাফা অর্জনের কোন সম্ভাবনা নাই বলিয়া বেসরকারী উদ্যোক্তাগণ ইহাতে কোনরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিবে না। এই সকল বিনিয়োগের কাজ সরকারকেই উদ্যোগী হইয়া গ্রহণ করিতে হইবে। অর্ধোন্নত দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিবেগ সৃষ্টির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্রমাগত নূতন বিনিয়োগ প্রয়োজন এবং পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্যায়ে ভারী শিল্প অগ্রাধিকার পাইলে উন্নয়ন দ্রুততর হইবে।

পরিবহন, জলসেচ এবং বিদ্যুৎ-উৎপাদন অর্থাৎ উপকাঠামোগত (infrastructure) সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি পাইলে বাজারের আয়তন সম্প্রসারিত হইবে এবং নূতন বিনিয়োগ উৎসাহিত হইবে। সামাজিক মূলধন খাতে

সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে মূলধন গঠনের হার এবং জনগণের কল্যাণ বৃদ্ধি পাইবে। বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিবহন ও সেচব্যবস্থার ব্যাপক সম্প্রসারণ না হইলে দ্রুত উন্নয়নের প্রারম্ভিক গতিবেগ সৃষ্টি হইবে না এবং অর্ধ-অচলাবস্থা হইতে গতিশীল ঊর্ধ্বগমন পর্যায়ের রূপান্তর বিলম্বিত হইবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সর্তগুলি বিশ্লেষণ করিলে ভারী শিল্প, পরিবহন, জলসেচ এবং বিদ্যুৎ সম্প্রসারণে রাষ্ট্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাইবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার নির্ভর করে তিনটি সর্তের উপর : (১) অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জনগণের কল্যাণ বৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণ, (২) মূলধন গঠনের হার এবং (৩) গণ-সহযোগিতা। অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার ত্বরান্বিত করিতে হইলে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে, নূতন বিনিয়োগ প্রবাহ সম্প্রসারিত করিতে হইবে, সমাজব্যবস্থাকে উপযুক্তভাবে সংগঠিত করিতে হইবে এবং জনগণের উদ্দীপনার রুদ্ধদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিতে হইবে।

মূল ও ভারী শিল্পগুলির উন্নয়ন এবং পরিবহন, জলসেচ ও বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ নূতন বিনিয়োগ প্রবাহকে বাড়াইবে আর এইভাবে মূলধন গঠনের গতিবেগ ত্বরান্বিত হইবে। মূলধন গঠনের এই বর্ধিত হারের দরুন অনগ্রসর অর্থনীতি ঊর্ধ্বগমন পর্যায় হইতে স্বয়ংনির্ভরশীল সম্প্রসারণের শেষ পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে অর্ধোন্নত দেশে বেসরকারী উদ্যোগ ভারী শিল্প, পরিবহন এবং বিদ্যুৎ-উৎপাদনে মূলধন বিনিয়োগ করিতে মোটেই আগ্রহী নয়। এই সকল ক্ষেত্রে একইসঙ্গে বিনিয়োগ প্রয়োজন বলিয়া প্রারম্ভিক পর্যায়ে রাষ্ট্রকে প্রভূত ব্যয় করিতে হইবে।

প্রভূত পরিমাণ রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের দরুণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিবেগ ত্বরান্বিত হইবে। গণতান্ত্রিক পরিকল্পনায় অবশ্য দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন একমাত্র বিবেচ্য বিষয় নয়। পরিকল্পনা রচয়িতাগণ জনগণের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মূলধনকে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরিকল্পনাসমূহের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করিবেন। এই কারণেই সম্পদের একাংশ সমষ্টি উন্নয়ন এবং গ্রামীন সম্প্রসারণ সেবায় ব্যয়িত না হইয়া সমগ্র মূলধন ভারীশিল্প উন্নয়নে বিনিয়োজিত হইলে অধিক মূলধনী দ্রব্য সৃষ্টি হইতে পারিত এবং মূলধন গঠনের হার বৃদ্ধি পাইত। কিন্তু গণতান্ত্রিক, কল্যাণ-কেন্দ্রিক পরিকল্পনায় সর্বাধিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জনগণের সর্বাধিক কল্যাণের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা প্রয়োজন।

গণতান্ত্রিক পরিকল্পনায় গণসহযোগিতার এক বিশেষ ভূমিকা রহিয়াছে।

গ্রামীণ জীবন পুনরুজ্জীবিত করায় সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। ইহা জনগণের মধ্যে নবীন আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিবে এবং কৃষিপ্রধান দেশের উন্নয়নের বিশেষ সহায়ক হইবে। বস্তুতঃ জনগণের সহযোগিতা এবং উদ্দীপনা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উপাদানগুলির মধ্যে নূতন প্রেরণার সঞ্চার করিবে এবং এইভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিবেগ ত্বরান্বিত হইবে।

ভারতের মতো কৃষিপ্রধান অর্ধোন্নত দেশে কি ধরনের পরিকল্পনা-কৌশল গ্রহণ করিতে হইবে সে সম্পর্কে আমরা এখন সিদ্ধান্তে আসিতে পারি। পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হইবে অর্থ-অচলাবস্থা হইতে অর্থ-ব্যবস্থাকে দ্রুত সম্প্রসারণশীল অর্থব্যবস্থায় পরিবর্তিত করা। ভারীশিল্প, পরিবহন, জলসেচ এবং বিদ্যুৎ দ্রুত শিল্পায়নের স্তম্ভস্বরূপ বলিয়া রাষ্ট্রকে উহাদের উন্নয়নের জন্য প্রভূত বিনিয়োগ করিতে হইবে। এই বিনিয়োগের ফলে মূলধন গঠনের হার ও রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণ উভয়ই বৃদ্ধি পাইবে আর ইহার দরুণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিবেগ দ্রুততর হইবে।

কিন্তু গণতান্ত্রিক পরিকল্পনায় জনগণের কল্যাণের প্রতিও সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থা এরূপভাবে প্রভাবিত করা প্রয়োজন জনসাধারণ যেন অনুভব করে যে তাহাদের সুবিধার জন্যই পরিকল্পনা রচনা করা হইয়াছে। জনগণের মধ্যে এই চেতনা বোধ সৃষ্টি হইলে পরিকল্পনার প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার মনোভাব গড়িয়া উঠিবে। কৃষি-প্রধান দেশে সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রামীণ জনগণের মধ্যে নূতন আশা এবং আকাঙ্খার সঞ্চার করিবে। সুতরাং পরিকল্পনা-কৌশল এরূপ হওয়া প্রয়োজন যাহাতে একই সঙ্গে ভারী শিল্প, পরিবহন, বিদ্যুৎ এবং সমষ্টি-উন্নয়ন প্রকল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত হয়।

ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহে এই ধরণের পরিকল্পনা-কৌশলই অনুসরণ করা হইয়াছে। ভারতের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ভারী ও মূল শিল্প, পরিবহন এবং বিদ্যুৎ-উৎপাদনের উপর অধিক মাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে কারণ ইহারা রাষ্ট্রীয় ব্যয় এবং নূতন বিনিয়োগ প্রবাহ—অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ধারণকারী এই দুইটি বিষয়কে উৎসাহিত করিবে। কিন্তু ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহ জনকল্যাণ প্রণোদিত গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা বলিয়া রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের একাংশ সমষ্টি উন্নয়ন এবং অন্যান্য

কল্যাণমূলক কার্যসূচীতে বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহা সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় শক্তিসমূহকে সঠিক পথে পরিচালিত করিতে সহায়তা করিবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিপথকে সুগম করিবে।

পরিকল্পনা কৌশলের সাফল্য নির্ভর করে দুইটি শর্তের উপর। প্রথমতঃ, কুটির ও হস্তশিল্পে যে উৎপাদন-ক্ষমতা সংরক্ষিত আছে আছে তাহা কার্যকরী-ভাবে একত্রিকরণ করিতে হইবে। মূলধন-স্বল্প অর্ধোন্নত দেশের পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্যায়ে ভারী শিল্পের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইলে ভোগ্যবস্তুর উৎপাদনের উপর যথোচিত দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু সম্প্রসারণশীল অর্থব্যবস্থায় ভোগ্যবস্তুর জন্য ব্যাপক চাহিদা দেখা দিবে এবং গ্রামীণ আধা-বেকারদের কুটির ও হস্তশিল্পে নিয়োগ করিয়া এই চাহিদা মিটাইতে হইবে। অবশ্য কুটিব এবং হস্তচালিত শিল্পগুলিকে ধীরে ধীরে যন্ত্রীকরণ করিতে হইবে। সুলভ বিদ্যুৎ এবং যন্ত্রপাতি উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় ইহা করা মোটেই কঠিন হইবে না। কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং ভোগ্য-বস্তুর ঘাটতি পূরণের দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কুটির এবং গ্রামীণ শিল্পের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

পরিকল্পনা-কৌশলের সাফল্যের দ্বিতীয় সর্ত হইল সম্প্রসারণশীল অর্থ-ব্যবস্থায় কৃষি এবং শিল্পের মধ্যে নিবিড় যোগসূত্র স্থাপন করা। দ্রুত শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজন কৃষির পুনর্গঠন এবং দ্রুত কৃষি উন্নয়ন। শিল্পের উন্নতি নির্ভর করে খাদ্যোৎপাদন এবং কাঁচামালের যোগানের উপর। দ্রুত শিল্পায়ন কৃষি উন্নয়নের উপর নির্ভরশীল। শিল্পবিপ্লবের পূর্ব সর্ত হইল কৃষিবিপ্লব। এই কারণেই আমাদের প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি উন্নয়ন এবং পুনর্গঠনের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু কৃষি উন্নয়নের কর্মসূচী দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় সম্যকভাবে অনুসৃত হয় নাই বলিয়াই তৃতীয় পরিকল্পনা কাল হইতে মূল্যস্তরে তীব্র ঊর্ধ্বগতি দেখা দেয়। চতুর্থ পরিকল্পনা-কালে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান হয়। কৃষি এবং শিল্প একই সঙ্গে সম্প্রসারিত না হইলে এবং পরস্পরকে সহায়তা না করিলে উন্নয়ন প্রয়াস ব্যাহত হইবে।

মিশ্র অর্থব্যবস্থা (Mixed Economy) : সরকারী উদ্যোগ এবং বেসরকারী উদ্যোগের সহ-অবস্থিতিকেই মিশ্র অর্থব্যবস্থা বলে। অর্থনৈতিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও মালিকানা থাকিবে, অপর অংশে

বেসরকারী উদ্যোগ ও মালিকানা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকিয়া কাজ করিবে। পূর্ণসমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে এই ধরনের অর্থব্যবস্থা থাকিতে পারে না কারণ সেখানে বেসরকারী মালিকানা ও উদ্যোগকে উৎখাত করিয়া সামগ্রিকভাবে সরকারী মালিকানা ও উদ্যোগের প্রবর্তন করা হইয়াছে; অপরপক্ষে, অবাধ ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও (Laissez-faire capitalism) এই ধরনের অর্থব্যবস্থা থাকিতে পারে না কারণ সেখানে রাষ্ট্রীয় মালিকানা এবং উদ্যোগের কোন স্থান নাই।

উনবিংশ শতকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদই স্বীকৃত রাজনৈতিক মতবাদ ছিল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদিগের মতে রাষ্ট্রের কার্যাবলী অভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা এবং বহিঃশত্রুর হাত হইতে দেশরক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে। অর্থনৈতিক জগতের সকল ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং মালিকানা নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ভোগ করিবে। সমাজজীবনে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ কাম্য নয় কারণ ইহা ব্যক্তিত্ব বিকাশের অন্তরায় সৃষ্টি করিয়া সামাজিক অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করে। এই ধরনের সমাজে চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক ঘাতপ্রতিঘাতে আদর্শ ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং মুনাফার সুযোগ রহিয়াছে বলিয়া উৎপাদনের পরিমাণ সর্বাধিক হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এই ব্যবস্থার কুফল হইল যে সমাজে ধনী ব্যক্তি অধিকতর ধনী হইবার সুযোগ পাইবে আর দরিদ্র ব্যক্তি অধিকতর দরিদ্র হইবে। সমাজে শ্রমিক এবং দরিদ্র ব্যক্তির উপর অবাধ শোষণ চলিতে থাকিবে। তাই অবাধ ধনতন্ত্র আজকের পৃথিবীতে কোন দেশই মানিয়া লইতে রাজী নয়। সমাজ-তন্ত্রবাদীরা সকল উৎপাদন-উপাদান রাষ্ট্রের মালিকানাধীনে আনিবার পক্ষপাতী। এই ধরনের সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানা এবং উদ্যোগের কোন স্থান নাই। কিন্তু এই ধরণের সমাজব্যবস্থাও সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। ব্যক্তিগত মালিকানা এবং মুনাফার কোন সুযোগ না থাকায় উৎপাদনের পরিমাণ সর্বাধিক হয় না, রাষ্ট্র সর্বেসর্বা হওয়ায় ব্যক্তিপ্রচেষ্টা হীনপ্রভ হয় এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা হ্রাস পায়। অবাধ ধনতন্ত্রের সমর্থকেরা ইহাকে দাসতন্ত্রের পথ (Road to Serfdom) বলিয়া মনে করেন।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ যেমন ব্যক্তিগত মালিকানা এবং উদ্যোগে বিশ্বাসী সমাজতন্ত্রবাদ সেইরূপ রাষ্ট্রীয় মালিকানা এবং উদ্যোগে বিশ্বাসী। মিশ্র অর্থব্যবস্থা হইল দুই পরস্পরবিরোধী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যবর্তী পথ। মিশ্র

অর্থব্যবস্থা হইল ধনতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের দোষগুলি বর্জন ও গুণগুলি গ্রহণ করিয়া এক নূতন সমাজব্যবস্থার বিবর্তন। এই ধরনের সমাজে জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার হয়। মূল এবং প্রতিরক্ষা শিল্প ব্যতীত অন্য সকল প্রকার শিল্পোন্নয়নের দায়িত্ব বেসরকারী উদ্যোগের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অবশ্য অর্থনৈতিক কেন্দ্রীভবন রোধের উদ্দেশ্যে বেসরকারী মালিকানা এবং বিনিয়োগের উপর সর্ব সময়েই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থাকিবে। রাষ্ট্র সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য নিজে উদ্যোগী হইবে। শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরীহার নির্ধারণ, কাজের সময় হ্রাস, সামাজিক বীমা-ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং বার্ধক্যে ভাতার ব্যবস্থা করিবে। সমাজের বৃহত্তম কল্যাণ সাধনই হইবে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। এই জন্য মিশ্র অর্থব্যবস্থার অপর নাম কল্যাণমূলক রাষ্ট্র (welfare state).

মিশ্র অর্থব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ হইল কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা। সমাজের সর্বাধিক কল্যাণের জন্য জাতীয় সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার এবং সমবণ্টন প্রয়োজন। দেশের বেসরকারী কার্যকলাপ যাহাতে এই উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় তাহার জন্য কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা করা হয়। ইহার দ্বারা সমগ্র অর্থনৈতিক কাঠামোয় ভারসাম্য সৃষ্টি করা যায়।

১৯৪৮ সালের শিল্পনীতির ভিত্তি হইল মিশ্র অর্থব্যবস্থা অর্থাৎ এই শিল্প-নীতিতে সুস্পষ্টভাবে ইহা ঘোষণা করা হয় যে ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোয় সরকারী ও বেসরকারী উভয় প্রকার শিল্পপ্রতিষ্ঠানের স্থান থাকিবে। এই ঘোষণায় শিল্পগুলিকে মোটামুটি চারশ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। প্রথমতঃ, প্রতিরক্ষা ও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলিকে রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকারে রাখা হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত ভিত্তিমূলক ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলি সরকারী মালিকানায় গড়িয়া উঠিবে এবং এই শ্রেণীর বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে জাতীয়করণের প্রশ্ন উঠিবে। তৃতীয় শ্রেণীতে যে সকল বেসরকারী শিল্প থাকিবে তাহাদের উপর অল্পবিস্তর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থাকিবে। বাকী শিল্পগুলি সম্পূর্ণরূপে বেসরকারী মালিকানাধীনে থাকিবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের আদর্শ গ্রহণ করা হয়। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সমষ্টিকল্যাণের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করা হইয়াছে যাহাতে দুই বিরুদ্ধধর্মী সমাজব্যবস্থার কুফলগুলি

বর্জন করিয়া এক সর্বগুণসম্পন্ন সমাজব্যবস্থা গড়িয়া তোলা যায়। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজগঠনের সর্তই হইল বেসরকারী উদ্যোগ ও মালিকানার সংকোচন এবং সরকারী মালিকানা ও উদ্যোগের ক্রমবর্ধমান সম্প্রসারণ। সেই কারণে ১৯৫৬ সালের বিঘোষিত শিল্পনীতিতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্ষেত্রকে অধিকতর সম্প্রসারণের নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রথম শিল্পনীতিতে মাত্র ৯টি শিল্পকে রাষ্ট্রের একচেটিয়া মালিকানাধীনে রাখা হয় কিন্তু দ্বিতীয় শিল্পনীতিতে ১৭টি শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত করা হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় স্পষ্টতঃ বলা হইয়াছে যে ব্যক্তিগত মুনাফা নয়—সামাজিক লাভের পরিমাণই হইবে অর্থনৈতিক অগ্রগতির মানদণ্ড। অর্থনৈতিক বিকাশের ধারাকে এরূপভাবে রচনা করিতে হইবে যাহাতে জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সাথে সাথে আয় বণ্টনের ক্ষেত্রে অধিকতর সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে আরও দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, যে সকল সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমাজতান্ত্রিকতার আদর্শের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, সেগুলিকে হয় পরিবর্তন নতুবা উৎখাত করিতে হইবে।

কল্যাণমূলক রাষ্ট্র—যাহা মিশ্র অর্থনীতির ভিত্তি—গঠন করিতে হইলে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করিতে হইবে। নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য রাষ্ট্রীয় মালিকানার সম্প্রসারণ প্রয়োজন :

প্রথমত, যে সকল উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকা ব্যতীত উহাদের বাস্তব রূপায়ন সম্ভব নয়। উন্নয়নের এই ব্যাপক কর্মসূচীকে রূপায়িত করিবার মত ইচ্ছা বা সম্পদ কোনটাই বেসরকারী উদ্যোগের নাই। পরিকল্পনাকে সফল করিতে রাষ্ট্রীয় ভূমিকার সম্প্রসারণ অপরিহার্য।

দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত উদ্যোগের মূল প্রেরণা হইল দ্রুত এবং সর্বাধিক মুনাফা অর্জন—সমাজকল্যাণ নয়। যে সকল ক্ষেত্রে মুনাফার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত স্বল্প বা দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ সাধারণতঃ সেই সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগ অগ্রসর হইতে দ্বিধা বোধ করে। এই কারণে বৃটিশ যুগে ভারতে ভোগ্যবস্তুশিল্পের কিছু বিকাশ ঘটিয়াছিল কিন্তু ভারী ও মূলধনী শিল্পের উন্নয়ন মোটেই হয় নাই। যে সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগ আগাইয়া আসিতে চায় না সেই সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে অগ্রসর হইতে হইবে তবেই দেশের সুষম উন্নয়ন সম্ভব হইবে।

তৃতীয়ত, ভারত সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের যে আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে তাহা বাস্তবে রূপায়িত করিতে হইলে আয়ের ন্যায্য বণ্টন, অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং সামাজিক কল্যাণের সম্প্রসারণ প্রয়োজন। এ জন্য রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা অপরিহার্য। আয় বণ্টনের বৈষম্য দূরীকরণ এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের জন্য করব্যবস্থাকে অধিকতর গতিশীল করা হইয়াছে।

চতুর্থত, পরিকল্পনায় প্রয়োজন অনুসারে বিশেষ বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনে অগ্রাধিকার দিয়া কার্যসূচী প্রণয়ন করা হয়। সমাজের মঙ্গল এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রাধিকার দেওয়া হয়; ব্যক্তিগত উদ্যোগে এইভাবে কার্যসূচী প্রণয়ন করিয়া অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় না।

পরিশেষে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিদেশ হইতে শিল্পজ্ঞান, ঋণ, বিনিয়োগ এবং সহযোগিতা প্রয়োজন হয়। এই সকল কার্যের জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের সম্প্রসারণ অপরিহার্য।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ১৯৫১-৫৬ (First Fiveyear Plan, 1951-56) ঃ প্রথম পরিকল্পনার কার্যকাল ছিল ১৯৫১ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৫৬ সালের মার্চ পর্যন্ত। প্রথম পরিকল্পনার প্রারম্ভকালে ভারতের অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত ছিল। খাদ্যঘাটতি, কাঁচামালের অভাব, দেশবিভাগজনিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের ওলট পালট, মুদ্রাস্ফীতির প্রবল চাপ, পরিবহনের দুরবস্থা এবং প্রতিকূল বাণিজ্যব্যালান্স —এমনই এক পটভূমিকায় রচিত হইয়াছিল প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা।

উদ্দেশ্য (Objectives) ঃ

প্রথম পরিকল্পনা বিশেষ উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিল না। ইহাব দুইটি মূল উদ্দেশ্য ছিল: (১) যুদ্ধ ও দেশবিভাগের দরুন যে সকল অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা দূর করা এবং (২) এমন এক উন্নয়ন পদ্ধতির সৃষ্টি করা যাহা উত্তরকালে বৃহত্তর প্রচেষ্টার ভিত্তিভূমি হইতে পারে। বিনিয়োগ এরূপ করিতে হইবে যাহাতে আগামী ২৭ বৎসরে মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ হইতে পারে।

প্রথম পরিকল্পনায় ভারতের সমগ্র অর্থব্যবস্থাকে দুইটি ক্ষেত্রে বিভক্ত করা হয়—সরকারী উদ্যোগ ও বেসরকারী উদ্যোগ। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্ষেত্রে পরিকল্পনায় ২০৬৯ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ স্থির করা হইয়াছিল, পরে উহা বৃদ্ধি করিয়া ২৩৭৮ কোটি টাকা করা হয়।

প্রথম পরিকল্পনার অগ্রগতি (**Achievements of the First Five Year Plan**) : বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি পর্যালোচনা করিয়া বলা যায় যে প্রথম পরিকল্পনার ফলাফল সন্তোষজনক। পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল জাতীয় আয় ১৮ শতাংশ এবং মাথাপিছু আয় ১১ শতাংশ বৃদ্ধি করা। এই পরিকল্পনার দরুন জাতীয় আয় ১৮ শতাংশ এবং মাথাপিছু আয় ১০'৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ১৯৫০-৫১ সালে জাতীয় আয় ছিল ৮৮৫০ কোটি টাকা এবং মাথাপিছু আয় ছিল ২৪৬'৩ টাকা ; পরিকল্পনার পর ১৯৫৫-৫৬ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ১০,৪৮০ কোটি টাকা ও ২৭৩'৬ টাকায় আসিয়া দাঁড়ায়। পরিকল্পনার পাঁচবৎসরে সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে মিলিতভাবে মোট ৩৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োজিত হইবে বলিয়া ধরা হইলেও কার্যতঃ মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩১০০ কোটি টাকা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির লক্ষ্য পূরণ হইলেও বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয় নাই।

প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে কৃষিজ উৎপাদনের পরিমাণ ১৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। পরিকল্পনার দরুন খাদ্যশস্যের উৎপাদন পাঁচ কোটি টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৬'৫ কোটি টনে আসিয়া দাঁড়ায় ; অর্থাৎ খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ২৯'৬ শতাংশ। বাণিজ্যিক শস্যের মধ্যে তুলা ও তৈলবীজের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছাড়াইয়া যাইলেও আখের উৎপাদন বৃদ্ধি নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌছাইতে পারে নাই। পরিকল্পনা কালে মোট এককোটি ৬৩ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়। ভূমিসংস্কার কাজের যথেষ্ট অগ্রগতি হয় এবং গ্রামবাসীদের শতকরা ২৫ শতাংশ সমাজোন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার অধীনে আসে। পরিকল্পনাকালে ২৩ লক্ষ একর পতিত জমিকে চাষের উপযোগী করা হয়। এই সময় বিদ্যুৎ উৎপাদন ২৩ লক্ষ কিলোওয়াট হয়।

প্রথম পরিকল্পনায় শিল্পক্ষেত্রেও কিছুটা অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। পরিকল্পনাধীন সময়ে মোট শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন ৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায় এবং মূলধন দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ৭০ শতাংশ। সরকারী আনুকূল্যে বেসরকারী শিল্পেরও যথেষ্ট সম্প্রসারণ হয়। এই পরিকল্পনার শেষে সরকারী উদ্যোগে তিনটি বৃহদায়তন লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হয়। বস্ত্র, চিনি, কাগজ, সাইকেল, সিমেন্ট ইত্যাদির উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়।

এই সময় জাহাজ নির্মাণ, তৈল শোধণাগার, বিমানপোত নির্মাণ, পেনিসিলিন উৎপাদন প্রভৃতি নূতন নূতন শিল্প গড়িয়া ওঠে। প্রথম পরিকল্পনাকালে ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের উন্নতির জন্য ৪৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়।

এই সময়ে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থারও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়। ৩৭০ মাইল নূতন রেলপথের পত্তন, ৫০০ মাইল পুরানো রেলপথের সংস্কার, ৬৩৬ মাইল নূতন রাস্তা এবং পুরানো ৪০০০ মাইল রাস্তার সংস্কার—এই সবই প্রথম পরিকল্পনাকালে হয়। রেলপথগুলি এই সময় ২৫ শতাংশ অতিরিক্ত মালপত্র বহন করিতে সমর্থ হয়।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণের অন্যান্য দিকেও অগ্রগতি মোটামুটি সন্তোষজনক। এই পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ঘটিলেও তাহা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। কৃষিও কৃষিসংক্রান্ত ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়ায় গ্রামাঞ্চলে বেকার সমস্যা বেশ কিছু হ্রাস পায় কিন্তু নগরাঞ্চলের বেকারসমস্যা তীব্র আকার ধারণ করে।

প্রথম পরিকল্পনাকালে ৩৩৩ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয় করা হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মূল্যস্তর বৃদ্ধি পায়নি—ববং উহা ১৩ শতাংশ হ্রাস পায়।

প্রথম পরিকল্পনা মোটামুটিভাবে সকল হইলেও ইহার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ত্রুটি চোখে পড়ে। প্রথমত, এই পরিকল্পনায় স্বল্পমেয়াদী অপেক্ষা দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। দ্বিতীয়ত, এই পরিকল্পনায় মোট ব্যয় বরাদ্দ ছিল ২৩৭৮ কোটি টাকা কিন্তু প্রকৃত ব্যয় হইয়াছিল মাত্র ২০১২ কোটি টাকা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সকল নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা পূরণে পরিকল্পনা সাফল্য লাভ করে নাই। পরিকল্পনা রচনার ত্রুটির জন্যই এই সকল কার্যসূচী বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভবপর হয় নাই। তৃতীয়ত, দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের (physical resources) হিসাব লইয়া পরিকল্পনা না করিয়া আর্থিক সম্পদেব (financial resources) উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করা হইয়াছে। চতুর্থত কৃষির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করায় বৃহৎ শিল্পগুলি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইয়াছিল, এমন কি ইহাদের উন্নয়নের জন্য যৎসামান্য টাকাও ব্যয় করা হয় নাই। অধিকন্তু শিল্পোন্নয়নের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে বেসরকারী উদ্যোগের উপর ছাড়িয়া দেওয়াও ঠিক হয় নাই। পরিশেষে, পরিকল্পনায় কৃষি উন্নয়নের জন্য দীর্ঘকালীন প্রকল্পের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করায় কৃষি উৎপাদন আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় নাই। কৃষির উপর গুরুত্ব

আরোপ করা হইলেও ফসল পরিকল্পনার (crop planning) কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই এবং ফসল বীমাকরণ কৃষি পরিকল্পনায় স্থান লাভ করে নাই।

এই সকল ত্রুটি সত্ত্বেও প্রথম পরিকল্পনা ভারতের পরিকল্পিত অগ্রগতির পথে নির্ভুল পদক্ষেপ। পরিকল্পনা কমিশন বলিয়াছেন যে, পরিকল্পনা জনসাধারণের মধ্যে অভূতপূর্ব উদ্দীপনা ও উৎসাহের সৃষ্টি করে। স্থিতিশীল ভারতীয় অর্থব্যবস্থায় প্রথম পরিকল্পনা নূতন প্রেরণা এবং গতিবেগের সঞ্চার করিয়াছিল।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ১৯৫৬-৬১ (Second Five Year Plan, 1956-61) ঃ ১৯৫৬ সালের ৩১শে মার্চ প্রথম পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হইলে দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যকাল সুরু হয়; ইহার কার্যকাল হইল ১৯৫৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৬১ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত। দ্বিতীয় পরিকল্পনা চলাকালীন অবস্থায় বৈদেশিক মুদ্রাসংকট চরমে ওঠায় এবং অনুমিত ব্যয় অপেক্ষা অধিক ব্যয় হওয়ায় ১৯৫৮ সালে পরিকল্পনার কাঁট ছাঁট এবং পরিবর্তন করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রথম পরিকল্পনা অপেক্ষা অধিকতর উচ্চকাঙ্ক্ষী এবং সাহসিকতাপূর্ণ ছিল।

উদ্দেশ্য (Objectives) ঃ দ্বিতীয় পরিকল্পার মূল উদ্দেশ্য ছিল চারটি : (১) পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয় ২৫ শতাংশ বাড়াইয়া জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা। প্রথমপরিকল্পনা মোটামুটিভাবে সফল হইলেও জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান মোটেই উন্নত হয় নাই। সেই কারণে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের উপর দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। (২) ভারী ও মূল শিল্পগুলির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া দ্রুততর গতিতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্প সম্প্রসারণ করিতে হইবে। প্রথম পরিকল্পনায় কৃষিকে অগ্রাধিকার দেওয়ায় শিল্পোন্নয়নের উপর যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করা সম্ভবপর নাই। (৩) কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা পরিকল্পনার একটি মূল লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করা হয়। এই পরিকল্পনায় ৮০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির কথা বলা হয়। প্রথম পরিকল্পনায় প্রত্যক্ষভাবে নিয়োগ বৃদ্ধির কোন লক্ষ্য ছিল না কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার অন্যতম মূল উদ্দেশ্যই হইল কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা। (৪) আয় ও ধনবৈষম্য হ্রাস করিয়া সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের আদর্শ এই পরিকল্পনার অন্যতম মূল উদ্দেশ্য। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ বলিতে বুঝায় যে সমাজের কাঠামোকে এরূপভাবে পরিবর্তিত করিতে

হইবে যাহাতে জাতীয় আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে আয় ও সম্পদ বণ্টনে অধিকতর সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজের সকল অর্থ যাহাতে মুষ্টিমেয় কয়েক ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত না হইতে পারে সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া সরকারী নীতি নির্ধারণ করিতে হইবে। সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করিতে হইবে এবং বেসরকারী উদ্যোগকে সমাজ অনুমোদিত পথে পরিচালিত করিতে হইবে।

গভীরভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে উদ্দেশ্যগুলি পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্ত। জাতীয় আয় বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন আবার উৎপাদন এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিবার জন্য প্রয়োজন সামাজিক মূলধন, খনিজ সম্পদ ও মূলশিল্পের সম্প্রসারণ। এই কারণে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পায়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছিল। মোট ব্যয়বরাদ্দের ১৮ শতাংশ ভারী ও মূলশিল্পে বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের জন্য ৬৯০ কোটি টাকা ব্যয়ের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাহা মূল নীতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রথম পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল অর্থব্যবস্থার মৌল অভাবগুলি দূর করা। দ্বিতীয় পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হইল শিল্পায়ন। শিল্পায়ন না হইলে দ্রুত অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ ঘটিতে পারে না। দ্রুত শিল্পায়ন না হইলে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কর্মসংস্থানের কোন উপায় নাই এবং অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে কৃষি হইতে শিল্পে সরাইয়া না লইলে জীবনযাত্রার মান উন্নত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। ইহা ব্যতীত শিল্পোন্নতি না হইলে কৃষিজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে না, ফলে কৃষিজ পণ্যের দাম হ্রাস পাইবে এবং ইহা সমগ্র অর্থনীতিতে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হইল শিল্পোন্নয়ন ত্বরান্বিত করা যাহাতে মূলধনের ভিত্তি দৃঢ় হয়, উৎপাদন ক্ষমতা সম্প্রসারিত হয়, কারিগরী ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং নূতন বিনিয়োগ প্রবাহ দ্রুততর হয়।

শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করিতে হইলে লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা, সিমেণ্ট, ভারী রসায়ন প্রভৃতি শিল্পের উন্নতি করা প্রয়োজন কারণ ইহারা মূলধনী সরঞ্জাম উৎপাদনে সহায়তা করিবে। মূল এবং ভারীশিল্পগুলি মূলধন-প্রগাঢ় (capital-intensive) বলিয়া ইহারা অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করিতে পারে না। মূল ও ভারীশিল্পে বিনিয়োগ হইলে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা এবং ভোগ্য পণ্যের জন্য চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে কিন্তু স্বল্পকালীন সময়ে উহাদের যোগান বৃদ্ধি পাইবে

না। সুতরাং সমতাপূর্ণ শিল্পায়নের (balanced development) জন্য অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বর্ধিত ভোগ্য-পণ্যের চাহিদা পূরণ করা ছাড়াও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছিল। এই সময় ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের উন্নতির জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়, অবশ্য প্রকৃত ব্যয় হইয়াছিল মাত্র ১৭৫ কোটি টাকা। কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প যদি দেশের ভোগ্যপণ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইতে পারে তবে মূল শিল্পগুলির উন্নতি ত্বরান্বিত হইবে। সমতাপূর্ণ শিল্পায়নের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে ভারী ও মূলশিল্প এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলির যুগপৎ উন্নয়নের চেষ্টা করা হইয়াছে।

ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ রাখিয়া পরিকল্পনা কমিশন কৃষির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। ভারতের গ্রামাঞ্চলেই ছদ্মবেশী বেকার তথা অর্ধবেকারদের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক। ইহারা পূর্ণ কর্মসংস্থানের জন্য আগ্রহী হইলেও নিজস্ব পরিবেশ ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে অনিচ্ছুক। ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের উপর গুরুত্ব যে দেওয়া হইয়াছে তাহাতে একই সঙ্গে অর্ধনিয়োগ সমস্যার সমাধান হইবে এবং ভোগ্যপণ্যের যোগান বৃদ্ধি পাইবে।

পরিকল্পনার অর্থসংস্থান (Financing the Plan): দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে ৪৮০০ কোটি টাকা এবং বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে ২৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। সরকারীখাতে যে ৪৮০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় তাহা নিম্নলিখিত সূত্রসমূহ হইতে সংগ্রহ করা হয়ঃ

আয়ের উৎস	কোটি টাকা
১। অভ্যন্তরীণ ঋণ	১২০০
২। ঘাট্‌তি ব্যয়	১২০০
৩। চল্‌তি রাজস্ব হইতে উদ্বৃত্ত (নূতন ও পুরাতন কর)	৮০০
৪। বৈদেশিক সাহায্য	৮০০
৫। অন্যান্য অভ্যন্তরীণ উৎস (প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, রেলপথ ইত্যাদি)	৪০০
৬। ঘাটতি—অভ্যন্তরীণ অন্যান্য উপায়ের সাহায্যে পূরণ করিতে হইবে	৪০০
মোট	৪৮,০০ কোটি টাকা।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার পুনর্বিচার (Reappraisal of the Second Plan) **:** অভিযোগ করা হয় যে প্রথম পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অতিশয় সংযত ছিল। ইহা শেষ হইলে উৎসাহের আতিশয্যে অতিরিক্ত উচ্চকাঙ্ক্ষী দ্বিতীয় পরিকল্পনা রচনা করা হয়। কি কি কাজ করা উচিত তাহার তালিকা প্রস্তুত করিতেই পরিকল্পনা রচয়িতাগণ এরূপ ব্যস্ত ছিলেন যে সেগুলি কি উপায়ে কার্যকর করা যাইতে পারে সে কথা বিস্তারিত ভাবে চিন্তা করিবার অবসর পান নাই। নৈসর্গিক কারণ এবং মজুতদারীর জন্য খাদ্যসংকট, বৈদেশিক মুদ্রাসঞ্চয়ের ঘাটতি পরিবহন ও যোগাযোগের বাধা এবং অর্থনীতির বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব—এই সকল কারণ ভারতীয় অর্থনীতিতে চাপের সৃষ্টি করে। একদিকে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির দরুণ চাহিদা বৃদ্ধি আর অপর দিকে বেসরকারী শিল্পের সামঞ্জস্যহীন অগ্রগতি দেখা দেয়। শিল্প বিরোধ, কাঁচামালের অভাব ইত্যাদি কারণে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রবর্তনের পর থেকেই বিশেষ অসুবিধা দেখা দেয় এবং উহা ক্রমে সংকটের আকার ধারণ করে। ইহাকে পরিকল্পনা রচয়িতাদের "উচ্চাকাঙ্ক্ষার সংকট" (crisis of ambition) বলিয়া বর্ণনা করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের হিসাবে ভুলভ্রান্তি এরূপ সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল যে পরিকল্পনার দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯৫৮ সালের মে মাসে পরিকল্পনা কমিশন এবং জাতীয় উন্নয়ন কাউন্সিল (National Development Council) দ্বিতীয় পরিকল্পনার পুনর্বিচার করিতে বাধ্য হয়। পরিকল্পনার সাফল্যের সর্তগুলি হইল পর্যাপ্ত পরিমাণে কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন, অনুমিত বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তি, যথেষ্ট পরিমাণে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বৃদ্ধি এবং মোটামুটি স্থিতিশীল মূল্যস্তর। বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায় যে উল্লিখিত সর্তগুলির কোনটাই পূরণ হয় নাই।

খাদ্যশস্যের উৎপাদন আশানুরূপ না হওয়ায় বিদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরেই খাদ্যদ্রব্যের জন্য ১২৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়।

অভ্যন্তরীণ সূত্র হইতে সঞ্চয় আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় নাই। হিসাব করা হইয়াছিল যে বৎসরে গড়ে ২৫০ কোটি টাকা সঞ্চিত হইবে সুতরাং দুই বৎসরে ৫০০ কোটি টাকা সঞ্চয় হওয়ার কথা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রথম দুই বৎসরে মোট সঞ্চয় হইয়াছিল মাত্র ৩২৭ কোটি টাকা।

বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণও আশানুরূপ হয় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরু থেকেই লেনদেন উদ্বৃত্ত প্রতিকূল হইতে আরম্ভ করে। হিসাব করা হইয়াছিল যে পরিকল্পনাধীন সময়ে মোট প্রতিকূল উদ্বৃত্ত হইবে ১১০০ কোটি টাকা কিন্তু প্রথম দুই বৎসরেই ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৪৯ কোটি টাকা

পরিশেষে, বিরাট পরিমাণ ঘাটতি ব্যয়ের ফলে দেশে মুদ্রাস্ফীতির চাপ প্রবল আকার ধারণ করে। ১৯৫৭ সালে মূল্যস্তর ১৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়; মূল্যস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ইহার সমানুপাতে পরিকল্পনার ব্যয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই সময়ে সুয়েজ সংকট দেখা দেয় যাহার দরুণ আমদানীকৃত দ্রব্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পরিকল্পনার যে কার্যসূচী ৪৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ে পূরণ হবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছিল, মুদ্রাস্ফীতির দরুণ সেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করিতেই ৫৪০০ কোটি টাকা লাগিবে।

এই সকল কারণে ১৯৫৮ সালের যে মাসে মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনার কিছু কাটছাঁট করিয়া পরিবর্তন করা হয়। পরিবর্তনের দরুণ পরিকল্পনাকে দুই অংশে বিভক্ত করা হয়—প্রথম অংশের জন্য ব্যয় বরাদ্দ হয় ৪৫০০ কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় অংশের জন্য ব্যয় বরাদ্দ হয় ৩০০ কোটি টাকা। মোট ব্যয় বরাদ্দ ৪৮০০ কোটি টাকাই রাখা হয়। প্রথম অংশে আছে জরুরী কার্যক্রম যাহাদের কাজ বহুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। এখন প্রথম অংশে বরাদ্দ টাকা ব্যয় করার পর সহায়সম্পদে সঙ্কুলান হইলে তবেই দ্বিতীয় অংশে হাত দেওয়া হইবে। প্রথম অংশের অন্তর্ভুক্ত পরিকল্পনাগুলিকে মূল পরিকল্পনা (core projects) বলে। মূল পরিকল্পনার মধ্যে রহিয়াছে (১) দুর্গাপুর, ভিলাই ও রাউরকেল্লার ইস্পাত কারখানা, (২) ১২টি বিদ্যুৎ-উৎপাদন কর্মসূচী (৩) জাতীয় উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রস্তাবিত কয়লাখনিসমূহ (৪) রেল ও বন্দর উন্নয়ন কর্মসূচী এবং (৫) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহ। নানারূপ বিচার বিবেচনার পর পরিশেষে দ্বিতীয় পরিকল্পনার ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ ৪৫০০ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৪৬০০ কোটি টাকা করা হয়। মূল বরাদ্দ ও পুনর্বিচারের পর বরাদ্দ নিম্নলিখিতরূপ হইবে:

উন্নয়নক্ষেত্র	মূলবরাদ্দ (কোটি টাকা)	পুনর্বিচারের পর বরাদ্দ (কোটি টাকা)
১। কৃষি ও সমাজোন্নয়ন	৫৬৮	৫৩০
২। সেচ ও বিদ্যুৎ	৯১৩	৮৬৫

৩।	শিল্প ও খনি	৮৯০	১০৭৫
৪।	পরিবহন	১৩৮৫	১৩০০
৫।	সমাজসেবা	৯৪৫	৮৩০
৬।	বিবিধ	৯৯	
		মোট ৪৮০০	৪৬০০

দ্বিতীয় পরিকল্পনার ফলাফল (Achievements of the Second Five Year Plan) **:** উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রের অগ্রগতি পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে দ্বিতীয় পরিকল্পনার ফলাফল বিশেষ সন্তোষজনক হয় নাই। এই পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল জাতীয় আয় ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি করা। কিন্তু সেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয় নাই—জাতীয় আয় ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতের জাতীয় আয় ছিল ১০,৫৮০ কোটি টাকা, ১৯৬০-৬১ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১২,৭৫০ কোটি টাকায় আসিয়া দাঁড়ায়। ১৯৫৫-৫৬ সালে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ছিল ২৬৭·৮ টাকা, ১৯৬০-৬১ সালে উহা ২৯৩·৭ টাকায় আসিয়া দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষিজ উৎপাদনের পরিমাণও আশানুরূপ হয় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় খাদ্যশস্যের লক্ষ্যমাত্রা ৮ কোটি ৫০ লক্ষ টনে ধার্য ছিল কিন্তু কার্যতঃ উৎপাদন হয় মোট ৭ কোটি ৬০ লক্ষ টন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে দ্বিতীয় পবিকল্পনায় খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয় নাই। এই পরিকল্পনাকালে সমবায়ের উন্নতি বেশ সন্তোষজনক হয়। পরিকল্পনার শেষে প্রাথমিক কৃষিসমবায় সমিতির সংখ্যা দাঁড়ায় ২,১০,০০০ ; ইহা ব্যতীত এই সময় ১৮৬০টি সমবায় বিক্রয় সমিতি স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৩৫ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয় কিন্তু উহা মাত্র ২৩ লক্ষ কিলোওয়াট বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৬০-৬১ সালে ৫৭ লক্ষ কিলোওয়াটে আসিয়া দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ১০০০টি ক্ষুদ্র কারখানা লইয়া ৬০টি শিল্প-তালুকের প্রতিষ্ঠা হয়। কয়লার উৎপাদন লক্ষ্য ছিল ৬ কোটি টন কিন্তু প্রকৃত উৎপাদন হয় মাত্র ৫ কোটি ৪৪ লক্ষ টন। ইস্পাতপিণ্ডের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪৫ লক্ষ টন কিন্তু প্রকৃত উৎপাদন হয় মাত্র ৩৫ লক্ষ টন।

মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এক কোটি লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থার কথা বলা হয় কিন্তু পরে উহাকে কমাইয়া ৮০ লক্ষ করা হয়। হিসাব করিয়া দেখা

গিয়াছে যে কৃষি-বহির্ভূত ক্ষেত্রে ৬৫ লক্ষ এবং কৃষিক্ষেত্রে ২৫ লক্ষ এই মোট ৯০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। অবশ্য নূতন কর্মসংস্থানের কতোখানি স্থায়ী নিয়োগ (sedimentary) আর কতোখানি অস্থায়ী (revolving) তাহা হিসাব করা হয় নাই।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ১৯৬১-৬৬ (Third Five Year Plan, 1961-66) : পরিকল্পনার প্রথম দশ বৎসরে ভারতের অর্থনীতিতে যে সম্প্রসারণশীলতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহারই উপর নির্ভর করিয়া এবং পূর্বতন দুইটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করিয়া ভারতের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা খসড়া রচিত হয়। ১৯৬১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৬৬ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকাল। তৃতীয় পরিকল্পনার সাফল্যের পথে দুইটি বিরাট বাধা আসিয়া পড়ে। ১৯৬২ সালে অতর্কিতে ভারত চীন কর্তৃক আক্রান্ত হয় এবং পরিকল্পনার শেষ বৎসরে পাক-ভারত সংঘর্ষ দেখা দেয়। এই অবস্থায় ভারতের পক্ষে, প্রতিরক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি অপরিহার্য হইয়া পড়ে এবং ইহার দরুন স্বভাবতই উন্নয়নী কার্যসূচী ব্যাহত হয়।

উদ্দেশ্য (Objectives) **:** যুদ্ধোত্তর দেশবিভাগের সংকটে অর্থনৈতিক অবস্থায় যে অসমতার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা দূর করিয়া জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তি স্থাপন করাই ছিল প্রথম পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের গতিবেগ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করাই হইল দ্বিতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। তৃতীয় পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হইল স্বয়ং-নির্ভরশীল সম্প্রসারণের (self-sustaining growth) সৃষ্টি করা। স্বয়ংনির্ভরশীল অর্থনৈতিক উন্নয়নের দ্বারা ৩৪ কোটি নরনারীর সুস্থ ও সুন্দর জীবনযাপনের সুযোগ দানই তৃতীয় পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য।

এই মূল লক্ষ্যকে কার্যকরী করার জন্য তৃতীয় পরিকল্পনা কালে পাঁচটি পন্থা গ্রহণ করা হয়। প্রথমত, পরিকল্পনাকালে বৎসরে ৫ শতাংশ হারে জাতীয় আয়, ৪ শতাংশ হারে ভোগ্যব্যয় এবং ১৪ শতাংশ হারে সঞ্চয় বৃদ্ধি করা হইবে। দ্বিতীয়ত, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং শিল্প ও রপ্তানীর ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের মতো কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি করা। তৃতীয়ত:, ইস্পাত, জ্বালানী, বিদ্যুৎ, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি মূল শিল্পগুলির সম্প্রসারণ করিয়া যন্ত্রপাতির উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াইতে হইবে যাহাতে আগামী

দশ বৎসরের মধ্যেই দেশে নিজ শক্তিতে শিল্পায়ন সম্ভবপর হইবে। চতুর্থতঃ, দেশের জনশক্তির পূর্ণব্যবহার করিয়া সর্বাধিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। পরিশেষে, সুযোগসুবিধা ভোগের ব্যাপারে ক্রমান্বয়ে অধিকতর সমতা আনয়ন করিতে হইবে এবং আয়বৈষম্য ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন হ্রাস করিয়া সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর সমাজ গঠনের পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

এইবার পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যাক। পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলিকে ব্যাখ্যা করিলেই উহার বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল স্বয়ংনির্ভরশীল সম্প্রসারণ। স্বয়ংনির্ভরশীল অর্থব্যবস্থা বলিতে আমরা সেই অর্থনীতিকে বুঝিব সেখানে প্রয়োজনীয় উন্নয়নের হার নিজস্ব সম্পদ দ্বারাই সম্ভব হইবে। স্বয়ংনির্ভরশীল সম্প্রসারণের জন্য উৎপাদনের হারবৃদ্ধি, খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন এবং মূল শিল্প সম্প্রসারণ প্রয়োজন।

স্বয়ংনির্ভরশীলতার লক্ষ্যে পৌঁছাইতে হইলে জাতীয় আয় দ্রুত হারে বৃদ্ধি করিতে হইবে। জাতীয় আয় বৃদ্ধি করিতে হইলে বিনিয়োগ হারকে বৃদ্ধি করিতে হইবে আর বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। স্বয়ংনির্ভরশীল সম্প্রসারণের দ্বিতীয় সর্ত হইল খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করা। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৎসরে ৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু ইহা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয় বলিয়া তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া দ্বিগুণ করিবার নীতি গৃহীত হয়। খাদ্যশস্য ব্যতীত অন্যান্য কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করাও প্রয়োজন কারণ শিল্পের কাঁচা মালের যোগান এবং রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পরিমাণ বাড়াইবার জন্য উহা প্রয়োজন। স্বয়ং নির্ভরশীল সম্প্রসারণের তৃতীয় সর্ত হইল মূল ও ভারী শিল্পের সম্প্রসারণ। বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা কমাইতে হইলে ইস্পাত, জ্বালানী, বিদ্যুৎশক্তি, রসায়ন, যন্ত্রপাতি নির্মাণ প্রভৃতি মূল ও ভারী শিল্পগুলিকে সম্প্রসারিত করিতে হইবে।

দ্বিতীয়ত, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে কৃষিজ উৎপাদনের হার কম বলিয়াই দেশের ব্যাপক উন্নতি হয় নাই। তৃতীয়

পরিকল্পনায় কৃষি ও সমাজোন্নয়ন খাতে মোট সরকারী বরাদ্দের পরিমাণ ছিল মোট বিনিয়োগের ১৪ শতাংশ। খাদ্যশস্যের উৎপাদনে ভারত স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না বলিয়া বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য আমদানী করিতে হয়। ইহার ফলে যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় হয় তাহার দ্বারা যন্ত্রপাতি আমদানী করিতে পারিলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুততর হইতে পারিত। কৃষির উন্নতি সাধন করিয়া গ্রামীণ অর্থনীতিতে বৈচিত্র্য আনিতে হইবে এবং কৃষির উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যার অনুপাত ক্রমশ হ্রাস করিতে হইবে।

তৃতীয়ত, তৃতীয় পরিকল্পনা সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের একটি অগ্রবর্তী পদক্ষেপ। সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর সমাজ গড়িবার পথে প্রথম প্রয়োজন হইল প্রগতিশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রসার। ইহা ব্যতীত সকলের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি করিতে হইবে। তবে প্রথমেই খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং ন্যূনতম আয়ের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন: পরিশেষে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য দূর করা ছাড়াও দেখিতে হইবে যে দ্রুত অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের দরুণ সকল অর্থনৈতিক ক্ষমতা যেন মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত না হইয়া পড়ে। এই উদ্দেশ্যে মূলধন লাভ, ফটকা-বাজী প্রভৃতি সীমিত করিয়া রাষ্ট্রকে তাহার প্রাপ্য অংশ গ্রহণে উদ্যোগী হইতে হইবে। অত্যাবশ্যক খাদ্যদ্রব্যের দাম যাহাতে স্থিতিশীল হয় এবং দরিদ্র জনগণের আয়ত্তে থাকে তাহার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। বেকারদিগের যতদূর সম্ভব কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম ও নগরাঞ্চলের লোকের মধ্যে আয়ের পার্থক্য বাড়িতে থাকে। গ্রামে ক্ষুদ্রশিল্প প্রসার এবং কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে এই বৈষম্য হ্রাস করিতে হইবে।

চতুর্থত, পরবর্তী তিনটি অর্থাৎ চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ পরিকল্পনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তৃতীয় পরিকল্পনা রচনা করা হইয়াছে। পরবর্তী তিনটি পরি-কল্পনার মধ্যেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগাইতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে ব্যাপকতর ভিত্তি রচনা করিয়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অগ্রসর হইতে হইবে যাহাতে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দেশ স্বাবলম্বী এবং স্বয়ংনির্ভরশীল হইয়া ওঠে।

পঞ্চমত, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ভারতে পরিকল্পনার অন্যতম মূল লক্ষ্য। বেশ খানিকটা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরই দেশের জনশক্তির পূর্ণ ব্যবহার সম্ভবপর।

যাহা হউক, কর্মপ্রার্থীর সংখ্যাবৃদ্ধির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কর্মসংস্থানের সুযোগবৃদ্ধি তৃতীয় পরিকল্পনার অন্যতম মূল লক্ষ্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনা কালে মোট বেকারের সংখ্যা ২ কোটি ৬০ লক্ষ বলিয়া হিসাব করা হয়। এই সময়ে ১ কোটি ৪০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয় অর্থাৎ তৃতীর পবিকল্পনার পরও দেশে ১ কোটী ২০ লক্ষ বেকার থাকিয়া যাইবে।

ষষ্ঠতঃ, তৃতীয় পরিকল্পনায় শিক্ষা ও অন্যান্য সমাজকল্যাণমূলক কাজের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। সমাজসেবা ও অন্যান্য খাতে মোট বিনিয়োগের ১৭ শতাংশ বরাদ্দ করা হইয়াছে। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের আদর্শ রূপায়ণের জন্য সমজকল্যাণমূলক ব্যয় বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

পরিশেষে, তৃতীয় পরিকল্পনায় বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সমতা আনয়নের চেষ্টা করা হইয়াছে, পরিকল্পনা কাযসূচীকে এরূপভাবে রচনা করা হইয়াছে যাহাতে পশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলির অগ্রগতি দ্রুততর হয়। পরিকল্পনার ফলাফল যাহাতে সকলেই সমানভাবে ভোগ করিতে পারে সেদিকেও লক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে।

অর্থসংস্থান (Financing the Plan): তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়া রচনার সময় ৭৫০০ কোটি টাকা প্রয়োজন হইবে বলিয়া হিসাব করা হয়। কিন্তু অল্প সময়েব মধ্যে দুইবার বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার পর সংশোধিত হিসাবে দেখা গেল যে তৃতীয় পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য ৮৬৩০ কোটি টাকার প্রয়োজন হইবে। অর্থসংস্থানের সূত্রগুলি নিম্নে দেখানো হইল:

উৎসসমূল	প্রাথমিক হিসাব (কোটি টাকা)	চূড়ান্ত হিসাব (কোটি টাকা)
১। কররাজস্ব হইতে উদ্বৃত্ত	৫৫০	৪৭০
২। রেলপথ প্রদত্ত অর্থ	১০০	৮০
৩। অন্যান্য সরকারী বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের মুনাফা	৪৫০	৩৭৫
৪। জনগণের নিকট হইতে ঋণ	৮০০	৯১৫
৫। স্বল্প সঞ্চয়	৬০০	৫৮৫
৬। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড	২৬৫	৩৪০

উৎসমূল	প্রাথমিক হিসাব কোটি টাকা	চূড়ান্ত হিসাব কোটি টাকা
৭। বাধ্যতামূলক আমানত এবং আমানত	—	১১৫
৮। ইস্পাত সমীকরণ তহবিল	১০৫	৩৫
৯। বিবিধ মূলধনী আয় (Capital Receipts)	১৭০	১৪০
১০। অতিরিক্ত কর	১৭১০	২৮৮০
১১। বৈদেশিক সাহায্য	২২০০	২৪৫৫
১২। ঘাটতি ব্যয়	৫৫০	১১৫০
মোট—	৭৫০০	৮৬৩০

তৃতীয় পরিকল্পনার অগ্রগতি (Progress of the Third Five Year Plan) : তৃতীয় পরিকল্পনার সুরুতে ভারত প্রতিবেশী রাষ্ট্র চীন কর্তৃক অতর্কিতে আক্রান্ত হয় এবং পরিকল্পনার শেষ পর্যায়ে পাক-ভারত সংঘর্ষ দেখা দেয়। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যসূচী ব্যাহত হয়। পরিকল্পনা কমিশন স্বীকার করে উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়া কৃষি, জলসেচ, বিদ্যুৎ, সংগঠিত শিল্প এবং গৃহনির্মাণ ক্ষেত্রে পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয় নাই। অবশ্য সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে মোট ব্যয় অনুমিত ব্যয় অপেক্ষা অধিক হইয়াছে। সরকারী ক্ষেত্রে মোট ব্যয় ৭৫০০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছিল কিন্তু প্রকৃত ব্যয় ৮৬৩০ কোটি টাকা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে ১১৩০ কোটি টাকা, দ্বিতীয় বৎসরে ১৪১৪ কোটি টাকা, তৃতীয় বৎসরে ১৬৫৪ কোটি টাকা এবং শেষ দুই বৎসরে ৪৪৩২ কোটি টাকা ব্যয় হয়; ফলে সরকারী খাতে মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৬৩০ কোটি টাকা।

এই পরিকল্পনাকালে আর্থনীতিক সম্প্রসারণের হার ছিল অত্যন্ত মন্থর। জাতীয় আয় বৃদ্ধি আশানুরূপ হয় নাই। এই পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল জাতীয় আয় বার্ষিক ৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি করা কিন্তু পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে জাতীয় আয় ২·২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায়। জনসংখ্যা বৎসরে ২·২ শতাংশ হারে বাড়িতেছিল, জাতীয় আয় ওই একই হারে বৃদ্ধি পাইলে মাথাপিছু আয় আদৌ বৃদ্ধি পাইবে না। অবশ্য পরবর্তী দুই বৎসরে জাতীয় আয় বৃদ্ধির

হার অধিক ছিল—যথাক্রমে ৪·৫ শতাংশ এবং ৭·৩ শতাংশ। পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে জাতীয় আয় ১৭ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছিল কিন্তু পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল জাতীয় আয় ওই সময়ে ২৩ শতাংশ বৃদ্ধি করা। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার আরও নৈরাশ্যজনক—পরিকল্পনার প্রথম চার বৎসরে বার্ষিক ১·৮ শতাংশ হারে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায়। পরিকল্পনায় সরকারী খাতে ৭৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হইলেও কার্যত: মোট বিনিয়োগের পরিমাণ অনেক বেশী হয়—৮৬৩০ কোটি টাকা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হইলেও জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয় নাই।

পরিকল্পনাকালে কৃষিক্ষেত্রে ব্যর্থতা জাতীয় আয় বৃদ্ধির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। পরিকল্পনায় কৃষি উৎপাদনের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ৬ শতাংশ হারে ধার্য করা হয়। কিন্তু কার্যত: ১৯৬১-৬২ সালে কৃষিউৎপাদন মাত্র ১ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায় এবং পরবর্তী বৎসরে ৩ শতাংশ হ্রাস পায়। কৃষি-উৎপাদনের ব্যর্থতার কারণ প্রাকৃতিক বিপর্যয়। কৃষি-উৎপাদনের ব্যর্থতার দরুন দেশে চরম খাদ্য সংকট দেখা দেয়। ১৯৬১-৬২ সালে কৃষি-উৎপাদনের সূচকসংখ্যা ছিল ১৪১·৪, ১৯৬২-৬৩ সালে উহা হ্রাস পাইয়া ১৩৬·৮ হয়, ১৯৬৩-৬৪ সালে বৃদ্ধি পাইয়া উহা ১৪০·৫-এ আসিয়া দাঁড়ায়, পরবর্তী বৎসর অর্থাৎ ১৯৬৪-৬৫ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া উহা ১৫০-এ আসিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু ১৯৬৫-৬৬ সালে পুনরায় কৃষি-উৎপাদন সূচী হ্রাস পায়।

১৯৬১-৬২ সালে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৭·৯৭ কোটি টন। ১৯৬২-৬৩ সালে উহার পরিমাণ হয় ৭·৭৫ কোটি টন, ১৯৬৩-৬৪ সালে হয় ৭·৯৪ কোটি টন। ১৯৬৪-৬৫ সালে হয় ৮·৮৪ কোটি টন কিন্তু ১৯৬৫-৬৬ সালে উহা হ্রাস পাইয়া ৭·৩ কোটি টনে আসিয়া দাঁড়ায়। অনুমান করা হইয়াছিল যে তৃতীয় পরিকল্পনা কালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১০ কোটি টন হইবে কিন্তু কার্যত: পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয় নাই।

কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সেচব্যবস্থার প্রসার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই ক্ষেত্রেও পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয় নাই। অতিরিক্ত ১২৮ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ ব্যবস্থা প্রসারের লক্ষ্যমাত্রা গৃহীত হইলেও প্রকৃতপক্ষে মাত্র ৬০ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ ব্যবস্থা প্রসারিত হইয়াছিল।

শিল্পক্ষেত্রে বার্ষিক ১১ শতাংশ শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য

ছিল কিন্তু পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে শিল্প উৎপাদন যথাক্রমে ৭ শতাংশ এবং ৭·৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী তিন বৎসরে শিল্প-উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ৮·৫ শতাংশ ৭ শতাংশ এবং ৪ শতাংশ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শিল্পক্ষেত্রেও উৎপাদন আশানুরূপ হয় নাই।

পরিবহন ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে অগ্রগতি সন্তোষজনক হইয়াছিল। রাস্তা নির্মাণ, জাহাজ নির্মাণ, বন্দর সম্প্রসারণ, বেসামরিক বিমান চলাচল এবং ডাক ও তার সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হইয়াছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি। পরিকল্পনায় ১২৭ লক্ষ কিলোওয়াট উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য ছিল কিন্তু প্রকৃত উৎপাদন হইয়াছিল মাত্র ১০২ লক্ষ কিলোওয়াট।

শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিকল্পনার অগ্রগতি আশাতিরিক্ত হইয়াছিল। শিক্ষার সকল পর্যায়ের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হইয়াছিল। এই সময়ে স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি করা হয়। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে নার্স এবং ধাত্রী ছাড়া অন্য সকল লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হইয়াছিল। গৃহনির্মাণ ক্ষেত্রে পরিকল্পনার অগ্রগতি বিশেষ উৎসাহজনক নয়। গৃহনির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা ৪ লক্ষে ধার্য করা হইলেও প্রকৃতপক্ষে মাত্র ২ লক্ষ গৃহ নির্মিত হয়।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে মূল্যস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ফলে মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত শ্রেণীর জীবনধারণ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িতেছে। মূল্যস্তর বৃদ্ধির কারণ হইল (ক) কৃষি-উৎপাদনের ব্যর্থতা, (খ) ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের স্বল্পতা এবং (গ) অতিরিক্ত ঘাটতি ব্যয়; তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়ায় ৫৫০ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ ধার্য করা হইলেও প্রকৃত ঘাটতি ব্যয় অনেক বেশী হয়—১১৩৩ কোটি টাকা, (ঘ) ১৯৬৬ সালের মুদ্রামান হ্রাসও মূল্যবৃদ্ধিতে ইন্ধন যোগায়।

তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৬৬-৬৯) (Three Annual Plans) ১৯৬৫-৬৬ সালে তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকাল শেষ হইলেও নানা অসুবিধার দরুণ চতুর্থ পরিকল্পনার কাজ সুরু করা সম্ভবপর হয় নাই। অবশ্য এই সময়ে উন্নয়নের কাজ বন্ধ রাখা হয় নাই তবে উহা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে না হইয়া পর পর তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে চলে। বার্ষিক পরিকল্পনাগুলির উদ্দেশ্য ছিল চতুর্থ পরিকল্পনা সুরু না হওয়া পর্যন্ত উন্নয়নের কার্যধারাকে অব্যাহত রাখা। তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনায় যথাক্রমে ২০৮২

কোটি টাকা, ২২৪৬ কোটি টাকা এবং ২৩৩৭ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়।

১৯৬৮-৬৯ সালের বার্ষিক পরিকল্পনা শেষ হইবার পরই চতুর্থ পরিকল্পনার কাজ সুরু হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ পরিকল্পনার মধ্যবর্তী সময়কে "পরিকল্পনা বিরতির কাল (Plan holiday) বলা ঠিক হইবে না। অবশ্য বার্ষিক পরিকল্পনা কালে যে বিনিয়োগের গতিধারা মন্থর হইয়া যায় তাহা অনস্বীকার্য আর এই কারণেই তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে দেশে মন্দাজনিত সংকট তীব্র আকারে দেখা দেয়।

এই পরিকল্পনাগুলির ব্যয়নির্বাহের জন্য অভ্যন্তরীণ উৎসসমূহ হইতে ৩৬৪৮ কোটি টাকা, বৈদেশিক সাহায্য বাবদ ২৪২৬ কোটি টাকা এবং ঘাটতি ব্যয় দ্বারা ৬৮২ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৬৯-৭৪ (Fourth Five Year Plan, 1969-74) : ১৯৬৮-৬৯ সালের বার্ষিক পরিকল্পনা শেষ হইবার পরই চতুর্থ পরিকল্পনার কাজ সুরু হয়। এই পরিকল্পনার কার্যকাল হইল ১৯৬৯ সাল হইতে ১৯৭৪ সাল। এই পরিকল্পনায় মোট ২৪,৮৮২ কোটি টাকা লগ্নী করা হয়। সরকারী খাতে ব্যয় হইবে ১৫,৯০২ কোটি টাকা আর বেসরকারী খাতে ব্যয় হইবে ৮৯৮০ কোটি টাকা। সরকারী খাতে বিনিয়োগ ব্যয় হইবে ১৩,৬৫৫ কোটি টাকা আর চলতি ব্যয় হইবে ২২৪৭ কোটি টাকা।

উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives) : অধ্যাপক গ্যাডগিল চতুর্থ পরিকল্পনা সম্পর্কে দৃষ্টিভংগী (Approach to Fourth Plan) নামে যে দলিল প্রস্তুত করেন মোটামুটি ভাবে তাহাকেই চতুর্থ পরিকল্পনার ভিত্তিস্তম্ভ বলা যায়।

(১) অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার মধ্যে উন্নয়নের গতিবেগ বৃদ্ধি করাই হইল চতুর্থ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। বর্তমান উন্নয়নের হার সকলের জন্য লাভজনক কর্মসংস্থান করার পক্ষে যে যথেষ্ট নয় তাহা স্বীকার করা হইয়াছে। খাদ্যশস্যে স্বয়ম্ভরতার অভাব এবং বৈদেশিক সাহায্যের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা বর্তমান উন্নয়নের অনুচ্চ হারকেও ব্যাহত করিতে পারে। ভারতীয় অর্থব্যবস্থা যাহাতে সুষম গতিতে অগ্রসর হইতে পারে তার জন্যে উন্নয়নের সঙ্গে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা প্রয়োজন। খাদ্যশস্যের দাম যাহাতে স্থিতিশীল রাখা যায় সেই উদ্দেশ্যে খাদ্যের মজুতভাণ্ডার গড়িয়া তুলিতে হইবে। আমাদের জাতীয় পরিকল্পনাগুলির লক্ষ্য কেবলমাত্র জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করা নয়—উন্নয়নের সুফলগুলি যাহাতে অধিকাংশ লোক

ভোগ করিতে পারে, আয় ও জীবনযাত্রাব মানে যে বৈষম্য আছে তাহা যাহাতে হ্রাস পায় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন পদ্ধতি যাহাতে সমাজে অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়া গণতান্ত্রিক সমাজের মূল কাঠামোকে বিপন্ন না করে তাহা দেখাও পরিকল্পনার লক্ষ্য। অন্যভাবে বলা যায় যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই চতুর্থ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। পরিকল্পনার কার্যসূচী এরূপভাবে রচনা করিতে হইবে যাহাতে সমাজের দুর্বলশ্রেণী ও অনুন্নত অঞ্চলগুলি বিশেষভাবে উপকৃত হয়। পরিকল্পনার অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলি নিম্নে বর্ণনা করা হইল ঃ

(২) খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন চতুর্থ পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ; চতুর্থ পরিকল্পনায় খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্য ১২ কোটি ৯০ লক্ষ টন ধার্য করা হয়। খাদ্যশস্য উৎপাদনের বার্ষিক হার হইবে ৫ শতাংশ। কৃষি ও সংশ্লিষ্ট খাতে সরকারী উদ্যোগে ব্যয়বরাদ্দের পরিমাণ হইল ২৭২৮ কোটি টাকা। খাদ্য উৎপাদনের যে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য আছে তাহা পূরণ হইলে ১৯৭৪ সালের পর বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী করিবার প্রয়োজন হইবে না।

(৩) জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি সন্তোষজনক হওয়া প্রয়োজন। এই সময়ে বৎসরে ৫.৫ শতাংশ হারে জাতীয় আয় এবং ৩ শতাংশ হারে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির লক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে। ১৯৭৩-৭৪ সালে জাতীয় আয় ২৮,৮০০ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩৭৯০০ কোটি টাকা হইবে। এই সময়ে মাথাপিছু আয় ৫৪৬ টাকা (১৯৬৮-৬৯) হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৬৩৬ টাকা হইবে। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে জাতীয় আয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিমাণ কি হইবে তাহার হিসাব দেওয়া হইল :

	১৯৬৮-৬৯	১৯৭৩-৭৪
১। জাতীয় আয়	২৮,৮০০ (কোটি টাকা	৩৭,৯০০ কোটি টাঃ
২। জন সংখ্যা	৬২ কোটি ৭০ লক্ষ	
৩। মাথাপিছু আয়	৫৪৬ টাকা	৬৩৬ টাকা
৪। অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় (জাতীয় আয়ের% হিসাবে)	৯ ,,	১৩·২ ,,
৫। নীট বিনিয়োগ (জাতীয় আয়ের % হিসাবে)	১১.৩ ,,	১৪·৫ ,,

(৪) পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হইল অর্থনৈতিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা। এই উদ্দেশ্যে পরিকল্পনায় সাধারণ মানুষ ও সমাজের দুর্বলতম শ্রেণীর কল্যাণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। আয় ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা যাহাতে মুষ্টিমেয় কয়েক ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত না হইতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সরকারী নীতি নির্ধারণ করিতে হইবে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করা প্রয়োজন। চতুর্থ পরিকল্পনায় সরকারী উদ্যোগে যে বিনিয়োগ করা হইয়াছে তাহা মোট বিনিয়োগের ৬০ শতাংশ।

(৫) জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের উপর চতুর্থ পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপর যে গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে তাহা পূর্ববর্তী কোন পরিকল্পনায় দেওয়া হয় নাই। সাধারণ লোক যাহাতে উন্নয়নের ফল ভোগ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে জন্মহার যতদূর সম্ভব হ্রাস করিতে হইবে। জন্মহার ছিল প্রতিহাজারে ৩৯—১৯৭৩-৭৪ সালের মধ্যে উহা ৩২-এ নামাইয়া আনিবার নির্দেশ দেওয়া হয়।

(৬) আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের জন্য রপ্তানী বৃদ্ধি ও আমদানী হ্রাসের উপর চতুর্থ পরিকল্পনায় সমুচিত গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করিয়া পরিকল্পনার অগ্রগতির অনিশ্চয়তা দূর করিতে হইবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৩৫০০ কোটি টাকা, চতুর্থ পরিকল্পনায় উহাকে হ্রাস করিয়া ১৮৫০ কোটি টাকা করা হইবে। বৈদেশিক সাহায্য হ্রাস এবং পরিকল্পনায় বিনিয়োগ বৃদ্ধির দরুন রপ্তানী সম্প্রসারণ করা অধিকতর প্রয়োজন হইবে।

(৭) দ্রব্যমূল্যের স্থায়িত্ব রক্ষা করা চতুর্থ পরিকল্পনার অন্যতম মূল লক্ষ্য। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার মধ্যে উন্নয়নের গতিবেগ ত্বরান্বিত করাই হইল চতুর্থ পরিকল্পনার লক্ষ্য। মূল্যস্তরের ঊর্ধ্বগতি রোধের জন্য চতুর্থ পরিকল্পনায় যথাসম্ভব কম ঘাটতি ব্যয় করিবার কথা বলা হয়, প্রকৃতপক্ষে ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩০০০ কোটি টাকা।

(৮) কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। অতীতে পরিকল্পনা কমিশন পরিকল্পনার সূচনায় পূর্বেকার বেকার ও পরিকল্পনাকালে যে নূতন বেকার সৃষ্টি হইবে তাহার এক হিসাব প্রকাশ করিত। কিন্তু চতুর্থ পরিকল্পনায় পরিকল্পনা কমিশন ইহা নিজে না করিয়া ভগবতী কমিটির উপর এই দায়িত্ব ছাড়িয়া দেয়। এইসময় মোট কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা হইবে ৩ কোটি

৯০ লক্ষ। আশা করা হইয়াছিল এই সময়ে ১ কোটি ৯০ লক্ষ নূতন কর্ম-সংস্থানের সৃষ্টি হইবে।

(৯) চতুর্থ পরিকল্পনায় শিল্প ও সমাজকল্যাণমূলক কাজের উপর পূর্ববর্তী পরিকল্পনাগুলি অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল। সমাজতান্ত্রিকতার আদর্শ রূপায়ণের জন্য শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তপশীলভুক্ত উপজাতি, প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষক প্রভৃতি অর্থনৈতিক দুর্বল শ্রেণীর অবস্থার উন্নতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়; এই সময়ে জেলাভিত্তিক পরিকল্পনা রচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

পরিকল্পনার ব্যয়বরাদ্দ (Outlay of the Plan) ঃ চতুর্থ পরিকল্পনায় সরকারী খাতে মোট ১৫,৯০২ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে। সম্পদ একত্রিকরণ করার ক্ষেত্রে পঞ্চম অর্থ কমিশনের সুপারিশগুলি গ্রহণ করা হইয়াছে।

অর্থসংস্থানের দিক হইতে বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে চতুর্থ পরিকল্পনার সঙ্গে তৃতীয় পরিকল্পনা ও তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনার পার্থক্য রহিয়াছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় এরূপভাবে অর্থ সংস্থানের প্রস্তাব করা হইয়াছে যাহাতে স্থিতি-শীলতার সহিত উন্নয়ন এবং স্বয়ংনির্ভরশীলতার উদ্দেশ্য সাধিত হয়। অভ্যন্তরীণ উৎস হইতে সংগৃহীত সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ৭৮ শতাংশ করা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনা ও তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনায় উহা যথাক্রমে ৫৯ শতাংশ ও ৫৪ শতাংশ ছিল। সরকারী ক্ষেত্রে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ তৃতীয় পরিকল্পনা ও তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনায় যথাক্রমে ২৮ শতাংশ ও ৩৬ শতাংশ ছিল—চতুর্থ পরিকল্পনায় উহা হ্রাস পাইয়া মোট অর্থ সম্পদের ১৭ শতাংশ হয়। এই পরিকল্পনায় বৈদেশিক সাহায্য নীট বিনিয়োগের ৮·২ শতাংশ হইবে। ঘাটতি ব্যয় হয় মোট সম্পদের মাত্র ৫ শতাংশ কিন্তু উহা তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনায় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় যথাক্রমে ১০ শতাংশ ও ১৩ শতাংশ ছিল। চতুর্থ পরিকল্পনায় সরকারী উদ্যোগে প্রস্তাবিত ১৫,৯০২ কোটি টাকা নিম্নলিখিত সূত্র থেকে সংগৃহীত হইবে :

১।	অভ্যন্তরীণ উৎস হইতে প্রাপ্ত সম্পদ	৮৭৩৪ কোটি টাকা
২।	অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ (অতিরিক্ত কর ইত্যাদি মারফৎ)	৩১৯৮ ,, ,,
৩।	জীবনবীমা ও অন্যান্য সরকারী সংস্থা ও বাজার হইতে গৃহীত ঋণ	৫০৬ ,, ,,
		১২,৪৩৮ ,, ,,

৪।	বৈদেশিক সাহায্য	২৬১৪ ,, ,,
৫।	ঘাটতি ব্যয়	৮৫০ ,, ,,
	মোট	১৫,৯০২ কোটি টাকা

চতুর্থ পরিকল্পনার অগ্রগতি (**Progress of the Fourth Plan**) : চতুর্থ পরিকল্পনার ফলাফল বিশেষ সন্তোষজনক হয় নাই। চতুর্থ পরিকল্পনা কালে ১৫,৯০২ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা হয়েছিল কিন্তু প্রকৃত ব্যয় হয় ১৬,১৬০ কোটি টাকা অর্থাৎ ২৫৮ কোটি টাকা বেশী। ব্যয় অধিক হওয়া সত্ত্বেও পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রাগুলি সকল ক্ষেত্রে পূরণ হয় নাই কারণ এই সময়ে অভূতপূর্ব মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়াছিল। পরিকল্পনায় ৮৫০ কোটি টাকা ঘাটতিব্যয় করা হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছিল কিন্তু উহার প্রকৃত পরিমাণ দাঁড়ায় ২০৬০ কোটি টাকা।

এই সময়ে উন্নয়ন হার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাইতে পারে নাই। পরিকল্পনায় জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্য ছিল বার্ষিক ৫·৭ শতাংশ কিন্তু উহা হয় গড়ে মাত্র ২·৮ শতাংশ মাত্র। জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ছিল প্রথম বৎসরে ৪·৭ শতাংশ, দ্বিতীয় বৎসরে ৪·৯ শতাংশ, তৃতীয় বৎসর ১·৪ শতাংশ, চতুর্থ বৎসর ০·৯ শতাংশ এবং শেষ বৎসর ৩·৪১ শতাংশ।

চতুর্থ পরিকল্পনাকালে উন্নয়নের হার আশানুরূপ না হওয়ার কারণ কৃষি-ক্ষেত্রে ব্যর্থতা। ধরা হইয়াছিল যে মোট খাদ্য উৎপাদন ৯ কোটি ৮০ লক্ষ টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া পরিকল্পনার শেষ বৎসরে (১৯৭৩-৭৪ সাল) ১২ কোটি ৯০ লক্ষ টনে পরিণত হইলে কিন্তু উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয় নাই। অবশ্য সবুজ বিপ্লবের দরুণ গমের উৎপাদন বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়া ছিল।

শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে আশানুরূপ উন্নতি হয় নাই। প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, কয়লা ও বিদ্যুৎশক্তির ঘাটতি এবং পরিবহনের অসুবিধার জন্য শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয় নাই। বৎসরে ৮ হইতে ১০ শতাংশ হারে শিল্পোৎপাদন বাড়িবে বলিয়া ধরা হইয়াছিল কিন্তু প্রকৃত উৎপাদন বৃদ্ধি ৪ হইতে ৫ শতাংশের বেশী হয় নাই।

পরিকল্পনাকালে বিদ্যুৎ উৎপাদন ৯৩ লক্ষ কিলোওয়াট বৃদ্ধি করিয়া মোট উৎপাদন ২ কোটি ৩০ লক্ষ কিলোওয়াট করা হইবে বলা হইয়াছিল। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয় নাই। মাত্র ৪৬ লক্ষ কিলোওয়াট উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৭৪-৭৯ (Fifth Five Year Plan, 1974-79) ১৯৭৪ সালে চতুর্থ পরিকল্পনার কার্যকাল শেষ হইলে পঞ্চম পরিকল্পনা সুরু হয়। পঞ্চম পরিকল্পনার কার্যকাল হইল ১৯৭৪ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৭৯ সালের মার্চ। পঞ্চম পরিকল্পনার প্রস্তুতিপত্র (Approach to the Fifth Plan) নামে যে প্রস্তাবনাটি রচিত হইয়াছিল তাহার উপর ভিত্তি করিয়া পঞ্চম পরিকল্পনার খসড়া রচনা করা হইয়াছিল। পঞ্চম পরিকল্পনাকে "জনগণের পরিকল্পনা" (People's Plan) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে কারণ ইহাতে দেশে দারিদ্র্যরেখার নীচে অবস্থিত বৃহত্তর জনগণের ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণের প্রতি অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে।

প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি উন্নয়ন এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। চতুর্থ পরিকল্পনায় স্থিতিশীলতার সহিত উন্নয়নই ছিল আমাদের প্রধান লক্ষ্য। পরিকল্পনার বিগত দুই দশকে যদিও আমরা অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেকখানি সাফল্য অর্জন করিয়াছি তথাপি জনগণের দুঃখকষ্টের বিশেষ লাঘব হয় নাই; দারিদ্র্য ও বেকারত্ব ক্রম-বর্ধমান আকারে বাড়িয়া চলিয়াছে। তাই পঞ্চম পরিকল্পনায় দারিদ্র্য দূর করা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উপর সর্বাধিক জোর দেওয়া হইয়াছে।

পরিকল্পনার লক্ষ্য হইল প্রভূত পরিমাণে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে এবং জনগণের ন্যূনতম প্রাথমিক প্রয়োজন মিটিয়ে বেকারী ও দারিদ্র্যের উপর সরাসরি এক প্রচণ্ড আঘাত হানা। দারিদ্র্যরেখার নীচে রহিয়াছে এরূপ লোকের সংখ্যা ২২ কোটি, পঞ্চম পরিকল্পনাকালে এই লোকগুলিকে জীবনযাত্রার ন্যূনতম পর্যায়ে আনিতে হইবে; ইহাদের মাসিক আয় অন্ততঃ ৪০ টাকা করিতে হইবে।

গ্রামের দরিদ্র লোকের অধিকাংশই হইল ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী। পরিকল্পনায় ইহাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। ভূমিসংস্কার আইনের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত জমি বণ্টন করিয়া এই সব মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি করা যায়। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জারের রাশিয়ায় জমি বণ্টন করিয়াও দারিদ্র্য সমস্যার কোন সুরাহা হয় নাই। অবশ্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে জাপানে ভূমিসংস্কারের দরুণ যথেষ্ট সুফল পাওয়া গিয়াছিল ভূমিসংস্কারের সঙ্গে শিল্প প্রসারও হইতে থাকে।

উদ্দেশ্য (Objectives) : পঞ্চম পরিকল্পনার প্রধান দুইটি লক্ষ্য হইল দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং স্বয়ংনির্ভরশীলতা অর্জন।

অর্ধোন্নত দেশের নিদারুণ সমস্যা হইল দেশব্যাপী দারিদ্র্য। মোট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ লোক আজও "দারিদ্র্যরেখার" নীচে বা জীবনযাত্রার ন্যূনতম মানের নীচে রহিয়াছে। দারিদ্র্যের মূল কারণ হইল বেকারত্ব, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা আর অসম ধনবণ্টন। পরিকল্পনায় উল্লিখিত দুই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজন উন্নয়নের উচ্চ হার, আয় বণ্টনের সমতা এবং অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হার বৃদ্ধি। পরিকল্পনার প্রধান দুই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিম্নলিখিত কার্যসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে :

(১) বার্ষিক ৫·৫ শতাংশ হারে জাতীয় আয় বৃদ্ধি করিতে হইবে ; (২) উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করিতে হইবে ; (৩) জনগণের ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণের কার্যসূচী রূপায়িত করিতে হইবে ; প্রাথমিক শিক্ষা, পানীয় জল, গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসার সুব্যবস্থা, ভূমিহীন শ্রমিকদের জন্য বাসস্থান, গ্রামীণ রাস্তাঘাট নির্মাণ, গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং বস্তি উন্নয়ন এই কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত। (৪) সমাজ কল্যাণের কার্যসূচী সম্প্রসারিত করিতে হইবে ; (৫) কৃষি, মূলশিল্প এবং ভোগপণ্য উৎপাদনকারী শিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ, (৬) সরকারী সংগ্রহ ও বণ্টন-ব্যবস্থার মাধ্যমে ন্যায্য মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের যোগান অব্যাহত রাখিতে হইবে ; (৭) রপ্তানী সম্প্রসারণ করা, (৮) অপ্রয়োজনীয় ভোগ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা, (৯) দাম, মজুরি ও আয়ের মধ্যে আপেক্ষিক সমতা আনয়ন করা এবং (১০) করব্যবস্থা ও অন্যান্য পদ্ধতির সাহায্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করা।

পঞ্চম পরিকল্পনার দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি হইল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করা। স্বয়ংনির্ভরশীলতার ধারণাটি প্রথম ব্যক্ত করা হয় তৃতীয় পরিকল্পনায়। স্বয়ংনির্ভরশীলতা অর্জনের তিনটি পদ্ধতি হইল (১) বিশেষ ধরনের বৈদেশিক সাহায্য হইতে দেশকে মুক্ত করা, (২) পর্যায়ক্রমে আত্মনির্ভরশীলতার পথে অগ্রসর হওয়া এবং (৩) অন্তবর্তীকালীন সময়ে বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমে দেশকে আরও গতিশীল করিয়া তোলা। অর্থনৈতিক স্বনির্ভরশীলতা অর্জনের উদ্দেশ্যে উৎপাদন বৃদ্ধি, রপ্তানী সম্প্রসারণ, বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ হ্রাস এবং উন্নয়নের হার বৃদ্ধির উপর দৃষ্টি দিতে হইবে। চতুর্থ পরিকল্পনায় বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ছিল মোট বিনিয়োগের ৮·২ শতাংশ। পঞ্চম পরিকল্পনা কালে উহা হ্রাস করিয়া ৩·১ শতাংশ করার লক্ষ্য স্থির করা হয়।

পঞ্চম পরিকল্পনার মোট ব্যয়বরাদ্দ হইল ৫৩,৪১১ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে সরকারী ক্ষেত্রে ব্যয়বরাদ্দ হইল ৩৭,২৫০ কোটি টাকা এবং বেসরকারী খাতে ব্যয় হইবে ১৬,১৬১ কোটি টাকা। চূড়ান্ত পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ১৯৭৫-৭৬ সালের দামের ভিত্তিতে বৃদ্ধি করিয়া ৬৬,৩৫৩ কোটি টাকা করা হয়—সরকারী ক্ষেত্রের জন্য ধরা হয় ৩৯,৩০৪ কোটি টাকা এবং বেসরকারী ক্ষেত্রের জন্য ২৭,০৪৯ কোটি টাকা। নীচের তালিকায় পঞ্চম পরিকল্পনার চূড়ান্ত ব্যয়বরাদ্দ দেওয়া হইল :

	উন্নয়নক্ষেত্র	ব্যয়বরাদ্দ (কোটি টাকা)
১।	কৃষি ও সংশ্লিষ্টক্ষেত্র	৪৬৪৩·৬
২।	জলসেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ	৩৪৩৪·০
৩।	বিদ্যুৎ	৭০১৫·৯
৪।	গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রশিল্প	১০,২০০·৬
৫।	শিল্প ও খনি	———
৬।	পরিবহন ও যোগাযোগ	৬৮৮১·৪
৭।	শিক্ষা	১২৮৪·৩
৮।	বৈজ্ঞানিক গবেষণা	৪৪৫·৩৩
৯।	স্বাস্থ্য	৬৮১·৭
১০।	পরিবার পরিকল্পনা	৪৯৭·৪
১১।	জলসরবরাহ এবং জনস্বাস্থ্য	৯৩০·২
১২।	গৃহনির্মাণ ও নগরোন্নয়ন	১১০৬·৯
১৩।	অনুন্নত জাতির কল্যাণ	৬৮৭·০
১৪।	সমাজকল্যাণ	৮৬·২
১৫।	শ্রমকল্যাণ ও শিল্পশিক্ষণ	৫০·১
১৬।	অন্যান্য কার্যসূচী	১৩৫৮·৬
	মোট	৩৯,৩০৩·২ কোটি টাকা

উন্নয়ন হার (Rate of Growth) : পঞ্চম পরিকল্পনাকালে গড় বার্ষিক অভ্যন্তরীণ উৎপাদন হার হইল ৪·৩৭ শতাংশ। পরিকল্পনার মূল কার্যপ্রণালী হইল দ্রুতহারে কৃষি উৎপাদন, বিশেষ করিয়া খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা, প্রাপ্ত শক্তি সম্পদের কাম্য ব্যবহার করা এবং প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও সাধারণের ব্যবহার্য পণ্যের উৎপাদন ও সুদক্ষ বণ্টন সুনিশ্চিত করা।

পঞ্চম পরিকল্পনা কালে খাদ্যশস্যের বার্ষিক উৎপাদন হার হইবে ৪·২ শতাংশ—চতুর্থ পরিকল্পনায় ওই হার ছিল ৫·৬ শতাংশ। খাদ্য উৎপাদন

বার্ষিক ৪'২ শতাংশ হারে বাড়িবে ধরিয়া পরিকল্পনার শেষ বৎসরে ১৪ কোটি টন উৎপাদন হইবে। কিন্তু চূড়ান্ত পরিকল্পনায় ওই লক্ষ্যমাত্রা হ্রাস করিয়া ১২'৫ কোটি টন ধার্য করা হয়। খাদ্যশস্য ও অন্যান্য ফসলের উৎপাদন বাড়াইবার জন্য আবাদী জমির প্রসার, উচ্চ ফলনশীল বীজ, সার ও সেচের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন বার্ষিক ৮'১ শতাংশ হারে বৃদ্ধির লক্ষ্য স্থির করা হইয়াছে। পরিকল্পনায় বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদন লক্ষ্যও স্থির করা হইয়াছে। এই সময়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১'৬৫ কোটি কিলোওয়াট বাড়ানো হইবে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমাজকে আধুনিকীকরণ করার ব্যাপারে শিক্ষার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। পরিকল্পনাকালে শিক্ষা খাতে ১'২৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে। প্রাথমিক শিক্ষার উপর অধিক জোর দেওয়া হইয়াছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় শিক্ষাখাতে ব্যয়বরাদ্দ ছিল ৭৮৬ কোটি টাকা।

পঞ্চম পরিকল্পনায় বার্ষিক ৭'৬ শতাংশ হারে রপ্তানী বৃদ্ধির হিসাব করা হইয়াছে।

ধনবৈষম্যের প্রধান কারণ হইল ব্যাপক বেকারত্ব ও অর্ধ বেকারত্ব—তাই উহা দূর করিবার সঠিক পথ হইল প্রভূত পরিমাণে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। কর্মসংস্থান দুই ধরনের হইতে পারে—মজুরী প্রদায়ী কর্মসংস্থান (wage employment) এবং স্বয়ংনির্ভরশীল কর্মসংস্থান (self-employment); পঞ্চম পরিকল্পনায় বিনিয়োগ নীতি মজুরী প্রদায়ী কর্মসংস্থান বৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নির্ধারণ করা হইয়াছে। কিন্তু শুধুমাত্র ওই ধরনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করিয়া বেকার-সমস্যার সমাধান করা যাইবে না, তাই কৃষি, ক্ষুদ্রশিল্প এবং ব্যবসায় ও বাণিজ্য-ক্ষেত্রে স্বয়ংনির্ভরশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টির দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে।

পঞ্চম পরিকল্পনার অগ্রগতি (Progress of the Fifth Plan) **:** পঞ্চম পরিকল্পনা রূপায়ণের পথে গোড়া থেকেই নানা বাধাবিঘ্ন দেখা দেয়। প্রবল মুদ্রাস্ফীতির চাপ, কৃষি উৎপাদনের অনিশ্চয়তা, বিশ্বব্যাপী তৈলসংকট, ক্রমাগত প্রতিকূল বাণিজ্য ব্যালান্স প্রভৃতি কারণ পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব-নিকাশ বানচাল করিয়া দিয়াছে। এই কারণে চূড়ান্ত পরিকল্পনায় ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করার প্রয়োজন দেখা দেয়। পরিকল্পনার প্রথম তিনবৎসরে সরকারী ক্ষেত্রে অনুমিত ব্যয় হইল ১৯,৫০৫ কোটি টাকা। ১৯৭৭-৭৮ সালে অর্থাৎ পঞ্চম পরিকল্পনার শেষ বৎসরে সরকারী ক্ষেত্রে ব্যয় হইয়াছে ৯৯৬৫ কোটি টাকা।

১৯৭৮-৭৯ সালে সরকারী ক্ষেত্রে ১১,৬৫০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে।

পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয় বৃদ্ধি সন্তোষজনক হয় নাই। পঞ্চম পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসর জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার হইল যথাক্রমে ০·২ শতাংশ, ৬·০ শতাংশ এবং ৫·২ শতাংশ।

কৃষিক্ষেত্রের অগ্রগতিও অসমান। ১৯৭৩-৭৪ সালে কৃষি উৎপাদন সূচক ১৩৩·৩-এ আসিয়া দাঁড়ায় কিন্তু পরবর্তী বৎসরে (১৯৭৪-৭৫) উহা হ্রাস পাইয় ১২৮·৬ হয়। ১৯৭৫-৭৬ সালে অবস্থার উন্নতি ঘটে এবং কৃষি উৎপাদনেব সূচক ১৪৮·৬-এ আসিয়া দাঁড়ায়। সেচব্যবস্থার সম্প্রসারণ হইয়াছে; চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে সেচসেবিত এলাকা ছিল ৪·২২ কোটি হেক্টর, ১৯৭৭-৭৮ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৪·৯৮ কোটি হেক্টরে আসিয়া দাঁড়ায়।

গত তিন দশকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি হইলেও উহা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। ১৯৫০ সালে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ২৩০০ মেগাওয়াট, ১৯৭৬-৭৭ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ২৪,০০০ মেগাওয়াট হয়। ১৯৭৭-৭৮ সালে ২০০০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে উন্নয়ন হার ১৯৭৪-৭৫ সাল হইতে ১৯৭৭-৭৮ সালে বার্ষিক ৬ শতাংশ হারে হইয়াছে।

শিক্ষাক্ষেত্রের অগ্রগতি বিশেষ সন্তোষজনক। ১৯৫০-৫১ সালে মোট স্কুল ও কলেজের সংখ্যা ছিল ২·৩১ লক্ষ, উহা পঞ্চম পরিকল্পনার সুরুতে বৃদ্ধি পাইয়া ৫·৭২ লক্ষ হয়।

পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষালাভ (Lessons of Planning Experience) ঃ ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ৩০ বৎসর অতিবাহিত হইতে চলিয়াছে সুতরাং অতীত অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষালাভ করিবার সময় আসিয়াছে বলা চলে। অতীতের ত্রুটি পরিহার করিয়া সঠিক পথে অগ্রসর হইতে পারিলে ভবিষ্যতে পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ সম্ভব হইবে।

মনে রাখা দরকার পরিকল্পনা স্বয়ং কোন উদ্দেশ্য নয়—বিদ্যাবত্তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করাও ইহার লক্ষ্য নয়। ইহা স্বল্প সময়ে সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার। দীর্ঘকালীন দৃষ্টিভংগী না থাকিলে অথবা সর্বদা নীতির উদ্দেশ্য

সম্পর্কে সচেতনতা না থাকিলে পরিকল্পনা তাহার সামাজিক তাৎপর্য হারাইয়া কয়েকজন মডেল নির্মাতা পণ্ডিতের বৈদগ্ধ প্রদর্শনে পর্যবসিত হইবে।

বিগত তিন দশকের পরিকল্পনার পরও দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং অর্থনৈতিক অসাম্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে; উন্নয়নের হার অর্জনের ক্ষেত্রে আমাদের পরিকল্পনা কিছুটা সাফল্যলাভ করিলেও সামাজিক ন্যায়বিচার এবং নিয়োগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে উহা ব্যর্থ হইয়াছে। সুতরাং বাস্তব অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া আমাদের পরিকল্পনার সামাজিক ন্যায়বিচার ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উপর জোর দিতে হইবে। উৎপাদন বৃদ্ধি বা মূলধন বৃদ্ধির সহিত নিয়োগ বৃদ্ধির সম্পর্ক থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ, ক্ষেত্রগত পরিকল্পনা (sectoral planning) সত্ত্বেও দেশের অনেক অংশ অনগ্রসর থাকিয়া যাইবে তাই এলাকা পরিকল্পনা (area planning) গ্রহণ করিয়া আঞ্চলিক বৈষম্যগত ত্রুটি সংশোধন করিতে হইবে।

পরিকল্পনার প্রথম ২৫ বৎসরে ২.৫ শতাংশ হারে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটিয়াছে যদিও প্রতিটি পরিকল্পনার উন্নয়ন হার উহা অপেক্ষা অনেক ঊর্ধ্বে নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল। উন্নয়নের এই হার দেশের সমস্যা সমাধানের পক্ষে যথেষ্ট নয়। জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নীচু, ৩০ শতাংশ লোক আজও দারিদ্র্যরেখার নীচে রহিয়াছে এবং দেশব্যাপী এক বিশাল বেকার বাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকল সমস্যা সমাধানের জন্য উন্নয়ন হার অনেক বেশী হওয়া প্রয়োজন।

অবশ্য ব্যবহারযোগ্য সম্পদের কথা চিন্তা না করিয়াই এক বিরাট পরিকল্পনা ফাঁদিয়া বসাও উচিত নয় কারণ উহার সার্থক রূপায়ণ সম্ভব হইবে না। অধ্যাপক লুইস বলেন অর্ধোন্নত দেশগুলিতে প্রায়ই উন্নয়নের অসম্ভব উচ্চহার ধার্য করার দুর্বলতা দেখা যায়। উন্নয়নের উচ্চহার স্থির করিলে নেতাদের পক্ষে প্রপাগ্যাণ্ডা করার সুবিধা হয় এবং অধিক পরিমাণে বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া সহজ হয়। আর্থিক ও বস্তুগত সম্পদের প্রতি নজর রাখিয়া পরিকল্পনা রচনা করা উচিত।

নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণের দিক হইতে বিচার করিলে বলা যায় যে প্রথম পরিকল্পনা মোটামুটি সার্থক হইয়াছিল। জাতীয় আয়, মাথাপিছু আয়, বিনিয়োগ, কৃষিউৎপাদন এবং শিল্প উৎপাদনের নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছান সম্ভব হইয়াছিল। প্রথম পরিকল্পনার আয়তন ছোট ছিল বলেই

তার সন্তোষজনক অগ্রগতি হয়। জহরলাল বলেন, "প্রথম পরিকল্পনার কাজ আমাদের কাছে খুবই সহজ ছিল, বিরাট কিছু ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন হয় নাই কারণ সেই সময় আমরা নিজেদের প্রসারিত করিনি। আমাদের কোন বিশেষ প্রয়াস ছিল না। সামনে যা পেয়েছি তাকেই গ্রহণ করে পরিকল্পনা আখ্যা দিয়েছি।"

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী বলা হয় কারণ প্রাপ্ত সম্পদের তুলনায় উহার আয়তন যথেষ্ট বড় ছিল। ফলে পরিকল্পনাকে রূপায়িত করিতে প্রভূত ঘাটতি ব্যয় অপরিহার্য হইয়া পড়ে আর সেইজন্য মুদ্রাস্ফীতি অর্থনীতিতে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা আকারে প্রথম পরিকল্পনার দ্বিগুণ অপেক্ষাও বড় ছিল কিন্তু তার সার্থক রূপায়ণ হয় নাই। কৃষি উৎপাদন হ্রাস, মূল্যস্তর বৃদ্ধি, ব্যাপক বেকারত্ব এবং বৈদেশিক মুদ্রা সংকট দ্বিতীয় পরিকল্পনার সাফল্যের পথে বাধার সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আয় বৈষম্য হ্রাস করিয়া সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ-গঠনের উদ্দেশ্য ঘোষণা করা হয়। অধ্যাপক এ. কে. দাশগুপ্ত বলেন এই পরিকল্পনার সাফল্য যাই হোক না কেন, উহার মধ্যে সমাজতন্ত্র বলিয়া কিছু নাই। গানার মিরডাল বলেন, ভারত মুখে সমাজতন্ত্রের যতই বুলি আওড়াক না কেন, সমাজতন্ত্র সম্পর্কে কোন ভান করে না এমন পশ্চিমী দেশগুলি থেকে ভারত খুব দূরে নাই। প্রথম দুইটি পরিকল্পনার পর একচেটিয়া পুঁজিবাদ পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী হইয়াছে। বিগত কয়েক বৎসরে অর্থনৈতিক অসাম্য যে মারাত্মক আকারে প্রসারিত হয়েছে দ্বিতীয় পরিকল্পনা উহাকে রোধ করিতে পারে নাই।

দুইবার পর পর বহিঃশত্রুর আক্রমণ, অর্থনৈতিক মন্দা, খাদ্যসংকট, মুদ্রামান হ্রাস, বৈদেশিক মুদ্রাসংকট ইত্যাদি ঘটনা তৃতীয় পরিকল্পনা রূপায়ণের পথে বাধার সৃষ্টি করে। তৃতীয় পরিকল্পনায় স্বয়ংনির্ভরশীল সম্প্রসারণের উপর জোর দেওয়া হয়। এই সময়ে নূতন কৃষিকৌশল প্রয়োগ করিয়া কিছুটা সাফল্যলাভ করাতে দেশ খাদ্য-উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্বনির্ভরশীল হইয়াছে এমন একটা অমূলক ধারণার সৃষ্টি হয়। কিন্তু পরবর্তী দুই বৎসরের খাদ্যসংকট তীব্র আকারে দেখা দিলে বোঝা গেল যে ওই ধারণা ভ্রান্ত।

নানা অসুবিধার দরুন তৃতীয় পরিকল্পনা শেষ হইবার পর চতুর্থ পরিকল্পনা সুরু করা সম্ভব হয় নাই। তিনবৎসর পরিকল্পনা বিরতি ঘটে যাহার ফলে

উন্নয়নের যে গতিবেগ সঞ্চারিত হইয়াছিল তাহা স্তিমিত হইয়া আসে এবং এক নূতন সংকটের সৃষ্টি হয় যাহাতে উৎপাদন অচল থাকে কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি বাড়িয়া চলে; উহাকে মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে অচলাবস্থা (stagflation) নামে অভিহিত করা হয়। ১৯৬৯ সালে চতুর্থ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় কিন্তু উহার সাফল্য সন্তোষজনক হয় নাই। তীব্র মুদ্রাস্ফীতি, বিদ্যুৎসংকট, তৈল-সংকট, বৈদেশিক মুদ্রাসংকট, ব্যাপক বেকারত্ব, শিল্পোৎপাদন হ্রাস পরিকল্পনা রূপায়ণের পথে বাধার সৃষ্টি করে।

পরিকল্পনা এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া বলিয়া চতুর্থ পরিকল্পনার পর পঞ্চম পরিকল্পনার কাজ সুরু হইয়া যায়। কিন্তু একবৎসর পরেই দেশের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সংকট এরূপ তীব্র আকার ধারণ করে যে পঞ্চম পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়া যায়। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী একটি ২০ দফা কার্যসূচী চালু করেন এবং জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। ১৯৭৭ সালে কেন্দ্রে নূতন সরকার গঠিত হইবার পর পঞ্চম পরিকল্পনার পরিসমাপ্তি সরকারী ভাবে ঘোষণা করা হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কেনেডি বলিয়াছিলেন দারিদ্র্য, অশিক্ষা এবং ব্যাধিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমত্ব অর্থহীন। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে আমাদের রাজনৈতিক সংগ্রামের অধ্যায় শেষ হয় আর ১৯৫১ সালের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সুরু হয় অর্থনৈতিক মুক্তি সংগ্রামের দীর্ঘ পদযাত্রা বা 'লং মার্চ।' সোভিয়েট রাশিয়ায় সাম্যবাদী সরকার ক্ষমতা লাভের ১১ বৎসর পরে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সুরু করে—ভারত সরকার সুরু করে মাত্র ৪ বৎসর পরে।

৩০ বৎসরের পরিকল্পনায় আমরা অনেক কিছু পেয়েছি আবার অনেক কিছু পাইনি। যাহারা ইংরেজ শাসনের অন্ধকারাচ্ছন্ন দারুন দুর্দিন দেখেছে তারা সেদিন ও আজকের দিনগুলির তুলনামূলক পার্থক্য বুঝিতে পারে কিন্তু নূতন যুগে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে এমন নূতন যুগের মানুষ চায় শোষণমুক্ত নয়া সমাজব্যবস্থা। স্বাধীনতাকে নবতর তাৎপর্যে মণ্ডিত করিয়া ইহাদের জীবনকে উজ্জল ভবিষ্যতের ইঙ্গিতে সম্ভাবনাময় করিয়া তোলার জন্য প্রয়োজন পরিকল্পিত পূর্বব্যবস্থা। দারিদ্র্যরেখার নীচে যে কোটি কোটি নিষ্প্রভ মানুষগুলি কোনমতে অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া বাঁচিয়া আছে পরিকল্পনা তাহাদের জীবনে আনিবে রূপান্তরের এক উজ্জ্বল জাগরণ—যুগান্তরের এক নবদিগন্ত। কিন্তু

জনগণের এই আশাআকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই পরিকল্পনার ত্রুটিবিচ্যুতির দরুন।

প্রথমতঃ, পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যগুলির সহিত সামাজিক লক্ষ্যগুলি সুস্পষ্টভাবে সামনে রাখা প্রয়োজন। সামাজিক লক্ষ্যে পৌছাইবার সময় এবং পদ্ধতি নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে নতুবা উহা পরিকল্পনা রচয়িতাদের শুধুমাত্র সদিচ্ছায় পর্যবসিত হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, পরিকল্পনা শুধুমাত্র টাকার অংকেই (financial planning) রচনা করিলে চলিবে না—সম্পদের আকারেও (physical planning) উহাকে দেখিতে হইবে। প্রথম পরিকল্পনায় শুধুমাত্র আর্থিক পরিকল্পনাই গুরুত্ব পায় কিন্তু দ্বিতীয় ও তৎপরবর্তী পরিকল্পনায় উভয় দিকের উপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়।

তৃতীয়তঃ, সঠিক উৎপাদন কৌশল (Production Technique) গ্রহণ করিলে উন্নয়ন হার বেশী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। প্রথম পরিকল্পনায় এ ব্যাপারে দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই কিন্তু পরবর্তী পরিকল্পনাগুলিতে এই ত্রুটি সংশোধন করিয়া সর্বাধিক উন্নয়ন এবং সর্বাধিক কর্মসংস্থানের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়।

চতুর্থতঃ, প্রথম পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে বেসরকারী উদ্যোগের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই নীতির দরুন পরিকল্পনার শেষে যে ধনবৈষম্য বৃদ্ধি পাইবে এ সম্পর্কে পরিকল্পনা রচয়িতাদের সাধারণ বোধের অভাব ছিল। যাই হোক, অতীত অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষালাভ করিয়া পরবর্তী পরিকল্পনাগুলিতে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের সহিত সামাজিক উদ্দেশ্যগুলিও ঘোষণা করা হয়।

পঞ্চমতঃ, আমাদের পরিকল্পনাগুলির সার্থক রূপায়ণের পথে একটি বিরাট বাধা হইল সঠিক পরিসংখ্যানের অভাব। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উন্নয়নী মডেলের (growth model) ভিত্তিই ছিল অবাস্তব। ধরা হইয়াছিল জনসংখ্যা বাড়িবে ১·২৫ শতাংশ হারে—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা ২·২৫ শতাংশ হারে বাড়ে। ধরা হইয়াছিল মূলধন-উৎপাদন অনুপাত (capital-output ratio) হইবে ২·৩ : ১ কিন্তু এক্ষেত্রেও হিসাব ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হয়। কোন কোন লেখক এই মতও ব্যক্ত করিয়াছে, যে দেশে নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান নাই তাহার পক্ষে ব্যাপক পরিকল্পনা না করাই শ্রেয়।

ষষ্ঠতঃ, পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য প্রশাসনিক দক্ষতা বিশেষ প্রয়োজন। প্রথম পরিকল্পনায় পরিকল্পনাকে কার্যকর করার জন্য কোন বিশেষ শাসনযন্ত্র সৃষ্টি না করিয়া উহা জেলা অফিসারদের দায়িত্বে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। জেলা অফিসারগণের অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিবার অবকাশ ছিল না তাই পরিকল্পনা রূপায়ণে অব্যবস্থাপনা চরমে ওঠে। পরবর্তীকালে যাহাতে এইরূপ অসুবিধা আর না ঘটে সেজন্য ভারতীয় অর্থনৈতিক সার্ভিসের সৃষ্টি করা হয়।

সপ্তমতঃ, জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতীত পরিকল্পনা সফল করা সম্ভব নয়। পরিকল্পনা ওপর হইতে জনগণের ওপর চাপাইয়া দিবার পরিবর্তে অর্থনীতির ভিত্তি হইতে অগ্রসর হইলে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা অধিক হইবে। প্রথম পরিকল্পনায় সমাজোন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার মধ্যে তৃণমূল (grass root) পরিকল্পনার বীজ থাকায় উহা জনগণের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চার করে। কিন্তু পরবর্তী পরিকল্পনাগুলিতে জনগণের আশাআকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হওয়ায় তাহাদের উৎসাহ স্তিমিত হইয়া পড়ে। পঞ্চায়েতি রাজ প্রবর্তন করিয়াও অবস্থার উন্নতি হয় নাই।

অষ্টমতঃ, সমাজের সর্বস্তরে দুর্নীতি প্রবেশ করিয়া সমাজ দেহকে জীর্ণ করিয়া দিয়াছে। প্রশাসনিক দুর্বলতার সুযোগে বিরাট অংকের "কালো টাকা" ভারতীয় অর্থনীতিতে এক "সমান্তরাল অর্থব্যবস্থা" সৃষ্টি করিয়াছে। গানার মিরডাল মনে করেন, দেশের লোকের দুর্নীতি ভারতে পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের সবচেয়ে বড় বাধা।

নবমতঃ, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সমতাহীন পরিকল্পন পদ্ধতি (planning with unbalanced growth) গ্রহণ করা হইয়াছিল। ইহার ফলে অর্থনীতিতে চাপ পড়ে ও নানা সংকটের সৃষ্টি হয়। এই পদ্ধতিতে ভারী শিল্পের ওপর জোর দেওয়া হয়। এই ধরনের শিল্প মূলধন-প্রগাঢ় বলিয়া কম পরিমাণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়, ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং অর্থনীতিতে ভোগ্যপণ্যের অভাব ও মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পায়। অভিজ্ঞতা হইতে বোঝাগিয়াছে যে সমতাপূর্ণ পরিকল্পনাপদ্ধতি (planning with balanced growth) গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। তৃতীয় পরিকল্পনায় দ্বিতীয় পরিকল্পনার পদ্ধতি পরিহার করা হয়।

দশমতঃ, কেন্দ্রে এক দল ও রাজ্যে অন্য রাজনৈতিক দল থাকিলে সেই ক্ষেত্রে কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাত অনিবার্য। কোন কোন রাজ্যে প্রকাশ্যে কেন্দ্রের

বিরোধিতা করা হয়; পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট অগ্রাধিকার অনেক ক্ষেত্রেই রাজ্য সরকারগুলি মেনে চলে নাই। আবার অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্র যে আর্থিক সাহায্য দিয়াছে রাজ্য সরকার তার সদ্ব্যবহার করে নাই। পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য রাজ্যসরকারসমূহ যাহাতে কেন্দ্রীয় নির্দেশ অবহেলা করিতে না পারে তাহা দেখিতে হইবে। রাজনৈতিক মতভেদ যাহাতে পরিকল্পনার পথে কোন বাধা না হয় তাহা লক্ষ্য রাখতে হইবে।

পরিশেষে, প্রতিটি প্রকল্প রচনার সময় ব্যয় ও প্রতিদান (cost benefit analysis) সম্পর্কে সম্যক বিশ্লেষণ করিয়া অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে যে এই ব্যাপারে যথেষ্ট নজর দেওয়া হয় নাই। প্রকল্প-গুলির ফলপ্রদায়ী ব্যবধান (fruition lag) যত কম হয় ততই ভালো কারণ তাহার ফলে অর্থনীতিতে ভারসাম্য বজায় থাকে। অতীতে, বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই ভারসাম্য বজায় থাকেনি।

পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের দায়িত্ব পরিকল্পনা রচয়িতা এবং প্রশাসনের উপর। সুপারসনিক এরোপ্লেনে দিল্লী হইতে মস্কো বা নিউইয়র্ক যাত্রার পরিকল্পনা সহজেই করা যায় কিন্তু উহাকে কার্যকর করা পাইলটের নৈপুণ্যের উপর অনেকখানি নির্ভর করে।

ঘূর্ণমান পরিকল্পনা (Rolling Plan): জনতা সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়া ১৯৭৮ সালে পাঁচ বছরের জন্য যে খসড়া পরিকল্পনা (১৯৭৮-৮৩) করে তাহা কার্যকরী হয় নাই। দুই বছর পরে ওই সরকারের পতন ঘটিবার পর পুনরায় কংগ্রেস (ই) ক্ষমতায় আসিয়া যে ষষ্ঠ পরিকল্পনা রচনা করে তাহা পরে আলোচিত হইয়াছে। জনতা সরকারের যে অভিনব পরিকল্পনা-কৌশল ছিল তাহাকে ঘূর্ণমান পরিকল্পনা বলা হয়। এই পরিকল্পনা কৌশল এখানে ব্যাখ্যা করা হইল।

ঘূর্ণমান পরিকল্পনা পদ্ধতির আবিষ্কর্তা প্রখ্যাত সুইডিস অর্থনীতিবিদ গানার মিরডাল (Myrdal); মিরডাল বিকাশমান দেশের জন্য ঘূর্ণমান পরিকল্পনা গ্রহণের নির্দেশ দিয়াছেন। তিন শ্রেণীর পরিকল্পনা লইয়া ঘূর্ণমান পরিকল্পনা গঠিত হইবে; (১) প্রতিবছর তিনটি পরিকল্পনা রচনা করা হইবে; আগামী একটি বছরের জন্য পরিকল্পনা (annual planning) প্রণয়ন; এই পরিকল্পনা আগামী বছরের অর্থনৈতিক কার্যাবলী নির্ধারণ করিবে; (২) পরবর্তী কয়েক বছরের জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ

(short-term planning) যেমন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে বার্ষিক পরিকল্পনার সমন্বয়সাধন—বিগত বছর বাদ ও অতিরিক্ত একটি বছর গ্রহণ—এই পদ্ধতিতে অগ্রসর হইতে হইবে; (৩) পরিশেষে একটি ১৫ বা ২০ বছরের দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা (perspective planning) গ্রহণ। ঘূর্ণমান পরিকল্পনার মূল ধারণা হইল যে প্রতি বছরের শেষে মধ্যবর্তীকালীন পরিকল্পনাকে প্রাপ্ত সহায়সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যায়ন ও পুনর্গঠন করিয়া উহাকে অধিকতর বাস্তবমুখী করিয়া তোলা।

ঘূর্ণমান পরিকল্পনার মূল ধারণা কারবারী সংস্থা এবং সরকারের বাজেট-সংক্রান্ত ধারণা হইতে লওয়া হইয়াছে। ঘূর্ণমান পরিকল্পনা-পদ্ধতি প্রথম গ্রহণ করে পোর্টোরিকো ও ফিলিপাইন্স। বর্মা ও মেক্সিকোতেও এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছিল কিন্তু সেখানে উহা সফল হয় নাই।

ভারতে জনতা সরকার এই পরিকল্পনা গ্রহণের সিদ্ধান্ত লইয়াছিল। ঘূর্ণমান পরিকল্পনা গ্রহণের অর্থ এই নয় যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাতিল করা হইল। ঘূর্ণমান পরিকল্পনা কোন মৌল পরিবর্তন নয়—উহা শুধুমাত্র পরিকল্পনার কৌশলগত পরিবর্তন। পরিকল্পনার এই কৌশল গ্রহণ করিলে দেশ প্রতিবছর পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলাফলের ধারণা পাইবে। এই পরিকল্পনা পদ্ধতির সুবিধা হইবে একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্যকাল শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে অপর একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রূপরেখা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। কার্যসূচী পূর্ব হইতেই প্রস্তুত থাকায় প্রাথমিক কাজের জন্য সময়ের কোনরূপ অপচয় হইবে না এবং অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হইবে।

ঘূর্ণমান পরিকল্পনা গ্রহণের মূল কারণ হইল যে—জনতা দলের নেতাদের মতে—অতীতের পঞ্চবার্ষিকভিত্তিক কার্যসূচী ছিল অনমনীয় এবং বাস্তবতা বিবর্জিত। ভবিষ্যৎ চাহিদার পূর্বানুমান (projection) কখনো প্রয়োজনের তুলনায় কম আবার কখনো বেশী হইত। এইজন্য পূর্বানুমানের ব্যাপারে প্রতি বছর অধিকতর নমনীয়তা প্রয়োজন। আগামী পাঁচ বছরের আর্থিক ও বস্তুগত সম্পদের প্রতি নজর রাখিয়া প্রতিটি বার্ষিক পরিকল্পনা রচনা করা হইবে; এ যাবৎ বার্ষিক পরিকল্পনা আনুষ্ঠানিক এবং অস্থায়ী ছিল—বহুক্ষেত্রে উহা বেতনভোগী আমলাদের সৃষ্টি; এই অবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন।

ঘূর্ণমান পরিকল্পনার একটি অসুবিধা এই যে প্রতি বছর পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা

পরিবর্তিত হইলে উহা উত্তোক্তার মনে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করিবে যাহা পরিণামে পরিকল্পনার অগ্রগতি ব্যাহত করিবে। ক্রমাগত লক্ষ্যমাত্রা পরিবর্তিত হইলে পরিণামে মূল লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইবার আশংকা থাকে। সেইজন্য সতর্ক থাকিতে হইবে যে ঘূর্ণমান পরিকল্পনা যেন এই ধারণার সৃষ্টি না করে যে মূল লক্ষ্যমাত্রাগুলি যথেচ্ছ পরিবর্তন করা যাইবে। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে লক্ষ্যমাত্রাগুলি স্থিরীকৃত হইবে এবং নমনীয়তার অজুহাতে কোনরূপ ঔদাসীন্য বরদাস্ত করা চলিবে না।

পরিকল্পনা কমিশনই ঘূর্ণমান পরিকল্পনা রচনা করিবে। ঘূর্ণমান পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণরূপে নূতন কৌশল বলা চলে না। ইহা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে অধিকতর বাস্তবমুখী করিবে। ইহা পরিকল্পনা কমিশনের ভূমিকা জোরদার করিবে এবং নীতি নির্ধারণ দৃঢ়তর করিবে। ঘূর্ণমান পরিকল্পনার ভিত্তি হইল অগ্রগতির ক্রমাগত এবং নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন এবং পূর্ণমূল্যায়ন, আর এইজন্য পরিকল্পনা কমিশনের গতিশীলতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইবে। এই পদ্ধতিতে পরিকল্পনা প্রতি পাঁচ বছরে একবার অনুশীলনের ব্যাপার না হইয়া উহা সতত সতর্ক দৃষ্টির সম্মুখে থাকিবে। ঘূর্ণমান পদ্ধতির দরুন উন্নয়ন সংশোধন এবং বিশোধন সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

ঘূর্ণমান পরিকল্পনা পরিকল্পনা-কমিশনকে যেমন নূতন কর্তৃত্ব দিয়াছে সেইরূপ ইহার উপর নূতন দায়িত্বও দিয়াছে। স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন নীতি নির্ধারণে ইহার গুরুত্ব অসীম। এই পরিকল্পনায় সামগ্রিক আয়তনের উপর যতখানি গুরুত্ব দেওয়া হয় ঠিক ততখানি গুরুত্ব দেওয়া হয় খুঁটিনাটির উপর।

মনে রাখিতে হইবে পরিকল্পনা স্বয়ং কোন উদ্দেশ্য নয়—উহা উদ্দেশ্যসাধনের হাতিয়ার মাত্র। দীর্ঘকালীন দৃষ্টিভঙ্গী না থাকিলে এবং সর্বদা নীতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে সজাগ না থাকিলে ঘূর্ণমান বা স্থিতিশীল যে কোন পরিকল্পনাই হোক না কেন তাহার সামাজিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য হারাইয়া কতকগুলি আত্মাভিমানী পণ্ডিতের অর্থহীন gimmick-এ পর্যবসিত হইবে।

বিগত তিন দশকের পরিকল্পনার পরও দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং ধনবৈষম্য বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের পরিকল্পনা উহার উদ্দেশ্যসাধনে ব্যর্থ হইয়াছে। তাই মোরারজী দেশাই বলিয়াছিলেন যে পিরামিডের আকারে পরিকল্পনা গঠন করিতে হইবে। সর্বনিম্ন স্তরে রহিয়াছে অর্থনীতির মূল ভিত্তি বা গ্রামীণ কাঠামো, উহা পরিকল্পিত সম্পদের সর্বাধিক

সম্পদ পাইবে। মধ্যম স্তরে থাকিবে নানাধরণের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমন্বিত ছোট ও মাঝারি শহর। পিরামিডের শীর্ষদেশে রহিয়াছে আধুনিক শিল্প-কেন্দ্রিক বড় বড় শহর। এই ক্ষেত্রে শিল্প প্রসারের তুলনায় প্রথম দুইটি ক্ষেত্রের সম্প্রসারণের উপর অধিকতর জোর দিতে হইবে। পিরামিডের এই তিনটি স্তর পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে।

অর্থমন্ত্রণালয় পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয় নির্ধারণ করিবে আর পরিকল্পনা কমিশন নূতন প্রকল্পের জন্য ব্যয়বরাদ্দ করিবে। অর্থ কমিশনের সুপারিশমত কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে সম্পদ বণ্টন করা হইবে। সম্পদ বণ্টনের ব্যাপারটি পূর্বের মত অর্থকমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হইবে এবং ঘূর্ণমান পরিকল্পনা গ্রহণের দরুন এই ক্ষেত্রে কোনরূপ অনিশ্চয়তা দেখা দিবে না।

ভারতীয় অর্থব্যবস্থার বাস্তব প্রয়োজনের কথা চিন্তা করিয়া ঘূর্ণমান পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। সুইডেনের দীর্ঘকালীন বাজেট রচনা, বার্ষিক বাজেটের সঙ্গে শ্বেতপত্র প্রকাশের বৃটিশ প্রথা অথবা সোভিয়েত রাশিয়ার পঞ্চম. দশম বা বিংশ বার্ষিকী পরিকল্পনা ভারতীয় অর্থব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কোন্ দেশ আছে যেখানে ৫০ লক্ষ শিক্ষিত বেকার? কোন্ দেশ আছে যেখানে গ্রাম ও শহরের মজুরিহারের পার্থক্য ১ : ৫ বা ১ : ১০? যে দেশে স্বাস্থ্য এবং স্যানিটারি ব্যবস্থা গ্রাম ও শহরে ভিন্ন রূপ সেখানে আন্তর্জাতিক মডেলের কথা ভাবিয়া লাভ কি?

ঘূর্ণমান পরিকল্পনায় তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তবতার সমন্বয় সাধন করা হয়; দীর্ঘকালীন পূর্বানুমানের (projection) ব্যবস্থাও যেমন থাকে, সেইরূপ দৈনন্দিন সমস্যাও উহার অন্তর্গত। দ্বিতীয়তঃ, পুরাতনপন্থী পরিকল্পনায় অবস্থা প্রতিকূল হইলে পরিকল্পনা বিরতি (plan holiday) ঘটিত; কার্যতঃ তৃতীয় পরিকল্পনার পর তিন বছর (১৯৬৬-৬৮) পরিকল্পনার বিরতি ঘটিয়াছিল কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় কোনরূপ পরিকল্পনা বিরতি থাকিবে না। তৃতীয়তঃ, ঘূর্ণমান পরিকল্পনাকৌশলের উদ্দেশ্য সর্বসাধারণের মঙ্গল। পূর্বের তুলনায় দেশ আর্থিক দিয়া যথেষ্ট শক্তিশালী হইলেও সামগ্রিকভাবে জনসাধারণের অবস্থা ভালো নয় তার কারণ জনগণের কল্যাণের উপর জোর দেওয়া হয় নাই। আমাদের এতদিনের পরিকল্পনা কৌশলে এমন কিছু ত্রুটি আছে যে জন্য ইহা ঘটিয়াছে; কর্মসংস্থান সৃষ্টির উপর জোর দিয়া ঘূর্ণমান পরিকল্পনা এই ত্রুটি সংশোধন করিবে।

ঘূর্ণমান পরিকল্পনাকৌশল গ্রহণের অর্থ এই নয় যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পরিত্যাগ করা হইয়াছে। বরং উহাকে অধিকতর কার্যকর করার ইহা একটি নূতন কৌশল। অবশ্য একথা মনে রাখিতে হইবে যে পরিকল্পনাকে সফল করিবার দায়িত্ব বহুলাংশে নির্ভর করে পরিকল্পনা রচয়িতাদের উপর।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৮০-৮৫, (Sixth Five Year Plan) ঃ ১৯৮১ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ ষষ্ঠ পরিকল্পনার খসড়া অনুমোদন করে। এই পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগ হইবে ১৭২,২১০ কোটি টাকা (১৯৭৯-৮০ সালের দামস্তরে)। সরকারী খাতে বিনিয়োগ হইবে ৮৪,০০০ কোটি টাকা এবং বেসরকারী বিনিয়োগ হইবে ৭৪,৭১০ কোটি টাকা। ইহা ব্যতীত সরকারী খাতে চলতি ব্যয় হইবে ১৩,৫০০ কোটি টাকা। সুতরাং সরকারী খাতে মোট ব্যয় হইবে ৯৭,৫০০ কোটি টাকা। পঞ্চম পরিকল্পনার তুলনায় ষষ্ঠ পরিকল্পনায় ব্যয় ১৪৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাইবে। বিগত ৩০ বৎসরের পরিকল্পিত উন্নয়নসূচীতে উন্নয়ন, আধুনিকীকরণ, স্বয়ংনির্ভরতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হইয়াছে এবং আর্থনীতিক কাঠামোব বৈচিত্র্য সাধিত হইয়াছে। এই সাফল্যের ভিত্তিতে রচিত ষষ্ঠ পবিকল্পনায় দারিদ্র্য ও অনুন্নতির উপর অধিকতর জোরে আঘাত হানা হইবে।

উদ্দেশ্য (Objectives) ঃ ষষ্ঠ পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য হইল দারিদ্র্যের উচ্ছেদসাধন কিন্তু এই কাজ এরূপ কঠিন যে পাঁচ বছরেব স্বল্প সময়ের মধ্যে উহার সমাধান অসম্ভব, এইজন্য ইহাকে দীর্ঘ পবিকল্পনাসূচীর (perspective planning) অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশেষ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ষষ্ঠ পরিকল্পনার কাজ সুরু করা হইয়াছে। তীব্র মুদ্রাস্ফীতি, বিদ্যুৎ, কয়লা, ইস্পাত, সিমেণ্ট, রেল পরিবহন প্রভৃতি মূল শিল্পক্ষেত্রে বিপর্যয় এবং পেট্রোলজাত পণ্যমূল্যের অবাধ ঊর্ধ্বগতির দরুন প্রতিকূল বাণিজ্য ব্যালান্স লইয়া ষষ্ঠ পরিকল্পনা সুরু হয়।

পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্যগুলি নিম্নে বর্ণনা করা হইল :

১। উন্নয়ন হারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি, দক্ষতাসহকারে সম্পদের ব্যবহার এবং সর্বক্ষেত্রে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে হইবে ;

২। অর্থনৈতিক এবং কারিগরীক্ষেত্রে স্বয়ংনির্ভরশীলতা অর্জন করিতে হইবে ;

৩। দ্রুতহারে দারিদ্র্য এবং বেকারীর পরিধি সংকুচিত করিতে হইবে ;

৪। শক্তির অভ্যন্তরীণ উৎসগুলির দ্রুত বিকাশ করিতে হইবে ও সেই সঙ্গে শক্তি সংরক্ষণ করিতে হইবে ও উহা দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করিতে হইবে ;

৫। ন্যূনতম প্রয়োজনভিত্তিক কার্যসূচী সম্প্রসারিত করিয়া সাধারণভাবে জনগণের এবং বিশেষভাবে দরিদ্র ও প্রতিবন্ধী মানুষগুলির জীবনধারণের গুণগত মানের উন্নতি সাধন করিতে হইবে ;

৬। দরিদ্র জনসাধারণের স্বার্থে সরকারী নীতি ও সেবার ক্ষেত্রে পুনর্বণ্টনের প্রবণতাকে দৃঢ়তর করিতে হইবে যাহার দরুন আয় ও সম্পদবণ্টনে অসাম্য দূরীভূত হয় ;

৭। উন্নয়নী ও কারিগরী সুবিধা বণ্টনের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক অসমতা গতিশীল হারে দূর করিতে হইবে ;

৮। স্বেচ্ছায় ছোট পরিবারের আদর্শ গ্রহণে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রতিরোধ করিতে হইবে

৯। সঠিক শিক্ষা, যোগাযোগ এবং প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থার সহায়তায় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সকল শ্রেণীর জনগণের সক্রিয় অংশ গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করিতে হইবে।

সরকারী খাতে ব্যয়বরাদ্দ (Outlay of the Plan) ঃ ষষ্ঠ পরিকল্পনায় সরকারী খাতে ৯৭,৫০০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৮৪,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ ব্যয় এবং ১৩,৫০০ কোটি টাকা চলতি উন্নয়নী খরচ। সরকারী খাতের নিজস্ব সঞ্চয় হইতে ৩১,৬৭৫ কোটি টাকা সংগৃহীত হইবে, অভ্যন্তরীণ অন্যান্য সূত্র হইতে ৪১,৩৯৬ কোটি টাকা এবং বৈদেশিক মুদ্রাসঞ্চয় হইতে ১০,৯২৯ কোটি টাকা সংগৃহীত হইবে। কেন্দ্রীয় সরকার ৪৭,২৫০ কোটি টাকা এবং রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি ৫০,২৫০ কোটি টাকা ব্যয় করিবে। উন্নয়নের কোন ক্ষেত্রে কিরূপ ব্যয় হইবে তাহা নীচের তালিকায় দেখান হইল :

উন্নয়ন ক্ষেত্র	ব্যয়বরাদ্দ (কোটি টাকার হিসাব)
১। কৃষি	৫,৬৯৫·০৭
২। গ্রামীন উন্নয়ন	৫,৩৬৩·৭৩
৩। বিশেষ এলাকা কার্যসূচী	১,৪৮০·০০

উন্নয়ন ক্ষেত্র	(কোটি টাকার হিসাব)
৪। জলসেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ	১২,১৬০·০৩
৫। শক্তি	২৫,৫৩৫.৪৪
৬। শিল্প ও খনিজ	১৫,০১৭·৫৭
৭। পরিবহন	১২,৪১১·৯৭
৮। যোগাযোগ ও তথ্য	৩,১৩৪·২৬
৯। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা	৮৬৫·২০
১০। সমাজসেবা	১৪,০৩৫·২৬
১১। বিবিধ	৮০১·৪৭
	৯৭,৫০০·০০

আর্থনীতিক ও সামাজিক নির্দেশ (Economic and Social Indicators) :

	১৯৭৯-৮০	১৯৮৪-৮৫	১৯৯৪-৯৫
১। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (কোটি টাকার হিসাবে)	৯৭,০৫১	১২৫,০৫০	২১৩,৬০০
২। জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	৬৫৪·১	৭১৭·২	৮৯৩·০
৩। মাথাপিছু উৎপাদন (টাকার হিসাবে)	১৪৮৪	১৭৪৪ (৩·২৮)	২৫৩৪ (৩·৮১)
৪। মাথাপিছু মাসিক ভোগ	৯৫·৬২	১০৯·৬৭ (২·৭৯)	১৫১·৫৮ (৩·৩২
৫। দারিদ্র্য রেখার নীচে অবস্থিত জনসংখ্যার অনুপাত	৪৮·৪৪	৩০·০০	৮ ৭৫
৬। কর্মসংস্থান	১৫১	১৮৫	২৪৮
৭। আয়ুষ্কাল (বৎসর) পুরুষ	৫২·৬	৫৫·১	৬০·১
স্ত্রীলোক	৫১·৬	৫৪·৩	৫৯·৮

পরিকল্পনার অর্থসংস্থান (Resources for the Plan) : পরিকল্পনার জন্য যে আর্থিক সম্পদের প্রয়োজন হয় তাহা অভ্যন্তরীণ ও বিদেশী উৎস হইতে সংগৃহীত হয়। নিম্নলিখিত উৎসগুলি হইতে যে অর্থ-সম্পদ সংগৃহীত হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে তাহা দেখান হইল :

উৎস	পরিমাণ (মোট টাকার হিসাব)
১। সরকারী সঞ্চয়	৩৪,২০০
২। বেসরকারী সঞ্চয়	১১৫,৪৪৭
৩। মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়	১৪৯,৬৪৭
৪। বিদেশ হইতে সাহায্য	৯,০৬৩
৫। মোট বিনিয়োগের জন্য মোট সঞ্চয়	১৫৮,৭১০
৬। সরকারী খাতে চল্‌তি উন্নয়নী ব্যয়	১৩,৫০০
৭। মোট সম্পদ	১৭২,২১০

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ (Saving and Investment **:** ষষ্ট পরিকল্পনা কালে মোট ১৫৮,৭১০ কোটি টাকা (১৯৭৯-৮০ সালের দামস্তরে) বিনিয়োজিত হইবে। ইহার মধ্যে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় হইতে ১৪৯,৬৪৭ কোটি টাকা এবং বৈদেশিক সাহায্য হইতে ৯,০৬৩ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে। মোট বিনিয়োগের ৯৪·৩ শতাংশ অভ্যন্তরীণ উৎস হইতে আর ৫·৭ শতাংশ বৈদেশিক সূত্র হইতে সংগ্রহীত হইবে।

মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বার্ষিক ৫·২ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পাইবে এবং ষষ্ঠ পরিকল্পনার পরবর্তী দশকে ৫·৫ শতাংশ হারে বাড়িবে। জনসাধারণের ভোগব্যয় বার্ষিক ৭·৫ শতাংশ হারে এবং রপ্তানী ৯ শতাংশ হারে বাড়িবে।

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় ১৫৮, ৭১০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হইবে। ইহার মধ্যে সরকারী খাতে ৮৪,০০০(৫৩%) কোটি টাকা এবং বেসরকারী খাতে ৭৪,৭১০ (৪৭%) কোটি টাকা বিনিয়োগ হইবে। ইহা ছাড়া সরকারী খাতে চল্‌তি ব্যয় হইবে ১৩,৫০০ কোটি টাকা।

স্থিতিশীলতার সঙ্গে উন্নয়ন (Growth with Stability) **:** ষষ্ঠ পরিকল্পনার প্রধান কাজ হইল উন্নয়নের জন্য এরূপভাবে সম্পদ সংগ্রহ করা যাহাতে মুদ্রাস্ফীতি পরিহার করা যায়। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং স্থিতিশীল মূল্যস্তর পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য প্রয়োজন। মুদ্রাস্ফীতিবিরোধী নীতি এই ভাবে নির্ধারণ করিতে হইবে যাহাতে মূল সাংগঠনিক পরিবর্তন সহজ হয় কারণ ওই পরিবর্তন দেশের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন। আর্থিক ও ফিসক্যাল নীতি এরূপ ভাবে রচনা করিতে হইবে যাহাতে টাকার অতিরিক্ত যোগান নিয়ন্ত্রিত হয়।

কৃষিক্ষেত্র (Agriculture) : পরিকল্পনাকালে ৫.২ শতাংশ হারে উন্নয়ন করিতে হইলে ফসল উৎপাদন বার্ষিক ৪—৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি করিতে হইবে। অভ্যন্তরীণ ভোগ ও রপ্তানীর কথা বিবেচনা করিয়া ষষ্ঠ পরিকল্পনায় কৃষি-উন্নয়নের প্রকৃতি নির্ধারণ করা হইয়াছে। কৃষির ক্ষেত্রে ফসলের সম্ভাব্য উৎপাদন এবং প্রকৃত উৎপাদনের মধ্যে যে ফাঁক আছে তাহা পূরণ করিবার উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে।

দানাশস্যের উৎপাদন ১০৯ মিলিয়ন টন হইতে বাড়িয়া ১৯৮৪-৮৫ সালে ১৪৯ হইতে ১৫৪ মিলয়ন টন হইবে। পরিকল্পনায় যে কৃষিকৌশল গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার বৈশিষ্ট্যগুলি এইরূপ :

১। ইতিমধ্যে যে উন্নয়ন সাধিত হইয়াছে তাহা সুদৃঢ় করিতে হইবে ;

২। নূতন কৃষিকৌশলের সুবিধা অধিক সংখ্যক কৃষকদিগের মধ্যে সম্প্রসারিত করিতে হইবে ;

৩। ভূমিসংস্কারের গতিবেগ দ্রুততর করিতে হইবে :

৪। কৃষিউন্নয়নকে গ্রামাঞ্চলে আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির একটি হাতিয়ার করিতে হইবে ;

৫। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে জমি ও জলের ব্যবহার করিতে হইবে ;

৬। উৎপাদক, সংরক্ষণ, বিক্রয় ও বণ্টনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়া উৎপাদক ও ভোগকারীর স্বার্থ রক্ষা করিতে হইবে ;

শিল্প, শক্তি ও খনিজ (Industry, Minerals and Energy) : ষষ্ঠ পরিকল্পনা কালে শিল্পের উৎপাদন বার্ষিক ৮ শতাংশ হারে বাড়িবে। স্বয়ং-নির্ভরশীলতা অর্জনের জন্য শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগের প্রকৃতি এরূপ হওয়া প্রয়োজন যাহার দরুন ইস্পাত, মূলধনী দ্রব্য, সার এবং পেট্রোকামিকেলের মতো মূল শিল্পসমূহের উৎপাদনক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। এই সকল শিল্প সম্প্রসারণে সরকারী ক্ষেত্র প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিলেও বেসরকারী, যৌথ ও সমবায় ক্ষেত্রের সম্প্রসারণেরও যথেষ্ট সুযোগ থাকিবে।

শক্তি উন্নয়নের অপরিহার্য সর্ত। উন্নয়ন যতই ত্বরান্বিত হইবে শক্তি ভোগের পরিমাণও ততই বৃদ্ধি পাইবে। শক্তির দেশীয় উৎসগুলিকে কাজে লাগাইতে হইবে এবং আমদানীকৃত তৈলের উপর নির্ভরশীলতা কমাইতে হইবে।

গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রশিল্প (Village and Small Industries) : ক্ষুদ্র

শিল্পের সংজ্ঞার সংশোধন করিয়া উহার পরিধি বাড়ান হইয়াছে। যে সকল শিল্পে স্থির বিনিয়োগ ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত (সহকারী শিল্পের ক্ষেত্রে এই সীমা ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত) তাহাদের ক্ষুদ্রশিল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। বর্তমানে ক্ষুদ্র শিল্প বলিতে (১) আধুনিক ক্ষুদ্রশিল্প এবং (২) সনাতন গ্রামীণ শিল্পকে বোঝায়। মূলধন-উৎপাদন অনুপাত অনুকূল হওয়ায় এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সুযোগ থাকায় ষষ্ঠ পরিকল্পনায় গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রশিল্প সম্প্রসারণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। ক্ষুদ্রও গ্রামীণ শিল্পের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি গ্রহণ করা হইয়াছে :

ক) দক্ষতা, কারিগরী জ্ঞান এবং বিক্রয়ব্যবস্থা উন্নত করিয়া উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইবে ;

খ) বিকেন্দ্রীকরণ করিয়া অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করিতে হইবে ;

গ) বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতার পরিপূর্ণ ব্যবহার করিতে হইবে ;

ঘ) প্রশিক্ষণ ও প্রেরণাদানের (incentives) সাহায্যে নূতন নূতন উদ্যোক্তা সৃষ্টি করিতে হইবে।

ঙ) গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্পকে দক্ষ করিয়া তুলিয়া উহাদের সাহায্য দান হ্রাস করিতে হইবে।

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পখাতে সরকারী উদ্যোগে ১,৭৮০·৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই সময়ে বেসরকারী উদ্যোগে ১২,৬০০ কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে।

দারিদ্র্য ও কর্মসংস্থান (Poverty and Employment) **:** গত ৩০ বছরে অর্থনৈতিক উন্নয়নের দরুন মাথাপিছু গড় আয় ৪৬৬ টাকা (১৯৫০-৫১) হইতে বাড়িয়া ১৯৭৯ সালে ৭৩০ টাকা হইয়াছে। এই অগ্রগতি সত্ত্বেও দেশে দারিদ্র্যের চাপ খুব বেশী। সুতরাং দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য সক্রিয় কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন। দারিদ্র ও বেকারত্ব বিনাশ করিবার জন্য শুধুমাত্র উন্নয়ন হারের উপর নির্ভর করাই যথেষ্ট নয়। সুনির্দিষ্ট কার্য-সূচীর সাহায্যে উৎপাদনের গঠনকে গণভোগপণ্য উৎপাদনের অনুকূলে আনয়ন করিতে হইবে আর সেইসঙ্গে উৎপাদনের আঞ্চলিক সমবণ্টণ সুনিশ্চিত করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত দারিদ্র্য বিনাশকারী যে সকল কর্মসূচী প্রচলিত আছে তাহাদের প্রসারিত করিতে হইবে। শ্রম-প্রগাঢ় গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রশিল্পগুলিকে উৎসাহিত করিতে হইবে।

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় দারিদ্র্য দূরীকরণের উপর উচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হইয়াছে। ১৯৭৯-৮০ সালে ৪৮·৪৪ শতাংশ লোক দারিদ্র্যরেখার নীচে ছিল, পরিকল্পনার শেষে উহা হ্রাস পাইয়া ৩৮·৯৩ শতাংশ হইবে।

লেনদেন উদ্বৃত্ত (Balance of Payments) : দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরু হইতেই ভারত লেনদেন উদ্বৃত্ত অসুবিধার সম্মুখীন হয়। ষষ্ঠ পরিকল্পনা কালের শেষে পণ্য লেনদেন খাতে ৩৯৭২ কোটি টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। এই ঘাটতির প্রধান কারণ পেট্রোলিয়ম ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যের আমদানী বৃদ্ধি। ষষ্ঠ পরিকল্পনা কালে রপ্তানীর পরিমাণ ৯ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাইবে। ওই সময়ে আমদানী বৃদ্ধির হার ৭·৯ শতাংশ হইবে।

জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা (Population and Family Planning) : জনসংখ্যার প্রবল বৃদ্ধি রোধ ষষ্ঠ পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। জন বিস্ফোরণ রোধ করিতে না পারিলে পরিকল্পনার কোন সুফলই জনসাধারণ ভোগ করিতে পারিবে না ; জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে পরিবার পরিকল্পনা কার্যসূচীকে জোরদার করা হইবে। জন্মহার প্রতি হাজারে ৩৩ হইতে হ্রাস করিয়া ২১ করিতে হইবে। বর্তমানে ২১ শতাংশ দম্পতি পরিবার পরিকল্পনার আওতায় আসিয়াছে—উহা বৃদ্ধি করিয়া ৬০ শতাংশ করিতে হইবে।

শ্রম ও শ্রমকল্যাণ (Labour and Labour Welfare) : শ্রমনীতির ভিত্তি হইল সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতি (Directive Policy) ; পরিকল্পিত উন্নয়নের প্রয়োজন ও সামাজিক ন্যায়বিচারের কথা চিন্তা করিয়া শ্রমনীতি বিবর্তিত হইয়াছে। শ্রমিক, মালিক ও সরকার এই তিন পক্ষের প্রতিনিধি লইয়া আলোচনা ও পরামর্শের ভিত্তিতে শ্রমনীতি বাস্তব রূপ গ্রহণ করে।

ইতিমধ্যে শ্রমসংক্রান্ত যে সব আইন পাশ হইয়াছে তাহাদের ঠিকভাবে কার্যকর করিবার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। ষষ্ঠ পরিকল্পনাকালে কর্মচারী রাজ্য বীমা আইন এবং প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আইনের পরিধি বাড়ান হইবে। ইহা ব্যতীত কৃষি-শ্রমিক, কারিগর, ধীবর, তন্তুবায় ও অন্যান্য অসংগঠিত শ্রমিকদের সুবিধার জন্য রাজ্যসরকারগুলি এই সময় বিশেষ কার্যসূচী গ্রহণ করিবে। শ্রমিকশিক্ষা প্রসার ও সেই সঙ্গে উহার গুণগত মান উন্নত করিতে হইবে।

ন্যূনতম মজুরির স্তর বৃদ্ধি করিতে হইবে যেন উহা অচিরেই প্রয়োজন-ভিত্তিক মজুরীর বাস্তব রূপ গ্রহণ করিতে পারে। বোনাস ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক সুবিধাকে আইনের আওতায় আনা হইয়াছে। উৎপাদন-শীলতার সঙ্গে যুক্ত বোনাস রেলকর্মী, ডাক ও তারকর্মী এবং আরও কয়েকটি সরকারী বিভাগীয় ক্ষেত্রে প্রবর্তন করা হইয়াছে।

শ্রমিক-মালিক সম্পর্ককে সহযোগিতার ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিতে হইবে কারণ উহার ফলাফল শুধুমাত্র শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া বৃহত্তর সমাজস্বার্থও উহার দ্বারা প্রভাবিত হয়। বিদ্যুৎ, কয়লা, ইস্পাত, রেল-পরিবহন প্রভৃতি মূল শিল্পে শ্রমিক-মালিক পরামর্শ ব্যবস্থা এরূপ ভাবে কার্যকর করিতে হইবে যাহার দরুন ধর্মঘট বা লকআউটের কোন প্রয়োজন হইবে না।

শিল্প পরিচালনায় শ্রমিকের অংশগ্রহণকে শিল্পসম্পর্ক ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংগ করা হইয়াছে। ইহাকে শ্রমিক ও মালিকের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের একটি পদ্ধতি করা হইবে এবং ইহা দেশে এরূপ এক সহযোগিতা-মূলক সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিবে যাহা দেশে শিল্পের ভিত্তিকে দৃঢ়তর করিবে। এই সঙ্গে ত্রিপাক্ষিক ব্যবস্থাকেও জোরদার করিয়া তুলিতে হইবে। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় শ্রম ও কল্যাণখাতে ১৬১৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

ষষ্ঠ পরিকল্পনার সমালোচনা (Criticism)**:** ষষ্ঠ পরিকল্পনার পাঁচ বছরের মধ্যে ১৮ মাস অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে কিন্তু তথাপি অর্থনীতিতে যথেষ্ট গতিবেগ সঞ্চারিত হয় নাই। বর্তমানে অর্থনীতির মন্থর গতি দেখিয়া মনে হয় না পরিকল্পনায় ৫·২ শতাংশ বৃদ্ধির যে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হইয়াছে তাহা আদৌ পূরণ হইবে। যদি পরিকল্পনায় গৃহীত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা যায় তবেই দারিদ্র্য, অর্ধবেকার এবং পূর্ণবেকার সমস্যার সমাধান হইতে পারে। কিন্তু যদি ওই লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হয় তাহা হইলে মূল সমস্যাগুলির কোন সুরাহা হইবে না। প্রথম পরিকল্পনা ব্যতীত পরবর্তী কোন পরিকল্পনায়ই নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয় নাই। বর্তমান গতিপ্রকৃতিও সমান নৈরাশ্যজনক।

প্রথমত, বর্তমান বছরে কৃষি-উৎপাদন পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বেশী হইবে সে সম্ভাবনা কম। দ্বিতীয়তঃ, শিল্পক্ষেত্রে অগ্রগতি খুবই নৈরাশ্যজনক। উৎপাদন বৃদ্ধির পরিবর্তে উহা হ্রাস পাইয়াছে। এপ্রিল-জুনে শিল্প উৎপাদন সূচক হ্রাস পাইয়া ১৫৬·৮ হয়; পূর্ববর্তী বছরে ওই সময় উহা ছিল ১৫৮·২% মূলধনী শিল্পে আর্থিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইলেও প্রকৃত উৎপাদন সেই তুলনায়

যথেষ্ট কম। অর্থনীতির উপকাঠামো (infrastructure) এখনও পুনর্গঠিত হয় নাই—বিদ্যুৎ, কয়লা ও পরিবহনের অগ্রগতি আদৌ সন্তোষজনক নয়।

বেসরকারী ক্ষেত্রেও অগ্রগতি উপকাঠামোর উপর নির্ভরশীল; এইক্ষেত্রে ব্যর্থতা বেসরকারী ক্ষেত্রেও ব্যর্থতার কারণ হইবে; মুদ্রাস্ফীতি অব্যাহত থাকায় বেসরকারী ক্ষেত্র সরকারী ক্ষেত্র অপেক্ষা ভাল কাজ করিতেছে কিন্তু ঋণদান কঠোর করিলে বেসরকারী ক্ষেত্রে মূলধন প্রবাহ সংকুচিত হইবে।

মুদ্রাস্ফীতি রোধে সরকারী ব্যবস্থা আদৌ কার্যকরী হয় নাই এবং দুই অঙ্কের মুদ্রাস্ফীতি অব্যাহত রহিয়াছে: ইহা একদিকে যেমন অধিক সংখ্যক লোককে দারিদ্র্য সীমার নিচে ঠেলিয়া দিতেছে, অপর দিকে তেমনি পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য প্রকৃত সম্পদের পরিমাণ হ্রাস করিতেছে।

ঘাটতি ব্যয়ের যে নিরাপদ সীমা স্থির করা হইয়াছিল ইতিমধ্যেই সেই সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। অধিক ঘাটতি ব্যয় ক্রমবর্ধমান মূল্যস্তরে ইন্ধন যোগাইবে। ক্রমাগত প্রতিকূল বাণিজ্য ব্যাল্যান্সের দরুন বৈদেশিক মুদ্রার সংরক্ষণও আশংকাজনক। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় ধরা হইয়াছিল যে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রির্জাভ ৪০০০ কোটির নিরাপদ স্তরে থাকিবে কিন্তু বর্তমানে উহা ওই পর্যায়ের নীচে নামিয়া গিয়াছে। বৈদেশিক ঋণ প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নয়নের কাজ ব্যাহত করিবে।

সর্বশেষে, আন্তর্জাতিক পরিবেশও বিশেষভাবে প্রতিকূল—একদিকে ক্রমবর্ধমান তৈলের দাম বৃদ্ধি ও বাণিজ্যহারের (terms of trade) অবনতি আর অন্য দিকে প্রতিবেশী রাষ্ট্র কর্তৃক যুদ্ধের প্রস্তুতি আমাদের অর্থনীতি ও পরিকল্পনার ক্ষেত্রে দারুন সংকটের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রতিরক্ষাকে শক্তিশালী করিবার জন্য কিছু পরিমাণ উন্নয়ন ব্যাহত হইবার আশংকা দেখা দিয়াছে।

অনুশীলনী

১। পরিকল্পনা কাহাকে বলে ? পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা কি ?

২। ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যৌক্তিকতা আলোচনা কর।

৩। পরিকল্পনা কয় শ্রেণীর হয় ? বিকাশমান দেশের সঠিক পরিকল্পনা কৌশল আলোচনা কর।

৪। মিশ্র অর্থব্যবস্থা কাহাকে বলে ? ভারতে কেন এই ধরনের অর্থব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা ব্যাখ্যা কর।

৫। ভারতের প্রথম পরিকল্পনার কি কি উদ্দেশ্য ছিল ? প্রথম পরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যালোচনা কর।

৬। দ্বিতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলি কি কি ? উহা কি ওই উদ্দেশ্যগুলি সফল করিতে সমর্থ হইয়াছিল ?

৭। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলি বর্ণনা কর। এই পরিকল্পনার অর্থসংগ্রহের উৎসগুলি কি কি ?

৮। তৃতীয় পরিকল্পনার অগ্রগতি আলোচনা কর।

৯। চতুর্থ পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলি কি কি ? এই পরিকল্পনার অগ্রগতি আলোচনা কর।

১০। পঞ্চম পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলি ও অগ্রগতি আলোচনা কর।

১১। ষষ্ঠ পরিকল্পনার রূপরেখা বর্ণনা কর।

১২। ঘূর্ণমান পরিকল্পনা কাহাকে বলে ? উহার সুবিধা ও অসুবিধাগুলি বর্ণনা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

ভারতের জাতীয় আয়
(Indian National Income)

পিঠে যতবড় হইবে প্রত্যেকের ভাগও ততই বাড়িবে এই অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া করিয়া আমরা অগ্রসর হই বলিয়া সমস্ত অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টার লক্ষ্য হইল জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি এবং সমবণ্টনের মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলি জাতীয় আয়ের ক্রমবৃদ্ধির উপর যথোচিত লক্ষ্য রাখিয়াছে। কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের আলোচনা প্রধানতঃ সেই দেশের উৎপাদন, জাতীয় আয় বৃদ্ধি এবং সমবণ্টনকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া ওঠে। অর্ধোন্নত দেশের অনগ্রসরতার প্রকৃতি তাহার জাতীয় আয়ের স্বল্পতা ও অসম বণ্টনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়।

দেশের শ্রম ও মূলধন যে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদে নিয়োগ করিয়া নির্দিষ্ট বৎসরে যে পরিমাণ দ্রব্যসমষ্টি ও সেবার সৃষ্টি হয় তাহাদের অর্থমূল্যের সমষ্টিই হইল জাতীয় আয়।

ভারতে জাতীয় আয় পরিমাপের অসুবিধা (Difficulties of National Income Calculations in India) : ভারতের মতো বিকাশমান দেশে জাতীয় আয় পরিমাপের নানারূপ অসুবিধা আছে। বিরাট দেশে আয়ের পরিসংখ্যান রচনা সংগ্রহ করা এক কঠিন ব্যাপার। আমাদের দেশে আর্থনীতিক বিশ্লেষণ অপেক্ষা শাসনবিভাগের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করিয়াই ভারতীয় পরিসংখ্যান করা হয়। জাতীয় আয় পরিমাপের অসুবিধাগুলি প্রধানতঃ দুই ধরনের—ধারণাগত অসুবিধা এবং তথ্যগত অসুবিধা।

১। অর্থবহির্ভূত ক্ষেত্র : প্রথম ধারণাগত অসুবিধা হইল যে উৎপাদনের এক বিরাট অংশ বাজারেই আসে না। জাতীয় আয় পরিমাপের সময় আমরা ধরিয়া লই যে দেশে উৎপাদিত সকল দ্রব্যই টাকার বিনিময়ে বিক্রয় হয়। কিন্তু ভারতে উৎপাদনের এক বিরাট অংশ বাজারে বিক্রয় হয় না—উৎপাদক হয় নিজেই উহা ভোগ করে নতুবা অপর উৎপাদকের দ্রব্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে বিনিময় করে। জাতীয় অর্থনীতিতে এইরূপ অর্থের লেনদেন বহির্ভূত ক্ষেত্র থাকায় প্রকৃত আয় গণনায় নানারূপ জটিলতা দেখা দেয়।

ভারতের কৃষকেরা সাধারণতঃ জীবনধারণের জন্য চাষ করে আর সেই কারণে বাজারে বিনিময়যোগ্য উদ্বৃত্ত প্রায় অনেক ক্ষেত্রেই শূন্য। এই অসুবিধা থাকার জন্য জাতীয় আয় কমিটি, জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামো অর্থ-সম্পর্কিত ও অর্থ-বহির্ভূত এই দুইভাবে বিভক্ত করিয়া জাতীয় আয় নির্ধারণের পরামর্শ দিয়াছে।

২। পরিমাণগত ও গুণগত অসুবিধা: বহু সংখ্যক কৃষক তাহাদের উৎপাদনের গুণগত ও পরিমাণগত মূল্য সম্পর্কে অজ্ঞ। পাশ্চাত্য দেশে উৎপাদকগণ তাহাদের উৎপাদনের হিসাব রাখে সুতরাং সহজেই ব্যক্তির কাছ থেকে অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু ভারতীয় কৃষক অজ্ঞ, তাহারা নিজেদের উৎপাদনের হিসাব রাখে না এবং গুণগত মান সম্পর্কে অবহিত নয়। সুতরাং কৃষিউৎপাদনের মূল্য নির্ধারণ করিতে অনেকখানি আন্দাজের আশ্রয় লওয়া হয়।

৩। অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগের অভাব: অর্থনৈতিক কাজের শ্রেণীবিভাগ না থাকায় জাতীয় আয়ের পরিমাপ করা কঠিন। ভারতীয় অর্থব্যবস্থা পারিবারিক ভিত্তিতে গঠিত এবং একই ব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে; উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একই ব্যক্তি জমি চাষ করে, মাছ ধরে এবং অন্যসময় মজুর খাটে। একই লোক বিভিন্ন কাজ করায় শ্রেণী-বিভাগের অসুবিধা হয়।

৪। দামের তারতম্য: কৃষক যে দামে তাহার ফসল বিক্রয় করে সেই দাম ভারতের মতো বিরাট দেশের সর্বত্র সমান থাকে না এবং বৎসরের বিভিন্ন সময়ে প্রতিটি পণ্যের দামের তীব্র ওঠানামা হইয়া থাকে; এই কারণে ফসলের আর্থিক মূল্য হিসাব করার অসুবিধা আছে।

৫। কৃষি ও শিল্প অসংগঠিত: ভারতের কৃষি ও শিল্প এখনও অসংগঠিত এবং অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে; কৃষি ও শিল্প উৎপাদনের হিসাবও নির্ভরযোগ্য নয়।

এই সকল ধারণাগত অসুবিধা ছাড়াও কতকগুলি তথ্যগত অসুবিধা আছে।

১। পরিসংখ্যানের অভাব: সঠিক ও নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানের অসুবিধা ভারতের জাতীয় আয় পরিমাপের এক বিশেষ অসুবিধা। অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কোন পরিসংখ্যানই নাই। যে সব তথ্য পাওয়া যায় তাহা

নির্ভরযোগ্য নয় আর এই সব তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া জাতীয় আয়ের যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তাহা কখনই ক্রটিবিমুক্ত হইতে পারে না। তথ্যের আঞ্চলিক পার্থক্য এতো বেশী যে এক অঞ্চলের তথ্য পাওয়া গেলে উহা হইতে Random Sample পদ্ধতিতে সারা দেশের হিসাব পাওয়া দুরূহ হয়।

২। পরিসংখ্যান সংগ্রহের অসুবিধা: পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা এক দুরূহ কাজ। নিরক্ষরতা ব্যাপক হওয়ায় পরিসংখ্যানের জন্য তথ্যাদি দিতে জনসাধারণ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে না। পরিসংখ্যান সংগ্রহকে তাহারা সন্দেহের চোখে দেখে।

৩। সাধারণ মানদণ্ডের অভাব: কোন ধরনের দ্রব্য এবং কাজকে হিসাবের মধ্যে ধরা হইবে এ সম্পর্কে মতভেদ আছে; ভারতের মতো বিরাট দেশে কার্যাবলীর সাধারণ মানদণ্ড (common denomination) খুঁজিয়া বাহির করা বেশ কঠিন।

ভারতে জাতীয় আয়ের গঠন ও প্রবণতা (Trends and Structures of India's National Incomes since 1951). ১৯৫১ সালের পর থেকেই ভারতের জাতীয় আয়ের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিতে পাই:

১। ভারত একটি সম্প্রসারণশীল দেশ—এখানে জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু আয় দুই-ই ধীরগতিতে বাড়িতেছে। প্রথম পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয় ১৮ শতাংশ, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয় ২১ শতাংশ এবং তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ১৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে আয় ১৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। অবশ্য সমগ্র পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয় বছরে মাত্র ৩ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫১ সালে জাতীয় আয় ছিল ৮,৮৫০ কোটি টাকা—১৯৭৬-৭৭ সালে উহা ৬৪,২৭৯ কোটি টাকায় (বর্তমান দামস্তরে) আসিয়া দাঁড়ায়।

জাতীয় আয়ের ন্যায় মাথাপিছু আয়ও বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রথম পরিকল্পনা কালে মাথাপিছু আয় ৮ শতাংশ, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উহা ৮·৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে মাথাপিছু আয় কিছুই বাড়ে নাই। চতুর্থ পরিকল্পনায়ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার বিশেষ নৈরাশ্যজনক। ১৯৫১ সালে মাথাপিছু আয় ছিল ২৬৫ টাকা—উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৭৬-৭৭ সালে ১,০৪৮·৬ টাকা (বর্তমান দামস্তরে) হয়; জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত হইলে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি আরও বেশী হইত।

২। ইউরোপ ও আমেরিকার উন্নত দেশগুলির তুলনায় ভারতে মাথাপিছু আয় লজ্জাজনকভাবে কম। নিচে ১৯৭০ সালে ভারত ও আরও কয়েকটি দেশের মাথাপিছু আয় দেখান হইল :

দেশ	মাথাপিছু আয় (মার্কিন ডলারে)
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	$ ৪৯০০
ক্যানাডা	$ ৩৫০০
সুইডেন	$ ৩৩০০
পঃ জার্মানী	$ ২৮০০
ফ্রান্স	$ ২৭০০
যুক্তরাজ্য	$ ২৪০০
জাপান	$ ১৫০০
ভারত	$ ৯০

৩। বিভিন্নপ্রকার উৎপাদনের ক্ষেত্র হইতে উদ্ভূত আয়ের অনুপাত ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর অ-সমতা নির্দেশ করে। বিভিন্ন ক্ষেত্রের উৎপাদনের পরিমাণে গভীর পার্থক্য থাকায় অর্থব্যবস্থায় ভারসাম্য রক্ষিত হয় নাই। ১৯৭৫-৭৬ সালে জাতীয় আয়ের ৪১·৭ শতাংশ আসে কৃষি ও অনুরূপ ক্ষেত্র হইতে ; শিল্প হইতে পাওয়া যায় মাত্র ২৩·৮ শতাংশ ; পরিবহন ও যোগাযোগ হইতে পাওয়া যায় ১৬·৯ শতাংশ , জাতীয় আয়ের বাকী ১৮·৮ শতাংশ পাওয়া যায় সেবামূলক কাজ হইতে।

৪। মাথাপিছু আয়ের দ্বারা বা মোট আয়ের দ্বারা সঠিকভাবে জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা বোঝা যাইবে না, তাহাদের প্রকৃত অবস্থা জানিতে হইলে জনগণের মধ্যে জাতীয় আয় কিভাবে বন্টিত হইতেছে তাহাও লক্ষ্য করিতে হইবে। ভারতে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ খুবই কম আর ওই সামান্য আয়ও অসমানভাবে বন্টিত। দেশের সর্বোচ্চ ৫ শতাংশ ধনী ব্যক্তি জাতীয় আয়ের ২০ শতাংশ ভোগ করে ; অন্যদিকে ৫০ শতাংশ ব্যক্তি জাতীয় আয়ের মাত্র ২০ শতাংশ ভোগ করে। গ্রাম ও শহরের অধিবাসীদের মধ্যে এবং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য না কমিয়া ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে। ধনবৈষম্য দূর করিবার জন্য রাষ্ট্র জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ করিয়াছে, মৃত্যুকর, সম্পদকর, ব্যয়-কর, দানকর প্রভৃতি স্থাপন এবং আয়করের হার বৃদ্ধি করিয়াছে। এই সকল ব্যবস্থা সত্ত্বেও ধনবৈষম্য ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। মহালনবীশ কমিটি

ধনবৈষম্যের দুইটি প্রধান কারণ নির্দেশ করিয়াছে। প্রথমতঃ, বেকারত্ব, অর্ধ বেকারত্ব আর সেইজন্য স্বল্প উৎপাদনশীলতা বৃহত্তর জনসমষ্টির স্বল্প আয়ের কারণ; দ্বিতীয়তঃ, কর ফাঁকির দরুণ মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে প্রভূত অর্থ কেন্দ্রীভূত হইয়াছে।

৫। আমাদের আয়ের অধিকাংশই খাদ্যের উপর ব্যয় হয়। জাতীয় আয়ের ৫২ শতাংশ খাদ্যবস্তু কিনতেই ব্যয় হইয়া যায়। গ্রামাঞ্চলে মোট ব্যয়ের ৬৭ শতাংশ খাদ্যবস্তু ক্রয় করিতে ব্যয় হয় আর বস্ত্রবাবদ ব্যয় হয় আয়ের ১০ শতাংশ। এ্যাংগেলের নিয়ম হইতে আমরা জানি যে দরিদ্র ব্যক্তির আয় কম বলিয়া জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিতেই উহার বৃহত্তর অংশ ব্যয় হইয়া যায়।

৬। বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তির মাথাপিছু উৎপাদনশীলতা নিচের তালিকায় দেখান হইল :

	নিযুক্ত শ্রমিকের %	উৎপাদনশীলতা (মাথাপিছু)
(১) কৃষি	৭২·৪	৫০০ টাকা
(২) খনি ও শিল্প	১০·৬	১০০০ ,,
(৩) বাণিজ্য, পরিবহন ও যোগাযোগ	৭·৭	১৫০০ ,,
(৪) অন্যান্য সেবামূলক কাজ	৯·৩	৮০০ .

উপরের তালিকায় দেখা যাইতেছে যে কৃষিতে দুই-তৃতীয়াংশ ব্যক্তি নিযুক্ত আছে কিন্তু উহাই সর্বাপেক্ষা কম উৎপাদনশীল ক্ষেত্র; কৃষিতে জনপিছু গড় উৎপাদন মাত্র ৫০০ টাকা পক্ষান্তরে শিল্প ও খনি ক্ষেত্রে উহা ১০০০ টাকা এবং বাণিজ্য, পরিবহন ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে উহা সর্বাধিক—১৫০০ টাকা।

৭। সরকারের আয় প্রত্যক্ষকর অপেক্ষা পরোক্ষ কর হইতে অনেক বেশী হয়। ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে প্রত্যক্ষ করের পরিমাণ চারগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্তু পরোক্ষ কর বৃদ্ধি পেয়েছে আটগুণ। ১৯৫০-৫১ সালে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের অনুপাত ছিল ৩৫ : ৬৫ কিন্তু ১৯৭১-৭২ সালে ওই অনুপাত হয় ১৯ : ৮১ ; ইহার অর্থ সরকার পরোক্ষ করের উপর অধিকতর নির্ভরশীল অর্থাৎ ভারতের করকাঠামো অধোগতিশীল।

৮। সরকারী বিনিয়োগ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে অর্থাৎ

জাতীয় আয় উৎপাদনে সরকারী ক্ষেত্রের অনুপাত দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে। প্রথম পরিকল্পনার সুরুতে সরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল মাত্র ২৯ কোটি টাকা—১৯৭১ সালে উহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ১১,০৯৭ কোটি টাকা হয়। ১৯৫০-৫১ সালে সরকারী ব্যয় মোট জাতীয় ব্যয়ের ৮ শতাংশ ছিল – বর্তমানে উহা বৃদ্ধি পাইয়া দ্বিগুণ হইয়াছে।

জাতীয় আয়বণ্টন : মহালনবীশ কমিটির রিপোর্ট (Distribution of National Income : Report of the Mahalanobis Committee) : পরিকল্পনা কালে দেশে যে অতিরিক্ত আয় সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা কিভাবে জনগণের মধ্যে বণ্টিত হইয়াছে সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার জন্য ১৯৬০ সালে ভারত সরকার প্রখ্যাত পরিসংখ্যানবিদ অধ্যাপক প্রশান্তকুমার মহালনবীশের সভাপতিত্বে "আয় বণ্টন ও জীবনযাত্রার স্তর কমিটি" (Distribution of Income and Levels of Living Committee) গঠন করে। কমিটি ১৯৬৪ সালে তাহার রিপোর্ট দাখিল করে। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা (National Sample Survey) এবং ফলিত অর্থনীতি গবেষণার জাতীয় পর্ষদের সংগৃহীত তথ্যসমূহের উপর ভিত্তি করিয়া কমিটি, তাহার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। কমিটির প্রধান প্রধান সিদ্ধান্তগুলি উল্লেখ করা হইল :

১। আয়বণ্টনে যে বৈষম্য রহিয়াছে প্রথম দুইটি পরিকল্পনার কাজ শেষ হইবার পরও সামগ্রিকভাবে তাহার কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। নগরাঞ্চলে আয়বৈষম্য সামান্য বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্তু গ্রামাঞ্চলে উহা কিছু পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। গ্রামাঞ্চলের তুলনায় নগরাঞ্চলে আয়বৈষম্য বেশী আর গ্রামাঞ্চলে কৃষিজীবিদের তুলনায় অ কৃষিজীবিদের মধ্যেই আয়বৈষম্য অধিক। গ্রামে উচ্চ আয়বিশিষ্ট ও নিম্ন আয়বিশিষ্ট পরিবারের সংখ্যা যথাক্রমে ৩ শতাংশ ও ৯৭ শতাংশ ; শহরে উহা যথাক্রমে ১১ শতাংশ ও ৮৯ শতাংশ। কমিটি মনে করে অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে আয়বণ্টনের বৈষম্য অধিক নয়।

২। জমি বা বাড়ীর মালিকানার তুলনায় কোম্পানী শেয়ারের মালিকানায় অর্থাৎ যৌথ বেসরকারী ক্ষেত্রে সম্পত্তির কেন্দ্রীভবন বেশী হয়েছে। আয়বণ্টনের বৈষম্যের তুলনায় সম্পদবণ্টনের বৈষম্য অনেক বেশী। ব্যাংক ও বেসরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি একাধিক কোম্পানীর ডাইরেক্টর থাকায় একচেটিয়া কারবার প্রসার লাভ করিয়াছে। কমিটির মতে সরকারী নীতিই বেসরকারী শিল্পের অবাঞ্ছনীয় সম্প্রসারণ ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রী-

ভবনের জন্য দায়ী। শিল্প অর্থ-কর্পোরেশন, জাতীয় শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন প্রভৃতি সরকারী অর্থসরবরাহ সংস্থাগুলি বেসরকারী শিল্পের অকাম্য প্রসারে সহায়তা করিয়াছে।

৩। দেশের ব্যাংকশিল্প অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। ১৯৫৯ সালে দেশের ৩৬৩টি ব্যাংকের মধ্যে যাহাদের আমানতের পরিমাণ ২৫ কোটি টাকা বা তদপেক্ষা বেশী এমন ১৫টি বৃহৎ ব্যাংক মোট ব্যাংক আমানতের ৭৮ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করিত। ব্যাংকগুলির ঋণদান নীতি অনুশীলন করিলে দেখা যাইবে যে ইহার দরুন প্রধানতঃ বড় বড় কোম্পানীগুলিই অধিকতর সুবিধা পাইয়াছে।

৪। একমাত্র কৃষি-শ্রমিক ছাড়া অন্যান্য কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের আয় গড় আয় অপেক্ষা অধিকহারে বাড়িয়া চলিয়াছে। খনি ও কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকদের আয় গড় আয় অপেক্ষা অধিক হারে বাড়িয়াছে। পক্ষান্তরে কৃষি-শ্রমিকদের আয় সামান্য হ্রাস পাইয়াছে,। ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৫৯ সালের মধ্যে কণ্ট্রাকটরদের আয় সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণ (৪৯ শতাংশ) বৃদ্ধি পায়।

৫। মোটামুটিভাবে বলা যায় গ্রাম ও শহরের জনসাধারণের অবস্থা ১৯৫০ সালের তুলনায় ১৯৬০ সালে উন্নত হইয়াছে কারণ তাহারা পূর্বের তুলনায় ভালো খাদ্য, বস্ত্র ও বাসগৃহ পাইতেছে।

৬। মহালনবীশ কমিটি ধনবৈষম্যের দুইটি প্রধান কারণ উল্লেখ করিয়াছে: প্রথমতঃ, বেকারত্ব ও আধাবেকারত্বের দরুন স্বল্প উৎপাদনশীলতা বৃহত্তর জনসমষ্টির স্বল্প আয়ের কারণ। দ্বিতীয়ত, কর ফাঁকির দরুন মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে প্রভূত অর্থ কেন্দ্রীভূত হইয়াছে।

পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় (Growth of National Income and Per Capita Income) :

জাতীয় আয়ের বৃদ্ধিসাধন ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। প্রতিটি পরিকল্পনায় সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া জাতীয় আয় বৃদ্ধির প্রয়াস চালান হইতেছে।

১৯৫০-৫১ সালে অর্থাৎ প্রথম পরিকল্পনার প্রারম্ভে জাতীয় আয় ছিল ৮,৮৮৫ কোটি টাকা আর মাথাপিছু আয় ছিল ২৪৬·৩ টাকা। প্রথম পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল জাতীয় আয় ১১ শতাংশ বৃদ্ধি করা; কিন্তু অনুকূল প্রাকৃতিক অবস্থার দরুন পরিকল্পনা আশাতীত ভাবে সাফল্যলাভ করে এবং ১৯৫৫-৫৬ সালে

প্রথম পরিকল্পনার শেষে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইয়া ১০,৪৮০ কোটি টাকা হয় অর্থাৎ উহা ১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। মাথাপিছু আয় ২৪৬ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২৭০·৪ টাকা হয় অর্থাৎ উহা ৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। কৃষিক্ষেত্রে বিস্ময়কর সাফল্য, শিল্পক্ষেত্রে ৪৯ শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধি, স্থিতিশীল মূল্যস্তর প্রভৃতি কারণে প্রথম পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয় বৃদ্ধি অতীব সন্তোষজনক হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার ফলাফল ওইরূপ সন্তোষজনক হয় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বছরে জাতীয় আয় ২৫ শতাংশ বৃদ্ধির লক্ষ্য গৃহীত হয় কিন্তু আয় বৃদ্ধির ঐ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয় নাই। জাতীয় আয় ওই সময়ে ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ৪১ শতাংশ কিন্তু কৃষির ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল মাত্র ২০ শতাংশ। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরুতে জাতীয় আয় ছিল ১০,৪৮০ কোটি টাকা, ১৯৬০-৬১ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৩,২৯৪ কোটি টাকা হয়; এই সময়ে মাথাপিছু আয় ২৭৩ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২৯৩·৭ টাকায় আসিয়া দাঁড়ায়।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে (১৯৬১-৬৬) ৩০ শতাংশ জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও ১৭ শতাংশ মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির লক্ষ্য গৃহীত হয়। কিন্তু এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয় নাই। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম চার বৎসরে জাতীয় আয় ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পায় কিন্তু শেষ বৎসরে অভূতপূর্ব খরা এবং পাক-ভারত যুদ্ধের জন্য জাতীয় আয় ৫·৬ শতাংশ হ্রাস পায়। মাথাপিছু আয়ের সামান্য বৃদ্ধি ঘটে। এই সময়ে জাতীয় আয় ১২,৭৩০ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৪,৬৪০ কোটি টাকা হয়। মাথাপিছু আয় ২৯৩·৭ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩০১ টাকায় আসিয়া দাঁড়ায়।

চতুর্থ পরিকল্পনাকালে ৩০ শতাংশ জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও ১৫ শতাংশ মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়। পঞ্চম পরিকল্পনাকালে বার্ষিক ৫·৫ শতাংশ হারে জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হইয়াছে।

সাম্প্রতিক কালে ভারতের জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি নিচের ছকে দেখান হইল:

১। নীট জাতীয় উৎপাদন

(কোটি টাকা)	১৯৭২-৭৩	১৯৭৫-৭৬	১৯৭৬-৭৭
(i) চলতি দামে	৪০,৩৯১	৬০,৫৯৬	৬৪,২৭৯
(ii) ১৯৭০-৭১ সালের দামে	৩৪,৩২৩	৩৯,৬২৬	৪০,১৬৪

২। মাথাপিছু আয়

(i) চলতি দামে	৭১৩'৬	১০০৮'৩	১০৪৮'৬
(ii) ১৯৭০-৭১ সালের দামে	৬০৬'৪	৬৫৯'৩	৬৫৫'২

ভারতে ভোগব্যয়ের ধরণ (Consumption Pattern in India) ঃ একদা সোভিয়েত নেতা নিকিতা ক্রুশ্চেভ বলেছিলেন, যদি আমার ব্রেকফাস্টের টেবিলে একটার পরিবর্তে দুটো ডিম পাই তবেই স্বীকার করব যে দেশের উন্নতি হচ্ছে। ব্যক্তিগত জীবনে জাতীয় উন্নয়নের প্রতিফলন না হলে সে উন্নয়ন অর্থহীন। উন্নয়ন, পরিকল্পনা, জাতীয় আয় এগুলি শুধুমাত্র পরিসংখ্যান নয়—বাস্তব সত্য।

মাথাপিছু আয়ের পরিবর্তে মাথাপিছু ভোগব্যয়কে জীবনযাত্রার মানের মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করিলে উহা অধিকতর বাস্তবমুখী হইবে। ভারতে অধিকাংশ ব্যক্তির জীবনযাত্রার মান খুব নিচু। বেশির ভাগ লোক খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসগৃহের মতো জীবনধারণের প্রাথমিক প্রয়োজন পূরণ করিতেই অসমর্থ, আরামপ্রদ দ্রব্য বা বিলাস দ্রব্যের কথা বাদই দিলাম। যে সকল দেশে মাথাপিছু আয় খুব কম ভারত তাহাদের অন্তর্ভুক্ত। মাথাপিছু আয় কম বলিয়াই ব্যক্তির সঞ্চয় ক্ষমতা কম এবং ভোগ্যবস্তু ক্রয় করিতেই স্বল্প আয়ের অধিক অনুপাত ব্যয় হইয়া যায়। ভারতে এক চতুর্থাংশ ব্যক্তি দিনে একবারের বেশী আহার পায় না আর সেই আহারও প্রধানতঃ জোয়ার বা বজরার মতো দানাশস্য। পর্যাপ্ত বস্ত্র বহু ব্যক্তির কাছে বিলাস এবং খুব কম লোকেরই শীতবস্ত্র আছে। গ্রামাঞ্চলে ৬।৭ জন ব্যক্তি এক একটি মাটির ঘরে বাস করে। এই ঘরগুলি স্যাঁতসেঁতে. অন্ধকার এবং বায়ু চলাচলের কোন ব্যবস্থা নাই।

জাতীয় স্যাম্পেল সার্ভে (18th Round of National Sample Survey, 1963 64) প্রকাশিত তথ্য হইতে দেখা যায় যে ষাটের দশকের সুরুতে গ্রামে মাথাপিছু মাসিক ভোগব্যয় ছিল ২২'৩৭ টাকা, শহরে উহা ৩২'৯৬ টাকা এবং কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী ও মাদ্রাজ এই চারটি বড় শহরে উহা ৫২'০৩ টাকা। খাদ্যের উপর ব্যয় গ্রাম, শহর ও উল্লিখিত চারটি বড় শহরে যথাক্রমে আয়ের ৭১'১ শতাংশ, ৬০'৩ শতাংশ এবং ৫৪'৪ শতাংশ। দানাশস্য ছাড়াও ডাল, দুধ, দুগ্ধজাতদ্রব্য, মাছ, মাংস, চিনি, নুন ইত্যাদি খাদ্যবস্তুর অন্তর্ভুক্ত। গ্রামের তুলনায় শহরে মোট খাদ্যের উপর ভোগব্যয়ের

পরিমাণ কিছু বেশী। খাদ্য ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যের জন্য গ্রাম, শহর এবং উল্লিখিত চারটি বড় শহরে ব্যয়ের অনুপাত হইল যথাক্রমে ২৯·৯ শতাংশ, ৩৯·৭ শতাংশ এবং ৪৫·৬ শতাংশ।

পরিকল্পনা কমিশনের মতে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে মাথাপিছু ভোগ ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছিল; অবশ্য অনেকেই ইহা স্বীকার করেন না। এই সময়ে যে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহা জীবনযাত্রার মানে প্রতিফলিত হয় নাই। স্বাধীনতার ৩০ বছর পরেও ২২ কোটি লোক দারিদ্র্যরেখার নীচে রহিয়াছে অর্থাৎ ইহারা জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ভোগ করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত।

নিচের তালিকায় দেশে মাথাপিছু ভোগব্যয়ের একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান দেওয়া হইল:

মাথাপিছু ভোগব্যয়
(টাকার অঙ্কে)

	গ্রামীণ		পৌর	
	১৯৫৬-৫৭	১৯৬৩-৬৪	১৯৫৬-৫৭	১৯৬৩-৬৪
১। সকল খাদ্যবস্তু	১২·১৩	১৫·৬৭	১৫·১২	১৯·৫৬
	(৭০·৮)	(৭০·১)	(৫৮·৭)	(৬০·৩)
২। খাদ্যব্যতীত অন্যান্য সকল বস্তু	৫·০১	৬·৭০	১০·২৫	১৩·৩১
	(২৯·২)	(২৯·৯)	(৪১·৩)	(৩৯·৯)
মোট ভোগব্যয়	১৭·১৪	২২·৩৭	২৫·৭৭	৩২·৯৬
	(১০০)	(১০০)	(১০০)	(১০০)

উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে আয়ের অধিক অংশই খাদ্যবস্তু ক্রয় করিতে ব্যয় হয়। গ্রামাঞ্চলে মোট ব্যক্তিগত ভোগব্যয়ের ৭০ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে মোট ব্যক্তিগত ভোগব্যয়ের প্রায় ৬০ শতাংশ খাদ্যবস্তুর উপর ব্যয় হয়। উপরের তালিকা হইতে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা যাইতেছে যে ১৯৫৬-৫৭ সাল হইতে ১৯৬৩-৬৪ সালের মধ্যে ভোগব্যয়ের অনুপাত মোটামুটিভাবে অপরিবর্তিত আছে।

নিচে দৈনিক ব্যয়গোষ্ঠী হিসাবে জনসংখ্যার শতকরা বণ্টন (Percentage Distrbution of Population by Daily Expenditure Classes) দেখান হইল :

দৈনিক মাথাপিছু ব্যয়গোষ্ঠী (পয়সার হিসাবে)

	গ্রামীণ		পৌর		বড় শহর	
	১৯৫৬-৭	১৯৬৩-৪	১৯৫৬-৭	১৯৬৩-৪	১৯৫৬-৭	১৯৬৩-৪
৫০ পয়সা পর্যন্ত	৫৫·৯	৩২·০	৩৬·০	১৬·৪	১১·২	৪·৮
৫০ থেকে ৭০ পয়সা	২২·০	২৭·৩	২২·২	২১·০	১৬·৬	৭·৭
৭০ থেকে ৯৩ পয়সা	১১·৭	১৯·৪	১৫·৭	২১·৩	১৬·৪	১৫·৭
৯৩ থেকে ১৪৩ পয়সা	৭·৩	১৪·৭	১৪·৬	২১·২	২৫·১	২৬·১
১৪৩ থেকে ১৮৩ পয়সা	২·৭	৩·৭	৪·৬	৭·৩	১০·৫	১১·৮
১৮৩ পয়সা ও তদূর্ধ	১·৪	২·৯	৬·৯	১২·৮	২০·২	৩৩·৯
সকল গোষ্ঠী	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০

দৈনিক মাথাপিছু ৫০ পয়সা পর্যন্ত ব্যয়কারী ব্যক্তিদের সমাজের সর্বাপেক্ষা দরিদ্রগোষ্ঠী বলিয়া অভিহিত করিলে দেখা যাইবে যে এই শ্রেণীটি হ্রাস পাইতেছে। ১৯৫৬-৫৭ সালে গ্রামের ৫৬ শতাংশ লোক এই শ্রেণীতে ছিল, ১৯৬৩-৬৪ সালে উহা হ্রাস পাইয়া ৩২ শতাংশ হয়। এই শ্রেণীটি প্রধানতঃ, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, কৃষিশ্রমিক এবং কারিগর লইয়া গঠিত। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে সর্বোচ্চ শ্রেণী ওই সময়ের মধ্যে বাড়িয়া দ্বিগুণ হইয়াছে ; জমিদার, মহাজন এবং সুদী এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

শহরাঞ্চলে যাহারা দৈনিক ৭০ পয়সা পর্যন্ত ব্যয় করে তাহাদের সর্বাপেক্ষা দরিদ্র শ্রেণী বলিয়া গণ্য করিলে দেখা যায় যে মোট জনসংখ্যার ৫৮ শতাংশ এই শ্রেণীভুক্ত। ১৯৬৩-৬৪ সালে এই শ্রেণীটি হ্রাস পাইয়া জনসংখ্যার ৩৭ শতাংশ হয়। সর্বোচ্চ শ্রেণী যাহারা মাথাপিছু দৈনিক ১৮৩ পয়সা ব্যয় করে

তাহাদের সংখ্যা ১৯৫৬-৫৭ সালে ৭ শতাংশ ছিল„ ১৯৬৩-৬৪ সালে উহা বাড়িয়া ১৩ শতাংশ হয়। বড় শহরে সর্বাপেক্ষা দরিদ্র শ্রেণী (অর্থাৎ যাহারা দৈনিক ৭০ পয়সা পর্যন্ত ব্যয় করে) ১৯৫৬-৫৭ সালে প্রায় ২৮ শতাংশ ছিল। ১৯৬৩-৬৪ সালে উহা হ্রাস পাইয়া ১২.৫ শতাংশ হয়।

ভারতে ভোগব্যয়ের গতি প্রকৃতি (Trends in Consumption Pattern in India) : দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায় এবং এ্যাঞ্জেলের নিয়মানুসারে খাদ্যদ্রব্যের উপর ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস পায়। ১৮৬৯ সাল থেকে ১৯২৮ সালের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় আয় ১২ গুণ বৃদ্ধি পায় কিন্তু খাদ্যের উপর জাতীয় ব্যয় ৯ গুণ বৃদ্ধি পায়। খাদ্যের উপর মোট ব্যয়ের অনুপাত ৩৫ শতাংশ হইতে হ্রাস পাইয়া ২৮ শতাংশ হয়। ওই সময়ের মধ্যে সুইডেনে জাতীয় আয় পাঁচগুণ বৃদ্ধি পায় কিন্তু খাদ্যের উপর জাতীয় ব্যয় চারগুণ বৃদ্ধি পায়। খাদ্যের উপর মোট ব্যয়ের অনুপাত ৪০ শতাংশ হইতে হ্রাস পাইয়া ২৯ শতাংশ হয়। এই সঙ্গে ভোগ প্রকৃতির কাঠামোও পরিবর্তিত হইতে থাকে। দানাশস্য ভোগের পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস পায় এবং মাথাপিছু দুধ, দুগ্ধজাত দ্রব্য, মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি ভোগের পরিমাণ ক্রমশ বাড়িয়া চলে। কলিন ক্লার্কের মতে কৃষিজ দ্রব্যের উপর ব্যয় হ্রাস ও অন্যান্য দ্রব্যের উপর ব্যয় বৃদ্ধি হইল জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান মান এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক।

মাথাপিছু আয় জীবনযাত্রার মানের সূচক বলিয়া ধরা হইলেও জনগণের মাথাপিছু ব্যক্তিগত ভোগের পরিমাণ হইতে জনগণের জীবনযাত্রার মান আরো ভালোভাবে উপলব্ধি করা যায়। নিচের তালিকায় ডাণ্ডেকার ও রথের আলোচনার ভিত্তিতে প্রথম দশকে মাথাপিছু ভোগের পরিমাণ দেখান হইল :

মাথাপিছু ব্যক্তিগত ভোগব্যয় (১৯৬০-৬১ সালের মূল্যে)

	মাথাপিছু আয়		মাথাপিছু ভোগ ব্যয়	
	টাকা	সূচক	টাকা	সূচক
১৯৬০-৬১	৩০৬.৭	১০০.০	২৭৬.৩	১০০.০
১৯৬১-৬২	৩১০.৭	১০১.৩	২৭৬.৬	১০০.১
১৯৬২-৬৩	৩০৮.৮	১০০.৭	২৭৭.৪	১০০.৩
১৯৬৩-৬৪	৩১৯.২	১০৪.১	২৭৮.৪	১০০.৮

	মাথাপিছু আয়		মাথাপিছুভোগ ব্যয়	
	টাকা	সূচক	টাকা	সূচক
১৯৬৪-৬৫	৩৩৩.৬	১০৮.৮	২৭৯.৩	১০১.০
১৯৬৫-৬৬	৩০৭.৩	১০০.২	২৭৯.২	১০১.০
১৯৬৬-৬৭	৩০২.৪	৯৮.৬	২৭৭.২	১০১.০
১৯৬৭-৬৮	৩২১.৩	১০৪.৮	২৮৭.০	১০৩.৯
১৯৬৮-৬৯	৩১৯.৪	১০৪.১	২৮৯.৬	১০৪.৮

১৯৬০-৬১ সাল থেকে ১৯৬৮-৬৯ সালের মধ্যে মাথাপিছু আয় ৩০৬.৭ টাকা থেকে বৃদ্ধি পাইয়া ৩১৯ টাকা হইয়াছে অর্থাৎ ৪.১ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ওই সময়ে মাথাপিছু ভোগব্যয় ২৭৬.৩ টাকা থেকে বৃদ্ধি পাইয়া ২৮৯.৬ টাকা হইয়াছে অর্থাৎ ৪.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। মাথাপিছু ভোগব্যয়ের বৃদ্ধি অতি সামান্য—বার্ষিক ½ শতাংশেরও কম।

পঞ্চম পরিকল্পনায় মাথাপিছু মাসিক ২০ টাকা ভোগকে (১৯৬০-৬১ সালের দামে) বা ৪০ টাকা (১৯৭০-৭১ সালের দামে) ন্যূনতম ভোগস্তর হিসাবে ধরিয়া বলা হইয়াছে যে, বর্তমানে ২২ কোটি লোক এই স্তরের নীচে রহিয়াছে।

অধ্যাপক ডাণ্ডেকার ও রথ ভারতের দারিদ্র্য আলোচনা প্রসঙ্গে ভোগ-ব্যয়ের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়াছেন। শারীরিক পুষ্টির জন্য অপরিহার্য যে ন্যূনতম ক্যালোরিযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করা ব্যক্তির প্রয়োজন তাহার বার্ষিক মূল্য (১৯৬৮-৬৯ সালের দামস্তরে) ৩২৪ টাকা। গ্রামীণ জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ ব্যক্তি মাথাপিছু ৩২৪ টাকা ভোগব্যয় করিতে পারে না।

১৯৫১ সাল হইতে ভারত পরিকল্পিত পদ্ধতিতে দ্রুত শিল্পায়ন আরম্ভ করিয়াছে। জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু আয় উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। প্রশ্ন হইল, ইহার ফলে জনগণের ভোগপ্রকৃতিতে কি পরিবর্তন ঘটিবে? এই প্রসঙ্গে জিমারম্যান বলিয়াছেন, উপবাস স্তর অতিক্রান্ত হইবার পর কিছু সময়ের জন্য অন্ততঃ অতিরিক্ত আয়ের অধিক অনুপাত খাদ্যের উপর ব্যয়িত হইবে। যখন খাদ্যব্যয় এতোই অল্প যে জনগণ নিজেদের অর্ধভুক্ত বলিয়া মনে করে তখন এইরূপ ঘটনাই ঘটিবে। জিমারম্যানের অভিমত এই যে গরীব লোকের আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার আয়ের এক বৃহৎ অংশ অধিক এবং উন্নত ধরনের খাদ্য ক্রয়ে ব্যয়িত হইবে। এক ন্যূনতম জীবনযাত্রার মানে পৌঁছাইবার পরই জনগণ খাদ্য হইতে অন্যান্য দ্রব্য ক্রয়ের প্রতি দৃষ্টি দিবে।

যদিও পরিকল্পনার প্রথম দশ বৎসর ভোগব্যয় কাঠামোর পরিবর্তনের জন্য খুবই কম সময় তথাপি এই সময়ের ভোগকাঠামো বিশ্লেষণ করিলে জিমারম্যানের উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়। জনগণের আয় বৃদ্ধির সঙ্গে খাদ্যের উপর তাহাদের ব্যয় বৃদ্ধি পাইতেছে ও সেইসঙ্গে তাহারা উন্নত খাদ্য গ্রহণ করিতেছে। জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির সঙ্গে ভোগব্যয়ের এই প্রবণতা যতদিন পর্যন্ত না উপবাস স্তর শেষ হইতেছে ততদিন পর্যন্ত চলিতে থাকিবে।

পরিকল্পনাকালে ভোগব্যয়ের প্রকৃতি সম্পর্কে যে সকল অনুসন্ধান চালান হইয়াছে তাহার ভিত্তিতে দেখা যায় যে ভারতে মোট খাদ্যব্যয়ের এক মোটা অংশ দানাজাতীয় খাদ্যের উপর ব্যয়িত হয় এবং ক্রয়বৃদ্ধির সঙ্গে ইহার স্থিতিস্থাপকতা কমিতে থাকে। সুতরাং দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির সঙ্গে আমরা আশা করিতে পারি যে ভোগকারীর নিকট দানাখাদ্য ব্যতীত অন্যান্য খাদ্যের গুরুত্বও বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু দানাখাদ্য ছাড়া অন্যান্য খাদ্যবস্তুর মোট অনুপাত (ডাল, শাকসব্জি ও মূলজাতীয় ফল ছাড়া) অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে এতোই কম যে উহারা বেশ কিছু কাল ধরিয়া দরিদ্র দেশগুলিতে বিলাসদ্রব্য হিসাবেই গণ্য হইবে।

ভোগব্যয়ের প্রকৃতিসংক্রান্ত পরিসংখ্যান অতি সতর্কতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করিলে এ্যাঞ্জেলের ভোগবিধি এবং জিমারম্যানের সিদ্ধান্তের সত্যতা প্রমাণিত হয়। ভারতে সর্বনিম্ন আয়ের লোকেরা প্রধানতঃ দানাজাতীয় খাদ্যের উপর নির্ভর করে; মাছ, মাংস, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য ভোগের পরিমাণ অতি অল্প। কিন্তু প্রকৃত আয় বৃদ্ধির সহিত দানাখাদ্যের (যেমন চাল, গম, বজরা ইত্যাদি) ভোগ হ্রাস পাইতেছে এবং প্রোটিনজাতীয় উন্নত খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে।

পরিকল্পনার ফলে ভারতে জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির দরুন খাদ্যভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে এ্যাঞ্জেলের নিয়ম কার্যকরী হয় নাই। কিন্তু এই ঘটনা ব্যাখ্যা করা কঠিন নয়; নিম্ন আয়স্তরের লোকেরা পর্যাপ্ত খাদ্য পায় না বলিয়া আয় বৃদ্ধির সহিত তাহাদের খাদ্যের উপর ব্যয়বৃদ্ধি পাইবে। ন্যূনতম খাদ্যের প্রয়োজন পূরণ হইলে তাহার পর হইতে ক্রয়শক্তি অন্যান্য দ্রব্যের প্রতি ধাবিত হইবে আর সেই সঙ্গে এ্যাঞ্জেলের নিয়ম কার্যকরী হইবে।

ভারতে সঞ্চয় (Savings in India)। সঞ্চয়ের মধ্যে উন্নয়নের চাবিকাঠি লুক্কায়িত আছে। সঞ্চয় সৃষ্টির নানা পদ্ধতি আছে। আমরা জানি যে সঞ্চয় হইল আয় ও ব্যয়ের পার্থক্য। সুতরাং সঞ্চয় সৃষ্টির প্রথম পদ্ধতি হইল ভোগ সমান রাখিয়া আয় বাড়ান। কিন্তু স্বল্পকালে আয়কে প্রদত্ত ধরিয়া অগ্রসর হই কারণ এই সময়ে আয় বাড়ান সম্ভব নয়। সঞ্চয় সৃষ্টির দ্বিতীয় পদ্ধতি হইল বর্তমান ভোগ হ্রাস করা। ভোগকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করিয়া সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়। তৃতীয়তঃ, অব্যবহৃত তহবিল খুঁজিয়া বাহির করিয়া সঞ্চয় বৃদ্ধি করা যায়। বিকাশমান দেশগুলিতে স্বর্ণের আকারে যথেষ্ট পরিমাণ সঞ্চয় অলসভাবে পড়িয়া আছে।

আমরা জানি অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের উৎস হইল তিনটি—ব্যক্তিগত সঞ্চয়, কোম্পানীগুলির প্রতিষ্ঠানগত সঞ্চয় এবং সরকারী সঞ্চয়। প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড, জীবনবীমা প্রকল্প এবং গ্রামাঞ্চলে ব্যাংকব্যবস্থার প্রসারের মাধ্যমে ব্যক্তিগত সঞ্চয় সৃষ্টি করা হয়।

প্রথম পরিকল্পনাকালে গড় সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ৩১৬ কোটি টাকা, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে উহা ১১৯০ কোটি টাকা হয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনাকালে উহা ১৩০০ কোটি টাকায় আসিয়া দাঁড়ায়। নীচের তালিকায় সরকার, কোম্পানী ও ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের অনুপাত দেখান হইল :

বিভিন্ন ক্ষেত্রে মোট সঞ্চয়ের অনুপাত

সময়	সরকার	কোম্পানী	পারিবারিক বা ব্যক্তিগত
প্রথম পরিকল্পনা ··	১৮	৮	৭৪
দ্বিতীয় পরিকল্পনা···	১৮	৫	৭৭
১৯৬১-৬২—৬২-৬৩	২৬·৩	৭·৪	৬৬·৩
১৯৬৩—৬৪···	২৬·০	৬·৯	৬৭·১
১৯৬৪—৬৫···	২৪·৮	৪·৩	৭০·৯
১৯৬৫—৬৬···	২৯·৫	৪·০	৬৬·৫
১৯৬৬—৬৭···	২১·৮	৬·৫	৭১·৭
১৯৬৭—৬৮···	১২·৭	৩·১	৮৪·২
১৯৬৮—৬৯···	২০·৬	৩·৪	৭৫·০
১৯৬৯—৭০···	১৪·০	৫·০	৮১·০

Source : Reserve Bank of India Bulletins.

উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে ভারতে সঞ্চয়ের সর্বাধিক অংশ পাওয়া যায় পারিবারিক ক্ষেত্র হইতে। সঞ্চয়ের দ্বিতীয় উৎস হইল সরকার। সরকারী ক্ষেত্রে যে সঞ্চয় পাওয়া যায় তাহা আসে সরকার পরিচালিত শিল্প ও ব্যবসায়ের মুনাফা হইতে এবং কর হইতে। সঞ্চয়ের সর্বাপেক্ষা কম অংশ পাওয়া যায় কোম্পানীগুলি হইতে। উন্নয়ন তথা শিল্পায়ন যত দ্রুতহারে ঘটিবে এই ক্ষেত্র হইতে সঞ্চয়ের পরিমাণও ততই বৃদ্ধি পাইবে।

নিচের তালিকায় জাতীয় আয়ের কত অংশ কোন ক্ষেত্র সঞ্চয় করে তাহা দেখান হইল :

বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাতীয় আয়ের অনুপাত

সময়	সরকার	কোম্পানী	পারিবারিক বা ব্যক্তিগত	নীট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়
প্রথম পরিকল্পনা	১.২	০.৫	৪.৯	৬.৫
দ্বিতীয় পরিকল্পনা	১.৬	০.৪	৬.৫	৮.৪
১৯৬১৬২—৬২-৬৩	২.৫	০.৭	৬.৩	৯.৫
১৯৬৩—৬৪	৩.১	০.৮	৮.১	১২.০
১৯৬৪—৬৫	২.৭	০.৪	৭.৬	১০.৭
১৯৬৫—৬৬	৩.২	০.৪	৭.২	১০.৮
১৯৬৬—৬৭	১.৮	০.৫	৫.৭	৮.০
১৯৬৭—৬৮	১.০	০.২	৬.৮	৮.০
১৯৬৮—৬৯	১.৯	০.৩	৬.৯	৯.৯
১৯৬৯—৭০	১.২	০.৪	৬.৮	৮.৫

Source : Reserve Bank of India Bulletins.

প্রথম দুইটি পরিকল্পনাকালে সঞ্চয়-আয় অনুপাত ৬·৫ শতাংশ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৮·৪ শতাংশ হয় ; মোট সঞ্চয় বৃদ্ধি ঘটে শহরাঞ্চলের পারিবারিক ক্ষেত্রে ; এই ক্ষেত্রটির সঞ্চয়ের অংশ মোট সঞ্চয়ের ৪৮ শতাংশ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৫৮ শতাংশ হয় ; কিন্তু গ্রামীণ পারিবারিক সঞ্চয় হ্রাস পায়। দুইটি কারণে এই পরিবর্তন দেখা দেয় : প্রথমতঃ, শহরাঞ্চলের আয়তন বৃদ্ধি এবং

সঞ্চয় বৃদ্ধির আনুষ্ঠানিক প্রয়াস শহরাঞ্চলকে অধিকতর প্রভাবিত করিয়াছে; ১৯৬৬-৬৭ সালে সরকারী সঞ্চয় হ্রাস পাওয়ার প্রধান কারণ হইল যে সরকারী কারবারসমূহের মুনাফা হ্রাস পায় আর মুদ্রাস্ফীতির দরুন সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

সামগ্রিকভাবে চতুর্থ পরিকল্পনাকালে বার্ষিক গড় সঞ্চয় ছিল জাতীয় আয়ের ৯·৩ শতাংশ। পঞ্চম পরিকল্পনাকালে মোট ৪৭,৫৬১ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়; উহার মধ্যে ৪৫,১৩০ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট বিনিয়োগের ৯৫ শতাংশ পাওয়া যাইবে অভ্যন্তরীণ উৎস হইতে আর ২৪৩১ কোটি টাকা বা মোট বিনিয়োগের ৫ শতাংশ পাওয়া যাইবে বৈদেশিক সঞ্চয় হইতে।

পঞ্চম পরিকল্পনাকালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঞ্চয়ের বণ্টন কিরূপ হইবে তাহা নিচের তালিকায় দেখান হইল:

	ক্ষেত্র		টাকা (কোটি)		শতকরা অংশ
ক	সরকারী সঞ্চয়		১৪,২০১		৩১.০
	১) সরকারী প্রশাসন	৮৭৮৯		১৮.৫	
	২) সরকারী কারবার	৬১১৮		১২.৮	
খ	বেসরকারী সঞ্চয়		৩০,২২৩		৬৩.৬
	১) কোম্পানী	৪১১৭		৮.৮	
	২) সমবায়	২৯৯		০.৬	
	৩) পারিবারিক	২৫,৭৪৭		৫৪.২	
গ	অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে মোট সঞ্চয়		৪৫,১৩০		৯৪.৯
ঘ	বৈদেশিক সঞ্চয়		২৪,৩১		৫.১
ঙ	বিনিয়োগযোগ্য মোট সঞ্চয়		৪৭,৫৬১		১০০.০

পঞ্চম পরিকল্পনাকালে সরকারী সঞ্চয়ের সম্ভাব্য পরিমাণ হইল ১৪,২০৭ কোটি টাকা। সরকারী সঞ্চয়ের দুইটি প্রধান উৎস হইল বাজেট উদ্বৃত্ত এবং সরকারী কারবারের মুনাফা। প্রথম উৎস থেকে ৮৭৮৯ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে আর দ্বিতীয় উৎস থেকে পাওয়া যাইবে ৬১১৮ কোটি টাকা। এই সময়ে সরকারী সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য সরকারী আয় বৃদ্ধি এবং সরকারী ব্যয় হ্রাস করিবার জন্য প্রয়াস চালান হয়।

বেসরকারী সঞ্চয়ের পরিমাণ হইবে ৩০,২২৩ কোটি টাকা। এই ক্ষেত্রে পারিবারিক সঞ্চয় সর্বাধিক—মোট সঞ্চয়ের ৫৪.২ শতাংশ।

নীচের তালিকায় বিগত দশকের নীট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় এবং সঞ্চয়ের হার দেখান হইল :

বৎসর	নীট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় (কোটি টাকা) (বর্তমান্ দামস্তরে)	সঞ্চয় হার (বর্তমান দামস্তরে)
১৯৭০-৭১	৪৬১৭	১২.১
১৯৭১-৭২	৫০১৮	১২.১
১৯৭২-৭৩	৫৩৪৮	১১.৮
১৯৭৩-৭৪	৭১৬৪	১২.৮
১৯৭৪-৭৫	৮৮৬২	১৩.৪
১৯৭৫-৭৬	১০,০০২	১৪.৬
১৯৭৬-৭৭	১১,৫৮৭	১৫.৯

ভারতে দারিদ্র্য (Poverty in India) : দারিদ্র্য এক নিছক অর্থনৈতিক ধারণা নয়, উহার বৃহত্তর সমাজতাত্ত্বিক দ্যোতনা আছে। কেউ কেউ ইহাকে মানবিক ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ব্যর্থতার দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করেন। আবার কেউ কেউ মার্কসীয় ব্যাখ্যা দিয়া বলেন দারিদ্র্য হইল শোষণের ফল। কারণ যাহাই হউক না কেন, বর্তমান পৃথিবীর নগ্ন সত্য হইল দারিদ্র্য। আন্তর্জাতিক শ্রমসংগঠনের ডাইরেক্টর জেনারেল বলেন বিকাশমান দেশগুলির ৩৯ শতাংশ লোক দারিদ্র্যপ্রপীড়িত। দারিদ্র্য বলিতে এমন এক অবস্থা বোঝায় যখন ব্যক্তি তাহার জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণ করিতে অক্ষম। দারিদ্র্য পরিমাপের পদ্ধতি হইল মাথাপিছু আয় অথবা মাথাপিছু ভোগ। যখন দেশের বৃহত্তর জনসমষ্টি জীবনধারণের ন্যূনতম পর্যায়ে কোন রকমে অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া চলে তখন বলা হয় যে, দেশে গণদারিদ্র্য দেখা দিয়াছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সর্ব বৃহৎ সমস্যা এই দারিদ্র্য। ইউরোপ ও আমেরিকার উন্নত দেশগুলির "ঘেটোতে" কোথাও কোথাও দারিদ্র্যের পকেট থাকিলেও এই জাতীয় গণদারিদ্র্য দেখা যায় না। অধিকাংশ অর্থনীতিবিবিদের মতে ভারতে দারিদ্র্যের পরিধি ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। অধ্যাপক প্রণব বর্ধন যে হিসাব দিয়াছেন তাহা হইতে দেখা যায় যে দারিদ্র্যরেখার নীচের লোকসংখ্যা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। অধ্যাপক ডাণ্ডেকার ও রথের মতে ১৯৬০-৬১

সালের তুলনায় ১৯৬৭-৬৮ সালে গ্রামীন দরিদ্র লোকের সংখ্যা ১৩৫ মিলিয়ন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৬৬ মিলিয়ন হইয়াছে আর শহরের দরিদ্রের সংখ্যা ৪২ মিলিয়ন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৫৯ মিলিয়ন হইয়াছে। খসড়া পঞ্চম পরিকল্পনায় দারিদ্র্য পরিমাপের চেষ্টা করা হইয়াছে ; মাথাপিছু আয়কে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করিয়া বলা হইয়াছে যাহাদের মাসিক আয় ৪০ টাকার কম তাহারা দারিদ্র্যরেখার নীচে আছে। এই হিসাবে ১৯৭৩-৭৪ সালে ১৭৩ মিলিয়ন লোক দারিদ্র্য রেখার নিচে ছিল। ১৯৭৮-৭৯ সালে এই সংখ্যা হইবে ১৯০ মিলিয়ন এবং ১৯৮৫-৮৬ সালে উহা আরও বৃদ্ধি পাইয়া ২১১ মিলিয়ন হইবে। ডাঃ মীনহাজ হইলেন একমাত্র অর্থনীতিবিদ যিনি মনে করেন দরিদ্রের সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। তাঁহার মতে ১৯৫৬-৫৭ সালের তুলনায় ১৯৬৭-৬৮ সালে গ্রামীণ দরিদ্রের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে।

পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব এবং বর্তমান গবেষণার ভিত্তিতে বলা যায় যে দারিদ্র্য রেখার নীচে আছে ২০ কোটি লোক—১৫ কোটি গ্রামীন দরিদ্র আর ৫ কোটি শহরের দরিদ্র।

আমাদের প্রথম তিনটি পরিকল্পনায় GNP বৃদ্ধির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় ; এই সময়ে একদিকে জাতীয় আয় যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায় আর সেই সঙ্গে বেশী সংখ্যক লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে নামিয়া আসে। GNP বৃদ্ধি ও উন্নয়ন সমার্থক নয় এই সত্য উপলব্ধির পর চতুর্থ পরিকল্পনা কাল হইতে GNP বৃদ্ধির পরিবর্তে দারিদ্র্য দূরীকরণের উপর জোর দেওয়া হয়।

আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হইল জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে উন্নয়নের সুফল অধিক পরিমাণে সমাজের দুর্বল শ্রেণী লাভ করিবে এবং উত্তরোত্তর আয়, সম্পদ এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন হ্রাস করিতে হইবে। চতুর্থ পরিকল্পনায় শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সাধারণ লোক ও সমাজের দুর্বল শ্রেণীর অবস্থা উন্নয়নের কথা বলা হইয়াছে। অধ্যাপক অমর্ত সেন যথার্থই বলিয়াছেন যে দারিদ্র্য দূর করিবার ষ্ট্র্যাটেজী হইল যথেষ্ট পরিমাণে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা কারণ নিয়োগ শুধুমাত্র উৎপাদন সৃষ্টি করে না, উহা আয়ও সৃষ্টি করে। জাতীয় সর্বনিম্নস্তরে পৌছানকে নিম্ন আয় শ্রেণীর অবস্থা উন্নয়নের পূর্বসর্ত বলা হইয়াছে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী এবং ভূমিহীন কৃষক যাহাদের উৎপাদন করিবার কোন উৎস নাই এবং জীবনধারণের জন্য মজুরীর উপর

নির্ভর করে তাহারাই কৃষিসর্বহারার বৃহত্তম অংশ। চতুর্থ পরিকল্পনায় সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে পরিকল্পনার কার্যসূচীকে রূপায়িত করিবার সময় সর্বাগ্রে দুর্বলতম ব্যক্তিটির প্রতি সর্তক নজর দিতে হইবে এবং উন্নয়নের সুফলকে পরিকল্পিত বিনিয়োগের মাধ্যমে অনুন্নত অঞ্চল এবং অনগ্রসর শ্রেণীর দিকে প্রবাহিত করিতে হইবে। কিন্তু এই সব সাধু সঙ্কল্প সত্ত্বেও দরিদ্রের সংখ্যা এবং দারিদ্র্যের পরিধি ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯৭১ সালে "গরীবী হটাও" 'স্লোগান দারিদ্র্য সমস্যার গুরুত্ব জনসমক্ষে তুলিয়া ধরে এবং সরকারী নীতির একটি অঙ্গ হইয়া ওঠে।

ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দারিদ্র্য হটানো দূরে থাক, দারিদ্র্যের ক্রমবর্ধমান প্রসারও রোধ করিতে পারে নাই। এই সম্পর্কে কতকগুলি কারণ উল্লেখ করা যায়:

প্রথমতঃ, পরিকল্পনা-কৌশলের ত্রুটি; পরিকল্পনায় উৎপাদনমুখী নীতি গ্রহণ করা হয় কিন্তু উৎপাদন-পদ্ধতি পরিবর্তনের কোন কার্যসূচী ছিল না। ইহা ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল যে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলেই প্রান্তিক কৃষক, ভূমিহীন কৃষক এবং কারখানার শ্রমিকের অবস্থাও উন্নত হইবে। উৎপাদনের উপব জোব দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু বণ্টন নীতিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা করা হয়। এই নীতি ব্যর্থ হইতে বাধ্য আর সেইজন্যই দেশের ৪০ হইতে ৫০ শতাংশ ব্যক্তি চরম দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাইতেছে। এই ত্রুটি স্বীকার করিয়া পঞ্চম পরিকল্পনার প্রস্তুতি পত্রে (Approach Paper to the Fifth Plan) উল্লেখ করা হইয়াছে যে বেকারত্ব এবং আধা-বেকারত্বই হইল দারিদ্র্যের প্রধান কারণ। শুধুমাত্র উন্নয়নের হার বৃদ্ধি করিলেই দারিদ্র্য সমস্যার কোন সমাধান হইবে না। সেইজন্য পঞ্চম পরিকল্পনায় বেকারত্ব, আধাবেকারত্ব এবং গণদারিদ্র্যের উপর সরাসরি প্রচণ্ড আঘাত হানিতে হইবে। দ্বিতীয় প্রস্তুতিপত্রে বলা হয় যে দারিদ্র্যের দুইটি প্রধান কারণ—অনুন্নতিও ধনবৈষম্য। দারিদ্র্য হটানোর জন্য দুই ধরণের নীতি নির্দেশ করা হয়—উৎপাদন বৃদ্ধি ও জনসংখ্যা হ্রাস। সেই সঙ্গে কর্মসংস্থান বৃদ্ধিও পঞ্চম পরিকল্পনায় "গরীব হটানোর" একটি প্রধান হাতিয়ার বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

দারিদ্র্য দূরীকরণের কোন কর্মসূচীকে সফল করিতে হইলে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। মুদ্রাস্ফীতি ধনবৈষম্য সৃষ্টি করে, সমাজে গরীব

শ্রেণীর পরিধি বৃদ্ধি করে, গরীব লোকদের সীমিত আয় ধ্বংস করিয়া তাহাদের সর্বহারায় পরিণত করে।

সুতরাং বলা যায় যে দারিদ্র্যের কারণগুলি এইরূপ : (১) বেকারত্ব ও অর্ধবেকারত্ব, (২) পরিকল্পনাকৌশলের ত্রুটি, (৩) মূলধন-প্রগাঢ় উৎপাদন পদ্ধতি, (৪) মুদ্রাস্ফীতি, (৫) শ্লথ্ হারে উন্নয়ন, (৬) অনিয়ন্ত্রিত ও ক্রম-বর্ধমান জনসংখ্যা এবং (৭) ধনবৈষম্য। গণদারিদ্র্যের প্রধান কারণ বেকারত্ব; বেকার সমস্যা সমাধানকল্পে ১৯৭৩ সালে ভগবতী কমিটি কয়েকটি সুপারিশ করিয়াছে। কমিটি মনে করে যে শিল্পক্ষেত্রে বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদনক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার হওয়া প্রয়োজন। কমিটির দুইজন সদস্য অশোক মিত্র ও জ্যোতির্ময় বসুর মতে বেকার সমস্যার প্রধান কারণ হইল বিগত ২৫ বৎসরের শ্লথ উন্নয়ন। ইহা ছাড়া আধুনিকীকরণের অজুহাতে মূলধন-প্রগাঢ় উৎপাদন কৌশল কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পথে আর একটি বড় বাধা। ডাঃ মিত্র বলেন সবুজ বিপ্লব আয়ের কেন্দ্রীভবনে সহায়তা করিয়াছে। কৃষি বিপ্লবের দরুণ গ্রামে যে ধনী চাষী সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে রাষ্ট্র তাহাদের নিকট হইতে সঞ্চয় সংগ্রহে ব্যর্থ হইয়াছে, ইহার দরুণ কৃষির আশানুরূপ সম্প্রসারণ হয় নাই আর সেই কারণে কৃষিক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি যথেষ্ট হয় নাই।

একদল অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে আয়ের কেন্দ্রীভবনের দরুণ চাহিদার প্রকৃতিতে যে পরিবর্তন হইয়াছে তাহা বিলাসী দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পের সৃষ্টি করিয়াছে; কিন্তু এই শিল্পের নিয়োগ ক্ষমতা কম। সুতরাং আয়ের কেন্দ্রীভবন রোধ করিতে পারিলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে। ভারতে পরিকল্পনার একটি দুর্ভাগ্যজনক দিক হইল কর্মসংস্থানের যে সাধারণ লক্ষ্যমাত্রা ধার্য আছে তাহা পূরণ করিবার কোন ব্যবস্থা নাই। কর্মসংস্থান কার্যসূচী কার্যকরী না হওয়ার জন্য যারা দায়ী থাকবে তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করিতে না পারিলে দারিদ্র্য হটানো অসম্ভব তাই প্রয়োজন হইলে পরিবার পরিকল্পনা বাধ্যতামূলক করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, শ্রম-প্রগাঢ় উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হইবে। আধুনিকী-করণের অজুহাতে মূলধন-প্রগাঢ় উৎপাদনপদ্ধতি বা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের প্রবর্তন রোধ করিতে হইবে।

চতুর্থতঃ, উন্নয়নের হার বৃদ্ধি করিতে হইবে। বিশেষ করিয়া কৃষি-বিপ্লবের দরুণ গ্রামে যে সঞ্চয় সৃষ্টি হইতেছে তাহা সংগ্রহ করিয়া উন্নয়নের হার বৃদ্ধি করিতে হইবে।

পরিশেষে, অশোক মিত্র ও জ্যোতির্ময় বসু বলেন যে বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য একটি কেন্দ্রীয় কর্মসংস্থান তহবিল গঠন করা প্রয়োজন। শিল্প মালিক, কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার ও রাষ্ট্রীয় ব্যাংক এবং সরকারী সংস্থাগুলি এই তহবিলে নিয়মিতভাবে চাঁদা দিবে। সংগঠিত শিল্পের উপর সেস ধার্য করিবার কথাও সরকারকে বিবেচনা করিতে হইবে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই তহবিলটি ব্যবহার করিতে হইবে এবং সরকারকে সকল কার্যক্ষম ও ইচ্ছুক ব্যক্তির "কাজের অধিকারের" সামাজিক দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

ভারতে ধনবৈষম্য (Inequality in India) :

ভারতে জনগণের যে দারিদ্র্য তাহার কারণ হিসাবে বেকারত্ব, ধনবৈষম্য এবং সামাজিক কাঠামোর অনমনীয়তার উল্লেখ করা হয়। ১৯৬৪ সালে জাতীয় আয়বণ্টন সম্পর্কে মহালনবীশ কমিটির রিপোর্টে দারিদ্র্য ও ধন-বৈষম্যের কারণ বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত মনোপলি অনুসন্ধান কমিশনের রিপোর্টে বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন বিশ্লেষণ করা হয়।

এ্যাডেলম্যান ও মরিস (Adelman and Morris) নামক দুইজন অর্থনীতি-বিদের হিসাব থেকে দেখা যায় যে ৪৪টি বিকাশমান দেশের মধ্যে ২৪টিতে সর্বনিম্ন ২০ শতাংশের গড় আয় জাতীয় মাথাপিছু গড় আয়ের এক-চতুর্থাংশ।

কোন দেশে আয়বণ্টন নির্ভর করে নিম্নলিখিত চারিটি বিষয়ের উপর : (১) আয়সৃষ্টিকারী সম্পত্তি বণ্টন যথা নিয়োগ, জমি এবং মূলধন ; (২) সরকারী দ্রব্যবণ্টন ব্যবস্থা যথা শিল্প, স্বাস্থ্য, বাসগৃহ ইত্যাদি ; (৩) হস্তান্তর পাওনার পরিমাণ এবং (৪) করব্যবস্থা যাহার মাধ্যমে সরকারী কর্মসূচীর অর্থ সংগৃহীত হয়। এই চারিটির মধ্যে প্রথমটি উপার্জিত আয় বণ্টনকে প্রভাবিত করে।

ফলিত অর্থনীতি গবেষণার জাতীয় পর্ষৎ যে তথ্য প্রদান করিয়াছে তাহা এইরূপ :

১৯৬০ সালে মোট আয়ের মধ্যে পরিবারগত আয়ের শতকরা অংশ এইরূপ ছিল :

শ্রেণীবিন্যাস	মোট আয়ের অংশ	
	পৌর	গ্রামীণ
০—১০	১.৩	০.৭
১০—২০	২.০	৩.৩
২০—৩০	৩.৬	৪.৫
৩০—৪০	৪.৫	৫.৬
৪০—৫০	৫.৪	৬.৬
৫০—৬০	৬.৫	৭.৭
৬০—৭০	৮.১	৯.৫
৭০—৮০	১০.৩	১২.১
৮০—৯০	১৫.২	১৬.৪
৯০—১০০	৪২.৪	৩৩.৬

উল্লিখিত পরিসংখ্যান হইতে আয়বণ্টনের অসাম্য সহজেই বোঝা যায়। নগরাঞ্চলের মোট আয়ের ৪২.৪ শতাংশ এবং গ্রামাঞ্চলের মোট আয়ের ৩৪ শতাংশ ভোগ করে সর্বোচ্চ দশ শতাংশ পরিবার। পক্ষান্তরে নগরাঞ্চলের মোট আয়ের মাত্র ১.৩ শতাংশ ও গ্রামাঞ্চলের মোট আয়ের ১.৭ শতাংশ ভোগ করে সর্বনিম্ন ১০. শতাংশ পরিবার। ধনবৈষম্য দূর করিবার জন্য সরকার জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ করিয়াছে, মৃত্যুকর, সম্পদ কর, দানকর প্রভৃতি স্থাপন এবং আয়করের হার অধিকতর গতিশীল করা হইয়াছে। এইসব সত্ত্বেও ধনবৈষম্য উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। মহালনবীশ কমিটির মতে ধন-বৈষম্যের দুইটি কারণ : প্রথমতঃ,. বেকারত্ব ও অর্ধবেকারত্ব আর সেইজন্য স্বল্প উৎপাদনশীলতা বৃহত্তর জনসমষ্টির স্বল্প আয়ের কারণ। দ্বিতীয়তঃ, কর ফাঁকির দরুণ মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে প্রভূত অর্থ কেন্দ্রীভূত হইয়াছে।

লুইস মডেলের সাহায্যেও অর্ধোন্নত দেশের আয়বৈষম্য ব্যাখ্যা করা যায়। বিকাশমান দেশে দুইটি উৎপাদনক্ষেত্র আছে—একটি আধুনিক ক্ষেত্র আর অপরটি সনাতন ক্ষেত্র। আধুনিক্ষ ক্ষেত্রে উন্নত কৃৎকৌশলের (technology) সাহায্যে ও শ্রম-প্রগাঢ় পদ্ধতিতে উৎপাদন পরিচালনা করা হয় বলিয়া ওই ক্ষেত্রের উৎপাদনশীলতা অনেক বেশী আর সনাতন ক্ষেত্রে মান্ধাতা আমলের উৎপাদন-পদ্ধতির সাহায্যে উৎপাদন করা হয় বলিয়া এই ক্ষেত্রের উৎপাদন-শীলতা অত্যন্ত কম। যাহারা আধুনিক ক্ষেত্রে নিযুক্ত আছে তাহাদের আয়

অনেক বেশী আর যাহারা সনাতন ক্ষেত্রে নিযুক্ত আছে তাহাদের আয় অনেক কম। দেশে এইরূপ দুইটি অসমান উৎপাদন ক্ষেত্র থাকায় আয়বৈষম্য দেখা দেয়। আয়বৈষম্য দূর করিতে হইলে সনাতন ক্ষেত্রটিকে আধুনিকীকরণ করিয়া উহার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করিতে হইবে।

ব্যক্তিগত আয়বণ্টন নির্ভর করে দুইটি বিষয়ের উপর: (১) সম্পত্তিজাত আয়বণ্টন ও (২) শ্রমজাত আয়বণ্টন। মহালনবীশ কমিটির মতে আয় বণ্টনে বৈষম্যের তুলনায় সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য অনেক বেশী। যদি পূর্ণ কর্ম-সংস্থানের কার্যসূচী গ্রহণ করিয়া শ্রমজাত আয়বণ্টনে সমতা আনার চেষ্টা করা হয় কিন্তু সম্পত্তিজাত আয় বণ্টন অপরিবর্তিত থাকে তাহা হইলেও আয় বৈষম্যে বিশেষ পরিবর্তন ঘটিবে না। মূলধন মালিকানা একটি বড় মাধ্যম যাহার সাহায্যে আয়বৈষম্য এক যুগ হইতে পরবর্তী যুগে স্থানান্তরিত হয়।

শুধুমাত্র বেকারবিনাশী কার্যসূচী গ্রহণ করিয়া আয়বৈষম্য দূর করা যাইবে না কারণ দেশে মজুরি-কর্মসংস্থানকারী শ্রেণী ছাড়াও স্বনির্ভর কর্মসংস্থানজীবী একটি গোষ্ঠী আছে; এই ক্ষেত্রেও চরম আয়বৈষম্য দেখা যায়। একদিকে ডাক্তার, উকিল, চাটার্ড একাউণ্ট্যাণ্ট প্রভৃতি পেশাজীবী রহিয়াছে যাহাদের আয় খুব বেশী আর অপরদিকে আছে ছোট ছোট দোকানদার, হকার, প্রান্তিক চাষী প্রভৃতি যাহাদের আয় খুবই কম, এক্ষেত্রে আয়বৈষম্য হ্রাস করা কঠিন।

আমাদের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে আয়বৈষম্য হ্রাস করিয়া সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠন করা প্রয়োজন। উন্নয়নের দরুণ যদি সম্পদ বৃদ্ধি পাইয়া মুষ্টিমেয় কয়েক ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হয় তাহা হইলে পরিকল্পনার একটি উদ্দেশ্য সার্থক হইলেও অপর উদ্দেশ্যটি ব্যর্থ হইবে।

আয়বৈষম্য হ্রাস করিবার জন্য যে সকল কার্যসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন তাহাদের মধ্যে পড়ে মজুরি নীতি, দাম নীতি, ভূমিসংস্কার এবং মূল শিল্প জাতীয়করণ এবং কর নীতি।

সংগঠিত ক্ষেত্রে ন্যূনতম মজুরি আইন চালু হইলেও অসংগঠিত ক্ষেত্রে এখনও উহা সম্প্রসারিত হয় নাই। ন্যূনতম মজুরি নীতি যাহাতে সর্বত্র প্রসারিত করা যায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি ব্যক্তির প্রকৃত আয় কমাইয়া তাহাকে দারিদ্র্য রেখার নীচে ঠেলিয়া দিতেছে।

দাম রেখা নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে, সরকারী বন্টনব্যবস্থার মাধ্যমে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহের দায়িত্ব সরকারকে গ্রহণ করিতে হইবে। ভূমি সংস্কার মাধ্যমে বেনামী জমি উদ্ধার করিয়া উহা ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। কর-কাঠামোকে অধিকতর গতিশীল করিতে হইবে। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী মিলটন ফ্রিডম্যান যে ঋণাত্মক আয়করের (Negative Income Tax) উল্লেখ করিয়াছিলেন তাহা প্রবর্তনের কথা বিবেচনা করিবার সময় আসিয়া গিয়াছে। যাহাদের আয় দারিদ্র্য রেখার নীচে আছে সরকার তাহাদের অর্থ প্রদান করিয়া এই দুই এর মধ্যে যে ব্যবধান তাহা দূর করিবেন।

অনুশীলনী

১। ভারতের মতো বিকাশমান দেশে জাতীয় আয় পরিমাপের অসুবিধা কি কি?

২। ভারতে জাতীয় আয়ের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। পরিকল্পনা কালে মাথাপিছু আয় ও জাতীয় আয় কিভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা ব্যাখ্যা কর।

৩। ভারতে জনগণের ভোগ-ব্যয়ের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর।

৪। ভারতে দারিদ্র্যের কারণগুলি কি কি? এই দারিদ্র্য দূরীকরণে পরিকল্পনার ভূমিকা আলোচনা কর।

৫। ভারতে আয়বৈষম্যের কারণগুলি কি কি? আয়বৈষম্য হ্রাস করিতে কি কি কার্যসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন?

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভারতীয় পরিকল্পনায় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা

(Employment Aspects of Indian Plans)

যুদ্ধকে বাদ দিলে বর্তমান শতাব্দীর সবচেয়ে বড় অভিশাপ হইল বেকারত্ব। জর্জ বার্ণাড শ বলিয়াছেন, যদি কোন লোককে নরকে পাঠাতে চাও, তাহা হইলে তাহাকে চিরদিনের জন্য ছুটি দিয়ে দাও। বেকার সমস্যা থেকে আসে শিল্পগত উন্নয়নে বাধা, ইহা স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বিদ্বেষের জন্ম দেয়, ইহা একদেশের মানুষের মনে সৃষ্টি করে আর একদেশের মানুষের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র এবং অভাবের সৃষ্টি করিয়া বেকারত্ব মানুষের যে ক্ষতি করে, নৈতিক অধঃপতন, হতাশাও চারিত্রিক বিকারের সৃষ্টি করিয়া উহা তদপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষতি করে মনুষ্যত্বের। দীর্ঘস্থায়ী বেকারত্ব যে মানসিক উত্তেজনার সৃষ্টি করে তাহা যে কোন সমাজব্যবস্থাকে উল্টাইয়া দিতে পারে। এই বেকার সমস্যাই ১৯৩৪ সালের আগে জার্মানীতে হিটলারের মত ফ্যাসিষ্ট শক্তির অভ্যুত্থান ঘটাইয়াছিল। উৎপাদনক্ষমতা অপচয়ের এক অর্থহীন নিদর্শন এই বেকারত্ব।

ভারতে বেকার সমস্যা (Unemployment in India) **:** মঙ্গল গ্রহ হইতে যদি সেখানকার কোন অধিবাসী ভারতে আসে তাহা হইলে সে আশ্চর্য হইয়া ভাবিবে যে ভারতের মতো অর্ধোন্নত দেশ যেখানে প্রয়োজনের তুলনায় দ্রব্যসামগ্রী এবং সেবা নেহাৎই কম, সেই দেশে কি করিয়া কাজের অভাব থাকিতে পারে। কিন্তু ভারতে এই অদ্ভুত ব্যাপারই ঘটিয়াছে এবং ব্যাপক কর্মহীনতা দেখা দিয়াছে। দেশব্যাপী বেকারত্বের দরুন জাতীয় আয় হ্রাস পায়, জীবনযাত্রার মান নামিয়া যায় এবং দারিদ্র্য ব্যাপক আকারে আত্মপ্রকাশ করে। কর্মসংস্থানের তিনটি দিক আছে—ইহা আয় সৃষ্টি করে, উৎপাদন বৃদ্ধি করে এবং ব্যক্তির কাজকে সামাজিক স্বীকৃতি দিয়া থাকে। বেকারত্ব আয়ের পথ বন্ধ করিয়া দেয়, উৎপাদন বৃদ্ধি ব্যাহত করে এবং ব্যক্তির সামাজিক স্বীকৃতির হানি ঘটায়।

শিল্পযুগের পূর্ববর্তী ফিউডাল সমাজে খোলা বেকারত্ব ছিল না। সেই যুগে সমগ্র শ্রমিক কৃষি এবং কুটিরশিল্পে নিযুক্ত থাকিত। অবশ্য গণদারিদ্র্য,

আধাবেকারত্ব এবং ছদ্মবেকারত্ব ছিল এই সমাজের বৈশিষ্ট্য। ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের পর উনিশ শতক থেকে খোলা বেকারত্ব দেখা দেয়। ভারতেও বিংশ শতাব্দীতে বর্তমান কারখানা ব্যবস্থার উদ্ভবের পরই খোলা বেকারত্ব তীব্র আকারে আত্মপ্রকাশ করে। ইহা শুনিতে আশ্চর্য লাগে যে, শিল্পায়ন বেকার সমস্যাব সৃষ্টি করে আবার বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন শিল্পায়ন। ভারতে শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে ছদ্মবেকারত্ব খোলা বেকারত্বে রূপান্তরিত হইয়াছে। ইহার কারণগুলি হইল: (১) জমির উপর নির্ভরশীল শ্রমিকদের জমির সহিত বিচ্ছিন্নতা, (২) একান্নবর্তী পরিবার প্রথার ধ্বংস, (৩) সাক্ষরতা বৃদ্ধি এবং (৪) অধিক সংখ্যায় মেয়েদের চাকুরী গ্রহণ।

উন্নত দেশগুলিতে বেকারদিগকে যেভাবে শ্রেণীবিভাগ করা হয় ভারতীয় বেকারদিগকে সেইভাবে শ্রেণীবিভাগ করা ঠিক হইবে না। কেনসীয় নীতি প্রয়োগ করিয়া উন্নত দেশগুলির বেকারত্ব হ্রাস করা যায়। উন্নত দেশগুলির বেকার সমস্যা সাময়িক এবং সরকাব ও শিল্পপতিদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সক্রিয় চাহিদা বাড়াইয়া ওই সমস্যার সমাধান করা যায়। পক্ষান্তরে ভারতে বেকারসমস্যা স্থায়ী প্রকৃতিব এবং উহাব মূল কারণ মূলধনগঠনের স্বল্পতা। দ্রুত উন্নয়ন হার বৃদ্ধি, জনসংখ্যা পরিকল্পনা, আবাদী জমির পরিমাণ বৃদ্ধি এবং স্বনির্ভর কর্মসংস্থানে ব্যবস্থা করিয়া বেকার সমস্যা সমাধান করিতে হইবে।

পরিকল্পনা কমিশন ভারতে ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার কতকগুলি কারণ নির্দেশ করিয়াছে: (১) দ্রুতহাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি; প্রতিবৎসর এককোটি ৩০ লক্ষ করিয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, (২) পুরাতন গ্রামীন শিল্পের ধ্বংস; বিদেশী বৃহদায়তন শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা, রুচিব পরিবর্তন, রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের লোপ পাওয়ায় ধীরে ধীরে কুটির শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায়। পূর্বে এই সকল শিল্প হইতে বহু লোকের আংশিক অথবা পূর্ণ কর্মসংস্থান হইত। (৩) শিল্পের অনগ্রসরতা; জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত যদি সমতালে শিল্পোন্নয়ন ঘটিত তাহা হইলে বেকারসমস্যা ব্যাপক আকার ধারণ করিতে পারিত না। (৪) দেশবিভাগ; দেশবিভাগের দরুন এককোটি আশ্রয়প্রার্থী পাকিস্তান হইতে ভারতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে; ইহাও বেকার সমস্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

উন্নত দেশগুলিতে বাণিজ্যচক্রজনিত বেকার, বিঘ্নজনিত বেকার, যান্ত্রিক

বেকার বা ঋতুগত বেকার দেখা যায়। এইগুলি অস্থায়ী ধরণের বেকারত্ব। ভারতের বেকার সমস্যার প্রকৃতি অন্যধরণের। ইহাকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—কৃষিগত বা গ্রাম্যবেকার, শিল্পগত বা শহরের বেকার এবং মধ্যবিত্ত বা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেকার।

কৃষি বা গ্রামীণ কর্মহীনতা (Rural Unemployment) **:** সমস্যার গভীরতা এবং পরিব্যাপ্তির দিক হইতে দেখিলে গ্রামাঞ্চলের বেকার সমস্যাই সবচেয়ে বড় সমস্যা। একটি সমীক্ষা হইতে দেখা যায় যে গ্রামীন জনগণের ৫৯ শতাংশ উপার্জনহীন এবং ৭১ শতাংশ সম্পূর্ণ বা আংশিক কর্মহীন। গ্রামীন বেকারত্ব প্রধানতঃ অর্ধনিয়োগ সমস্যা (underemployment) এবং ঋতুগত বেকারত্ব। কৃষিতে সারাবছর কাজ পাওয়া যায় না, কৃষকেরা সাধারণতঃ ছয়সাত মাস মাঠে কাজ করে আর বছরের বাকী সময় কার্যাভাবে বেকার থাকিতে বাধ্য হয়। যাহারা কৃষিতে নিযুক্ত থাকে তাহাদের মধ্যেও বহু ছদ্মবেশী বেকার (disguised unemployed) রহিয়াছে। জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি জমির উপর জনসংখ্যার চাপ বাড়াইয়াছে অর্থাৎ কৃষিতে অনুৎপাদন-শীল শ্রমিক তথা ছদ্মবেশী বেকারের সংখ্যা বাড়াইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র ৮০ লক্ষ কৃষক ৩৬০০ একর জমি চাষ করে। অপর পক্ষে ভারতে মোট জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ অর্থাৎ ৪২ কোটি লোক কৃষিকার্যে নিযুক্ত আছে। এই তুলনামূলক পরিসংখ্যান হইতেই ভারতে জমির উপর জনসংখ্যার চাপের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাইবে আর জনসংখ্যার এই চাপের জন্যই জমি ক্ষুদ্রতম আকারে খণ্ড খণ্ড এবং অসম্বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। গ্রামীণ কুটির শিল্পের ধ্বংস হওয়ায় কৃষক অবসর সময়ে আংশিক উপজীবিকা গ্রহণ করিয়া যে আয়বৃদ্ধি করিবে সে উপায়ও নাই।

কৃষিগত কর্মহীনতা প্রধানতঃ আংশিক কর্মহীনতা এবং ঋতুগত কর্মহীনতা। কৃষকগণ সারাবছর কাজ পায় না। আবার কৃষকগণ যখন কর্মরত থাকে তাহাদের পূর্ণ কর্মশক্তি ব্যবহৃত হয় না। বর্তমানে কৃষি ও অন্যান্য জীবিকা হইতে বিচ্যুত হইয়া গ্রামে আর একটি শ্রেণী গড়িয়া উঠিতেছে। ইহারা অনেকেই কৃষিমজুরের কাজ করে, ভাগ চাষ করে অথবা গ্রাম্য ও কুটির শিল্পে নিযুক্ত থাকিয়া স্বনির্ভর কর্মসংস্থান করে; এই ক্ষেত্রেও বেকারত্ব ব্যাপক আকারে দেখা দিতেছে।

কৃষিগত ও গ্রামীণ বেকার সমস্যার সমাধান করিতে হইলে সবুজ বিপ্লবকে

সারা দেশে প্রসারিত করিতে হইবে। পাঞ্জাব ও হরিয়ানা অঞ্চলে সবুজ বিপ্লব সার্থক হওয়ায় সেখানে গ্রামাঞ্চলে কৃষক ও কৃষিমজুর সারাবৎসর কাজ কাজ পাইতেছে এবং বেকারত্ব ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও কৃষিবিপ্লব ঘটাইতে হইবে, কৃষিউন্নয়নের জন্য জলসেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করিতে হইবে, উন্নত প্রণালীতে সারা বৎসর জমি চাষ করিতে হইবে, অধিক পরিমাণে রাসায়নিক সার ব্যববহার করিয়া একর প্রতি ফলন বাড়াইতে হইবে এবং সমবায় পদ্ধতিতে বহু বিভক্ত এবং অসম্বদ্ধ জোতের সংহতি সাধন করিতে হইবে। শ্বেতবিপ্লব, হাঁসমুরগী পালন এবং মৎস্যচাষের সম্প্রসারণ করিয়া যথেষ্ট পরিমাণ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা যাইবে। যে দেশে মূলধনের পরিমাণ কম কিন্তু শ্রমিকের সংখ্যা বিপুল সেখানে কৃষির ও গ্রামীণ শিল্পের এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রহিয়াছে। ক্ষুদ্র এবং কুটিরশিল্পকে পুনর্গঠিত করিতে পারিলে শুধু গ্রামেই নয় শহরাঞ্চলেও বহু শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থান হইবে।

শহরাঞ্চলের বেকার সমস্যা (Urban Unemployment) : শহরাঞ্চলে বেকারত্ব এক ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে। শহরাঞ্চলের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে গ্রাম হইতে আগত কর্মপ্রার্থীর অবিরাম প্রবাহ এক গভীর সংকট সৃষ্টি করিয়াছে। শহরে শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে বেকারসমস্যা বিস্ফোরণ ঘটাইতে পারে এবং শহরগুলি উত্তরোত্তর যুব অসন্তোষ এবং সামাজিক অস্থিরতার এক একটি ঝটিকাকেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইতেছে।

যদিও বেকারত্ব সর্বভারতীয় সমস্যা, তথাপি দেখা যায় যে অনগ্রসর এলাকায় এই সমস্যার ব্যাপ্তি এবং গভীরতা বিশেষভাবে তীব্র। সারা দেশে সুষম উন্নয়ন না হইয়া কতকগুলি বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে উহা ঘটিয়াছে। অনগ্রসর এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকায় সেখানকার কর্মপ্রার্থী যুবকেরা চাকুরীর অন্বেষণে দলে দলে উন্নত শহরাঞ্চলে আসিয়া ভিড় করিয়াছে। অনগ্রসর অঞ্চলে দ্রুত উন্নয়ন ঘটাইয়া কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা দরকার। শহরাঞ্চলেব বেকারসমস্যার সমাধান করিতে হইলে গ্রাম ও শহরের ব্যবধান হ্রাস করিয়া গ্রাম হইতে শহরে কর্মপ্রার্থীর প্রবাহ আশু বন্ধ করা প্রয়োজন।

শহরাঞ্চলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকারসমস্যা ব্যতীত আর একশ্রেণীর বেকার দেখা যায় যাহাদের শিল্পগত বেকারশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়; যাহারা গ্রামাঞ্চলে মজুর বা কারিগরের কাজ করিত কিন্তু সেখানে জীবিকার্জনে ব্যর্থ

হইয়া কাজের অন্বেষণে শহরে আসিয়াছে। ইহারা সাধারণতঃ অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত এবং কোনরূপ কারিগরী শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা নাই; ইহারা সাধারণতঃ অদক্ষ (unskilled) কাজ করিয়া থাকে। এই ধরণের শিল্পগত বেকার সমস্যা ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে।

ফ্লোরা সুলিভান এবং জন ফ্রিডম্যান (Flora Sullivan and John Friedman) শহরাঞ্চলের শিল্পগত বেকারসমস্যা আলোচনা করিতে যাইয়া "রাস্তার জগৎ" (Street Economy) এবং "সংগঠিত শিল্পক্ষেত্র" (Corporate Sector) নামে দুইটি বিভাগের উল্লেখ করিয়াছেন। শহরাঞ্চলে আংশিকভাবে অথবা সম্পূর্ণরূপে স্বনির্ভর জীবিকা অর্জনকারী একটি ক্ষেত্র দেখা যায়, ইহাকে "রাস্তার জগৎ" বলা হইয়াছে কারণ এই ক্ষেত্রে কর্মস্থল হইল ফুটপাত, রাস্তার মোড অথবা বাজার। দোকানদার, ফেরিওয়ালা, হকার, জুতাপালিশ, মোটবাহী প্রভৃতি কর্মে নিযুক্ত লোক এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সংগঠিত শিল্পক্ষেত্রের একজন কারখানা শ্রমিক বা অফিস পিওন যে মজুরী পায় ইহাদের গড় আয় তদপেক্ষা অনেক কম। আয় কম শুধু তাই নয়, ইহা অনিয়মিতও বটে; প্রধানতঃ গ্রাম হইতে আগত অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত বেকারদের কোনরকমে অস্তিত্ব বজায় রাখিবার উপায় এই ক্ষেত্রটি।

শহরাঞ্চলের অপর ক্ষেত্রটি সংগঠিত শিল্পক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকদের মজুরী বেশী, কাজের সর্ত ভালো এবং ইহারা লে-অফজনিত অস্থায়ী বেকার অবস্থায় ক্ষতিপূরণ পাইয়া থাকে। এই ক্ষেত্রটি হইতে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয় কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রটি কোন উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করিতে পারে না।

শহরাঞ্চলে শিল্পগত বেকারসমস্যার মূল কারণ হইল ভারতে শিল্পের অনগ্রসরতা। শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া এবং ব্যাপকভাবে শিল্পস্থাপন করিয়া শিল্পগত বেকারসমস্যা সমাধান করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, সুনামের অভাব, গুণনিয়ন্ত্রণের অভাব, ঠিক সময়ে মাল ডেলিভারী না দেওয়া প্রভৃতি কারণে বৈদেশিক বাজারে ভারতীয় পণ্যের চাহিদা হ্রাস পাওয়ার দরুন চা, পাট প্রভৃতি রপ্তানি শিল্পের উৎপাদন সংকোচজনিত বেকারসমস্যা দেখা দিয়াছে। তৃতীয়তঃ, বিদ্যুৎসংকট, কাঁচামালের ঘাটতি, অযোগ্য পরিচালনা প্রভৃতি কারণে শিল্পে অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার মাত্র ৭০ শতাংশ ব্যবহৃত হয়। শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার হইলে কর্মে নিযুক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। চতুর্থতঃ,

মারাত্মক মুদ্রাস্ফীতির দরুন জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা এবং প্রকৃত আয় হ্রাস পাইতেছে। ইহার দরুন দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় শিল্পে উৎপাদন সংকোচ এবং শ্রমিক ছাঁটাই হইতেছে। পরিশেষে, শিল্পজাত পণ্যের চাহিদা বাড়াইতে হইলে উৎপাদনব্যয় কমাইয়া পণ্যমূল্য হ্রাস করিতে হইবে। উৎপাদনব্যয় কমাইতে হইলে শিল্পে র‍্যাশানালাইজেশন করা প্রয়োজন। ভারতীয় শিল্পে র‍্যাশানালাইজেশনের দুইটি প্রধান বাধা রহিয়াছে—প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব এবং শ্রমিকদিগের বিরোধিতা। শ্রমিকদের যুক্তি এই যে শিল্পে র‍্যাশানালাইজেশন করিলে বেকারসমস্যা করিলে দেখা দিবে। কিন্তু এই যুক্তি যথেষ্ট শক্তিশালী নয় কারণ র‍্যাশানালাইজেশন না করিলেও বেকার সমস্যার সৃষ্টি হইবে। উৎপাদন খরচ বেশী হইলে প্রতিযোগিতার বাজারে পণ্য বিক্রয় করা কঠিন হইবে, বিক্রয় এবং উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাইলে স্বাভাবিকভাবেই কিছুসংখ্যক শ্রমিক ছাঁটাই হইবে। অপরপক্ষে র‍্যাশানালাইজেশনের মাধ্যমে যে বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয় তাহা সাময়িক; উৎপাদনব্যয় হ্রাস করিয়া উহা দাম কমাইয়া বিক্রয় বাড়াইতে সাহায্য করে যাহার দরুন পরিণামে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়।

শিল্পগত বেকারসমস্যার সমাধান করিতে হইলে দ্রুত শিল্পায়ন এবং শিল্পে র‍্যাশানালাইজেশন করা প্রয়োজন। দ্রুত শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজন শিল্পগত উদ্যোগ, মূলধনগঠন, দক্ষতাগঠন (skill formation) এবং শিল্পের উপকাঠামো (infrastructure) সৃষ্টি করা। সরকারী প্রচেষ্টায় সরকারী শিল্পোদ্যোগের এবং শিল্পপতিদের প্রচেষ্টায় বেসরকারী শিল্পের প্রসার করিতে হইবে। শ্রমিকদের কারিগরী দক্ষতা বাড়াইবার জন্য অধিক পরিমাণে কারিগরী বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। বর্তমান ভোগকে কঠোরভাবে হ্রাস করিয়া পরিকল্পনার সাহায্যে জাতীয় আয় সম্প্রসারিত করিয়া মূলধন গঠনের হার বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং দেশে এমন এক অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে হইবে যাহাতে বৈদেশিক মূলধন সরবরাহ বৃদ্ধি পায়।

মনে রাখিতে হইবে প্রতিটি সমস্যার দুইটি দিক আছে—চাহিদা ও যোগান। একদিকে যেমন উন্নয়ন হার বৃদ্ধি করিয়া শ্রমের চাহিদা বাড়াইতে হইবে অপরদিকে পরিবার পরিবার পরিকল্পনার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া জনবিস্ফোরণ নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে।

শিক্ষিতসম্প্রদায়ের বেকারসমস্যা (Educated Unemployment):

সরকার ১৯৫২ সালে শিবরাওয়ের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করে। উক্ত কমিটি ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে উহার রিপোর্ট দাখিল করে; কমিটির প্রধান প্রধান সুপারিশগুলি নিম্নলিখিতরূপ :

(১) নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্রকে পুনর্গঠন করিয়া জাতীয় নিয়োগ সংস্থা (National Employment Service) নাম দিতে হইবে এবং উহা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করিবে। সরকারী এবং আধা-সরকারী চাকুরী নিয়োগ কেন্দ্রের মাধ্যমে দিতে হইবে।

(২) রাজ্যসরকারগুলির হাতের নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্রের পরিচালনাভার থাকিবে। কিন্তু সাধারণ নীতি নির্ধারণ এবং তত্ত্বাবধান কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকিবে।

(৩) যে সকল নিয়োগকর্তা এবং নিয়োগপ্রার্থী নিয়োগ বিনিময়ে কেন্দ্রের সেবা এবং সাহায্য চাইবে তাহাদের নিকট হইতে কোনরূপ ফী আদায় করা চলিবে না।

(৪) নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্রগুলি শিল্পগত এবং পেশাগত শিক্ষার ব্যবস্থা করিবে। শিবরাও কমিটির সুপারিশগুলি সরকার আংশিকভাবে গ্রহণ করিয়াছে। আমাদের মনে হয় নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্রগুলি জাপানী পদ্ধতিতে গঠিত হইলে অধিকতর সুবিধা পাওয়া যাইবে। জাপানে নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্রগুলি শ্রমিকদিগকে ঋণদান করিয়া থাকে যাহাতে তাহারা বিশেষ ধরণের ট্রেনিং গ্রহণ করিতে পারে অথবা নিয়োগের সম্ভাবনা থাকিলে দূরবর্তী স্থানে যাইতে পারে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও কর্মসংস্থাননীতি (Five Year Plan and Employment Policy) : প্রথম পরিকল্পনায় সাধারণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছিল কিন্তু কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য কোন বিশেষ কার্যসূচী গ্রহণ করা হয় নাই। কিন্তু পরে বেকারসমস্যা তীব্র আকার ধারণ করায় উহা সমাধানের জন্য ১৭০ কোটি টাকা ও ১১ দফা কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়। গৃহ নির্মাণ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে সাহায্যদান, ভূমিসংরক্ষণ, রাস্তাঘাট নির্মাণ প্রভৃতি এই কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহার দরুন সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে মোট ৪৫ লক্ষ লোকের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পরিকল্পনার অন্যতম মূল লক্ষ্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। নূতন বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, পুরানো

বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং গ্রামাঞ্চলের অর্ধবেকারদের পূর্ণ-নিয়োগের ব্যবস্থা করা—দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান সমস্যাকে এই তিন দিক হইতে সমাধানের চেষ্টা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে মোট বেকারের সংখ্যা দাঁড়ায় এক কোটি ৭০ লক্ষ – ইহার মধ্যে এক কোটি ব্যক্তির কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয় অর্থাৎ ৭০ লক্ষ পুরানো বেকার লইয়া তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকাল সুরু হয়।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে নূতন কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা এক কোটি ৭০ লক্ষ হইবে আর ইহার সহিত ৭০ লক্ষ পুরানো কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা যোগ করিলে মোট বেকারের সংখ্যা দাঁড়াইবে ২ কোটি ৪০ লক্ষ। তৃতীয় পরিকল্পনায় এককোটি ৪৫ লক্ষ ব্যক্তির কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয় অর্থাৎ তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে প্রায় এককোটি বেকার থাকিয়া যাইবে। এই পরিকল্পনায় বেকার সমস্যাকে তিন দিক হইতে বিবেচনা করা হয়; প্রথমতঃ পরিকল্পনাধীন কার্যসূচীতে অধিক পরিমাণে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়, দ্বিতীয়তঃ, গ্রামে শিল্প স্থাপনের ব্যাপক কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়; এই সব কার্যসূচীতে গ্রামে বৈদ্যুতিকরণ, শিল্পতালুক স্থাপন, গ্রামীন শিল্পের উন্নয়ন এবং জনশক্তির পূর্ণ নিয়োগের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। তৃতীয়তঃ, ২৫ লক্ষ বা ততোধিক ব্যক্তির যাহাতে বছরে ১৯০ দিনের কর্মসংস্থান হয় তাহার জন্য গ্রামীন কর্মসূচী (rural work's programme) গ্রহণ করা হয়। ইহা অর্ধবেকারীর সংখ্যা হ্রাস করিবে। বেকারসমস্যা সমাধানের কথা চিন্তা করিয়াই পরিকল্পনা কমিশন শ্রম-প্রগাঢ় উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণের সুপারিশ করে।

তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনাকালে (১৯৬৬-৬৯) নূতন কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা হয় এককোটি ৪০ লক্ষ আর ইহার সহিত এককোটি পুরানো বেকার যোগ করিলে এই সময়ে মোট কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় ২ কোটি ৪০ লক্ষ কিন্তু এই সময়ে মাত্র ১০ লক্ষ অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়; সুতরাং চতুর্থ পরিকল্পনা ২ কোটি ৩০ লক্ষ বেকার লইয়া সুরু হয়।

চতুর্থ পরিকল্পনাকালে মোট কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৪ কোটি ৩৫ লক্ষ—ইহার মধ্যে আছে ২ কোটি ১০ লক্ষ নূতন কর্মপ্রার্থী এবং ২ কোটি ২৫ লক্ষ পুরাণ বেকার। প্রথম তিনটি পরিকল্পনার মতো চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধির কোন লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয় নাই অথবা পুরানো বেকারদেরও কোন হিসাব করা হয় নাই। দাঁতওয়ালা কমিটির (Dantwalla Committee) সুপারিশ অনুসারে ইহা করা হইয়াছিল।

কর্মসংস্থান দুই ধরনের হইতে পারে—মজুরীপ্রার্থী কর্মসংস্থান (wage employment) এবং স্বনির্ভর কর্মসংস্থান (self employment) ; আমাদের দেশে বেকারত্ব ও অর্ধবেকারত্বের যে বিরাট সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে শুধুমাত্র মজুরীগ্রাহী কর্মসংস্থানের দ্বারা তাহার মোকাবিলা করা যাইবে না, স্বনির্ভর কর্মসংস্থানের ব্যাপক সম্প্রসারণ প্রয়োজন।

চতুর্থ পরিকল্পনায় প্রধানতঃ গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত কার্যসূচী গ্রহণ করা হইয়াছিল :

১। গ্রামীণ নিয়োগের কার্যসূচী (Rural Works Programme) : ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে চতুর্থ পরিকল্পনাকালে গ্রামীন নিয়োগের কার্যসূচী চালু করা হয়। গ্রামের রাস্তাঘাট নির্মাণ, জলসেচ ব্যবস্থার প্রসার ও শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করিয়া কৃষি-শ্রমিকদের অর্ধনিয়োগ ও পূর্ণনিয়োগের ব্যবস্থা করা এই কার্যসূচীর লক্ষ্য।

২। ক্ষুদ্রচাষী উন্নয়ন সংস্থা (Small Farmers Development Agencies) : চতুর্থ পরিকল্পনাকালে সারা দেশে ৬৭·৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৬টি পাইলট প্রকল্প চালু করা হয়। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হইল ক্ষুদ্র চাষীদের ঋণদান করা যাহার সাহায্যে চাষীরা নিবিড় চাষ প্রবর্তন করিতে এবং কৃষিক্ষেত্রে সর্বাধুনিক উৎপাদনকৌশল প্রয়োগ করিতে পারে।

৩। খরাপ্রবণ অঞ্চলের কৃষিউন্নয়ন কার্যসূচী (Integrated Dry Land Agricultural Development) : ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে এই কেন্দ্রীয় প্রকল্পটি চতুর্থ পরিকল্পনাকালে চালু করা হয়। এই কর্মসূচীতে ২৪টি প্রকল্প থাকিবে এবং প্রত্যেকটি প্রকল্পে ৮০,০০০ একর জমি থাকিবে। এই সব প্রকল্পে ভূমি সংরক্ষণ, জমি উন্নয়ন, জলজ উদ্ভিদের চাষ প্রভৃতি জমির স্থায়ী উন্নয়নমূলক কার্যসূচী থাকিবে। এই ধরনের কাজে প্রতি এককোটি টাকায় ১৫,০০০ ব্যক্তির কর্মসংস্থান হইবে।

৪। প্রান্তিক চাষী ও কৃষিশ্রমিক কার্যসূচী (Marginal Farmer's and Agricultural Labourers Programme) : ৪১·৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্প চতুর্থপরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয়। সারা দেশের নির্বাচিত এলাকায় ৪১টি প্রকল্প চালু করা হয়। ২০ হাজার প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষী পরিবার লইয়া এক একটি প্রকল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এইসব কৃষকগণ চাষ ও পশুপালন প্রভৃতি কাজের জন্য ঋণ পাইবে। ৮ হইতে ৯ লক্ষ কৃষি-পরিবার এই কার্যসূচীর দ্বারা উপকৃত হইবে।

৫। অঞ্চল উন্নয়ন কার্যসূচী (Area Development Schemes): অঞ্চল উন্নয়ন কার্যসূচী জলসেচের সুবিধাপ্রাপ্ত অঞ্চলে প্রধানতঃ রাস্তাঘাট নির্মাণ, বাজার সৃষ্টি প্রভৃতি মৌল উপকাঠামো (infrastructure) গঠনে লিপ্ত।

৬। গ্রামীন বেকারবিনাশ কার্যসূচী (Crash Programme for Rural Employment): শ্রম-প্রগাঢ় ও উৎপাদনশীল প্রকল্পের মাধ্যমে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাই হইল এই কার্যসূচীর প্রধান লক্ষ্য। এই কার্যসূচীর দুইটি প্রধান লক্ষ এইরূপ: (১) প্রতিটি প্রকল্প প্রতি জেলায় এক হাজার ব্যক্তির জন্য বৎসরে ১০ মাস কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিবে এবং (২) প্রতিটি প্রকল্প স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করিবে। ক্ষুদ্র জলসেচ ব্যবস্থা, ভূমি সংরক্ষণ, বনসৃষ্টি, পতিত জমির পুনরুদ্ধার, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, রাস্তানির্মান প্রভৃতি। ১৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাসে গ্রামীন বেকার বিনাশী কার্যসূচী গৃহীত হয় এবং ওই বৎসর ইহা ৪ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে।

৭। বিশেষ কর্মসংস্থান কার্যসূচী (Special Employment Programmme): ১৯৭২-৭৩ সালে ভারত সরকারের উদ্যোগে বিশেষ কর্মসংস্থান কার্যসূচী গৃহীত হয়। কিন্তু ১৯৭৪-৭৫ সাল হইতে এই কার্যসূচীর জন্য সকল রাজ্যের ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় সাহায্য বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের প্রচণ্ড বেকার সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যসরকার নিজ তহবিল হইতে এই কার্যসূচী চালাইয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৭৪-৭৫ সালে এককোটি ৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক কার্যসূচীর মাধ্যমে ১৮,৭০০ লোকের কর্মসংস্থান হয়।

পঞ্চম পরিকল্পনার সর্ববৃহৎ চ্যালেঞ্জ হইল বেকার সমস্যার মোকাবিলা। খসড়া পরিকল্পনায় বেকার সমস্যার কতকগুলি প্রধান কারণ উল্লেখ করা হইয়াছে। বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি এবং সামাজিক ঐতিহ্য কায়িক পরিশ্রমের পথে বাধার সৃষ্টি করে। শিল্পপতিরা মৌল উপকাঠামোর অভাবে অনগ্রসর অঞ্চলে যাইতে অনিচ্ছুক, ফলে অনুন্নত এলাকা চিরদিনই অনগ্রসর থাকিয়া যায়, পরিশেষে, পূর্ববর্তী পরিকল্পনাগুলি হইতে আশানুরূপ কর্মসংস্থান হয় নাই।

অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পঞ্চম পরিকল্পনার কর্মসংস্থান নীতি নির্ধারিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হইল যুক্তিসঙ্গত আয়ত্তরে ব্যাপক কর্ম-

সংস্থান সৃষ্টি করা। আশা করা যায় যে পঞ্চম পরিকল্পনার বর্ধিত বিনিয়োগ প্রভূত পরিমাণে নূতন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করিবে। কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পঞ্চম পরিকল্পনায় বিনিয়োগ কাঠামো যতদূর সম্ভব শ্রম-প্রগাঢ় পদ্ধতি অনুসরণ করিবে। শুধুমাত্র বেতনগ্রাহী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করিয়া সমস্যার মোকাবিলা করা যাইবে না, সেইজন্য স্বনির্ভর কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উপর অধিকতর জোর দেওয়া হইয়াছে। দক্ষ ও সমর্থ ব্যক্তিরা যাহাতে নিজ বিদ্যা ও কুশলতার ভিত্তিতে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে তাহার জন্যে সরকার ১০ শতাংশ প্রান্তিক মূলধন সরবরাহ করিবে এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি বাকী মূলধন সরবরাহ করিবে। ক্ষুদ্র চাষী উন্নয়ন এজেন্সি, প্রান্তিক চাষী ও কৃষি-শ্রমিক, বিশেষ কর্মসংস্থান কার্যসূচী প্রভৃতি যে সকল ব্যবস্থা চতুর্থ পরিকল্পনা-কালে গৃহীত হইয়াছিল সেগুলি পঞ্চম পরিকল্পনাকালেও অব্যাহত থাকিবে।

১৯৭০ সালে কেন্দ্রীয় সরকার কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শ্রীবিজয় ভগবতীর নেতৃত্বে ১০ জন সদস্যবিশিষ্ট এক নিয়োগ কমিশন (Employment Commission) গঠন করে। কমিশনের উদ্দেশ্য ছিল তিনটিঃ (১) বেকার ও আধাবেকারদের সংখ্যা নির্ধারণ করা, (২) চতুর্থ পরিকল্পনাকে অধিক পরিমাণে নিয়োগমুখী করিয়া তোলা এবং (৩) স্বল্পকালীনও দীর্ঘকালীন কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উপযোগী উৎপাদন কৌশল নির্ধারণ করা। নিম্নে কমিটির সুপারিশগুলি আলোচনা করা হইল :

ভগবতী কমিটির সুপারিশ (Bhagavati Committee on Unemployment) : বেকার সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে সরকার বিজয় ভগবতীর নেতৃত্বে এক কমিটি গঠন করে। কমিটি ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে উহার অন্তবর্তী রিপোর্ট এবং ১৯৭৩ সালের মে মাসে তার চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করে। এই কমিটির দুইটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল (১) বেকারদের সংখ্যা নির্ধারণ করা এবং (২) বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য কার্যসূচী প্রণয়ন করা।

প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কমিশন হিসাব করে যে ১৯৭১ সালে মোট বেকারের সংখ্যা ছিল এক কোটি ৮৭ লক্ষ ; ইহাদের মধ্যে পূর্ণ বেকারের সংখ্যা ৯০ লক্ষ এবং আধাবেকারের সংখ্যা ৯৭ লক্ষ। সপ্তাহে যাহারা ১৪ ঘণ্টার কম কাজ করে তাহাদের আধাবেকার বলা হইয়াছে। নিয়োগবিনিময়কেন্দ্র এবং অন্যান্য প্রকাশিত সরকারী তথ্যের ভিত্তিতে এই হিসাব করা হইয়াছে। সেই জন্য এই হিসাবে বেকারদের যে সংখ্যা দেখানো হইয়াছে প্রকৃত সংখ্যা তদপেক্ষা অনেক বেশী হওয়াই স্বাভাবিক। কমিটির মতে মোট এক কোটি

৮১ লক্ষ বেকারের মধ্যে এক কোটি ৬০ লক্ষ (অর্থাৎ ৮৬ শতাংশ) গ্রামীন বেকার এবং ২৬ লক্ষ শহরাঞ্চলের বেকার।

বেকার সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কমিটি আগামী দুই বৎসরের জন্য গ্রামে বৈদ্যুতিকরণ ; রাস্তা নির্মাণ, গ্রামে গৃহনির্মাণ কার্যসূচী এবং অপ্রধান জলসেচ প্রকল্প সুপারিশ করে। ইহার দরুন অতিরিক্ত ১৪০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। এই সকল কার্যসূচীর মাধ্যমে প্রধানতঃ গ্রামীণ বেকার ও আধাবেকার-দের কর্মসংস্থান হইবে।

১। শিল্পক্ষেত্রে বেকার সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কমিটি মনে করে যে বিভিন্ন শিল্পের পূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার হওয়া প্রয়োজন। সম্প্রতি স্থির হইয়াছে যে কয়েকটি সর্তসাপেক্ষে কতিপয় শিল্পকে অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা ১০০ শতাংশ বৃদ্ধির অনুমতি দেওয়া হইবে। এই ব্যবস্থার ফলে যথেষ্ট কর্ম-সংস্থান হইলে অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রেও অনুরূপ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে হইবে।

২। শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে শ্লথহারে উন্নয়ন কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে শ্লথতর হারে সম্প্রসারণের জন্য দায়ী। পরিকল্পনা কালে প্রধানত: উৎপাদনের প্রতি নজর রাখিয়া বিনিয়োগ করা হয়—কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ছিল উহার গৌণ লক্ষ্য ; এই ধরণের বিনিয়োগ নীতি গ্রহণ করায় যথেষ্ট পরিমাণে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায় নাই।

৩। কর্মসংস্থান যথেষ্ট বৃদ্ধি না পাওয়ার আর একটি কারণ হইল র‍্যাশা-নালাইজেসন ও আধুনিকীকরণের অজুহাতে মূলধন-প্রগাঢ় উৎপাদন কৌশলের ব্যবহার ; কমিটিও স্বীকার করিয়াছে যে দ্রুত যন্ত্রীকরণ করা ঠিক নয়।

একদল অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে আয়ের কেন্দ্রীভবনের দরুন চাহিদার প্রকৃতির যে পরিবর্তন হইয়াছে তাহা বিলাস দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পের সৃষ্টি করিয়াছে কিন্তু এইসব শিল্পে নিয়োগ সৃষ্টির ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত কম। জমির মালিকানার বিকেন্দ্রীকরণ এবং জমির ভোগদখল সম্পর্কে রায়তের নিরাপত্তা এই দুই উদ্দেশ্যে ভূমিসংস্কার কৃষিক্ষেত্রে বাঞ্ছিত প্রতিষ্ঠানগত পরিবর্তন আনিবে। অ-কৃষিগত ক্ষেত্রে যদি একচেটিয়া প্রবণতা রোধ করা যায় তাহা হইলে অবস্থার উন্নতি হইবে।

কমিটির দুইজন সদস্য অশোক মিত্র ও জ্যোতির্ময় বসু মত পার্থক্যের নোট দেন। ইহাদের মতে ভগবতী কমিটির সুপারিশগুলি অত্যন্ত মামুলি

ধরণের। এই কমিটি যে সব কার্যসূচীর সুপারিশ করিয়াছে সেগুলি সর্বই চতুর্থ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে; যেমন বেকারনাশক পরিকল্পনা, জলসেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, জমি পুনরুদ্ধার, গ্রামে বৈদ্যুতিকরণ, গ্রামে রাস্তা নির্মাণ, জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা, গৃহ নির্মাণ ও অন্যান্য শ্রম-প্রগাঢ় কার্যসূচী। ভারতে পরিকল্পনার একটি দুভার্গ্যজনক দিক হইল কর্মসংস্থানের যে সাধারণ লক্ষ্যমাত্রা ধার্য আছে তাহা বাধ্যতামূলকভাবে পূরণ করিবার কোন ব্যবস্থা নাই। জ্যোতির্ময় বসু বলেন যে কর্মসংস্থানের কার্যসূচী কার্যকর না হওয়ার জন্যে যারা দায়ী থাকিবে তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

এই দুইজন সদস্য বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য একটি কর্মসংস্থান তহবিল (Central Employment Fund) গঠনের নির্দেশ দেন। শিল্পমালিক, কেন্দ্র ও রাজ্যসরকার, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক এবং সরকারী শিল্পসংস্থাগুলি নিয়মিতভাবে এই তহবিলে চাঁদা দিবে। সংগঠিত শিল্পের উপর সেস ধার্যের কথাও সরকারকে বিবেচনা করিতে হইবে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই তহবিলটি ব্যবহার করা হইবে এবং সরকারকে সকল কার্যক্ষম ও ইচ্ছুক ব্যক্তির "কাজের অধিকারের" সামাজিক দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

জনসংখ্যা সম্পর্কিত নীতি (Policy relating to Population): বেকার সমস্যার সহিত অনিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যার এক প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে শিক্ষা কমিশন মনে করে যে বেকার সমস্যা সমাধানের অন্যতম পদ্ধতি হইল পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ। জনসংখ্যা সম্পর্কে পরিকল্পনাধীন সময়ে সরকারী নীতি লইয়া আলোচনা করিলে উহার বিবর্তন লক্ষ্য করা যাইবে।

অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে "অধিক জনসংখ্যা অধিক সম্পদ সৃষ্টি করে" (more people means more wealth); সমাজ বিজ্ঞানের বিবর্তন ও অবস্থার পরিবর্তনের দরুণ মানুষের অনেক পুরানো ধারণা বদলাইয়াছে। জনসংখ্যা সম্পর্কেও মানুষের ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। তাই বর্তমান অর্থনীতিবিদেরা বলেন, অধিক জনসংখ্যার অর্থ অধিক দারিদ্র্য (more people means more poverty).

বহু অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ অত্যাবশ্যক। ষ্টীফেন এন্‌ক (Stephen Enke) বলেন, যদি প্রদত্ত

সম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধির পরিবর্তে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধে নিয়োজিত হয় তাহা হইলে উহা অর্ধোন্নত দেশে জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বহুগুণ অধিক কার্যকরী হইবে।

ভারতে জনসংখ্যা প্রতি বৎসর এক কোটি ৩০ লক্ষ করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে; ফাকাল কমিশন এবং পরিকল্পনা কমিশনের মতে এই জন বৃদ্ধির হার অতি ভয়াবহ। অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক স্তর হিসাবে আগামী কয়েক বৎসর জনসংখ্যা দ্রুত হারে বাড়িতে থাকিবে; অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে মাথাপিছু আয় এবং জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাইবার যে সম্ভাবনা দ্রুত জনবৃদ্ধির ফলে তাহা বাস্তবে রূপায়িত হইবে না। অতি দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে জনসাধারণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোন ফলই ভোগ করিতে পারিবে না। উন্নয়নের সকল প্রয়াসই বাড়তি জনসংখ্যার খাদ্য সংগ্রহে আবদ্ধ থাকিবে বলিয়া জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হইবে না; দ্রুত জনবৃদ্ধি যাহাতে উন্নয়নের গতি রুদ্ধ না করিতে পারে সেজন্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। মূলধন-স্বল্প দেশে জনগণের জীবনযাত্রার মানের দ্রুত উন্নতি করিতে হইলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা অপরিহার্য।

অনেকে এই যুক্তি দেখান যে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি উনিশ শতকে ইউরোপে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে নাই। সেখানে জনসংখ্যা হ্রাসের কোন সক্রিয় পরিকল্পনা গ্রহণ না করা সত্ত্বেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি আপনা-আপনি কালক্রমে হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু তখনকার ইউরোপের অবস্থার সঙ্গে বর্তমান ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার তুলনা করা ঠিক হইবে না। প্রথমতঃ, ইউরোপে যখন শিল্পবিপ্লব ঘটে তখন সেখানকার মোট জনসংখ্যার পরিমাণ খুবই অল্প ছিল, তাই জনসংখ্যার শতকরা বৃদ্ধির হার অধিক হইলেও মোট বৃদ্ধির পরিমাণ খুব বেশী ছিল না; দ্বিতীয়তঃ, ইউরোপে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন তদপেক্ষা অধিক হারে হইয়াছে।

খ্যাতনামা বৃটিশ বৈজ্ঞানিক স্যার জুলিয়ান হাক্সলের মতে ভারতের দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত না হইলে উহা ভয়াবহ সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয় ডাকিয়া আনিবে। পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারত জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির প্রয়াসী, সেই কারণে জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যয়কে লাভজনক বিনিয়োগ বলিয়া গণ্য করা চলে। বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মৃত্যুহার দ্রুত হ্রাস পাইতেছে; জন্ম নিয়ন্ত্রণ করিয়া মৃত্যু নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে ভারসাম্য না আনিলে বিপর্যয় ঘটিবে।

ক্লিমেণ্ট মার্কেট (Clement Market) বলেন, যে সব দেশ মৃত্যু নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে তাহাদের জন্ম নিয়ন্ত্রণও করিতে হইবে নতুবা সেই ভয়াবহ সময়ের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে যখন বসিবার বা শুইবার মতো জায়গার অভাবে মানুষকে দাঁড়িয়ে বেঁচে থাকতে হবে।

১৯৪৯ সালে জাতীয় আয় কমিটি এবং ১৯৫১ সালের আদমসুমারী রির্পোটে প্রথম জনসংখ্যার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সাধারণতঃ তিনটি পদ্ধতি আছে। প্রথমতঃ, পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে "অপরিণামদর্শী মাতৃত্ব (improvident maternity)" পরিহার করিতে হইবে। তিন বা ততোধিক সন্তানবতী মাতার পুনরায় মাতৃত্ব লাভকে অপরিণামদর্শী মাতৃত্ব বলা হইয়াছে; ইহাই পরিবার পরিকল্পনা।

দ্বিতীয়তঃ, স্ত্রী-পুরুষের, বিশেষ করিয়া মেয়েদের বিবাহের বয়স বাড়াইয়া দেওয়া জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের একটি উপায়। একটি স্ত্রীলোক সাধারণতঃ ১৫ থেকে ৪০ বৎসর পর্যন্ত সন্তান উৎপাদন করিতে পারে। অধিক বয়সে বিবাহ হইলে সন্তান প্রজননের কম সময় (shorter span of reproduction age) পাওয়া যায় যাহার ফলে কম সংখ্যক সন্তানাদি হয়।

তৃতীয়তঃ, চরমপন্থীরা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষপাতী; যেমন তিনটির অধিক সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে পিতার উপর কর ধার্য করা, এবং নারীপুরুষের দ্বিতীয়বার বিবাহ আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করার নির্দেশ হয়।

পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব তিন দিক হইতে বিচার করা যায় (১) মাতার স্বাস্থ্য, (২) নিয়ন্ত্রিত পরিবারের সুবিধা এবং (৩) দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা।

পরিবার পরিকল্পনা স্বয়ং কোন উদ্দেশ্য নয়—ইহা উদ্দেশ্যসাধনের উপায় মাত্র। পাশ্চাত্য দেশে পরিবার পরিকল্পনার আদর্শ প্রচার করিবার কোন প্রয়োজন নাই কারণ ক্ষুদ্র পরিবারই তাহাদের আদর্শ ও জীবনদর্শনের সঙ্গে অধিক সংগতিপূর্ণ তাহারা "বেবি" অপেক্ষা "বেবি কারই" (baby car) অধিক পছন্দ করে। জাতীয় দৃষ্টিকোণ হইতে তিনটি কারণে পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজন রহিয়াছে: (১) জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস (২) জীবনযাত্রার মান উন্নত করা এবং (৩) সরকারী জননীতিকে সফল করা। জনবিস্ফোরণের (population explosion) মারাত্মক পরিণতির হাত হইতে রক্ষা পাইতে

হইলে পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আজ আর দ্বিমত নাই।

পরিবার পরিকল্পনার দুইটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হইল গর্ভনিয়ন্ত্রণ বা জন্মনিয়ন্ত্রণ (Conception Control or Birth Control) এবং যৌন শিক্ষা (Sex Education)

ভারতে এখনো পর্যন্ত সাধারণভাবে গর্ভ নিয়ন্ত্রণ অবৈধ কিন্তু জাপান ও অন্যান্য দেশে গর্ভ নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ বৈধ এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণের একটি পদ্ধতি হিসাবে গণ্য হয়। সুইজারল্যাণ্ড ও অন্যান্য বহু দেশে যৌন শিক্ষার ব্যবস্থা আছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় উহা অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। অবশ্য কতকগুলি রাজ্যে ইতিমধ্যেই জনসংখ্যা (Population Education) স্কুল পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে আর বাকী রাজ্যগুলিতেও শীঘ্রই উহা পঠন পাঠনের ব্যবস্থা হইবে।

১৯৭১ সালে Medical Termination of Pregnancy Act প্রবর্তিত হওয়ায় আমাদের দেশেও বর্তমানে চিকিৎসাসম্মত গর্ভপাত আইনসিদ্ধ হইয়াছে। যদিও চিকিৎসার প্রয়োজনে এই ব্যবস্থা লওয়া হইয়াছে— পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনে নয়, তবুও ইহা জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করিতে সাহায্য করিবে। এই আইনানুসারে প্রসূতির জীবনহানি অথবা শারীরিক ও মানসিক কোন ক্ষতির আশংকা থাকিলে তবেই অস্ত্রোপচার করা চলিবে এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শল্য চিকিৎসকেরাই শুধু ইহা করিতে পারিবেন। বিশেষ ক্ষেত্রে সন্তান সংখ্যা সীমিত রাখিবার প্রয়োজনেও চিকিৎসকেরা অস্ত্রোপচারের সুপারিশ করিতে পারিবেন।

প্রথম পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পনার জন্য মাত্র ৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা হয়; এই সময় পরিবার পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল মাতার স্বাস্থ্য রক্ষা করা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পনার জন্য প্রায় পাঁচ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পনার যে কার্যসূচী গ্রহণ করা হয় তাহাকে সম্প্রসারণমূলক কার্যসূচী (Extension Programme) বলা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পনাখাতে প্রথমে ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়, পরে উহা বৃদ্ধি করিয়া ৫০ কোটি টাকা করা হয়। চতুর্থ পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পনাকে ব্যাপক গণআন্দোলনে পরিণত করিবার কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়। চতুর্থ পরিকল্পনা কালে পরিবার পরিকল্পনার জন্য ৩৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল; পঞ্চম পরিকল্পনায় ওই খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করিয়া ৫১৬

কোটি টাকা করা হয়। চতুর্থ পরিকল্পনায় জন্মহার প্রতি হাজারে ৪০ হইতে হ্রাস করিয়া ৩২ ও পঞ্চম পরিকল্পনায় ২৫ করার কথা বলা হইয়াছে। পরে পঞ্চম পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা পরিবর্তন করিয়া ৩০ করা হয়। পঞ্চম ও খসড়া ষষ্ঠ পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণখাতে যথাক্রমে ১৭৭৯ ও ২০৯৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। প্রথম পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পনা ছিল ব্যক্তি কেন্দ্রিক (মাতা), দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উহা হয় গ্রামকেন্দ্রিক এবং চতুর্থ পরিকল্পনায় উহা দেশব্যাপী এক আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে।

১৯৭৭ সালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডঃ করণ সিং জনসংখ্যা সম্পর্কিত জাতীয় নীতি ঘোষণা করেন। সরকারী নীতির মূল লক্ষ্য হইল ষষ্ঠ পরিকল্পনার শেষে ১৯৮৪ সালের মধ্যে দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস করিয়া ১.৪ শতাংশ করিতে হইবে। এই লক্ষ্যে পৌঁছাইবার জন্যে যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে সেগুলি হইল এইরূপ: (১)

(১) মেয়েদের ও ছেলেদের ন্যূনতম বিবাহের বয়স যথাক্রমে ১৮ ও ২১ করার জন্য আইন পাশ করা হইবে; (১) রাজ্যগুলিতে পরিবার পরিকল্পনার অগ্রগতি অনুসারে কেন্দ্রীয় সাহায্যের ৮ শতাংশ রাজ্য উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য বরাদ্দ করা হইবে। ইহার ফলে রাজ্যগুলি পরিবার পরিকল্পনার কার্যসূচী সফল করিতে উৎসাহিত হইবে; (১) রাজ্যসমূহ যাহাতে পরিবার পরিকল্পার কর্মসূচী সফল করিতে সচেষ্ট হয় সেজন্য আগামী ২৫ বৎসর ১৯৭১ সালের জনসংখ্যার ভিত্তিতে লোকসভার ও রাজ্য বিধানসভার আসনসংখ্যা নির্ধারিত হইবে; জনসংখ্যা বাড়িলেও আসনসংখ্যা বাড়ানো হইবে না; (৪) রাজ্যগুলি কেন্দ্রীয় সাহায্য, অনুদান ও করের অংশ ১৯৭১ সালের জনসংখ্যার ভিত্তিতে পাইবে—লোকসংখ্যা বাড়িলেও তাহা হিসাবে ধরা হইবে না। (৫) কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশের জন্য বাধ্যতামূলক নির্বীজকরণে আগ্রহী নহেন। তবে কোন রাজ্য সরকার ইহা প্রবর্তন করিলে কেন্দ্রীয় সরকার তাহাতে কোন আপত্তি করিবেন না। তিনটি সন্তানের পরই বাধ্যতামূলক নির্বীজকরণ করা যাইবে। সরকারী নীতি মূলত পুরস্কার ও শাস্তি (Reward and Punishment) তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।

পরিবার পরিকল্পনাকে সফল করিতে হইলে ব্যাপক প্রচার ও প্রণোদনা (incentive) আবশ্যক। জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কুসংস্কার দূরীকরণ, বৃহৎ পরিবারের অসুবিধা এবং পরিবার পরিকল্পনার সর্বাধুনিক পদ্ধতি সম্পর্কে

জনসাধারণকে ওয়াকিবহাল করিবার জন্য ব্যাপক প্রচার কার্যের প্রয়োজন। দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ জনপ্রিয় করিবার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে প্রদান করিতে হইবে। অধিক সংখ্যায় সর্বত্র, বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে পরিবার পরিকল্পনাকেন্দ্র স্থাপন করিতে হইবে।

একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ একটি দীর্ঘকালীন ব্যবস্থা; স্বল্পকালীন ব্যবস্থা হিসাবে ইহার বিশেষ উপযোগিতা নাই। জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার অপেক্ষা উন্নয়নের হার বৃদ্ধিই হইল স্বল্পকালীন সমাধানের ব্যবস্থা।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের একটি অবাঞ্ছিত দিকও আছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ জাতির ভবিষ্যৎ গুণগত অবনতি ঘটাইতে পারে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সকল উচ্চশিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিই অবহিত আছেন বলিয়া তাঁহারা পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে সন্তান সংখ্যা সীমিত রাখিবেন। অপর পক্ষে কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং অশিক্ষিত জনসাধারণ পরিবার পরিকল্পনার উপযোগিতা বোঝে না, জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে আগ্রহী নয়, সন্তানসন্ততির শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে না তাই তাহারা যথেচ্ছভাবে সন্তানোৎপাদন করিয়া চলিবে ফলে অদূর ভবিষ্যতে মোট জনসংখ্যার মধ্যে বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত জনসংখ্যার অনুপাত কমিয়া যাইবে আর এই কারণে দেশের সামাজিক, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ব্যাহত হইবে। সরকারী জনসংখ্যা নীতিতে শুধুমাত্র জনসংখ্যার পরিমাণগত দিকটার প্রতি জোর দেওয়া হইয়াছে, উহার গুণগত দিকটির প্রতি মোটেই দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। জনসংখ্যার গুণগত দিকটি অবহেলিত থাকিলে পরিবার পরিকল্পনানীতি নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিবে।

অনুশীলনী

১। ভারতে ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার কারণগুলি কি কি? কি ভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যায়?

২। গ্রামীন কর্মহীনতা এবং শহরাঞ্চলের বেকার সমস্যার প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর এবং কিভাবে উহা সমাধান করা যায় তাহা বল।

৩। বেকার সমস্যা সমাধানে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির ভূমিকা আলোচনা কর।

৪। জনবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে পরিবার পরিকল্পনার ভূমিকা আলোচনা কর।

সপ্তম অধ্যায়

স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে সরকারী শিল্প নীতি

(Government Industrial Policy since Independence)

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব সুরু হয় তখন শ্রমিকেরা দলবদ্ধভাবে কারখানায় কারখানায় গিয়া যন্ত্রপাতি ধ্বংস করিয়া তাহাদের প্রতিবাদ সোচ্চার করিয়াছিল। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে "তৃতীয় বিশ্বের" দেশগুলিতে শিল্পায়ন সুরু হইলে শ্রমিক তথা জনগণ যন্ত্রপাতি ধ্বংস করিবার জন্য কোন আন্দোলন করে নাই। আজকের প্রতিবাদ শিল্পায়নের বিরুদ্ধে নয়— উহার স্বপক্ষে। পৃথিবীর সকল দেশ শিল্পায়নের পথে যাত্রা করিয়াছে কারণ দারিদ্র্যকে জয় করিবার ইহা একটি বড় হাতিয়ার। শিল্পায়ন অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জনের একটি বড উপায়।

অর্থনীতিবিদেরা মনে করেন দরিদ্র দেশে উন্নয়নের চাবিকাঠি রহিয়াছে শিল্পায়নের মধ্যে। এই ধারণাকে সমর্থন করে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি এবং এ্যাঞ্জেলের ভোগ নিয়ম। ক্রমহ্রাসমান নিয়ম জমিভিত্তিক কাজকর্মের সম্প্রসারণ সম্পর্কে এক অন্ধকারময় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেয় অপরপক্ষে এ্যাঞ্জেলের নিয়মানু-সারে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের চাহিদা কমিতে থাকিবে। সুতরাং উন্নয়ন অব্যাহত রাখিতে হইলে শিল্পায়ন করিতে হইবে।

অর্ধোন্নত দেশে শিল্পোন্নয়নের দায়িত্ব সরকারকেই বহন করিতে হইবে। আধুনিককালে কোন দেশেই রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকা ব্যতিরেকে দ্রুত এবং সুষম শিল্পোন্নয়ন হয় নাই। দুঃখের বিষয় বৃটিশ যুগে বিদেশী সরকার ভারতের শিল্পোন্নয়নের জন্য সুপরিকল্পিত অথবা সুসম্বদ্ধ কোন দীর্ঘকালীন নীতি লইয়া অগ্রসর হয় নাই। ১৯১৬ সালে দেশের শিল্প সম্ভাবনা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার উদ্দেশ্যে ভারতীয় শিল্প কমিশন নিযুক্ত হইলেও সরকার কোন সুনির্দিষ্ট শিল্পনীতি গ্রহণ করে নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সরকার প্রথম শিল্পসম্প্রসারণ, গবেষণা এবং প্রশিক্ষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। ১৯৪০ সালে বৈজ্ঞানিক এবং শিল্পসংক্রান্ত গবেষণা পর্ষদ স্থাপিত হয়। বৃটিশ সরকারের শিল্পনীতিকে উদাসীন স্বাতন্ত্র্যবাদ (apathetic laissez faire) বলা চলে ; ফলে শিল্পের ক্ষেত্রে ভারত স্বভাবতই পিছিয়ে পড়ে। স্বাধীনতা লাভের পর জাতীয় সরকার সুনির্দিষ্ট শিল্পনীতি ঘোষণা করে।

১৯৪৮ সালের শিল্পনীতি (Industrial Policy of 1948): দেশের শিল্পনীতির প্রধান উদ্দেশ্য হইল দ্রুত এবং সুসম শিল্পায়ন। বেসরকারী উদ্যোগের হাতে দেশের শিল্পায়নের সকল দায়িত্ব ছাড়িয়া দিলে দ্রুত এবং সুসম শিল্পায়ন হইতে পারেনা। প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব, কারিগরী জ্ঞানের অভাব এবং মুনাফার স্বল্পতার দরুন শিল্পোন্নতি ব্যাহত হইতে পারে। শিল্পনীতির উদ্দেশ্য হইবে ; (১) দেশে দ্রুত এবং সুসম শিল্পোন্নতি ঘটান, (২) সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র প্রসারিত করা (৩) একচেটিয়া কারবার এবং অর্থনৈতিক কেন্দ্রীভবন রোধ করা, (৪) ভারী ও মূল শিল্প প্রতিষ্ঠা করা এবং (৫) আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস করা।

১৯৪৮ সালের ৬ই এপ্রিল তদানীন্তন কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী সরকারের শিল্পনীতি ঘোষণা করেন। এই শিল্পনীতির ভিত্তি হইল মিশ্র অর্থব্যবস্থা। এই শিল্পনীতির চারটি উদ্দেশ্য হইল (১) সকলের জন্য সমান সুযোগও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা, (২) দেশের প্রাপ্ত সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করিয়া জনগণের জীবনযাত্রার মানের দ্রুত উন্নতি সাধন করা, (৩) প্রত্যেকের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং (৪) ক্রমবর্ধমান উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

মিশ্র অর্থব্যবস্থা প্রবর্তনের সংকল্প ঘোষণা করিয়া বলা হয় যে সরকারের উপর দেশের পরিকল্পিত শিল্পোন্নয়নের সর্বময় দায়িত্ব ন্যস্ত থাকিবে। প্রয়োজন হইলে জাতীয় স্বার্থে যে কোন শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিতে পারিবেন। সেই সঙ্গে বেসরকারী উদ্যোগের সম্প্রসারণের সকল সুযোগ দেওয়া হইবে, অবশ্য জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজনমত উহার নিয়ন্ত্রণ করা হইবে।

এই শিল্পনীতি ঘোষণায় শিল্পগুলিকে চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ একচেটিয়া এলাকাভুক্ত শিল্প ঃ অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ, আণবিক শক্তি উৎপাদন এবং রেল পরিবহন এই তিনটি শিল্পকে রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ এক চেটিয়া এলাকায় রাখা হইয়াছে ; দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত ক্ষেত্র : মূল গুরুত্বপূর্ণ শিল্প যেমন লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা বিমান নির্মাণ, জাহাজ নির্মাণ, খনিজ তৈল প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ; এইগুলিকে সরকারী মালিকানায় গড়িয়া তোলা হইবে আর এই সব ক্ষেত্রে যে সব নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবে তাহারা সরকারী মালিকানায় পরিচালিত হইবে। এই ক্ষেত্রে বেসরকারী মালিকানায় পরিচালিত শিল্পগুলিকে দশবৎসর কাজ করিতে দেওয়া হইবে এবং তাহার পর উহাদের জাতীয় করণের প্রশ্নটি

বিবেচনা করা হইবে। তৃতীয়ত রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে বেসরকারী শিল্পসমূহ : চিনি, বস্ত্র, সিমেন্ট, কাগজ, যন্ত্রপাতি, মোটরগাড়ী, সার, ভারী রসায়ন প্রভৃতি ২০টি শিল্প বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে থাকিবে কিন্তু এগুলির উপরও সরকারের অল্পবিস্তর নিয়ন্ত্রণ থাকিবে। অবশ্য এই ক্ষেত্রে জাতীয়করণের কোন আশংকা নাই। চতুর্থত, শিল্পক্ষেত্রের বাকী অংশ : ব্যক্তিগত ও সমবায় প্রচেষ্টার অন্য সকল শিল্প ইহার অন্তর্গত। এই ক্ষেত্রের শিল্পগুলি সাধারণতঃ বেসরকারী উদ্যোগে পরিচালিত হইবে, কিন্তু প্রয়োজন দেখা দিলে সরকার এই ক্ষেত্রেও অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে।

এই শিল্পনীতি ঘোষণায় জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোয় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের যথাযোগ্য স্থান নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল। বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের ভিত্তিতে শিল্পোন্নয়নের আদর্শ সম্মুখে রাখা হয়। বৃহৎ শিল্পের পরিপূরক হিসাবে এবং যতদূর সম্ভব সমবায়ের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে সম্প্রসারিত করিতে হইবে।

উৎপাদন বৃদ্ধি ও শিল্প সুপরিচালনার জন্য সৌহার্দ্যপূর্ণ শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উপর জোর দেওয়া হয়। শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধির, বাসস্থানের উন্নতির এবং শিল্পপরিচালনায় শ্রমিক যাহাতে ক্রমান্বয়ে অধিকতর অংশ গ্রহণ করে তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। আবার মালিক যাহাতে ন্যায্য মুনাফা লাভ করে তাহাও দেখিতে হইবে।

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগাধীন শিল্পগুলি প্রধানতঃ কর্পোরেশনের মাধ্যমেই পরিচালিত হইবে বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হয়। মূল ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের অবস্থান নির্বাচনের ভার রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

বৈদেশিক মূলধন সম্পর্কে এই ঘোষণায় বলা হইয়াছিল যে ভারতে লগ্নীকৃত বৈদেশিক মূলধনের বিরুদ্ধে কোনরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ করা হইবে না। বৈদেশিক মূলধনকে দেশীয় মূলধনের সমান সুযোগসুবিধা দেওয়া হইবে এবং মুনাফা স্বদেশে পাঠানোর সুবিধা দেওয়া হইবে। যাহাতে প্রত্যেক ক্ষেত্রে ভারতীয়রা বিশেষজ্ঞের স্থান গ্রহণ করিতে এবং উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

সমালোচনা (Criticism) : ভারতের প্রথম শিল্পনীতি কাহাকেও বিশেষ সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। যখন এই নীতি ঘোষণা করা হয় তখন দেশের সম্মুখে কোন সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ছিল না। সরকারের অপরিণত

অর্থনৈতিক চিন্তাধারা মূল এবং গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের ক্ষেত্রে জাতীয় করণের প্রশ্নটি তুলিয়া ধরে। দশ বৎসর পর জাতীয়করণের আশংকা বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করে, বেসরকারী ক্ষেত্রে মূলধনগঠন ব্যাহত করে, এবং মূলশিল্পের ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ রোধ করে। বাধ্য হইয়া দুই বৎসরের মধ্যেই সরকারকে ঘোষণা করিতে হয় যে আগামী ১০ বৎসর পরেও মূল ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকে জাতীয়করণ করা হইবে না। প্রথম শিল্পনীতির আর একটি ত্রুটি হইল যে শিল্পনীতি ও উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার মধ্যে কোন সমন্বয় ছিল না। যখন শিল্পনীতি ঘোষণা করা হয় তখন পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থায় শিল্পোন্নয়নে সরকারী ভূমিকা কি হইবে সে সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। ফলে ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতিতে সাধারণ ভাবে শিল্পসম্পর্কে সরকারের দৃষ্টিভংগীর পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র—দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপেক্ষিতে শিল্পসম্প্রসারণের কোন সুস্পষ্ট, বলিষ্ঠ এবং বাস্তব নীতি উহাতে ছিল না। এই নীতি ভারতের শিল্পক্ষেত্রে জটিলতা বৃদ্ধি করে; যাহা হউক এই শিল্পনীতিই ভারতের মিশ্র অর্থব্যবস্থার বনিয়াদ দৃঢ় করে।

শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫১ [Industries (Development and Regulation) Act, 1951]: বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৫১ সালে শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন পাস করা হয়। বেসরকারী শিল্পগুলির উৎপাদনক্ষমতা আশানুরূপ না হইলে সরকার সেগুলির পরিচালনাভার অথবা নিয়ন্ত্রণভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারিবে। দেশের সুষ্ঠু শিল্পোন্নয়নের জন্য বেসরকারী শিল্পগুলির পক্ষে রেজেষ্ট্রি করা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে এবং নূতন শিল্প স্থাপন করিতে হইলে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে।

এই আইনে বেসরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই আইনের উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল তিনটি: (১) এক কোটি টাকার অধিক মূলধন লইয়া গঠিত শিল্পগুলিকে সরকারের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে। ১৯৭০ সালে দত্ত কমিটির সুপারিশ অনুসারে অনধিক এক কোটি টাকা লইয়া গঠিত শিল্পগুলিকে সরকারের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ করার প্রয়োজন নাই। (২) এই আইনের তালিকাভুক্ত যে কোন শিল্পের জন্য সরকার উন্নয়ন পরিষদ (Development Council) গঠন করিতে পারিবেন; (৩) এই আইনে কতকগুলি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

গ্রহণের কথাও বলা হইয়াছে। যদি কোন কার্যের উৎপাদন অথবা পণ্যমান হ্রাস পায় অথবা শিল্পজাত দ্রব্যের দাম অত্যধিক বৃদ্ধি করে তাহা হইলে সরকার উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ বা দাম নির্ধারণ সম্পর্কে নির্দেশ জারি করিতে পারে। প্রয়োজন মনে করিলে সরকার উহার পরিচালনভারও গ্রহণ করিতে পারে।

এই আইনে শিল্প সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা করিবার এবং উপদেশ দিবার জন্য শ্রমিক, মালিক ও ভোগকারীদের প্রতিনিধি লইয়া একটি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পর্ষদ (Central Advisory Council) গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ত, কোন নূতন শিল্পকে লাইসেন্স দিবার পূর্বে উহার যোগ্যতা এবং অবস্থান বিচার করিয়া দেখিবার জন্য একটি লাইসেন্স প্রদানকারী কমিটি (Licensing Committee) স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। তৃতীয়ত, প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের উন্নতি সাধনের জন্য একটি করিয়া উন্নয়ন পর্ষদ (Development Council) স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষপর্যন্ত ১৩টি উন্নয়ন পর্ষদ গঠিত হইয়াছিল।

১৯৫৩ সালে শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইনের সংশোধন করিয়া ইহার কার্যপরিধি সম্প্রসারণ করা হয়। বর্তমানে ১৬২টি শিল্প এই আইনের অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় শিল্পনীতি, ১৯৫৬ (Second Industrial Policy, 1956): ১৯৫৬ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখে প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু মূল শিল্পনীতির সংশোধন ঘোষণা করেন। ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতি ঘোষণার পর আটবৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে এবং ইহার মধ্যে নানারূপ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছে, যেমন ভারতীয় সংবিধান রচিত হইয়াছে, পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হইয়াছে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পস্থাপনে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে এবং সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের নীতি গৃহীত হইয়াছে। এই সকল পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে নূতন করিয়া শিল্পনীতি নির্ধারণের প্রয়োজন দেখা দেয়।

এই নীতির উদ্দেশ্যগুলি হইল: (১) শিল্পোন্নতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার ত্বরান্বিত করা; (২) সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করা, (৩) একচেটিয়া কারবার ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন রোধ করা, সমবায় (৪) ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করা, (৫) ভারী যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্প স্থাপন করা

এবং (৬) আয় ও সম্পদের বৈষম্য হ্রাস করা। এই শিল্পনীতির প্রধান প্রধান দিকগুলি ব্যাখ্যা করা হইল ঃ

(ক) এই শিল্পনীতিতে শিল্পগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীভুক্ত শিল্পগুলির ভবিষ্যৎ উন্নয়নের সম্পূর্ণ দায়িত্ব রাষ্ট্র গ্রহণ করিবে। এই শ্রেণীতে আছে কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত, ভারী যন্ত্রপাতি, আণবিক শক্তি, খনিজ তৈল, বিমান নির্মাণ, জাহাজ নির্মাণ, রেল পরিবহন, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বণ্টন প্রভৃতি ১৭টি শিল্প। মোটামুটি ভাবে বলা যায় প্রথম শিল্পনীতিতে যে শিল্পগুলিকে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে রাখা হইয়াছিল নূতন শিল্পনীতিতে তাহাদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত করা হয়। ভবিষ্যতে রাষ্ট্র বৃহত্তর ক্ষেত্রে শিল্পসম্প্রসারণের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ করিবে বলিয়া মূল এবং গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলিকে প্রথম শ্রেণীভুক্ত করা হয়।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে যে ১২টি শিল্পকে রাখা হইয়াছে উহাদের ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ পাশাপাশি চলিলেও ক্রমশ রাষ্ট্রের মালিকানা প্রসারিত হইবে এবং রাষ্ট্রই নূতন শিল্প গঠনে উদ্যোগী হইবে। মেসিনটুল্‌স, এ্যান্টিবায়োটিক, সার, কৃত্রিম রবার, পথপরিবহন, সামুদ্রিক পরিবহন প্রভৃতি শিল্পগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। ইহা হইল মিশ্র অর্থব্যবস্থার ক্ষেত্র—সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ পাশাপাশি থাকিয়া কাজ করিবে।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত শিল্প ছাড়া অন্য সকল শিল্পকে তৃতীয় শ্রেণীতে রাখা হইয়াছে। সাধারণতঃ এইসব শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন বেসরকারী উদ্যোগ এবং প্রচেষ্টার উপর ন্যস্ত থাকিবে। ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতিতে যে শিল্পগুলিকে চতুর্থ শ্রেণীতে রাখা হইয়াছিল এই নূতন নীতিতে তাহাদের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। দেশের দ্রুত শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজন হইলে এই ক্ষেত্রেও সরকার নূতন শিল্প গঠন করিতে পারবে। সরকার বেসরকারী উদ্যোগের অনুকূলে সঠিক ফিসক্যাল নীতি গ্রহণ করিবেন এবং বেসরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করিবেন। বেসরকারী উদ্যোগও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্যসূচীর সহিত সামঞ্জস্য রাখিবে এবং শিল্প উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ আইনের ধারাগুলি মানিয়া চলিবে।

(খ) ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতিতে জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ এই

শিল্পগুলি দ্রুত এবং ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়ত, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার ঘটিলে যে মূলধন গ্রামাঞ্চলে সঞ্চিত হইয়া আছে তাহা ব্যবহারের সুযোগ আসিবে। তৃতীয়ত, স্বল্প পরিমাণ মূলধনেই এই সকল শিল্প গড়িয়া তোলা যায়। পরিশেষে, এই শিল্পগুলি ধনবৈষম্য হ্রাস এবং জাতীয় আয়ের ন্যায্য বণ্টনে সহায়তা করিবে। সরকার শুধু কুটির এবং ক্ষুদ্র শিল্পের ভূমিকার প্রশংসা করেন নাই, উহার প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাও গ্রহণ করিয়াছেন। ক্ষুদ্রশিল্পকে বৃহৎ শিল্পের পরিপূরক হিসাবে গড়িয়া তোলার জন্য কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়।

(গ) ভারতে আঞ্চলিক শিল্পবৈষম্য দেখা যায়। কোন অঞ্চলে শিল্পের বিপুল প্রসার ঘটিয়াছে আবার কোন অংশে শিল্প অতিমাত্রায় অনগ্রসর। এই বৈষম্য দূর করিবার জন্য রাষ্ট্র অনগ্রসর অঞ্চলগুলিতে বিদ্যুৎ, পরিবহন জ্বালানি এবং জলসরবরাহ অর্থাৎ মৌল উপকাঠামো (infrastructure) গঠনের ব্যবস্থা করিবে। যে সকল অঞ্চলে ব্যাপক বেকারসমস্যা রহিয়াছে সেখানে নূতন শিল্প স্থাপন করিতে হইবে।

(ঘ) শিল্পায়নের প্রারম্ভিক পর্যায়ে সাংগঠনিক অসুবিধা, দক্ষ এবং অভিজ্ঞ পরিচালকের অভাব দেখা দিতে পারে। উপযুক্ত পরিচালক সৃষ্টি, শ্রমিকের দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়েও সরকার যাহাতে যথোচিত দৃষ্টি দেন সে সম্পর্কে এই শিল্পনীতিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বৈদেশিক মূলধন ও শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক বিষয়ে পূর্বতন শিল্পনীতির পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে।

সমালোচনা (Criticism) ঃ এই শিল্পনীতিকে উদাসীন ধনতন্ত্রের (laissez-faire capitalism) সমর্থকেরা তীব্রভাবে সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এই শিল্পনীতিতে সরকারী ক্ষেত্রকে অবাঞ্ছিতভাবে প্রসারিত করা হইয়াছে এবং বেসরকারী ক্ষেত্রকে অতিমাত্রায় সংকুচিত করা হইয়াছে। ইহা বাস্তব জ্ঞানবিবর্জিত অবাস্তব আদর্শবাদ দ্বারা প্রভাবিত। দক্ষ-পরিচালক, টেকনিসিয়ান এবং মূলধনের অভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের সুষ্ঠ পরিচালনা অসম্ভব হইবে ; আবার এই ক্ষেত্রে বেসরকারী মালিকানা উদ্যোগী হইবে না কারণ এই শিল্পনীতিতে তাহাদের সেই অধিকার খর্ব করা হইয়াছে ; ফলে দেশের দ্রুত শিল্পায়ন ব্যাহত হইবে। দ্বিতীয়ত ব্যাপক জাতীয়করণের আশংকা দেশের শিল্পপতিদের মনে ভয়, সন্দেহ এবং নিরাশার সৃষ্টি করিয়াছে ফলে

শিল্পপ্রসারের উপযুক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় নাই। তৃতীয়ত, বেসরকারী উদ্যোগের সম্পূর্ণ অধীন কোন ক্ষেত্র থাকিল না বলিয়া তাহাদের পক্ষে দক্ষতা সহকারে কাজ করা সম্ভব নয়।

কিন্তু যুক্তিগুলি কেবল মাত্র শিল্পপতিদের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া বলা হয়—সমগ্র দেশের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া নয়। রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা ছাড়া কোন অর্ধোন্নত দেশে দ্রুত শিল্পোন্নতি সম্ভব নয়। জাপানের মতো ধনতান্ত্রিক দেশেও রাষ্ট্রের সক্রিয় প্রচেষ্টায়ই দ্রুত শিল্পোন্নতি ঘটিয়াছিল। ইহা ব্যতীত, বর্তমান শিল্পনীতিতে যখন বেসরকারী শিল্পসংস্থাগুলিকে আর্থিক ও অন্য প্রকার সাহায্য দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে তখন এই ধরনের সমালোচনার বিশেষ কোন মূল্য নাই।

১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচনা হইয়াছে তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে ইহার যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব। অর্ধোন্নত দেশে সরকার যদি স্বয়ং সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া শিল্পক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া আসে তবেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হইতে পারে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করিবার জন্য নূতন বিনিয়োগের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি করিতে হইবে যাহাতে মূলধন গঠনের হার বৃদ্ধি পায়। সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটিলে বেসরকারী উদ্যোগও উৎসাহিত হইবে।

একদিকে কর্মসংস্থান ও উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠন আর অপর দিকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য লইয়া ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি রচিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যে উচ্চাকাঙ্ক্ষী কার্যসূচী গ্রহণ করা হয় তাহারই ফলশ্রুতি এই পরিমার্জিত শিল্পনীতি।

১৯৭৩ সালের সংশোধিত শিল্পনীতি (Revised Industrial Policy, 1973) : ১৯৭৩ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী যে সংশোধিত শিল্পনীতি ঘোষণা করা হয় তাহা ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি প্রস্তাবের ভিত্তিতেই করা হইয়াছে। ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি ভারতে শিল্পোন্নয়নের হারকে ত্বরান্বিত করিতে পারে নাই এবং ভারতের শিল্পক্ষেত্রে পরবর্তীকালে যে মন্দা দেখা যায় তাহা প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয় নাই। দ্বিতীয়ত, দত্ত কমিটির মতে শিল্পনীতি

ভারতের শিল্পক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারের প্রসার রোধ করিতে পারে নাই। ইহা ছাড়া, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের উপর শিল্পোন্নয়নের যে গুরু দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল তাহাও ইহা যথাযথভাবে পালন করিতে পারে নাই। এই সকল কারণের জন্য ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতির সংশোধনের দাবী উঠিতে থাকে। অবশেষে ১৯৭৩ সালে সরকার শিল্পনীতির সংশোধন করেন। এই সংশোধিত শিল্পনীতির মূল বিষয়গুলি নিম্নে বর্ণনা করা হইল :

(ক) **শিল্পনীতির উদ্দেশ্য :** ১৯৭৩ সালের শিল্পনীতিতে ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতির প্রস্তাবের মৌল আদর্শ ও উদ্দেশ্যের প্রতি সমর্থন জানান হয়। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অধিকতর নিশ্চয়তা আনয়ন করা এবং পঞ্চম পরিকল্পনার অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পগুলির অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা বর্তমান শিল্পনীতির প্রধান লক্ষ্য। ইহা ব্যতীত ভারতের অর্থব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের যে প্রসার লাভ ঘটিয়াছে তাহা ব্যাহত করাও ইহার আর একটি প্রধান লক্ষ্য।

(খ) **রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ :** এই শিল্পনীতিতে সরকারী শিল্পক্ষেত্রের সম্প্রসারণের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতিতে প্রথম শ্রেণীতে যে ১৭টি শিল্পকে রাখা হইয়াছিল সেইগুলি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের জন্য এককভাবে সংরক্ষিত থাকিবে। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, স্বনির্ভরতা অর্জন এবং জনগণের ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণের জন্য পঞ্চম পরিকল্পনায় যে সকল কার্যক্রম গৃহীত হয় তাহা বাস্তবে রূপায়ণের জন্য রাষ্ট্রকে অধিকতর দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

(গ) **বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী ও বিদেশী কোম্পানীর ক্ষেত্র :** সংশোধিত শিল্পনীতিতে যে পরিবর্তন করা হইয়াছে তাহার প্রধান উদ্দেশ্য হইল অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন রোধ করা। ১৯টি শিল্পের উল্লেখ করা হইয়াছে যেখানে বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী ও বিদেশী কোম্পানী অনুপ্রবেশ করিতে পারিবে। এই শিল্পগুলির মধ্যে আছে বাস্তব শিল্প, বয়লার ও স্টীম তৈয়ারীর কারখানা, প্রাইম মুভার, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, পরিবহন শিল্পের যন্ত্রপাতি, মোটর টায়ার, সিমেন্ট, কাগজ ইত্যাদি। অবশ্য এই শিল্পগুলির মধ্যে যেগুলি সরকারী প্রতিষ্ঠান বা ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের জন্য নির্দিষ্ট থাকিবে সেই সকল ক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্পসংস্থাকে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করিতে দেওয়া হইবে না। সাধারণতঃ এই সকল নির্দিষ্ট শিল্পক্ষেত্র ছাড়া অন্যত্র বৃহৎ শিল্পসংস্থাকে উৎপাদন করার

অনুমতি দেওয়া হইবে না। অবশ্য যে সকল ক্ষেত্রে প্রধানতঃ রপ্তানীর উদ্দেশ্যে উৎপাদন করা হইবে সেই ক্ষেত্রে বিশেষ অনুমতি দেওয়া হইবে।

(ঘ) **ক্ষুদ্রশিল্প ও সমবায়ঃ** উল্লিখিত ১৯টি শিল্পের ক্ষেত্র সমেত অন্যান্য ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসংস্থাকে উৎসাহ ও প্রেরণা দেওয়া হইবে। কোন নূতন প্রতিষ্ঠান গঠনের ক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীর অধীন সংস্থা ও বিদেশী কোম্পানীর তুলনায় ক্ষুদ্র শিল্পসংস্থাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। ইহা ছাড়া, বহুল ভোগের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের জন্য সমবায় এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে বৃহৎ শিল্পসংস্থার সহিত প্রতিযোগিতা হইতে সংরক্ষণ করার যে নীতি সরকার বর্তমানে অনুসরণ করিতেছে তাহা অব্যাহত থাকিবে।

(ঙ) **বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীর সম্পত্তিসীমাঃ** বৃহদায়তন শিল্পগোষ্ঠীর উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হইয়াছে। এতদিন পর্যন্ত যে সকল শিল্পসংস্থার সম্পত্তির মূল্য ৩৫ কোটি টাকা ছিল তাহারাই বৃহত্তর শিল্পসংস্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল ; এই সংশোধিত নীতিতে সম্পত্তি সীমা হ্রাস করিয়া ২০ কোটি টাকা করা হয় ; ইহার দরুন বৃহদায়তন শিল্পগোষ্ঠীর তালিকায় আরও ২৫টি শিল্পগোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত হইল।

(চ) **শিল্প লাইসেন্স নীতিঃ** এই শিল্পনীতিতে ১৯৮০ সালের শিল্প-লাইসেন্স নীতির পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি লগ্নীকারীদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য পূর্ব নীতি বহাল রাখা হইয়াছে। এক কোটি টাকা পর্যন্ত লগ্নীর ব্যাপারে ক্ষুদ্রায়তন ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারের নিকট হইতে কোন লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে না।

(ছ) **যৌথক্ষেত্র** (Joint sector) **:** নূতন শিল্পনীতিতে যৌথ-উদ্যোগের ধারণাটিকে আরও সুস্পষ্ট করা হইয়াছে। ১৯৫৬ সালের প্রস্তাবের ভিত্তিতেই যৌথক্ষেত্রের ধারণাটি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই ক্ষেত্রটি সম্প্রসারণের মূল উদ্দেশ্য হইল যে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন রোধ করা। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার বেসরকারী শিল্পপতিদের সঙ্গে শিল্পক্ষেত্রে ইকুইটি মূলধনে অংশগ্রহণ করিবে। একই শিল্পপ্রতিষ্ঠানে সরকারী ও বেসরকারী মূলধন বিনিয়োগ করার দরুন যৌথ-উদ্যোগের ক্ষেত্র গড়িয়া উঠিবে। এই ধরনের যৌথ-উদ্যোগে গঠিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের নীতি নির্ধারণ, কর্তৃত্ব ও পরিচালনার ব্যাপারে সরকারের ক্ষমতাই অধিক হইবে। অর্থনীতির দ্রুত ও সুষম

উন্নয়নের জন্য সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্র ছাড়াও প্রয়োজন যৌথ ক্ষেত্রের। পরিকল্পনার লক্ষ্যে পৌঁছাইবার জন্য যে সকল ক্ষেত্রে যৌথ-উদ্যোগের প্রয়োজন দেখা দিবে সেই সকল ক্ষেত্রেই সরকার ইহার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিবেন। প্রকৃতপক্ষে যৌথ ক্ষেত্র হইবে উন্নয়নের একটি হাতিয়ার।

১৯৭৩ সালের শিল্পনীতি সম্পূর্ণরূপে নূতন কোন নীতি নয়, ইহা ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতির সম্প্রসারণ মাত্র। বিভিন্ন মহল হইতে এই নীতিকে বাস্তবধর্মী, সময়োপযোগী এবং উন্নয়নমুখী বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রশিল্প ও বেসরকারী উদ্যোগের যে অনিশ্চয়তা ছিল তাহা দূর করা হইয়াছে এবং সরকার আশা করেন যে সকল শ্রেণী দেশের স্বয়ংনির্ভরশীল সম্প্রসারণের জন্য কাজ করিবে। পঞ্চম পরিকল্পনায় যে সকল শিল্পকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে তাহার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া ১৯৭৩ সালের শিল্পনীতি রচনা করা হয়। সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা হইলেও বেসরকারী উদ্যোগের জন্য যথেষ্ট ক্ষেত্র খোলা রাখা হইয়াছে।

১৯৭৭ সালের নূতন শিল্পনীতি (New Industrial Policy, 1977): ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি প্রস্তাব দীর্ঘ ২০ বৎসর অনুসৃত হয় কিন্তু ইহার দ্বারা আমাদের কোন উদ্দেশ্যই ঠিকভাবে পূরণ হয় নাই। এই নীতি আমাদের দেশে দ্রুত শিল্পায়ন ঘটাইতে পারে নাই। ১৯৬৭ সাল হইতে ১৯৭৭ সালের মধ্যে (১৯৭৬ সাল বাদ) কোন বৎসরই শিল্পোৎপাদন বৎসরে ৩—৪ শতাংশের বেশী হয় নাই। এই সময়ে একটার পর একটা শিল্পসংস্থা রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছে কতকগুলি বড় বড় শিল্প বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, শিল্পের উৎপাদনব্যয় ও দামের মধ্যে সমতা বিনষ্ট হইয়াছে এবং শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ অতি ধীর-গতিতে হইয়াছে। শিল্পক্ষেত্রে এই সকল অসুবিধা দূর করিয়া শিল্পোন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৭৭ সালের ২৩শে ডিসেম্বর তৎকালীন জনতা সরকারের শিল্পমন্ত্রী জর্জ ফার্নাণ্ডেজ নূতন শিল্পনীতি ঘোষণা করেন।

এই নূতন শিল্পনীতির উদ্দেশ্যগুলি হইল: (১) জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ৩·৫ শতাংশ হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৭ শতাংশ করিতে হইবে; (২) দ্রুতহারে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে; (৩) ব্যাপক হারে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করিতে হইবে; (৪) আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস করিতে হইবে এবং (৫) অর্থনৈতিক ক্ষমতার একচেটিয়ামূলক কেন্দ্রীভবন রোধ করতে হইবে।

নূতন শিল্পনীতিতে ধনতন্ত্র এবং সাম্যবাদ উভয়কেই যুগপৎ বর্জন করা হইয়াছে। চরণ সিং মনে করেন যে ১৯৫৬ সালে ভারত পাশ্চাত্য দেশের উপযোগী কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা মডেল গ্রহণ করিয়া মারাত্মক ভুল করিয়াছে। দেশের জনগণের প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিকেন্দ্রীভূত গ্রামমুখী নূতন শিল্পনীতি গ্রহণ করিতে হইবে। গ্রামকেন্দ্রিক ভারতে নগরকেন্দ্রিক পরিকল্পনার ব্যর্থতা অনিবার্য। গ্রামগুলিকে এরূপভাবে উন্নয়নকেন্দ্রে রূপান্তরিত করিতে হইবে যাহাতে লোক শহর হইতে গ্রামের দিকে ছুটিতে আরম্ভ করিবে।

নূতন শিল্পনীতি গান্ধীবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া গ্রামাঞ্চলে ও ছোট ছোট শহরে ছড়িয়ে থাকা কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের বিকাশসাধন করাই হইল নূতন শিল্পনীতির প্রধান কাজ। এ যাবৎ শিল্পনীতিতে মূলতঃ বৃহৎ শিল্পের উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে, ফলে ক্ষুদ্র শিল্প সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইয়াছে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন ছিল জনতা সরকারের বিঘোষিত নীতি। নূতন শিল্পনীতির বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করা হইল।

(ক) ক্ষুদ্র শিল্প : গ্রাম ও ছোট ছোট শহরে ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। নূতন শিল্পনীতিতে অনগ্রসর এলাকা এবং ক্ষুদ্র শিল্পের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের উন্নয়নের জন্য জেলাসদর কার্যালয়গুলিতে কেন্দ্র স্থাপন এবং বড় শহরের আশেপাশে নূতন শিল্পসংস্থা স্থাপন নিষিদ্ধ করা হইবে। ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য সংরক্ষিত বিষয়ের সংখ্যা ১৮০ হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৫০০ করা হইবে। কুটির শিল্পের স্বার্থরক্ষার জন্য বিশেষ আইন প্রণয়ন করা হইবে।

(খ) অতিক্ষুদ্র শিল্প (Tiny sector): যেসব ক্ষুদ্র শিল্পে মূলধনী বিনিয়োগ এক লক্ষ টাকার অধিক নয় সেগুলি অতিক্ষুদ্র শিল্প হিসাবে বিবেচিত হইবে। প্রতি জেলায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য জেলা শিল্পকেন্দ্র (District Industrial Centre) থাকিবে। ক্ষুদ্রশিল্প উদ্যোক্তার প্রয়োজনীয় সবকিছুই এই কেন্দ্র হইতে পাওয়া যাইবে।

(গ) খাদি ও গ্রামশিল্পের উন্নয়ন : খাদি কার্যসূচী উন্নয়নের জন্য সরকার সর্বাধিক আর্থিক বিপণন সাহায্য প্রদানের আশ্বাস দিয়াছেন। "নই খাদির" বৃহৎ কার্যসূচী রূপায়ণের জন্য খাদি ও গ্রামীন শিল্প আইনের সংশোধন করা হইবে। জনগণের বস্ত্রের প্রয়োজন মিটাইবে খাদি এবং

হস্তচালিত তাঁত। তাঁত শিল্প বহু লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিবে। মিলজাত দ্রব্য যাহাতে হস্তচালিত তাঁত শিল্পদ্রব্যের সহিত অন্যায় প্রতিযোগিতা না করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইবে।

(ঘ) বৃহদায়তন শিল্প: যে সব বড় শিল্প কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পের সহায়ক তাহাদের সম্প্রসারণ করা হইবে। ইহার মধ্যে আছে মূল শিল্প যাহারা ক্ষুদ্র শিল্পের মৌলবিন্যাস গঠনের সহায়ক, যেমন ইস্পাত, সিমেন্ট, তৈল শোধনাগার ইত্যাদি। মূলধনী শিল্প যাহারা ছোট ছোট শিল্পকে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে বলিয়া উহাদের সম্প্রসারণ দরকার। সার এবং কীটনাশক ঔষধপত্র ইত্যাদি কৃষিসংক্রান্ত শিল্পও সম্প্রসারিত করা হইবে। ইহা ব্যতীত, যে সব শিল্প দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন তাহাদের উন্নতি করা হইবে যেমন মেশিনটুল, রাসায়নিক শিল্প ইত্যাদি।

(ঙ) বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান: তদানীন্তন শিল্পমন্ত্রী জর্জ ফার্নাণ্ডেজ বলেন, যাহাতে কোন ব্যবসায়ী গোষ্ঠী একচেটিয়া অধিকার লাভ করিতে না পারে তাহা লক্ষ্য রাখা হইবে। অতীত অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীর শ্রীবৃদ্ধি তাহাদের সৃষ্ট সম্পদের তুলনায় অতিরিক্ত হইয়াছে এবং সরকারী অর্থসরবরাহ সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া এই শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। এখন হইতে বৃহৎ ব্যবসায় গোষ্ঠীকে নূতন অথবা সম্প্রসারিত প্রকল্পগুলিতে অর্থলগ্নীর জন্য নিজেদের উদ্বৃত্ত অভ্যন্তরীণ সম্পদের উপর নির্ভর করিতে হইবে। বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণ লাইসেন্স নীতি এবং একচেটিয়া ও সংকোচনমূলক আইন (MRTP Act) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(চ) সরকারী ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা হইবে; সরকারী ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করিয়া বেসরকারী শিল্পগোষ্ঠীর অবাঞ্ছিত প্রাধান্য ব্যাহত করিতে হইবে; সরকারী ক্ষেত্র মূল প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন করিবে।

(ছ) বৈদেশিক বিনিয়োগ: বিদেশী কোম্পানীগুলির ক্ষেত্রে বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ আইন (FERA) কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হইবে। বিদেশী অধিকৃত শেয়ারের অনুপাত হ্রাস করিয়া ৪০ শতাংশ করা হইবে। যে সকল ক্ষেত্রে বৈদেশিক কারিগরি-জ্ঞানের কোন প্রয়োজন নাই সেই সব ক্ষেত্রে উৎপাদনরত বৈদেশিক কোম্পানীগুলির কার্যাবলী পরিবর্তন করিতে হইবে।

(জ) শিল্পের অবস্থান: বড় বড় শহরে নূতন কোন শিল্পসংস্থা স্থাপনের জন্য কোন লাইসেন্স প্রদান করা হইবে না। শিল্পসংস্থা বড় শহর

হইতে অনুন্নত অঞ্চলে স্থানান্তরিত হইলে তাহারা সরকারী সাহায্য পাইবে।

(ঝ) রুগ্ন শিল্পসংস্থা : ভবিষ্যতে যে কোন শিল্পসংস্থা রুগ্ন হইয়া পড়িলেই সরকার তাহার পরিচালনভার গ্রহণ করিবেন না। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিল্পটি পুনরুজ্জীবিত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তবেই তাহা গ্রহণ করা হইবে। সরকার একটি "শ্রমিক ক্ষেত্র" গড়িয়া তুলিতে আগ্রহী যাহা রুগ্ন শিল্পগুলির পরিচালনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিবে।

জনতা সরকারের শিল্পনীতি প্রকৃতপক্ষে নূতন কোন শিল্পনীতি নয়। ইহাতে কোন মৌলিক পরিবর্তন না থাকিলেও ক্ষুদ্রশিল্পের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে এবং বৃহদায়তন শিল্পের সম্প্রসারণ ব্যাহত করা হইয়াছে। কিন্তু কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের উৎপাদনকৌশল অনুন্নত বলিয়া উহাদের সাহায্যে এমন কোন উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করা সম্ভব হইবে না যাহার সাহায্যে শিল্পোন্নয়নের গতিবেগ ত্বরান্বিত করা সম্ভব হইবে।

১৯৮০ সালে কংগ্রেস (ই) শিল্পনীতি (Industrial Policy of the Congress (I) Government in 1980) : ১৯৮০ সালের ২৩শে জুলাই শিল্পমন্ত্রী শ্রীচরণজিৎ চানানা লোকসভায় নূতন শিল্পনীতি ঘোষণা করেন। ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতির ভিত্তিভূমিতে বর্তমান শিল্পনীতি নির্ধারণ করা হইয়াছে। শিল্পে উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার, ভগ্নপ্রায় উপকাঠামোর পুনর্গঠন, ক্ষুদ্র শিল্পের পরিধি বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবহার প্রবর্তন আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস, সরকারী সংস্থাগুলিকে মুনাফামুখী করিয়া তোলা, অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, রপ্তানি শিল্পকে অগ্রাধিকার প্রদান—এইগুলি হইল নূতন শিল্পনীতির বৈশিষ্ট্য।

বিনিয়োগের পরিমাণ এবং শিল্পসংক্রান্ত কার্যকলাপের দিক হইতে বিবেচনায় সরকারী ক্ষেত্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উদ্বৃত্ত সৃষ্টি (generation of surplus) এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এই ক্ষেত্রকে সুদৃঢ় করিতে হইবে। সরকারী শিল্পগুলির দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অভিযান চালাইতে হইবে। প্রত্যেকটি সরকারী সংস্থাকে আলাদা আলাদা ভাবে পরীক্ষা করিতে হইবে এবং সময়-সীমানির্দিষ্ট কার্যসূচী গ্রহণ করিতে হইবে। সরকারী শিল্পগুলি ঠিকভাবে পরিচালিত না হইবার একটি প্রধান কারণ হইল দক্ষ ম্যানেজারের অভাব; দক্ষ ম্যানেজারশ্রেণী গড়িয়া তুলিতে হইবে।

এই শিল্পনীতিতে বলা হইয়াছে এরূপ এক স্বয়ংনির্ভরশীল, সচল এবং আধুনিক অর্থব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে যেখানে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রের ভূমিকা থাকিবে। জাতীয় পরিকল্পনার নীতি ও লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া বে-সরকারী উদ্যোগকে উৎসাহিত করিতে হইবে; সেইসঙ্গে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন একচেটিয়া প্রবণতা এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন বৃদ্ধি না পায়।

অর্থনৈতিক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা (economic federalism) গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে প্রতিটি অনগ্রসর জেলায় কয়েকটি কেন্দ্রীয় শিল্পসংস্থা গঠন করা হইবে। কেন্দ্রীয় শিল্পগুলি সহায়ক শিল্পগুলিকে উপকরণ যোগান দিবে এবং উহাদের পণ্যসামগ্রী বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবে।

এই শিল্পনীতিতে ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করিবার উদ্দেশ্যে সরকার স্থির করিয়াছে অতি ক্ষুদ্রশিল্পের (tiny units) বিনিয়োগ-সীমা এক লক্ষ টাকা হইতে বৃদ্ধি করিয়া ২ লক্ষ টাকা করা হইবে; (২) ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে বিনিয়োগসীমা ১০ লক্ষ টাকা হইতে বৃদ্ধি করিয়া ২০ লক্ষ টাকা করা হইবে, (৩) সহায়ক শিল্পের ক্ষেত্রে বিনিয়োগসীমা ১৫ লক্ষ টাকা হইতে বৃদ্ধি করিয়া ২৫ লক্ষ টাকা করা হইবে।

বিকেন্দ্রীভূত ক্ষেত্রে যে সকল শিল্পসংস্থা গড়িয়া উঠিতেছে তাহারা যাহাতে ঠিক সময়ে ঠিক পরিমাণ ঋণ পায় সেই ব্যবস্থা করা হইবে। ক্ষুদ্র শিল্পকে সাহায্য দিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় উপকরণগুলির এক মজুত ভাণ্ডার (buffer stock) গড়িয়া তোলা হইবে। যে সকল রাজ্য মাত্র কয়েকটি কাঁচামালের উপর নির্ভর করে তাহারা ওই সকল দ্রব্যের যোগানের জন্য অগ্রাধিকার পাইবে।

বিকেন্দ্রীভূত ক্ষেত্র হইতে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী সরকারের নিকট হইতে বিক্রয়ের জন্য সমর্থন পাইবে এবং ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপাদনের জন্য ক্ষেত্র সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা আছে তাহা অব্যাহত থাকিবে।

গ্রামাঞ্চলে শিল্প স্থাপন করিতে হইবে। হস্তচালিত তাঁত, খাদি, কারুশিল্প এবং অন্যান্য গ্রামশিল্পগুলি অধিকতর সুযোগ পাইবে। আঞ্চলিক অসমতা দূর করিবার জন্য শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ করা হইবে এবং অনগ্রসর এলাকায় শিল্প স্থাপনে উৎসাহ প্রদান করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হইবে। শিল্পে যে প্রণোদনা (incentives) দেওয়া হইবে তাহা উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত থাকিবে; নিয়মিতভাবে কিছু সময় পর পর উহার মূল্যায়ন করা হইবে।

শিল্পোন্নয়নের নূতন উদ্দেশ্য হইবে সামাজিক উন্নতি অর্থাৎ উহা অধিক কর্মসংস্থান এবং উৎপাদনমুখী হইবে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব স্থানীয় জনশক্তি এবং কাঁচামাল ব্যবহার করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে সরকার বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহ দেবে এবং সহায়ক শিল্প গড়িয়া তুলিবার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিবে।

১৯৭৫ সালে সরকার ১৫টি শিল্পের ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় সম্প্রসারণের (automatic growth) অনুমতি দান করিয়াছিল। এই শিল্পগুলির উৎপাদন ক্ষমতা বছরে ৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাইবে। এখন হইতে সকল মূল শিল্প এই সুবিধা পাইবে। সম্পূর্ণরূপে রপ্তানীমুখী শিল্পগুলি এবং রপ্তানীর উদ্দেশ্যে চালু শিল্পগুলির সম্প্রসারণের অনুরোধ সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হইবে। বহরজনিত ব্যয়সংকোচনের ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উন্নত প্রযুক্তিজ্ঞানের সমর্থন করা হইবে; প্রযুক্তিজ্ঞানকে সর্বদা সর্বাধুনিক পর্যায়ে রাখিয়া দুষ্প্রাপ্য সম্পদের কাম্য ব্যবহার করিবার জন্য ভারতীয় শিল্পগুলিকে গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট সম্পদ বিনিয়োগ করিতে হইবে।

প্রত্যেকটি শিল্পের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করিয়া শিল্পের আধুনিকী-করণের প্যাকেজ (modernization packages) কার্যসূচী তৈয়ারী করা হইবে। উপযুক্ত স্থান নির্বাচন, বিদ্যুতের কাম্য ব্যবহার, এবং ব্যয়সংকোচের জন্য সঠিক প্রযুক্তিজ্ঞান ও বহর গ্রহণ ইহার অন্তর্গত। বস্ত্রশিল্পে চিরাচরিত ব্যবস্থার পরিবর্তে নূতন ব্যবস্থা ও প্রযুক্তিবিদ্যা গ্রহণ করিতে হইবে। বিকেন্দ্রীভূত ক্ষেত্রের জন্য বিক্রয়ের সুব্যবস্থা এবং ঋণদানের সুবিধা সুদৃঢ় করিতে হইবে।

মূল্যায়ন (Evaluation) : নূতন শিল্পনীতির উদ্দেশ্য হইল উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা, আঞ্চলিক অসমতা দূর করা এবং রপ্তানীমুখী শিল্পের দ্রুত প্রসার করা। বিগত তিন দশকে এগুলি আমাদের পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হওয়া সত্ত্বেও অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয় নাই। জনতা সরকার এই ত্রুটিগুলি সংশোধন করিবার জন্য এক প্রয়োগমুখী (pragmatic) কার্যসূচী গ্রহণ করে। ইহাতে স্বল্পকালীন কার্যসূচীর উপর অধিক জোর দেওয়া হয়। নূতন প্রয়োগমুখী শিল্পনীতির লক্ষ্য হইল নূতন করিয়া ক্ষুদ্রশিল্পের সংজ্ঞা প্রদান করা, শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে অন্তরায় দূর করা এবং উৎপাদন ক্ষমতার স্বয়ংক্রিয় সম্প্রসারণ অনুমোদন করা।

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পের মধ্যে যে কৃত্রিম শ্রেণীবিভাগ ছিল তাহা এই নীতিতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বর্তমানে দেশে জাতীয় আয়ের ২২-২৩ শতাংশ সঞ্চয় হওয়া সত্ত্বেও উন্নয়ন হার মাত্র ৩ হইতে ৩·৫ শতাংশ হারে হইয়াছে। ইহা হইতে এটাই বোঝা যাচ্ছে যে মূলধন-উৎপাদন অনুপাত অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। মনে করা লইতেছে যে ইহা ৬ এবং মূল্যধন-প্রগাঢ় উৎপাদন-পদ্ধতি গ্রহণ করার জন্য ইহা হইয়াছে। বর্তমান শিল্পনীতির একটি উদ্দেশ্য হইল বিনিয়োগ প্রকৃতির এরূপ পরিবর্তন করা যাহাতে মূলধন-উৎপাদন কম হয় কারণ তাহা হইলে উন্নয়নহার বৃদ্ধি পাইবে।

পরিশেষে, কোনরকম যুক্তি না দেখাইয়া সরকার জেলা শিল্পকেন্দ্রগুলি [DIC] তুলিয়া দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। ইহা একটি ভালো প্রকল্প ছিল। যেহেতু ইহা পূর্ববর্তী জনতা সরকার প্রবর্তন করিয়াছিল সেই যুক্তিতে ইহার উচ্ছেদ সমর্থনযোগ্য নয়; নূতন শিল্পনীতির ইহা একটি বড় ত্রুটি।

ভারতে সরকারী শিল্প-উদ্যোগের ভূমিকা (Role of Public Sector in India): অর্ধোন্নত দেশের শিল্পোন্নয়নে রাষ্ট্র নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা লইতে পারে না। রাষ্ট্র প্রয়োজন মত বেসরকারী শিল্পগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিবে উহাই যথেষ্ট নয়, উহা স্বয়ং শিল্পক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদান করিবে, শিল্প-কাঠামোর ফাঁকগুলি পূরণ করিবে এবং শিল্পগঠনে অগ্রণী হইবে। ভারতের ন্যায় দেশের মিশ্র অর্থব্যবস্থায় সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কারণ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের উদ্যোগের উপরই অর্থনীতির সম্প্রসারণ এবং সংহতি সাধনের দায়িত্ব বিশেষভাবে ন্যস্ত রহিয়াছে।

ভারতে সরকারী শিল্প-উদ্যোগ স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগের ঘটনা। ১৯৪৭ সালের পূর্বে ভারতীয় অর্থব্যবস্থায় সরকারী ক্ষেত্র বলিতে যাহা বুঝায় তাহার অস্তিত্ব ছিল না বলিলেই চলে। রেলপথ, ডাক ও তারবিভাগ, অস্ত্র নির্মাণ কারখানা, লবণ কারখানা, কুইনাইন কারখানা ইত্যাদি কয়েকটি অত্যাবশ্যকীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে পরিচালিত হইত। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে সরকার রাষ্ট্রীয় শিল্প-উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারে নাই; সরকার শিল্পক্ষেত্রে উদাসীন স্বাতন্ত্র্যনীতি (apathetic laissez-faire) অনুসরণ করিতেন। ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতিতে সুস্পষ্টভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ভূমিকা

স্বীকার করা হয়। বর্তমানে খনি, কারখানা, পরিবহন, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বণ্টন, অর্থ সরবরাহ, ব্যাংক, বীমা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ সম্প্রসারিত হইতেছে।

সরকারী ক্ষেত্র হইতে যে পরিমাণ আয় পাওয়া যায় তাহা এখনো মোট জাতীয় আয়ের সামান্য অংশ। কিন্তু সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ সরকারী ক্ষেত্র হইতে উদ্ভূত আয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৬০-৬১ সালে সরকারী ক্ষেত্র হইতে মোট জাতীয় আয়ের ৭·৪ শতাংশ পাওয়া যাইত, ১৯৭৬-৭৭ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া জাতীয় আয়ের ১৮·৯ শতাংশ হয়। ১৯৭৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ১৪৫ এবং মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১১,০৯৬·৯৭ কোটি টাকা।

ভারত যখন স্বাধীনতা লাভ করে সেই সময় দেশে কতকগুলি মূল শিল্পের অভাব ছিল যাহার দরুন দেশের শিল্পসম্প্রসারণ ব্যাহত হইতেছিল। এই সকল শিল্পের মধ্যে আছে পেট্রোলিয়াম, রাসায়নিক শিল্প, ভারী যন্ত্রপাতি, মেশিন টুল ইত্যাদি। আবার ইস্পাতের উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম ছিল। শিল্পক্ষেত্রের এই অভাবপূরণের উদ্দেশ্যে সরকারী উদ্যোগে শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়। সীমাবদ্ধ সহায়সম্বল লইয়া বেসরকারী উদ্যোগের পক্ষে এই ধরনের শিল্প স্থাপন করা সম্ভব ছিল না।

ইহা ব্যতীত মূল শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া বহু ক্ষুদ্র ও সহায়ক শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। সরকারী উদ্যোগে গঠিত ইস্পাত শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া যে সব ইস্পাত নগরী গড়িয়া উঠিয়াছে কালক্রমে তাহারা জামসেদপুরের মতো সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। দ্বিতীয়ত, রপ্তানী সম্প্রসারণে সরকারী উদ্যোগের এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রহিয়াছে। তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় গুদামঘর কর্পোরেশন, জাতীয় বীজ কর্পোরেশন, জাতীয় ক্ষুদ্রশিল্প কর্পোরেশন প্রভৃতি সমবায় ও ক্ষুদ্রশিল্পগুলিকে সাহায্য দিবার জন্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চতুর্থত, সরকারী শিল্পগুলি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত থাকিয়া বেসরকারী শিল্পপতিদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। পেট্রোলিয়াম, রাসায়নিক শিল্প, ঔষধ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে সরকারী উদ্যোগের অনুপ্রবেশ সংশ্লিষ্ট পণ্যের দামের ঊর্ধ্বগতি রোধ করিয়াছে।

সরকারী শিল্প-উদ্যোগ সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা (Need for the Expansion of the Public Sector): বিকাশমান অর্থনীতিতে

সরকারী উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দ্বিমত নাই। রাষ্ট্রীয় সহায়তায় দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কতো দ্রুত হইতে পারে তাহার ক্লাসিক দৃষ্টান্ত হইল জাপান। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তার যুক্তিগুলি নিম্নে বর্ণনা করা হইল :

প্রথমত, যে হারে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনা করা হইয়াছে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ব্যতীত তাহার বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব নয়। পরিকল্পিত শিল্পোন্নয়নের বিরাট কার্যসূচীকে বাস্তবে রূপদানের মতো সহায়সম্বল অথবা ইচ্ছা কোনটাই বেসরকারী উদ্যোগের নাই। দ্রুত লাভের সম্ভাবনা না থাকায় বেসরকারী উদ্যোগে ভারী শিল্প গড়িয়া ওঠে নাই। বেসরকারী মালিকানায় যথেষ্ট মূলধন না থাকায় মূলধন-প্রগাঢ় শিল্প উৎসাহিত হয় না। শিল্প-ব্যবস্থার এই ফাঁকগুলি পূরণ করার জন্য সরকারী উদ্যোগ সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, পরিকল্পনার কাজ হইল অগ্রাধিকার বিবেচনা করিয়া অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা। কিন্তু ব্যক্তিগত উদ্যোগের মূল লক্ষ্য মুনাফা অর্জন বলিয়া উহার পক্ষে সামাজিক কল্যাণের কথা বিবেচনা করিয়া মুনাফার আশাহীন ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের পক্ষেই শুধু অগ্রাধিকার বিবেচনা করিয়া অগ্রসর হওয়া সম্ভব।

তৃতীয়ত, আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস করিয়া অর্থনীতির সুষম উন্নয়নের জন্য সরকারী উদ্যোগের সম্প্রসারণ প্রয়োজন। সরকার দেশের অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর অঞ্চলে শিল্প স্থাপন করিয়া আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস করিতে সচেষ্ট হইবে। দুর্গাপুর, রুরকেল্লা, ভিলাই ও বোকারো ইস্পাত কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্য হইল পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের উন্নয়ন সাধন।

চতুর্থত, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের উদ্দেশ্য ঘোষণা করা হইয়াছে। এই ধরনের সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলি হইল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা, ন্যায্য বণ্টন, ধনবৈষম্য হ্রাস, অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন রোধ এবং সমাজকল্যাণের বৃদ্ধি সাধন ; সরকারী উদ্যোগ সম্পদ ও আয়বৈষম্য হ্রাস করিয়া সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠন করিবে।

পঞ্চমত, ব্যক্তিগত উদ্যোগের প্রেরণার উৎস এবং চালকশক্তি হইল মুনাফা। যে ধরনের শিল্পে মুনাফার আশু প্রত্যাশা নাই বা উহা সর্বাধিক নয়, সে শিল্প দেশের উন্নয়নের জন্য যত প্রয়োজনীয় হউক না কেন, বেসরকারী উদ্যোগ উহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে না। এই ধরনের শিল্প শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় উদ্যোগেই গড়িয়া উঠিতে পারে।

ষষ্ঠত, ভারতের মিশ্র অর্থব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইয়াছে অর্থাৎ এখানে সরকারী ও বেসরকারীউদ্যোগ পাশাপাশি চালু থাকিবে। সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের কথা মনে রাখিয়া বেসরকারী উদ্যোগকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। সরকারী শিল্প-সংস্থাগুলি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত থাকিয়া বেসরকারী শিল্পপতিদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। বিভিন্ন বেসবকাবী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অপচয়মূলক প্রতিযোগিতা বন্ধ করার জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের সম্প্রসারণ প্রয়োজন।

সপ্তমত, ভারত আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে জোট নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করায় ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। সমাজতান্ত্রিক দেশের সকল অর্থনৈতিক কাজকারবার তাহাদের সরকারের মাধ্যমে হয় বলিয়া রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ভিত্তিতে সম্পর্ক স্থাপন করাই সুবিধাজনক। বাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন গঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য হইল সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিব সহিত বাণিজ্য সম্প্রসারণ করা।

পরিশেষে, বাষ্ট্রীয় কারবার শিল্পের উপকাঠামো (infrastructure) গঠনে এক বিশেষ ভূমিকা নেয় বলিয়া উহার দরুণ বেসবকাবী শিল্পও উৎসাহিত ও সম্প্রসারিত হয়; রাষ্ট্রায়ত্ত রেলপথ ও ওয়াগন নির্মাণ বৃদ্ধি পাইলে, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বণ্টন সম্প্রসাবিত হইলে, ডক ও জাহাজ নির্মাণ শিল্প সম্প্রসারিত হইলে, কয়লা ও ইস্পাতের উৎপাদন বাড়িলে ছোট বড নানা ধরনের বেসরকারী শিল্পের উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়।

রাষ্ট্রীয় কারবারের পরিচালনা (Management of State Enterprises): ভারতীয় শিল্পনীতিতে মিশ্র অর্থব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির প্রকৃতি ও সাংগঠনিক বিভিন্নতার দরুন উহাদের পরিচালনাও বিভিন্ন ধরনের হইয়া থাকে। এদেশে রাষ্ট্রীয় কারবারসমূহ প্রধানতঃ নিম্নলিখিত তিনটি পদ্ধতিতে পরিচালিত হইয়া থাকে।

১। **বিভাগীয় পরিচালনা** (Departmental Management): বিভাগীয় পরিচালনা ব্যবস্থা হইল রাষ্ট্রীয় কারবার পরিচালনার প্রাচীনতম রূপ। কোন সবকারী দপ্তব বা বিভাগের অধীনে প্রত্যক্ষভাবে কোন কারবার পরিচালিত হইলে সরকার ও কারবারটিকে আলাদা করিয়া দেখা হয় না অর্থাৎ ইহার আইনগত কোন পৃথক সত্তা থাকে না। সরকারী কোষাগার

হইতে কারবারের ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ প্রেরিত হয় এবং কারবারের যাহা আয় হয় তাহা সরকারী কোষাগারেই জমা পড়ে। এই ধরনের কারবার পরিচালনায় নিযুক্ত সব কর্মীই সরকারী কর্মচারী হিসাবে গণ্য হয়। দোষ-ক্রটির জন্য পার্লামেণ্টে জবাবদিহি করিতে হয়। সাধারণতঃ একজন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর অধীনে ইহা পরিচালিত হয়। ডাক ও তার বিভাগ, রেল পরিবহন, অস্ত্র নির্মাণ কারখানা, অলইণ্ডিয়া রেডিও, চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানা প্রভৃতি ৪৫টি বিভাগীয় প্রতিষ্ঠান আছে।

বিভাগীয় পরিচালনার সুবিধাগুলি এইরূপ: (১) এই ব্যবস্থায় সরকারের সর্বাধিক প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ থাকে; কিছু কিছু শিল্পবাণিজ্য আছে যেখানে সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ থাকা দেশের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে প্রয়োজন যেমন অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ, আণবিক শক্তি উৎপাদন ইত্যাদি। (২) পরিচালনা ভার দায়িত্বশীল উচ্চপদস্থ কর্মচারীর উপর ন্যস্ত থাকে বলিয়া সর্বাধিক পরিমাণ গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব হয়। (৩) এই ব্যবস্থায় গণ কৈফিয়তের (Public Accountability) উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় অর্থাৎ কারবারের সামাজিক দিকটার প্রতি সর্তক দৃষ্টি রাখা হয়; পার্লামেণ্টে প্রশ্ন উত্থাপন করে ইহার দোষক্রটির সমালোচনা করা হয়। (৪) জাতীয় নিরাপত্তার দিক হইতে বিবেচনায় এই ধরনের পরিচালনা বাঞ্ছনীয়। রেলপথ, অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ, আণবিক শক্তি প্রভৃতি শিল্পে এই ধরনের পরিচালনা বাঞ্ছনীয় কারণ ইহাতে জাতীয় নিরাপত্তা সংরক্ষিত হয়।

বিভাগীয় পরিচালনার অসুবিধাগুলি এইরূপ: (১) বিভাগীয় ব্যবস্থাপনা আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় বলিয়া লাল ফিতার দৌরাত্ম্যে কাজে দীর্ঘসূত্রতা দেখা দেয়; এইরূপ পরিচালনায় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। (২) সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা কারখানা রুটিনমাফিক পরিচালিত হয়; ব্যক্তিগত মুনাফায় কোন প্রশ্ন থাকে না বলিয়া উদ্যোগ ও তৎপরতার বিশেষ অভাব দেখা যায়। (৩, দায়িত্বের অবস্থান নির্ধারণ করা কঠিন হয় তাই দোষক্রটির জন্য দায়ী ব্যক্তিকে খুঁজিয়া বাহির করা শক্ত; (৪) বাজারের অবস্থা অনুসারে কারবারের নীতি ও কর্মধারায় দ্রুত প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা কঠিন হয়; অনমনীয় মনোভাব এবং রক্ষণশীলতা শিল্পবাণিজ্যে সাফল্যের অন্তরায়। (৫) প্রতিযোগিতামূলক শিল্পবাণিজ্যের অনুপোযোগী বলিয়া এই ধরনের কারবার পরিচালনায় দক্ষতার বিশেষ অভাব দেখা দেয় যার

দরুন প্রায়ই লোকসান হয়। (৬) কারবারের দৈনন্দিন পরিচালনা কার্যে ঘন ঘন সরকারী হস্তক্ষেপ এই ধরনের কারবারের একটি বিশেষ ত্রুটি। (৮) ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের পরিবর্তনের সঙ্গে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও অনুসৃত নীতির পরিবর্তন ঘটে; দীর্ঘকাল ধরিয়া নীতি ও কর্মপন্থার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা কঠিন হয়।

২। **পাবলিক বা বিধিবদ্ধ কর্পোরেশন** (Statutory or Public Corporation): সরকারী কর্পোরেশনগুলি পার্লামেন্টের বিশেষ আইন দ্বারা গঠিত হয় এবং পৃথক আইনগত সত্তা হিসাবে ইহাদের স্বাতন্ত্র্য থাকিলেও পরিচালনার জন্য ইহারা সরকারের নিকট দায়ী থাকে। যে আইন দ্বারা কারবার গঠিত হয় তাহাতেই কোম্পানীর উদ্দেশ্য, নীতি ও কার্যক্ষেত্র বর্ণিত থাকে। এই কর্পোরেশনগুলির সংগঠন যৌথ মূলধনী কারবারের ন্যায় কিন্তু যৌথ মূলধনী কারবারের মতো এদের কোন Articles থাকে না। কারবারটি স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য হয় এবং ইহাদের পরিচালনা ভার সরকার মনোনীত একটি পরিচালকমণ্ডলীর উপর ন্যস্ত থাকে। সরকারই পুরাপুরি ভাবে ইহার মূলধন যোগান দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে। পাবলিক কর্পো-রেশনের কর্মচারিগণ সরকারী কর্মচারী হিসাবে গণ্য হন না। ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক, রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, জীবন বীমা কর্পোরেশন, শিল্প-অর্থ কর্পোরেশন, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন, ভারতীয় বিমানপথ প্রভৃতি ৩৫টি পাবলিক কর্পোরেশন আছে।

পাবলিক কর্পোরেশনের সুবিধাগুলি এইরূপ: (১) ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের গুণগুলি পাবলিক কর্পোরেশনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে; (২) বিভাগীয় পরিচালনার ন্যায় ইহাতে আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ থাকে না বলিয়া লাল ফিতার প্রভাব ও দীর্ঘসূত্রতা ইহাতে খুব কম হয়; দৈনন্দিন কাজে সরকারী হস্তক্ষেপ ঘটে না। (৩) এই জাতীয় কারবার মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে গঠিত হয় না বলিয়া কারবারের সামাজিক দিকটি গুরুত্ব পায়। (৪) এই ধরনের কারবারে গণ-দায়িত্ব রক্ষিত হয়; কারবারের দোষত্রুটি পার্লামেন্টে সমালোচনা করা হয়। (৫) সরকারী বিভাগীয় সংগঠনের কোন পৃথক সত্তা নেই কিন্তু পাবলিক কর্পোরেশনের এক পৃথক আইনগত সত্তা আছে। (৬) কারবারের অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া আইনের বিভিন্ন ধারা রচনা করা হয়।

পাবলিক কর্পোরেশনের অসুবিধাগুলি এইরূপ : (১) কারবার পরিচালনার ভার যাহাদের উপর ন্যস্ত থাকে সেই কর্মচারীদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কারবার সংক্রান্ত কোন অভিজ্ঞতা থাকে না। (২) যে আইনের দ্বারা কারবার প্রতিষ্ঠিত হয় উহা সংশোধন না করা পর্যন্ত কারবারের কর্মধারা বা নীতির পরিবর্তন করা যায় না ; সংশোধন বেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। (৩) কর্পোরেশনের কার্যাবলী সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত একথা বলা চলে না ; সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদপ্তরের হস্তক্ষেপের দরুণ কারবারের গতি ব্যাহত হইতে পারে। (৪) সরকারী বিভাগীয় সংগঠন সরকারের নিকট হইতে যে সব সুযোগসুবিধা লাভ করে পাবলিক কর্পোরেশন তাহা পায় না

সরকারী যৌথ মূলধনী কোম্পানী (Government Joint Stock Company) : রাষ্ট্রীয় মালিকানায় যৌথ মূলধনী কারবার গঠিত হইতে পারে ; এই সকল কারবার ভারতীয় কোম্পানী আইনানুসারে গঠিত হয়। ভারতীয় কোম্পানী আইনের ৬১৭ নং ধারায় সরকারী মালিকানায় যৌথ-মূলধনী কারবার গঠনের উল্লেখ আছে। কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, বেসরকারী সংস্থা বা ব্যক্তিগণ ইহার শেয়ার কিনিতে পারে। তবে কারবার পরিচালনার ব্যাপারে সরকারী নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য কোম্পানীর মোট শেয়ারের অন্ততঃ ৫১ ভাগ সরকার নিজে ক্রয় করে। কারবার পরিচালনার ভার একটি পরিচালকমণ্ডলীর হাতে ন্যস্ত থাকে, সরকার কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিগণই পরিচালকমণ্ডলীতে থাকে। কোম্পানী পরিচালনায় নিযুক্ত কর্মীগণ সরকারী কর্মচারী হিসাবে গণ্য হন না। হিন্দুস্থান ষ্টীল, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন, সিন্ধ্রি সার কারখানা, হিন্দুস্তান সিপইয়ার্ড প্রভৃতি ২৫৯টি সরকারী কোম্পানী আছে। সরকারী কোম্পানীতে বেসরকারী অংশীদার থাকিলে তাহাকে মিশ্র মালিকানাভিত্তিক কোম্পানী (Mixed Ownership Company) বলা হয়, যেমন অয়েল ইণ্ডিয়া লিমিটেড।

সরকারী কোম্পানীর সুবিধাগুলি এইরূপ : (১) সরকারী কোম্পানী পরিচালনার নীতি অপেক্ষাকৃত সহজেই পরিবর্তন করা যায় বলিয়া পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সহজেই সামঞ্জস্য বিধান করা যায় ; ইহা অধিক পরিমাণে ব্যবসায়-বাণিজ্যের নীতি অনুসারে পরিচালিত হয়। (২) সরকারী কোম্পানীর পৃথক সত্তা বজায় থাকে। (৩) সরকারী উহার হিসাবপত্র পার্লামেন্টে পেশ করিতে বাধ্য নয়। ইহার দরুন পরিচালকগণ কাজে

অধিকতর স্বাধীনতা ভোগ করে। (৪) দীর্ঘসূত্রতা ও লালফিতার দৌরাত্ম্য থেকে এই ধরনের কারবার মুক্ত। (৫) কোম্পানী আইনানুসারে গঠিত এই কারবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলের পরিবর্তনে বিশেষ প্রভাবিত হয় না; (৬) বেসরকারী সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গের কাছে শেয়ার বিক্রয় করিয়া সহজেই অধিক মূলধন সংগ্রহ করা যায়।

সরকারী কোম্পানীর অসুবিধাগুলি এইরূপ: (১) সরকারী কোম্পানী যৌথমূলধনী কারবার হইলেও আসলে ইহা সরকারের এক মালিকানাধীন কারবার ব্যতীত আর কিছুই নয়; ইহাতে গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ থাকে না, সরকারই পুরাপুরি কর্তৃত্ব করে। (২) সরকারের বিভাগীয় কারবারে সুবিধাগুলি হইতে ইহা বঞ্চিত হয়। (৩) গণতান্ত্রিক দেশে গণ কৈফিয়ৎ পরিহারের একটি উপায় এই ধরনের কারবার। (৪) কারবার পরিচালনার দায়িত্ব যাহাদের উপর ন্যস্ত থাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহাদের ব্যবসায়ের কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকে না।

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের দাম নীতি (Price Policy of Public Sector Enterprises): সরকার পরিচালনাধীন প্রতিষ্ঠানগুলি নিম্নলিখিত তিন ধরণের মূল্যনীতির কোন একটি অনুসরণ করিতে পারে।

১। মুনাফাভিত্তিক দাম-নীতি: এই নীতি অনুসৃত হইলে কারবারটি মুনাফা অর্জনের নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়। এই ক্ষেত্রে উৎপন্ন দ্রব্যের দাম উৎপাদন ব্যয়ের উর্ধ্বে রাখা হয়। এয়ার ইণ্ডিয়া, রেলপথ, হিন্দুস্তান মেশিন টুলস প্রভৃতি সরকারী প্রতিষ্ঠানে এই নীতি অনুসৃত হয়। যে মুনাফা হয় তাহা কারবার সম্প্রসারণের জন্য পুনঃ বিনিয়োজিত হইতে পারে অথবা সরকারী কোষাগারে অর্থ যোগান দিতে পারে।

২। ক্ষতি স্বীকারের দাম-নীতি: কোন কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান ইচ্ছাকৃত ভাবে ক্ষতি স্বীকার করিয়া কারবার চালাইবার নীতি গ্রহণ করে। এই ক্ষেত্রে উৎপন্ন দ্রব্য বা সেবার দাম উহার উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা কম রাখা হয়। কোন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার প্রাথমিক পর্যায়ে অথবা কোন অনগ্রসর এলাকায় শিল্প স্থাপন করিলে ক্ষতি স্বীকারের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি গঠনের উদ্দেশ্য মুনাফা বৃদ্ধি নয়—সমাজ কল্যাণ বৃদ্ধি। যখন রাষ্ট্রীয় ব্যাংক গ্রামাঞ্চলে শাখা স্থাপন করে তখন সে ক্ষতি স্বীকারের নীতির দ্বারা চালিত হয়।

৩। "লাভ ও নয়, ক্ষতিও নয়" (No Profit No loss) দাম-নীতি : সরকারী প্রতিষ্ঠান কখন কখন "লাভ ও নয়, ক্ষতিও নয়" নীতি অনুসরণ করিয়া দাম স্থির করে। এই ক্ষেত্রে দাম উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয় এবং উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে মুনাফার অংশ থাকে না। রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রাক্কালে এই নীতি গ্রহণের সপক্ষে জনমত প্রবল ছিল।

ডাঃ ভি. কে. আর. ভি. রাও বলেন, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পক্ষেত্রে দাম-নীতি এরূপ হইবে যেন উহা জাতীয় আয় ও উহার হার বৃদ্ধি করে। এই নীতি গ্রহণ করা হইলে "না লাভ না ক্ষতির" নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে। উন্নয়নের হার বৃদ্ধির দিক হইতে বিবেচনা করিলে বলিতে হইবে যে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পকে মুনাফা অর্জন অবশ্যই করিতে হইবে এবং প্রতিষ্ঠানের আয়তন যত বড় হইবে মুনাফা অর্জনের প্রয়োজনও ততই বেশী হইবে। মুনাফা যে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করিবে তাহা সঞ্চয় ও বিনিয়োগ হইবে।

সরকারী কারবারে এই নীতির প্রতিফলন ধীরে ধীরে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। খসড়া চতুর্থ পরিকল্পনায় ১১ হইতে ১২ শতাংশ মুনাফা হারের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হইয়াছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক মূলধনের ভূমিকা (Role of Foreign Capital in Economic Development) : অর্ধোন্নত দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের বৈদেশিক মূলধনের একটি ভূমিকা আছে। অর্ধোন্নত দেশগুলি স্বল্প উৎপাদন, মূলধনের ঘাটতি ও দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের মধ্যে আবর্তিত হইতেছে। বৈদেশিক মূলধন আমদানী করিয়া অর্ধোন্নতির দুষ্টচক্রটি ভেদ করিয়া বাহিরে আসা যায়। বৈদেশিক মূলধন প্রারম্ভিক গতির সূচনা করিতে সক্ষম হইলেও অনুন্নতির দুষ্টচক্র ভেদ করিতে পারেনা। বাহ্যিক শক্তির সাহায্যে অগ্রগতির স্থায়ী বেগ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়— উন্নয়নের গতিবেগ আসিবে অভ্যন্তরীণ প্রচেষ্টার মাধ্যমে।

বৈদেশিক মূলধন দেশে উন্নয়নহার বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। বৈদেশিক মূলধনের সঙ্গে কারিগরী শিল্পজ্ঞান দেশে আসে, ফলে নৈপুণ্য গঠনও (skill formation) ত্বরান্বিত হয়। জাতীয় উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে বৈদেশিক মূলধনের ভূমিকা সম্পর্কে নির্দিষ্ট করিয়া কিছু বলা শক্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইংলণ্ড অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ হইতে মূলধন গ্রহণ করিয়া বর্তমানে উন্নয়নের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছাইয়াছে। শিল্পায়নের প্রথম পর্যায়ে সুইডেনে বৈদেশিক

বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৮০ শতাংশ। বিংশ শতকের প্রথম দুই দশকে ক্যানাডায় বৈদেশিক মূলধনের পরিমাণ ছিল মোট বিনিয়োগের ৫০ শতাংশ। অপর পক্ষে সোভিয়েত রাশিয়া প্রায় কোনরূপ বৈদেশিক মূলধন গ্রহণ না করিয়াই অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটাইয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন সাহায্য লাভ করিয়া জাপান দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাইয়াছে। ভারতে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ও মূলধন গঠনের হার কম বলিয়া দেশের উন্নয়ন হার ত্বরান্বিত করিতে হইলে বৈদেশিক মূলধন গ্রহণ করা অপরিহার্য।

বৃটিশ শাসনকালে বৈদেশিক মূলধন খনি, বাগিচাশিল্প, রেলপথ, জাহাজ চলাচল প্রভৃতি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। অবশ্য বৈদেশিক মূলধন কখন দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে বিনিয়োজিত হয় নাই বলিয়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভারসাম্য বজায় থাকে নাই। স্বাধীনতা লাভের পর দেখা গেল যে দেশের দ্রুত উন্নয়নের উপযোগী মূলধন দেশে নাই। সুতরাং রাষ্ট্রনায়কগণ মনে করিলেন যে, যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে বৈদেশিক মূলধন পাওয়া যায় তবে অপেক্ষাকৃত স্বল্প ত্যাগ স্বীকার করিয়া দ্রুত উন্নয়ন ঘটানো যাইবে। বৈদেশিক মূলধন সম্পর্কে সরকারী মনোভাব হইল যে, কোনরূপ রাজনৈতিক চাপ না থাকিলে তবেই উহা গ্রহণ করা হইবে এবং উহা এরূপভাবে ব্যবহার করিতে হইবে যাহাতে উহা দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের পরিপন্থী না হয়। উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে ঠিকভাবে বৈদেশিক বিনিয়োগ হইলে অর্ধোন্নত দেশ যথেষ্ট লাভবান হইবে কারণ ইহা দেশীয় উদ্যোগের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া দক্ষতার মান উন্নত করিবে। মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং বিশেষজ্ঞের আকারে বৈদেশিক সাহায্যে পাওয়া গেলে উহা অর্থনৈতিক উন্নয়নে গতিবেগের সঞ্চার করিবে। ভারতে অভ্যন্তরীণ মূলধনের স্বল্পতার দরুণ বৈদেশিক মূলধনকে দেশীয় মূলধনের পরিপূরক হিসাবে ব্যবহার করা হইলে দেশের উন্নয়ন দ্রুততর হইবে।

বৈদেশিক মূলধনের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি (Arguments for and against Foreign Capital): সোভিয়েত রাশিয়া ব্যতীত প্রায় আর সকল অর্ধোন্নত দেশ উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে বৈদেশিক মূলধনের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিয়াছে। অর্ধোন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য হইল সঞ্চয়ের স্বল্পতা, মূলধনী দ্রব্যের স্বল্পতা এবং কারিগরীদক্ষতার অভাব। ভারত একটি অর্ধোন্নত দেশ বলিয়া উহার সকল বৈশিষ্ট্য তাহার আছে। ১৯৫০-৫১ সালে যখন

ভারতে পরিকল্পিত উন্নয়নের যাত্রা সুরু হয় তখন সঞ্চয়ের হার ছিল জাতীয় আয়ের ৫ শতাংশ মাত্র। সঞ্চয় কম হইলে দেশের দ্রুত উন্নয়ন সাধন করিতে হইলে বিদেশ হইতে মূলধন আমদানী করিয়া অভ্যন্তরীণ ঘাটতি পূরণ করিতে হইবে। দেশে যথেষ্ট পরিমাণে প্রাকৃতিক সম্পদ থাকিতে পারে, প্রয়োজনীয় শ্রমিক থাকিতে পারে কিন্তু মূলধনের অভাব হইলে দ্রুত শিল্পায়ন হইতে পারিবে না। ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, পাট শিল্প, রেলপথ নির্মাণ এবং চা কফি প্রভৃতি বাগিচাশিল্পের অগ্রগতির মূলে রহিয়াছে বৈদেশিক মূলধন।

দ্বিতীয়ত বৈদেশিক মূলধন শুধুমাত্র দেশীয় মূলধনের ঘাটতিজনিত ফাঁকই পূরণ করে না, উহা অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বৃদ্ধিরও সহায়ক। বৈদেশিক মূলধনের সাহায্যে উৎপাদিত সম্পদের এক মোটা অংশ সুদ এবং মুনাফা হিসাবে বিদেশে চলিয়া যায় বলিয়া জনগণের মনে উহার প্রতিক্রিয়া হিসাবে মূলধন গঠনের আকাঙ্ক্ষা দৃঢ় হয়।

তৃতীয়ত অনেক সময় বৈদেশিক মূলধনের সঙ্গে উন্নত ধরনের কারিগরী জ্ঞান দেশে আসে। মূলধন অপেক্ষা উন্নত কারিগরী জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা কোন অংশে কম নয়। অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত বলেন যে শিল্পজ্ঞানের অভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি রোধ করিয়া দিতে পারে।

চতুর্থত, বৈদেশিক মূলধন শিল্পায়নের প্রাথমিক ঝুঁকি বহন করে। প্রাথমিক অবস্থায় মুনাফার পরিবর্তে ক্ষতি হইতে পারে এবং বৈদেশিক মূলধন এই ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করিয়া শিল্পের ভিত্তি দৃঢ়তর করে। পরিশেষে, শিল্পোন্নতির জন্য যন্ত্রপাতি আমদানী করিলে রপ্তানী বৃদ্ধি করিয়া তাহার মূল্য পরিশোধ করিতে হয়। ভারতকে যে বিপুল পরিমাণ রপ্তানী করিতে হইবে তাহার দরুন ভোগ্যবস্তুর সরবরাহে ঘাটতি দেখা দিবে এবং মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ বৃদ্ধি পাইবে। বৈদেশিক মূলধনের সাহায্য গ্রহণ করিয়া এই অসুবিধা লাঘব করা যায়।

বৈদেশিক মূলধনের বিরুদ্ধেও নানা ধরনের যুক্তি উপস্থাপিত করা হয়। বৈদেশিক মূলধনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় যুক্তি রাজনৈতিক। বিদেশী মূলধন অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিলে দেশের বৈদেশিক নীতির স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবার আশংকা থাকে। বৈদেশিক মূলধনের সঙ্গে আসে বৈদেশিক কর্তৃত্ব। বৈদেশিক মূলধন কায়েমী স্বার্থের সৃষ্টি করিয়া দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের উন্নয়নের পথ রুদ্ধ

করিয়া দেয়—দেশের সামগ্রিক অর্থব্যবস্থার উপর তাহাদেব ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করে। চীনে একদা বৈদেশিক মূলধন দেশের রাষ্ট্রশাসনকে করায়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিল।

দ্বিতীয়ত বৈদেশিক মূলধনের সাহায্যে উন্নয়ন ঘটিলে মোট উৎপাদিত সম্পদের একটা বড অংশ সুদ এবং মুনাফা হিসাবে দেশের বাহিরে চলিয়া যায়। আবার বিদেশীরা শুধুমাত্র মুনাফার দিকে নজর রাখিয়া যথেচ্ছ ভাবে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে বলিয়া ক্ষয়শীল খনিজ সম্পদ সংরক্ষিত হইতে পারেনা।

তৃতীয়ত জাতীয় স্বার্থরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় মূল শিল্পগুলি বিদেশীদেব আয়ত্তে আসিলে দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হইতে পারে। রাষ্ট্রীয় অগ্রগতি ব্যাহত হইবার আশংকায় ভারতীয়েরা বৈদেশিক মূলধন সুনজরে দেখে নাই।

চতুর্থত, সাধারণত এই যুক্তি দেখানো হয় যে বৈদেশিক মূলধনের সহিত উন্নত কারিগরী শিল্পজ্ঞান দেশে আসে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বিদেশীরা উন্নত শিল্পজ্ঞান নিজেদের ভিতরই করায়ত্ত করিয়া রাখে। দেশীয় লোকদের উন্নত শিল্পশিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখিবার জন্য তাহাবা অছিলা খোঁজে। পরাধীন ভারতে বৈদেশিক মূলধন দ্বারা পরিচালিত সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠানেই ভারতীয়দের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হইত। সাধারণ ভাবে ভারতীয়দের কোন উচ্চপদ দেওয়া হইত না। এইজন্যই ফিস্ক্যাল কমিশন মন্তব্য করিয়াছে যে বিদেশ হইতে শুধুমাত্র শিল্পজ্ঞানই আমদানী করা উচিত।

ভারতে বৈদেশিক মূলধন আসিয়াছে বৈদেশিক প্রভুত্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ। ইহা পাট, চা, কয়লা, রেলপথ নির্মাণ ইত্যাদিতে বিনিয়োজিত হইয়াছিল। ইংরেজ মূলধন মালিকেরা সেই সব শিল্পে তাহাদের মূলধন বিনিয়োগ করিয়াছিল যেখানে দ্রুত মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা ছিল এবং যে সকল শিল্পকে উন্নত করিলে এই দেশে তাহাদের প্রভুত্ব দৃঢ়তর হয়। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তাহাদের কাম্য ছিল না এবং যেটুকু উন্নয়ন হয়েছিল তাহা উহাদের স্বার্থের অনুকূলেই ঘটেছিল। তবে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে প্রাক-স্বাধীনতা যুগে ভারতে যেটুকু শিল্পায়ন হইয়াছিল তাহার মূলে আছে বৃটিশ মূলধন। যদি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বৃটিশ মূলধন বিনিয়োজিত হইত তাহা হইলে দেশে শিল্পায়ন দ্রুততর হইত।

স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে ভারতীয় জনগণ বৈদেশিক মূলধনকে সুনজরে দেখে নাই তাহার কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ, দেশের লোক দেখিল বিদেশীরা এদেশে প্রচুর মুনাফা লুটিতেছে এবং উহাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ভারত সরকার তাহাদের নানাধরনের সুযোগসুবিধা দিতেছে কিন্তু সরকার দেশীয় উদ্যোক্তাদের প্রতি উদাসীন। দ্বিতীয়ত, বৈদেশিক মূলধনপুষ্ট শিল্পের বড় বড় পদ বিদেশীরাই পাইত যাহার দরুন দেশের লোকেরা বিশেষ অসন্তুষ্ট হয়। ভারতীয়গণ দেখিল যে তাহাদের দেশে বিদেশীরা সকল সুযোগসুবিধা পাই-তেছে কিন্তু এসব তো তাহাদেরই পাইবার কথা, ফলে অসন্তোষ ঘনীভূত হইতে থাকে। তৃতীয়তঃ ডাঃ জ্ঞানচাঁদের মতে বৈদেশিক মূলধন ভারতের বহু শিল্পের উন্নতি করিয়াছে সত্য কিন্তু ইহাই আবার চরম শিল্পক্ষমতার কেন্দ্রীভূত হইবার কারণ। বিদেশীদের নিকট হইতে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা ইহা শিখিয়াছে এবং ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ দেশের অগ্রগতির পথে বাধার সৃষ্টি করিয়াছে।

কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর বৈদেশিক মূলধনের প্রতি আমাদের বিরূপ মনোভাবের অবসান ঘটিয়াছে; ইহার কয়েকটি কারণ আছে: প্রথমতঃ, স্বাধী-নতা লাভের দরুন রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা ভারতীয়দের হাতে আসিয়া পড়িয়াছে; বৈদেশিক মূলধন এখন আর দেশে বৈদেশিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে না। দ্বিতীয়ত, শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে দেশে শিল্পায়ন দ্রুততর করা যাইবে না। দ্রুত শিল্প বিকাশ করিতে হইলে বৈদেশিক মূলধনের উপর কিছু পরিমাণে নির্ভর করিতেই হইবে। তৃতীয়ত, বর্তমানে বৈদেশিক মূলধন বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে আসে বলিয়া উহার রাজনৈতিক চরিত্র নাই। চতুর্থত, বৈদেশিক মূলধন বলিতে অর্থসম্পদের আমদানী বুঝায় না; উন্নততর কারি-গরী কৌশলও উহার অন্তর্গত। কারিগরী জ্ঞান আমদানী করিয়া অর্ধোন্নত দেশ তাহার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করিতে পারে। পঞ্চমত, বৈদেশিক মুদ্রাসংকট অতিক্রম করিবার জন্য বৈদেশিক মূলধন প্রয়োজন। শিল্পায়নের প্রাথমিক পর্যায়ে যন্ত্রপতি ক্রয় করিবার জন্য প্রভূত পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন। বৈদেশিক মুদ্রাসংকটের সময় যদি বৈদেশিক মূলধন রপ্তানী শিল্প বা আমদানী শিল্প উন্নয়নের জন্য নিয়োজিত হয় তাহা হইলে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা সংকট লাঘব হইতে পারে। পরিশেষে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অর্ধোন্নত দেশের উন্নয়নের জন্য যে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে

তাহাতে বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগ সম্পর্কে পূর্বে যে সন্দেহ এবং সংশয় ছিল তাহা দূর হইয়াছে।

বৈদেশিক মূলধন সম্পর্কে সরকারী নীতি : (Goverment Policy towards Foreign Capital) ভারত সরকারের বৈদেশিক মূলধন সম্পর্কিত নীতি দুই পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারার ফলশ্রুতি। একদিকে বৈদেশিক মুদ্রা-সংকটের দরুন বৈদেশিক মূলধনের বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে আর অন্যদিকে দেশের নবলব্ধ স্বাধীনতা যাহাতে বিপর্যস্ত না হয় তাহার প্রতিও দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। বৈদেশিক মূলধনের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করিবার সঙ্গে এই আশঙ্কাও রহিয়াছে যে, দেশ হইতে বৈদেশিক মূলধন অন্তর্হিত হইয়া যাইতে পারে, সুতরাং বৈদেশিক মূলধনের ক্ষেত্রে সরকারের এরূপ এক নীতি গ্রহণ করা উচিত যাহা মূলধন প্রদানকারী অথবা মূলধন গ্রহণকারী কোন দেশেরস্বার্থের পরিপন্থী না হয়।

প্রাক-স্বাধীনতা যুগে বৈদেশিক মূলধন সম্পর্কে সরকার যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা হইল উহার নিঃসর্ত এবং অনিয়ন্ত্রিত আগমন। প্রথম ফিস্‌ক্যাল কমিশন এই অভিমত পোষণ করে যে, যদিও জনসাধারণ বৈদেশিক মূলধনকে সন্দেহের চোখে দেখে তথাপি দেশের উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক মূলধনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির মতে কেবলমাত্র সরকারী উদ্যোগেই বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োজিত হইবে—বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে উহা নিয়োজিত হইবে না। দ্বিতীয় ফিস্‌ক্যাল কমিশন উল্লেখ করে, যে নূতন শিল্পোদ্যোগের জন্য অভ্যন্তরীণ মূলধন প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প সেই ক্ষেত্রেই বৈদেশিক মূলধন গ্রহণ করা যাইতে পারে।

বৈদেশিক মূলধনের প্রতি স্বাধীন ভারত সরকারের মনোভাব ও নীতি সর্বপ্রথম প্রকাশ পায় ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতিতে এবং ১৯৪৯ সালের ৬ই এপ্রিল পার্লামেন্টে প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতিতে।

প্রথম শিল্পনীতিতে বৈদেশিক মূলধনের উপর কিছু পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়, যেমন সংখ্যাগরিষ্ঠ শেয়ারের ভারতীয় মালিকানা, নিযুক্ত ভারতীয় কর্মীদের কারিগরী জ্ঞান শিক্ষাদান ইত্যাদি; ইহা ব্যতীত জাতীয়করণের আশংকা থাকায় বৈদেশিক মূলধনের প্রবাহ ব্যাহত হয়। বৈদেশিক বিনিয়োগকারীর আশংকা দূর করিয়া ভারতে বৈদেশিক মূলধন প্রবাহ বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী জহরলাল নেহেরু ১৯৪৯ সালের ৬ই এপ্রিল

পার্লামেন্টে একটি বিবৃতি প্রদান করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে শুধুমাত্র দেশে মূলধনের ঘাটতির জন্য নয়, বৈদেশিক কারীগরী ও শিল্পজ্ঞানের জন্যও বিদেশী মূলধনের প্রয়োজন রহিয়াছে। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণায় বৈদেশিক মূলধনকে সাদরে আমন্ত্রণ জানাইয়া বৈদেশিক বিনিয়োগকারীকে তিন ধরনের আশ্বাস প্রদান করা হয়; প্রথমত, সরকারের অনুসৃত নীতিতে দেশীয় মূলধন ও বৈদেশিক মূলধনের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা হইবে না। দ্বিতীয়ত, দেশী এবং বিদেশী সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিয়মের মধ্যে থাকিয়া বিদেশী শিল্প মুনাফা অর্জন করিতে পারিবে। বৈদেশিক মুদ্রার অবস্থা বিবেচনা করিয়া বিদেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে মুনাফা দেশে পাঠাইবার এবং মূলধন প্রেরণের যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দেওয়া হইবে। তৃতীয়ত, বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলিকে বর্তমানে জাতীয়করণ করিবার কোন আশংকা নাই। যদি কোন বিদেশী প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করা হয় তাহা হইলে উহা ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ পাইবে।

প্রধান মন্ত্রীর এই ঘোষণার ফলে ভারতীয় শিল্পে বৈদেশিক বিনিয়োগ কিছুটা বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৮ সালে বৈদেশিক মূলধনের ক্ষেত্রে আরও কতকগুলি সুযোগসুবিধা দেওয়ার নীতি ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বৈদেশিক মূলধনের অনুপ্রবাহ আশানুরূপ না হওয়ায় বৈদেশিক মূলধনকে অধিকতর সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়। ১৯৬৫ সাল হইতে বৈদেশিক বিনিয়োগকারীর নিকট হইতে কেবল তাহাদের ভারতীয় বিনিয়োগ হইতে আয়ের উপর কর আদায় করা হইতেছে। ইহা ছাড়া করের ক্ষেত্রেও কিছু কিছু সুযোগসুবিধা দেওয়া হইতেছে। রয়ালটির উপর আয়কর ও অতিরিক্ত করের সর্বোচ্চ হার ৬৩ শতাংশ হইতে হ্রাস করিয়া ৫০ শতাংশ করা হইয়াছে।

চতুর্থ পরিকল্পনায় শিল্পক্ষেত্রের প্রয়োজনীয় ফাঁকগুলি পূরণ করিবার জন্য জন্য বহুজাতি প্রতিষ্ঠান (Multinational Corporation) স্থাপনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। ১৯৭৩ সালে ভারত সরকারের শিল্পনীতি ঘোষণা হইতে জানা যায় যে মূল শিল্পগঠনের ক্ষেত্রে বৈদেশিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে সুবিধা দেওয়া হইবে কিন্তু অন্যান্য শিল্পগঠনের ক্ষেত্রে সাধারণত বৈদেশিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে অনুমতি প্রদান করা হইবে না। অবশ্য যে সব ক্ষেত্রে বিদেশী মূলধন প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হইবে না বলিয়া স্থির করা হইয়াছিল তাহাদের অনেকগুলিতেই বিদেশী মূলধনকে বিনিয়োগের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। ১৯৭৩ সালের বিদেশী মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ সংশোধন আইনানুসারে বিমান ও

জাহাজী কোম্পানী ছাড়া অন্য সব বিদেশী কোম্পানীর ভারতীয় শাখাগুলিকে ভারতীয় টাকায় শেয়ার মূলধন লইয়া গঠিত কোম্পানীতে রূপান্তরিত করিতে হইবে এইসব কোম্পানীতে বিদেশী শেয়ারহোল্ডারদের অংশ শেয়ার মূলধনের ৭৪ শতাংশের বেশী হইতে পারিবে না।

ভারতীয় শিল্পে একচেটিয়া ক্ষমতা ও তৎসম্পর্কে সরকারী নীতি Monopoly Power in Indian Industry and Government Policy relating to it) : ভারতে মিশ্র অর্থব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার নীতি গ্রহণ করা হইলেও মূলতঃ ইহা একটি ধনতান্ত্রিক দেশ। বিগত ৩০ বছরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন কতখানি ঘটিয়াছে তাহা অনুসন্ধান করিবার উদ্দেশ্যে সরকার কে. সি. দাসগুপ্তের সভাপতিত্বে একটি কমিশন গঠন করে ; ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কমিশন তাহার রিপোর্ট দাখিল করে। ভারতে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন সংকুচিত করিবার আইনগত নির্দেশও এই কমিশন দিয়াছে।

কমিশন দুই ধরনের অর্থনৈতিক ক্ষমতাব কেন্দ্রীভবনের উল্লেখ করিয়াছে—(১) পণ্য বা শিল্পভিত্তিক কেন্দ্রীভবন (productwise concentration) এবং (২) দেশভিত্তিক কেন্দ্রীভবন (countrywise concentration) , কোন বিশেষ দ্রব্যের উৎপাদন বা বণ্টন ক্ষমতা যখন কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠানের হাতে আসিয়া কেন্দ্রীভূত হয় তখন তাহাকে পণ্যভিত্তিক কেন্দ্রীভবন বলে ; উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় যে মাত্র তিনটি উৎপাদনকারী ফার্ম শিশুদের দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদনের প্রায় সবটাই যোগান দেয়। আবার যখন কোন ব্যক্তি বা আর্থিক গোষ্ঠী অধীনস্থ বহুসংখ্যক ফার্মের বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদন বা বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করে তখন তাহাকে দেশভিত্তিক কেন্দ্রীভবন বলে , উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে বিড়লাগোষ্ঠীর অধীনে ১৫১টি ফার্ম আছে এবং তাহারা বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদন করে।

কমিশন চা, চিনি, টায়ার, শিশুখাদ্য, মোটরগাড়ী প্রভৃতি ১০০টি নির্বাচিত দ্রব্যের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন নির্ধারণ করিয়াছে। নির্দিষ্ট ১০০টি দ্রব্যের মধ্যে ৬৫টি দ্রব্যের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভবনের মাত্রা অত্যধিক। ওই ৬৫-টি দ্রব্যের প্রতিটির ক্ষেত্রে তিনজন নেতৃস্থানীয় উৎপাদনকারী মোট উৎপাদনের ৭৫ শতাংশ যোগান দেয়। কমিশন ২২৫৯টি কোম্পানীর ক্ষেত্রে দেশভিত্তিক কেন্দ্রীভবনের মাত্রা নির্ধারণ করিয়াছে। ওই ২২৫৯টি কোম্পানী

৭৫টি ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর কোন একটির অন্তর্ভুক্ত। ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর যে তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছিল তাহাতে টাটাগোষ্ঠী সর্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল বিড়লাগোষ্ঠী। টাটাগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে ৫৩টি কোম্পানী ছিল এবং উহার সম্পত্তির (assets) মূল্য ছিল ৪১৭ কোটি টাকা; বিড়লাগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে ১৫১টি কোম্পানী ছিল যাহার মোট সম্পত্তির মূল্য ছিল ২৯২ কোটি টাকা।

ব্যবসায়ীদের মধ্যে একচেটিয়া এবং সংকোচনমূলক (monopolistic and restrictive practices) প্রথার প্রচলন রহিয়াছে। উৎপাদনকারীদের মধ্যে পণ্যের বাজার বণ্টন, ব্যবসায়ী চুক্তি, নূতন ফার্মের ব্যবসায়ে প্রবেশের বাধার সৃষ্টি, চুক্তি দ্বারা দাম নির্ধারণ, পণ্যমজুত করিয়া কৃত্রিম দুষ্প্রাপ্যতার সৃষ্টি প্রভৃতি একচেটিয়া এবং সংকোচনমূলক পদ্ধতির ব্যবহার ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রচলিত আছে।

কমিশন অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের কতকগুলি কারন উল্লেখ করিয়াছে: প্রথমত, যৌথমূলধনী কারবার সম্প্রসারণের ফলেই ভারতে অর্থনৈতিক ক্ষমতার চরম কেন্দ্রীভবন ঘটিয়াছে। দ্বিতীয়ত, ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীনতা লাভ করিলে বহু বৃটিশ শিল্পপতি তাহাদের শিল্প-প্রতিষ্ঠান বিক্রয় করিয়া স্বদেশে চলিয়া যায় তাহার ফলে 'কতিপয় মুষ্টিমেয় দেশীয় শিল্পপতিদের হাতে এইসব শিল্পসংস্থাগুলি চলিয়া আসে। তৃতীয়ত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় স্বাভাবিক সংরক্ষণের আওতায় থাকিয়া শিল্পপতিগণ প্রভূত মুনাফা অর্জন করে এবং পরবর্তীকালে শিল্পায়ন সুরু হইলে তাহারা ওই মূলধন বিনিয়োগের লাভজনক সুযোগ পায়; ইহার দরুন বহু শিল্প ও ব্যবসায়ের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা তাহাদের হাতে আসিয়া পড়ে। চতুর্থত, ভারতে ম্যানেজিং এজেন্সির প্রসার অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ত্বরান্বিত করিয়াছে। পরিশেষে, স্বাধীনতার পরিকল্পিত পদ্ধতিতে উন্নয়নের জন্য সরকার আমদানী ও বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ এবং লাইসেন্স প্রথার প্রবর্তন করে। প্রমাণিত যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে লাইসেন্স দানের নীতি গ্রহণ করায় প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতিরাই ইহার সুযোগ লাভ করে, নূতন উদ্যোক্তারা লাইসেন্সের কোন সুবিধা পায় নাই। বড় বড় শিল্পপতিগণ সরকারী নীতি ও ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া কারবার করিতে সমর্থ হয় কিন্তু ছোট ছোট উদ্যোক্তার পক্ষে ওই সকল বিধিনিষেধের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া শিল্প প্রসার করা সম্ভব হয় নাই।

ইহার ফলে শিল্পবাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ মুষ্টিমেয় বৃহৎ শিল্পপতির হাতে চলিয়া আসে।

অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের ফলে জনগণের মনে বৃহদায়তন কারবার সম্পর্কে মনোভাব খুব অনুকূল নয়; ইহাকে মন্দ বলা মনে করা হয়। ধনী শিল্পপতিরা দেশের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে অনুপ্রবেশ করিয়া গণতান্ত্রিকতার প্রসারে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিয়াছে; নির্বাচনের পূর্বে শিল্পপতিগণ ক্ষমতার অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলকে অর্থ প্রদান করে এবং সরকারী কর্মচারীদের ঘুস দিয়া অনেক অন্যায় কাজ আদায় করে। ধনী শিল্পপতিগণ বিলাসবহুল জীবন যাপন করে আর উহার প্রভাবে যুবগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ নিম্নগামী হওয়ার বিপজ্জনক আশংকা দেখা দেয়। ইহা ব্যতীত অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন হওয়ায় প্রতিযোগিতামূলক বাজার অপেক্ষা দ্রব্যের দাম বেশী হয় এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বল ব্যবসায়ীগণ বাজার হইতে বিতাড়িত হন। ছোট ছোট শিল্পপতিদের বিতাড়িত করা হইলে ধনবৈষম্য বৃদ্ধি পাইবে।

অবশ্য অর্থনৈতিক ক্ষমতার কোন সুফল নাই একথা বলা চলে না। অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন মূলধন গঠনে সাহায্য করিয়া দেশের উন্নয়নের সহায়ক হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, বড় বড় শিল্পগুলি দেশে উচ্চ পর্যায়ের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কর্মীর নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়া দেশে নৈপুণ্য গঠনে (skill formation) সহায়তা করিয়াছে। পরিশেষে, বড় বড় শিল্পপতিদের সুনাম বিদেশী মূলধন ও উদ্যোক্তাকে দেশে আকৃষ্ট করিয়া তাহাদের সহযোগিতায় (collaboration) অনেক নূতন শিল্প স্থাপন করিয়াছে। অবশ্য একচেটিয়া ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের কুফলের তুলনায় এই সুফল নগণ্য।

জনস্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে কমিশনকে আইনগত এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতে বলা হয়। কমিশন অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের মূলে আঘাত না করিয়া, কিভাবে ইহাকে ন্যায্য বণ্টনের অনুকূল করা যায় তাহাই চিন্তা করিয়াছে।

অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন রোধ করিয়া একচেটিয়া কারবারের কুফল বন্ধ করিবার জন্য কমিশন একটি বিধিবদ্ধ স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গঠনের সুপারিশ করে। এই প্রতিষ্ঠান গঠনের সময় মোটামুটি চারটি মূলনীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে; প্রথমত, আইন দ্বারা সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন খর্ব করা হইবে না; অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন

যখন ন্যায্য উৎপাদন এবং বণ্টন ব্যবস্থার পরিপন্থী হইবে তখনই শুধু তাহাকে প্রতিরোধ করা হইবে। দ্বিতীয়ত, সরকারী নিয়ন্ত্রণমুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে হইবে যাহার উদ্দেশ্য হইবে বৃহৎ শিল্পপতিদের উপর নজর রাখা ; একচেটিয়া ক্ষমতার অপব্যবহার যাহাতে না হয় উহা লক্ষ্য রাখাই তাহার কাজ। তৃতীয়ত, শিল্পে যতদূর সম্ভব একচেটিয়া অবস্থাকে নিরুৎসাহিত করিতে হইবে। চতুর্থত, যে সকল ক্ষেত্রে একচেটিয়া এবং সংকোচনমূলক পদ্ধতির ব্যবহার জনগণের মঙ্গল বৃদ্ধি করিতে পারে সেই সকল ক্ষেত্রে ইহাদের সমর্থন করা হইবে ; অন্যান্য ক্ষেত্রে তাহাদের প্রতিরোধ করা হইবে।

এই সকল বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা ছাড়াও কমিশন কতকগুলি বিধি-বহির্ভূত (non-legislative) ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করিয়াছে। প্রথমত, অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের জন্য যাহাতে গণতান্ত্রিক আদর্শ বিপন্ন না হয় তাহার জন্য রাজনৈতিক দলগুলি যেন নির্বাচনের পূর্বে শিল্পপতিদের নিকট হইতে কোনরূপ অর্থসাহায্য গ্রহণ না করে তাহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, লাইসেন্স প্রদান পদ্ধতি সরল করিতে হইবে যাহাতে অধিক অর্থব্যয় না করিয়া ছোট ছোট উদ্যোক্তাগণ লাইসেন্স গ্রহণ করিতে পারে। তৃতীয়ত, সরকারী উদ্যোগে বিভিন্ন ধরনের অধিকসংখ্যক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করিলে বেসরকারী উদ্যোগে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন সংকুচিত হইবে। চতুর্থত, ভোগকারীদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমদানী লাইসেন্স দিতে হইবে। পঞ্চমত, ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার এবং ভোগকারীদের সমবায় সমিতি গঠন করিয়া অসৎ বিক্রেতার শোষণ বন্ধ করিতে হইবে। পরিশেষে, সরকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার সময় এরূপ নীতি অনুসরণ করিবে যাহাতে ছোট ছোট শিল্পসংস্থাগুলি অর্ডার লাভ করে।

মনোপলি কমিশন শুধুমাত্র ব্যক্তিগত শিল্পের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন অনুসন্ধান করিয়াছে। ব্যক্তিগত সম্পদের ক্ষেত্রে এবং ভারতীয় মুদ্রণযন্ত্রের ক্ষেত্রে যে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ঘটিয়াছে তাহা অনুসন্ধান করা হয় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের আদর্শ গৃহীত হয়। ইহাকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে হইলে অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং সমাজকল্যাণের সম্প্রসারণ প্রয়োজন। অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের ব্যাপারে ব্যর্থতার উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

একচেটিয়া কারবার সম্পর্কে সরকারী নীতি (Government Policy towards Monopolies) : একচেটিয়া কারবার সম্পর্কে সরকারী নীতি দাশগুপ্ত কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে নির্ধারিত হইয়াছে। লাইসেন্স প্রদানের নীতির সংশোধন করা হইয়াছে এবং একটি স্থায়ী কমিশন গঠন করা হইয়াছে। ১৯৬৯ সালে একচেটিয়া কারবার ও ব্যবসায় সংকোচন মূলক আইন (Monopolies and Restrictive Trade Practices Act) পাশ করা হইয়াছে। একচেটিয়া কারবারের সম্প্রসারণ রোধের উদ্দেশ্যে ১৯৬৯ সালে দেশের ১৪টি বড় বাণিজ্য ব্যাংককে জাতীয়করণ করা হয়।

একচেটিয়া কারবার সম্পর্কে সরকারী নীতি ১৯৬৯ সালের একচেটিয়া কারবার ও ব্যবসায় সংকোচনমূলক আইনে প্রতিফলিত হইয়াছে বলিয়া উহার আলোচনা প্রয়োজন। একচেটিয়া ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করিবার জন্য এই আইনটি পাশ করা হয়। এই আইনের তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য : (১) জনস্বার্থহানিকর অর্থনৈতিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করা, (২) জনস্বার্থের অনুকূল না হইলে একচেটিয়া কারবার ও ব্যবসায় সংকোচনমূলক কার্য নিয়ন্ত্রণ করা এবং (৩) ব্যবসায় সংকোচনমূলক কার্য নিষিদ্ধ করা।

চারশ্রেণীর শিল্প-প্রতিষ্ঠান এই আইনের আওতায় আসিবে : (১) যে সকল প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পত্তির মূল্য ২০ কোটি টাকা বা তদপেক্ষা অধিক ; (২) আন্তঃসম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানসমূহ (interconnected undertakings) যাহাদের একত্রে ২০ কোটি টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যের সম্পত্তি আছে ; (৩) প্রভাবশালী কারবার (dominant undertaking) যাহার এক কোটি বা তদপেক্ষা অধিক মূল্যের সম্পত্তি আছে; যে কারবার দেশে কোন একটি পণ্যের এক-তৃতীয়াংশ উৎপাদন করে, যোগান দেয় অথবা নিয়ন্ত্রণ করে তাহাকে প্রভাবশালী কারবার বলে। (৪) প্রভাবশালী কারবার লইয়া গঠিত আন্তঃসম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানসমূহ যাহাদের এক কোটি বা তদূর্ধ্ব মূল্যের সম্পত্তি আছে।

যে সকল উদ্যোক্তা এই আইনের আওতায় পড়ে তাহাদের পক্ষে কোন নূতন সংস্থা গঠন করিতে হইলে অথবা চালু ইউনিটের সম্প্রসারণ করিতে হইলে শিল্প-লাইসেন্স গ্রহণই যথেষ্ট নয়—কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে উহাদের অনুমোদন লইতে হইবে। শিল্প-লাইসেন্স কমিটি বা দত্ত কমিটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে লাইসেন্স-ব্যবস্থা বড় বড় শিল্পগোষ্ঠীর বৃদ্ধিতে সহায়তা করিয়াছে কিন্তু নূতন উদ্যোক্তা গঠনে ব্যর্থ হইয়াছে। MRTP

আইনে শিল্পায়নের এই ত্রুটি সংশোধন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। গৃহীত সামাজিক অগ্রাধিকারের কথা চিন্তা করিয়া এই আইনে তথাকথিত একচেটিয়া শিল্পগোষ্ঠীর বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে।

এই আইনে একচেটিয়া কারবারের সম্প্রসারণ বন্ধ করিবার নীতি গৃহীত হয় নাই--শুধু মাত্র বলা হইয়াছে যে জাতীয় নীতির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া উহাদের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করা হইবে। অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন যে সর্বদাই অবাঞ্ছিত তাহা মনে করা হয় নাই; যদি উহা জনস্বার্থের পরিপন্থী হয় তবেই উহা মন্দ বলিয়া বিবেচিত হইবে। যদি সরকার মনে করেন যে কোন শিল্পসংস্থার সম্প্রসারণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বৃদ্ধি অথবা কর্মসংস্থান বৃদ্ধি অথবা রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন তাহা হইলে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন বৃদ্ধি পাইলেও উহার অনুমোদন করা হইবে।

ভারতীয় অর্থনীতিতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের ভূমিকা (Role of Small scale industries in the Indian Economy): একদা গান্ধীজী বলেছিলেন যে ঈশ্বরকে প্রতারণা করা সম্ভব হইলেও পরিসংখ্যানকে প্রতারণা করা সম্ভব নয়। তিনি পরিসংখ্যানের উল্লেখ করিয়া বলেন যে ভারতের ৮০ শতাংশ লোকের জীবন কাটে গ্রামে, কাজ করে গ্রামে আর মরেও গ্রামে। কোন অর্থনৈতিক উন্নয়নসূচীকে জাতীয় কর্মসূচী হিসাবে পরিগণিত হইতে হইলে তাহাকে লক্ষ লক্ষ বেকার ও আধাবেকার গ্রামবাসীর নিকট কাজ ও মজুরীর সুযোগ পৌঁছে দিতে হইবে। যে অর্থনৈতিক কার্যসূচী লক্ষ লক্ষ গ্রামের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়া নিষ্প্রভ গ্রামগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারে তাহা হইল ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্প। সেই জন্য গ্রামীণ শিল্পগুলি লোপ পাওয়ার দরুন আমাদের গ্রামগুলি ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্প-গুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারিলে তবেই গ্রামগুলিকে সমৃদ্ধিশালী করা যাইবে। ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্প গড়িয়া তোলার প্রধান উদ্দেশ্য হইল-গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা, আয় ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা এবং অধিকতর সুষম ও সুসম্বদ্ধ অর্থব্যবস্থার সৃষ্টি করা। নূতন ফিস্‌ক্যাল কমিশন এবং পরিকল্পনা কমিশন উভয়েই ভারতীয় শিল্পকাঠামোতে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প পুনর্গঠনের উপর যথোচিত গুরুত্ব দিয়াছে।

১৯৪৮ সালের শিল্পনীতিতে বলা হইয়াছে, জাতীয় অর্থনীতিতে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এই শিল্পগুলিকে বৃহদায়তন শিল্পের সঙ্গে সমন্বয় সাধন নীতি ভারত সরকার গ্রহণ করিয়াছে।

বিগত ১৫ বছরে ক্ষুদ্র শিল্পের দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে। ১৯৬১ সালে রেজেষ্ট্রিভুক্ত ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা ছিল ৩৬,০০০ — ১৯৭৬ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৫·২৬ লক্ষ হয়। এই শিল্পগুলি হইতে ৫৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হয়। ইহাদের মোট উৎপাদন মূল্য হইল ১২,৪০০ কোটি টাকা। একদিকে যেমন সংখ্যাগত বৃদ্ধি ঘটিয়াছে অপর দিকে ঘটিয়াছে গুণগত বৈচিত্র্যসাধন। বর্তমানে ক্ষুদ্র শিল্পসংস্থাগুলি চিরাচরিত পণ্য উৎপাদন ছাড়াও নতুন এবং দক্ষতাভিত্তিক (sophisticated) পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছে যাহার মধ্যে আছে টি.ভি. সেট, পেস মেকার (cardiac pacemakers), শ্রবণযন্ত্র ইত্যাদি। ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে উৎসাহ দিবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ৮০৭টি বিষয় শুধুমাত্র এই শিল্পের জন্য সংরক্ষিত রাখিয়াছেন। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পক্ষেত্র হইতে ২৫০০ পণ্য উৎপাদিত হয়।

অধ্যাপক সুমাকার (E.F Schumacher) অর্থনীতি-দর্শনের (Meta-economics) দৃষ্টিকোণ হইতে ক্ষুদ্র শিল্পকে বিস্তার করিয়া এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন, "ক্ষুদ্রই সুন্দর" ("small is beautiful") ; নবতর যুক্তি দিয়া তিনি বলেন শিল্পে অহিংস উৎপাদন কৌশল প্রবর্তন করা আশু প্রয়োজন — প্রয়োজন এমন এক উৎপাদন কৌশল আবিষ্কার করা যাহার "মানবিক মুখ" আছে (technology with human face)। ক্ষুদ্র শিল্প ঠিক এরূপ এক শিল্প।

বৃহদায়তন শিল্পের যতই অগ্রগতি হইতেছে পরিবেশ ততই দূষিত হইতেছে। বায়ুমণ্ডল, জল এবং মৃত্তিকা দূষিত করিয়া বৃহদায়তন শিল্প মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করিয়া সমগ্র মানবসমাজের বিশেষ ক্ষতি সাধন করিতেছে। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির ভারসাম্য যাহাতে ক্ষুন্ন না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হইবে। ক্ষুদ্র শিল্প এই ভারসাম্যের কোন ক্ষতি করে না। ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে মাও সেতুং এবং মহাত্মা গান্ধীর অবদান সুমাকার শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন।

দ্বিতীয়ত, এই শিল্পের একটি বড় সুবিধা যে ইহা বিপুল সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ করিয়া দিয়াছে। গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রশিল্পে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা ২ কোটির মতো। দেশ যে ভয়াবহ বেকারসমস্যার সম্মুখীন তাহার সমাধান বৃহদায়তন শিল্পপ্রসারের মাধ্যমে হইবে না—বিরাট কর্মপ্রার্থীর একটা বড় অংশের কর্মসংস্থান হইবে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মাধ্যমে। বৃহদায়তন শিল্প মূলধন-প্রগাঢ় অর্থাৎ বৃহৎ শিল্পে যে পরিমাণ মূলধন নিয়োগ করা হয়

সেই পরিমাণে নিয়োগ বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প শ্রম-প্রগাঢ় অর্থাৎ যে পরিমান মূলধন বিনিয়োগ করা হয় তদপেক্ষা অধিক অনুপাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। ব্যাংকিং কমিশন উল্লেখ করিয়াছে, এক লক্ষ টাকা স্থির মূলধন বিনিয়োগ করিয়া ক্ষুদ্রশিল্পে ৫৫ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়, মাঝারি শিল্পে ২৭ জনের আর বৃহৎ শিল্পে হয় মাত্র ৬ জনের।

এই শিল্প স্বাধীন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে বলিয়া আমাদের অর্থনীতিতে ইহার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কার্ভে কমিটি এই অভিমত প্রকাশ করে যে, গণতন্ত্র সফল করিতে স্বাধীন শাসন যতখানি প্রয়োজন ঠিক ততখানি প্রয়োজন স্বাধীন কর্মসংস্থানের।

তৃতীয়তঃ, ভারতে মূলধনের পরিমাণ সীমাবদ্ধ যাহা বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠার পক্ষে একটা বড় বাধা। এই কারণে আমরা এরূপ প্রকৃতির শিল্প গঠন করিতে চাই যাহাতে অধিক শ্রমিক এবং অল্প মূলধন প্রয়োজন। কুটির এবং ক্ষুদ্র শিল্প শ্রম-প্রগাঢ় এবং মূলধন-স্বল্প পদ্ধতি বলিয়া এই ধরনের শিল্প গঠন করিলে অধিক মূলধনের প্রয়োজন হয় না।

চতুর্থত, কৃষির উপর জনসংখ্যার চাপ কমাইবার জন্যও ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্প প্রসারের প্রয়োজন। ভারতে জনসংখ্যার ৬৯ শতাংশ লোক জীবিকার জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ভারতে কৃষি জীবনধারণের জন্য একটি পদ্ধতি এবং ইহা একটি অবহেলিত, মুনাফাবিহীন পেশা। ইহা ব্যতীত, কৃষক বছরের কয়েক মাস মাত্র জমিতে কাজ করে আর বাকী সময় কার্যাভাবে আলস্যে দিন কাটায়। এইরূপ অবস্থায় কুটির শিল্পকে পার্শ্ববর্তী উপজীবিকা হিসাবে গ্রহণ করিয়া কৃষক তাহার আয় বৃদ্ধি এবং অবসর সময়ের যথাযথ সদ্ব্যবহার করিতে পারে। এছাড়া কোন বৎসর অজন্মা হইলে কৃষক ক্ষুদ্র শিল্পকে শেষ আশ্রয় হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিবে। ক্ষুদ্রশিল্পের প্রসার হইলে জমির উপর জনগণের চাপ এবং নির্ভরশীলতা হ্রাস পাইবে।

পঞ্চমত, অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণের যুক্তিতে কৃষির এবং ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার সমর্থন করা হয়। নগরাঞ্চলে বৃহদায়তন শিল্পগুলি যখন গড়িয়া ওঠে তখন সেগুলি নানা কারণে একস্থানে কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়ে। ইহার ফলে গৃহসমস্যা, স্বাস্থ্যসমস্যা এবং জনাধিক্য সমস্যা দেখা দেয়। কিন্তু ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার ঘটিলে এই ধরনের কোন সমস্যা দেখা দেয় না। দেশের সর্বত্র ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার বৃহদায়তন শিল্পের আঞ্চলিক কেন্দ্রীভবন জনিত অসুবিধা দূর করে। ইহা ব্যতীত গ্রামাঞ্চলে শিল্পকে ছড়াইয়া দিতে পারিলে ইহা গ্রামাঞ্চলে বিনিয়োগের

অভ্যাস গড়িয়া তুলিবে এবং বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে শিল্পায়নের বৈষম্য দূর করিবে।

ষষ্ঠত, ক্ষুদ্র শিল্পের সামাজিক ব্যয় (social cost) বৃহদায়তন শিল্প অপেক্ষা অনেক কম ; বৃহদায়তন উৎপাদন অবস্থায় ইউনিট প্রতি উৎপাদন-ব্যয় কম হয় এবং ইহা সত্য যে ছোট বহরে উৎপাদনব্যবস্থা পরিচালিত হইলে বৃহদায়তন উৎপাদনের ব্যয়সংকোচের সুবিধা পাওয়া যায় না কিন্তু এই অসুবিধা বণ্টনগত সুবিধার দ্বারা কিছু পরিমাণে পূরণ হইয়া যায়। বৃহদায়তন শিল্পের জন্য অধিক পরিমাণে পরিবহন এবং যোগাযোগের সুবিধা প্রয়োজন হয় ; কিন্তু ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে উহার বিশেষ প্রয়োজন হয় না।

সপ্তমত, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠন ভারতের অর্থনৈতিক নীতির লক্ষ্য। আর্থিক বৈষম্য হ্রাস করিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের এক বিশেষ ভূমিকা রহিয়াছে। বৃহদায়তন শিল্প কয়েকজন মুষ্টিমেয় শিল্পপতির হাতে দেশের সকল অর্থ কেন্দ্রীভূত করিতেছে ফলে ধনবৈষম্য বৃদ্ধি পাইতেছে। ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্পের বিকাশ করিতে পারিলে আয়বৈষম্য কিছু পরিমাণে হ্রাস পাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

অষ্টমত, বৃহদায়তন শিল্পে শুধু মাত্র প্রভূত মূলধনেরই প্রয়োজন হয় তাহ নয়, যথেষ্ট উন্নত কারিগরী জ্ঞানেরও প্রয়োজন হয়। ভারতে বর্তমানে অভিজ্ঞ টেক্‌নিসিয়ানের বিশেষ অভাব আছে। ভারতে বৃহদায়তন শিল্পের দ্রুত প্রসার হইতেছে না এবং যতদিন বৃহদায়তন শিল্পের দ্রুত প্রসার না ঘটে ততদিন দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে কৃষি এবং ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে।

নবমত, ক্ষুদ্র এবং কুটিরশিল্পে যে পরিমাণে দামের ওঠানামা হয়, বৃহদায়তন শিল্পে তদপেক্ষা অনেক বেশী হয়। ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে স্থির ব্যয় কম বলিয়া ইহা সহজেই মন্দার হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে।

পরিশেষে, পরিকল্পনার ফলে যে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ এবং ক্রয় ক্ষমতার সৃষ্টি হইতেছে তাহার দরুন যাহাতে মুদ্রাস্ফীতি আয়ত্তের বাইরে না যেতে পারে সেজন্য ক্ষুদ্র শিল্পপ্রসারের মাধ্যমে অধিক মাত্রায় ভোগ্যপণ্য উৎপাদন করিতে হইবে। ভারী শিল্পে ব্যয় বৃদ্ধি করিয়া অতি দ্রুত ভোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না। স্বল্পকালীন সময়ে ভোগ্যপণ্যের যোগান বৃদ্ধি করিয়া মুদ্রাস্ফীতির চাপ কমাইতে ক্ষুদ্র শিল্পের এক বিশেষ ভূমিকা রহিয়াছে।

ক্ষুদ্রশিল্পের সমস্যা ও তাহার প্রতিকার (Problems of small scale industries and their remedies):—ভারতের কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প নিম্নলিখিত সমস্যাগুলির সম্মুখীন হইয়াছে :

প্রথমত, মূলধনের সমস্যা : ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্পের উদ্যোক্তাদিগের প্রধানতঃ দুই ধরনের মূলধন প্রয়োজন হয়—দীর্ঘমেয়াদী মূলধন ও স্বল্পমেয়াদী মূলধন। যন্ত্রপাতি, জমি ইত্যাদি ক্রয় করিবার জন্য দীর্ঘমেয়াদী মূলধনের প্রয়োজন হয় এবং কাঁচামাল কিনিবার ও শ্রমিকদের মজুরী দিবার জন্য স্বল্পমেয়াদী মূলধনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উৎপাদকগণ সাধারণতঃ দরিদ্র এবং জামিন দিবার মতো তাহাদের কোন সম্পত্তি নাই। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উৎপাদকগণের সামান্য পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন হয়, সেই কারণে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি ইহাদের ঋণ সরবরাহ করা লাভজনক বলিয়া মনে করে না। এই কারণে ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপাদকগণ মহাজন, সাহুকর, বেনিয়া প্রভৃতির শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হয়। উচ্চ হারে সুদ আদায় করা ব্যতীত ইহারা অল্পদামে তাহাদের কাছে দ্রব্য বিক্রয়ের সর্তে ঋণ দিয়া থাকে ; এইভাবে উৎপাদক তাহার পক্ষে ন্যায্য দাম হইতে বঞ্চিত হয়।

মূলধন সমস্যা সমাধানে জন্য বিশেষ উন্নয়ন কর্পোরেশন গঠনের সুপারিশ করা হইয়াছে। আন্তর্জাতিক প্ল্যানিং দল ক্ষুদ্রশিল্পে ঋণদানের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া রাজ্য অর্থ কর্পোরেশন গঠনের নির্দেশ দেয়। বর্তমানে ১৮টি রাজ্য অর্থ কর্পোরেশন কার্যকরী রহিয়াছে।

ঋণপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিল্প অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ক্ষেত্র। ক্ষুদ্র শিল্পসংস্থাগুলি রাজ্য সরকার, বাণিজ্য ব্যাংক এবং রাজ্য অর্থ সরবরাহ কর্পোরেশনের কাছ হইতে ঋণ পায়। ১৯৭৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত তপশীলভুক্ত বাণিজ্য ব্যাংকগুলি চার লক্ষ ৭৭ হাজার ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাকে ২২৭৩ কোটি টাকা ঋণদান করে ; রাজ্য অর্থ কর্পোরেশন ৩২, ৯৪২টি ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থাকে ৪৬৭ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ মঞ্জুর করে। এছাড়া ভারতের শিল্প উন্নয়ন ব্যাংক রাজ্য অর্থ সরবরাহ কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে পুনঃ অর্থ প্রদানের নীতিকে আরও উদার করিয়াছে। যে সব উদ্যোক্তার লাভজনক প্রজেক্ট, টেকনিক্যাল জ্ঞান এবং পরিচালন দক্ষতা আছে কিন্তু অর্থ নাই তাহাদের এক কোটি টাকা পর্যন্ত মূল অর্থ (seed money) দিবার দুইটি প্রকল্প ভারতীয় শিল্প উন্নয়ন ব্যাংক লইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বর্তমানে ক্ষুদ্র শিল্পে মূলধন

সরবরাহের যে সকল কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার ফলে মূলধনের অভাব ঘটিবে না বলিয়া মনে হয়।

দ্বিতীয়ত, কাঁচামাল সংগ্রহের সুবিধা : কুটির এবং ক্ষুদ্রশিল্পগুলি নিয়মিতভাবে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎকৃষ্ট ধরনের কাঁচামাল পায় না বলিয়া নানারূপ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। ইহা ছাড়া মধ্যস্বত্বভোগী বা ফড়িয়া থাকার দরুণ কাঁচামালের দাম বেশী হয় আর সেই কারণে শিল্পজাত দ্রব্যেরও দাম বৃদ্ধি পায়। বিক্রয়মূল্য বেশী হওয়ায় বৃহদায়তন শিল্পসংস্থায় উৎপন্ন শিল্পজাত দ্রব্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কুটির এবং ক্ষুদ্র শিল্প পেরে ওঠে না। ক্ষুদ্রশিল্পের মালিক একসঙ্গে অধিক পরিমাণে কাঁচামাল ক্রয় করে না বলিয়া তাহাকে খুচরা দামে কিনিতে হয়—পাইকারী দামের সুবিধা সে পায় না। ক্ষুদ্রশিল্পগুলি যাহাতে ন্যায্য দামে উৎকৃষ্ট কাঁচামাল পায় তাহার জন্য সমবায় সমিতি গড়িয়া তুলিতে হইবে।

তৃতীয়ত, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উৎপাদন পদ্ধতি অত্যন্ত অনুন্নত, অদক্ষ এবং ইহারা মান্ধাতা আমলের যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদন করিয়া থাকে ; আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার এই ক্ষেত্রে বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই, গবেষণা ও শিক্ষার বিশেষ সুযোগসুবিধা নাই এবং গুণগত বিচারে উৎপন্ন দ্রব্যের মান নিম্নস্তরের। আধুনিক রুচি ও ফ্যাসন অনুযায়ী পণ্য উৎপাদনের বিশেষ প্রচেষ্টা দেখা যায় না।

বর্তমানে ক্ষুদ্রশিল্পে উৎপাদনকৌশল এবং পণ্যমান উন্নত করিবার জন্যে কার্যসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। আন্তর্জাতিক প্ল্যানিংদল উৎপাদনপদ্ধতি উন্নয়নের এবং কারিগরী শিক্ষা প্রসারের জন্য কয়েকটি সুপারিশ করে। এই দল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে চারটি কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (Regional Institutes of Technology) স্থাপনের প্রস্তাব দেয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ক্ষুদ্র শিল্পের কারিগরদিগকে যন্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিবে, উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি সম্পর্কে খোঁজখবর দিবে, গবেষণা করিবে এবং তাহার ফলাফল কারিগরদের জানাইবে। ইহা ব্যতীত ডিজাইন এবং ফ্যাসান শিক্ষা দিবার জন্য একটি জাতীয় ডিজাইন শিক্ষালয় (National School of Designs) স্থাপনের সুপারিশ করে।

ক্ষুদ্রশিল্পে টেকনিক্যাল সাহায্য এবং পরামর্শ দিবার জন্য ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন সংগঠন (Small Industries Development Organisation) স্থাপিত হইয়াছে। সারা দেশে এই সংস্থাটি ১৬টি ক্ষুদ্রশিল্প সেবা সংস্থার (Small

Industries Service Institutes) গঠন করিয়া তাহার মাধ্যমে শিল্প পরিচালনা এবং টেকনিক্যাল বিষয়ে শিক্ষাদান করিতেছে। কলিকাতা, দিল্লী, বোম্বাই এবং মাদ্রাজে চারটি আঞ্চলিক পরীক্ষাকেন্দ্র (Regional Testing) Centres) স্থাপিত হইয়াছে। ইহারা মেকানিক্যাল, রাসায়নিক এবং ইলেকট্রিক্যাল শিল্পের পরীক্ষার কাজ করিবে।

চতুর্থত, কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয়সমস্যা রহিয়াছে। উৎপন্ন দ্রব্যের সুনির্দিষ্ট মান না থাকায় এবং মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের অস্তিত্বের দরুন কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পে মালিকেরা তাহাদের পণ্যসামগ্রীর ন্যায্য দাম পায় না। মুদ্রাস্ফীতির দরুন সাধারণ লোকের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় চাহিদা হ্রাস পাইয়াছে। চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে উৎপাদকেরা ন্যায্য দাম পাইবে। রপ্তানী প্রসার করিয়া চাহিদা বৃদ্ধি করার উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে। আন্তর্জাতিক প্ল্যানিং দল বৈদেশিক বাজার প্রসারের জন্য রপ্তানী উন্নয়ন অফিস স্থাপনের সুপারিশ করিয়াছে। বহির্বাজারের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে অভ্যন্তরীণ বাজার বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে। ভারত পৃথিবীর বৃহত্তম সম্ভাব্য বাজার কারণ ভারতের জনসংখ্যা আয়তনে বিরাট এবং মাথাপিছু ভোগের পরিমাণ অত্যন্ত কম। অভ্যন্তরীণ বাজারে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যকে জনপ্রিয় করিয়া তোলার জন্য প্রদর্শনী, মিউজিয়াম ও সুনিপুণ প্রচারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

পঞ্চমত, বৃহদায়তন শিল্পের প্রতিযোগিতা হইতে ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্পকে বাঁচাইয়া রাখা এই শিল্পগুলির একটি বড় সমস্যা। অনেক ক্ষেত্রেই কুটির শিল্পজাত দ্রব্য বৃহদায়তন শিল্পজাত দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারে না, ইহার জন্য প্রয়োজন আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পকে সংগঠন করা এবং যতদিন পর্যন্ত এই শিল্পগুলি প্রাথমিক বাধাসমূহ অতিক্রম করিয়া স্বাবলম্বী হইয়া দাঁড়াইতে না পারে ততদিন পর্যন্ত বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সীমাবদ্ধ রাখা ও বৃহৎ শিল্পগুলির উপর শুল্ক ধার্য করা অথবা ইহাদের ভর্তুকী প্রদান করা। ইহা ছাড়া পণ্য বিক্রয়ের ব্যাপারে কর অব্যাহতির ব্যবস্থা করিয়াও কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যাইবে।

পরিশেষে, বৃহদায়তন এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বৃহদায়তন শিল্পের পরিপূরক হইতে পারে। ইহা ব্যতীত ক্ষুদ্র শিল্পের আংশিকভাবে উৎপাদিত দ্রব্যসমূহের বাকী

অংশ বৃহদায়তন শিল্পে সম্পন্ন হইতে পারে। ১৯৫৫ সালে জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন (National Small Industries Corporation) গঠিত হইয়াছে; ইহা ক্ষুদ্র শিল্পের মালিকদের সুবিধাজনক সর্তে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করিবে এবং ক্ষুদ্র ও বৃহদায়তন শিল্পের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিবে।

১৯৭৭ সালে প্রতি জেলায় জেলা শিল্পকেন্দ্র (DIC) গঠিত হইয়াছে। জেলার ক্ষুদ্র শিল্প মালিকদের ইহা সকল প্রয়োজন পূরণ করিবে এবং জেলার উন্নয়নের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাইবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র শিল্প (Small Scale Industries under the Five Year Plan) **:** ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতিতে কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পকে ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোর অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করার নীতি ঘোষণা করা হয়। পরিকল্পনাগুলিতে এই সরকারী নীতির প্রতিফলন দেখা যায়। প্রথম পরিকল্পনায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের গুরুত্ব স্বীকার করা হয়। এই শিল্পের উন্নতি হইলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাইবে, জীবনযাত্রার মান উন্নত হইবে এবং গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামোয় অধিকতর ভারসাম্য এবং সুসম্বদ্ধতা দেখা দিবে। কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতির জন্য প্রথম পরিকল্পনায় ৪৯ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়।

ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের উন্নয়নের দায়িত্ব প্রধানতঃ রাজ্য সরকারের হইলেও প্রথম পরিকল্পনাকালে ইহাদের সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ছয়টি বোর্ড স্থাপন করে—সারাভারত খাদি ও হস্তশিল্প বোর্ড, সারাভারত তাঁতশিল্প বোর্ড, ক্ষুদ্রশিল্প বোর্ড, কেন্দ্রীয় সিল্ক বোর্ড এবং নারকেল দড়ি বোর্ড।

ক্ষুদ্রশিল্পে অধিকতর ঋণদানের উদ্দেশ্যে রাজ্য অর্থ কর্পোরেশন গঠিত হয় ইহা ব্যতীত ঋণদানের ব্যাপারে ক্ষুদ্রশিল্পকে গ্যারান্টি দেওয়া ও ক্ষুদ্রশিল্পসংস্থা হইতে সরকারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের বন্দোবস্ত করার উদ্দেশ্যে জাতীয় ক্ষুদ্রশিল্প কর্পোরেশন (Nationel Small Industries Corporation) স্থাপিত হয়। পরিশেষে, সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমেও ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়নের চেষ্টা করা হয় এবং প্রতি ব্লকে একজন করিয়া ব্লক শিল্প উন্নয়ন অফিসারের পদ সৃষ্টি করা হয়। ফোর্ড ফাউণ্ডেশান দলের সুপারিশ অনুসারে প্রথম পরিকল্পনাকালে ক্ষুদ্রশিল্পকে পুনর্গঠিত করার চেষ্টা করা হয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দ্রুত শিল্পায়নের উপর জোর দেওয়ায়

ক্ষুদ্রও কুটির শিল্পের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করার নীতি গৃহীত হয়। কার্ভে কমিটির সুপারিশের উপর ভিত্তি করিয়া ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়নের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। কমিটি সুপারিশ দানকালে তিনটি প্রধান নীতির কথা স্মরণ রাখে : প্রথমত : ক্ষুদ্রশিল্পের যান্ত্রিক পরিবর্তনের দরুণ কর্মসংস্থানের পরিমাণ হ্রাস পাইবে না ; দ্বিতীয়ত, ক্ষুদ্রশিল্পের মূল নীতি হইবে বিকেন্দ্রীকরণ; এই জাতীয় শিল্প দেশের সর্বত্র গড়িয়া তুলিতে পারিলে বৃহৎ শিল্পগুলির এক-দেশজনিত অসুবিধা দূর হইবে। তৃতীয়ত, ক্ষুদ্র শিল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করিতে হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে মোট ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করিতে হইবে।

কার্ভে কমিটির (১৯৫৫) প্রধান প্রধান সুপারিশগুলি এইরূপ : (১) রাষ্ট্র সমবায় সমিতিগুলিকে অর্থ সাহায্য করিবে যাহাতে তাহারা ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করিতে পারে। সরকার, রাষ্ট্রীয় ব্যাংক ও রিজার্ভব্যাংক কি পদ্ধতিতে ক্ষুদ্রশিল্পগুলিকে সাহায্য করিবে কমিটি সে সম্পর্কে নির্দেশ দিয়াছে। (২) রাষ্ট্র কর্তৃক ক্ষুদ্র শিল্পজাত পণ্যের সর্বনিম্ন দাম বাঁধিয়া দিবার সুপারিশ করা হয়—কোন রকম ক্ষতি হইলে রাষ্ট্র তাহা পূরণ করিবে। (৩) ক্ষুদ্রশিল্প প্রসারের জন্য বৃহদায়তন শিল্পজাত পণ্যের উপর শুল্ক ধার্য করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত বৃহদায়তন শিল্পের ক্ষেত্র সংরক্ষণ করিয়া ক্ষুদ্র শিল্পকে সাহায্য করিতে হইবে। (৪) কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়নের জন্য একজন বিভাগীয় মন্ত্রী ও মন্ত্রিদপ্তর রাখিতে হইবে। (৫) সমবায়ের উপর যথোচিত গুরুত্ব দিতে হইবে; সমবায় সমিতির মাধ্যমে ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থাগুলিকে কাঁচামাল সরবরাহ করিতে হইবে ; সমবায় সমিতির মাধ্যমেই কেনাবেচা করিতে হইবে। (৬) কৃষি ঋণের মতো ক্ষুদ্র শিল্পে ঋণ সরবরাহের সামগ্রিক দায়িত্ব রিজার্ভ ব্যাংক গ্রহণ করিবে, ক্ষুদ্র শিল্পে ঋণ সরবরাহের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের কার্যপরিধি সম্প্রসারিত করিতে হইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও আয়বণ্টনের অধিকতর সমতা সাধনের উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্রশিল্পের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলিকে উন্নত টেকনিক প্রবর্তন করিয়া উহাদের গতিশীল করিবার নীতি গ্রহণ করা হয়। এই পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের কার্যসূচী রূপায়ণের ক্ষেত্রে পাঁচটি নীতির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া হয় : (১) কর্মীদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও উৎপাদনব্যয় হ্রাস করা ; (২) অর্থসাহায্য, বিক্রয় রেয়াৎ এবং সংরক্ষিত বাজারের উপর নির্ভরশীলতা ধীরে ধীরে কমানো ; (৩) ছোট

ছোট শহর ও গ্রামাঞ্চলে শিল্পের বিকাশ সাধন করিয়া আঞ্চলিক শিল্প-বৈষম্য হ্রাস করা ; (৪) বৃহদায়তন শিল্পের পরিপূরক হিসাবে ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ সাধন করা এবং (৫) কর্মী ও কারিগরদের সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করা।

তৃতীয় পরিকল্পনায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য ২৬৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। ইহা ছাড়া সমষ্টি উন্নয়ন কার্যসূচীতে আরও ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। ওই সময় কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পখাতে বেসরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ২৭৫ কোটি টাকা।

চতুর্থ পরিকল্পনায় কুটির ও গ্রামীণ শিল্পসম্পর্কিত কার্যসূচীর তিনটি উদ্দেশ্য ছিল : (১) ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে কার্যক্ষম করিয়া তোলা এবং উচ্চমানের পণ্য প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে ওই শিল্পগুলির উৎপাদন-কৌশলের ক্রমোন্নতি সাধন করা ; (২) শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ করা এবং (৩) কৃষিভিত্তিক শিল্পসমূহের বিকাশসাধন করা। এই উদ্দেশ্যগুলি কার্যকর করার জন্য ক্ষুদ্র শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন এবং বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ক্ষুদ্রশিল্পগুলি যাহাতে পাল্লা দিতে পারে সেইজন্য তাহাদের শুল্ক বিষয়ক সুবিধা অব্যাহত রাখা হয়। চতুর্থ পরিকল্পনা কালে ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পখাতে ২৯৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইলেও প্রকৃত ব্যয় হয় ২৫০ কোটি টাকা। বেসরকারীখাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৫৬০ কোটি টাকা।

পঞ্চম পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হইল দারিদ্র্য দূরীকরণ। এই উদ্দেশ্য সাধনে ক্ষুদ্র শিল্পের এক বিশেষ ভূমিকা আছে কারণ অতিরিক্ত এবং পূর্ণতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করিয়া এই শিল্প পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সাধনের বিশেষ সহায়ক। পঞ্চম পরিকল্পনাকালে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের কার্যসূচী রূপায়ণে নিম্নলিখিত নীতিগুলির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে : (১) নূতন নূতন উদ্যোক্তাদিগকে উৎসাহিত করিতে হইবে যাহার দরুন কর্ম-সংস্থানের সর্বাধিক সুযোগ সৃষ্টি হইবে ; (২) ক্ষুদ্র শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তির দক্ষতার পরিপূর্ণ ব্যবহার করিতে হইবে ; (৩) ক্ষুদ্র শিল্পগুলির উৎপাদন-কৌশলের উন্নতি করিয়া উহাদের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বাড়াইতে হইবে এবং (৪) নির্বাচিত উন্নয়ন কেন্দ্রে (growth centres) এই শিল্পগুলির সম্প্রসারণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। পঞ্চম পরিকল্পনাকালে সরকারী উদ্যোগে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে ৬১১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইলেও প্রকৃত ব্যয় হয়

৩৬২ কোটি টাকা। ষষ্ঠ পরিকল্পনায় কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পবাবদ ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে ১৪১০ কোটি টাকা।

উন্নয়নের আঞ্চলিক বৈষম্য (Regional Imbalances): যদিও ভারতীয় অর্থনীতি দ্রুত উন্নয়নের পথে অগ্রসর হইয়াছে, তথাপি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানী, জাপান প্রভৃতি দেশের তুলনায় সে এখনো অনেক পিছাইয়া রহিয়াছে। ভারতীয় অর্থনীতির একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে দেশের সকল অংশ সমান উন্নত নয়। কতকগুলি রাজ্য অপেক্ষাকৃত উন্নত আর কতকগুলি রাজ্য অনগ্রসর; আবার একই রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যথেষ্ট বৈষম্য রহিয়াছে। দেশের মধ্যে উন্নত এবং অনগ্রসর অঞ্চলের সহাবস্থানকে উন্নয়নের আঞ্চলিক বৈষম্য বলা হয়। মাথাপিছু আয়ের পার্থক্য, জীবনযাত্রার মানের তারতম্য, ব্যাপক বেকারত্ব, শহরাঞ্চলে মোট জনসংখ্যার অনুপাত প্রভৃতি আঞ্চলিক বৈষ্যমের লক্ষণ। যদি কোন অঞ্চলে বিনিয়োগ বা উন্নয়ন প্রয়াস উপেক্ষিত হয় বা অগ্রাধিকার লাভ করে তাহা হইলে উন্নয়নের আঞ্চলিক বৈষম্য ঘটিবে। বিনিয়োগ বা উন্নয়ন প্রয়াস সর্বত্র সমান হইলে সমতাপূর্ণ আঞ্চলিক উন্নয়ন সংঘটিত হইবে আর ইহার দরুন মাথাপিছু আয় বা জীবনযাত্রার মানে কোনরূপ আঞ্চলিক বৈষম্য দেখা দিবে না।

বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে মাথাপিছু আয় বণ্টন নিম্নলিখিত তালিকায় দেখান হইল:

তালিকা: ১. ১.

রাজ্য	মাথাপিছু আয় সূচক (১৯৬০-৬১)
	সর্ব ভারতীয় মাথাপিছু আয় টাকা ৩৩৪.৫৪ = ১০০
১। দিল্লী	২৬০·৫
২। মহারাষ্ট্র	১৪০·০
৩। পঃ বঙ্গ	১৩৮·৯
৪। পাঞ্জাব ও হরিয়ানা	১৩৪·৯
৫। গুজরাট	১১৭·৬
৬। তামিলনাড়ু	৯৯·৯
৭। আসাম	৯৯·৬
৮। ত্রিপুরা	৯৮·৬

৯।	হিমাচল প্রদেশ	৯৮·১
১০।	কেরালা	৯৪·১
১১।	মহীশূর	৯১·১
১২।	উত্তর প্রদেশ	৮৮·৯
১৩।	অন্ধ্র	৮৫·৮
১৪।	মধ্যপ্রদেশ	৮৫·৩
১৫।	উড়িষ্যা	৮২·৬
১৬।	রাজস্থান	৭৯·৯
১৭।	বিহার	৬৬·০

উৎস : ভারতীয় আদমসুমারী, ১৯৭১

উপরের তালিকা হইতে দেখা যে মাথাপিছু আয় দিল্লী, মহারাষ্ট্র পশ্চিমবঙ্গ এবং পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় অপেক্ষাকৃত বেশী ; পক্ষান্তরে উহা বিহার, রাজস্থান ও উড়িষ্যায় খুব কম।

কৃষির উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা অনগ্রসরতার লক্ষণ। কৃষির উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যার জাতীয় গড় হইল ৬৮·৬ শতাংশ ; কেরালার কৃষিনির্ভরশীল জনসংখ্যা সর্বাপেক্ষা কম, মাত্র ৪৮·৬ শতাংশ, উহার পর আছে পঃ বংগ, তামিলনাড়ু, পাঞ্জাব হরিয়ানা এবং মহারাষ্ট্র। কৃষিনির্ভরশীল জনসংখ্যা সর্বাধিক হইল বিহারে, ৮০·৪ শতাংশ, উহার পিছনে আছে মধ্যপ্রদেশ; উড়িষ্যা এবং উত্তরপ্রদেশ। নগরাঞ্চলে জনসংখ্যার অনুপাত অধিক হইলে উহাকে উন্নয়নের একটি লক্ষণ বলিয়া ধরিতে হইবে। মহারাষ্ট্রে মোট জনসংখ্যার ৩১·২ শতাংশ, শহরাঞ্চলে বাস করে; উহার পিছনে আছে তামিলনাড়ু গুজরাট, উড়িষ্যা, আসাম ও বিহার। মোট শিল্পে নিযুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত সর্বাধিক হইলে পঃ বঙ্গে—উহার পিছনে আছে মহারাষ্ট্র, কেরল, গুজরাট, তামিলনাড়ু, উড়িষ্যা, রাজস্থান, আসাম, বিহার এবং উত্তরপ্রদেশ।

১৯৬৫ সালে ৭৫টি বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীর অধীনে ৫৩৩টি বড় শিল্পকারখানা ছিল; উহার মধ্যে ২৮৮টি কারখানা ছিল মাত্র তিনটি রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গ (১৫২টি), মহারাষ্ট্র (৭১টি) এবং তামিলনাড়ু (৬৫টি) ; আবার পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার শিল্প উন্নয়ন অসমান। ১৫২টি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে কলকাতা হাওড়া, হুগলী ২৪ পরগণা এবং বর্ধমানে ১২৪টি অবস্থিত। অনুরূপভাবে মহারাষ্ট্রের ৭১টি শিল্প কারখানার ৪৯টি বোম্বাই-থানা অঞ্চলে অবস্থিত।

যে সকল রাজ্যে অধিকমাত্রায় নগরীকরণ ঘটিয়াছে সেখানে মাথাপিছু আয় যথেষ্ট উচ্চ। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যেমন বৈষম্য রহিয়াছে সেইরূপ একই রাজ্যের বিভিন্ন জেলার মধ্যেও তীব্র বৈষম্য দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে ১৯৬১-৬২ সালে কলিকাতায় মাথাপিছু আয় ছিল ৮৫০ টাকা কিন্তু পুরুলিয়া জেলায় তখন উহা মাত্র ১৯৭ টাকা ছিল।

আঞ্চলিক বৈষম্যের কারণসমূহ ঃ নিম্নলিখিত কারণে আঞ্চলিক বৈষম্য ঘটিয়া থাকে। প্রথমত, বিকাশমান অর্থনীতিতে ভৌগোলিক অবস্থান অর্থনৈতিক উন্নয়নকে যতখানি প্রভাবিত করে উন্নত অর্থনীতিতে উহার প্রভাব অনেক কম। প্রাকৃতিক সম্পদের নৈকট্য জলবায়ু ও কৃষি-উৎপাদনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া ভৌগোলিক অবস্থান অর্থনৈতিক উন্নয়নে পার্থক্য ঘটায়। শিল্পস্থাপনে কতকগুলি অঞ্চলের অবস্থানগত সুবিধা থাকায় শিল্পসমূহ ওই স্থানে আকৃষ্ট হয়। লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, তৈল শোধনাগার প্রভৃতি শিল্প সেই সকল অঞ্চলে স্থাপিত হইবে সেখানে অবস্থানগত সুবিধা আছে। দ্বিতীয়ত, ঐতিহাসিক দিক থেকে দেখা যায় যে ভারতে বৃটিশ শাসনকাল হইতেই অনগ্রসর এলাকার অস্তিত্ব সুরু হয়। যে সকল অঞ্চলে শিল্প ও বাণিজ্য প্রসারের সম্ভাবনা ছিল ইংরেজরা সেইসব অঞ্চলের উন্নয়নে সহায়তা করে; পশ্চিমবঙ্গ এবং মহারাষ্ট্র এই দুইটি প্রদেশকে ইংরেজ শিল্পপতিগণ বিশেষ পছন্দ করেন। লর্ড কর্ণওয়ালিশ প্রবর্তিত জমিদারি প্রথার প্রভাবে গ্রামগুলি নিঃস্ব হইতে থাকে, এই ভূমিব্যবস্থা উন্নয়নের প্রতিবন্ধক ছিল ; বৃটিশ যুগে অসমান বিনিয়োগের দরুণ কতকগুলি অঞ্চল সমৃদ্ধশালী হইয়া ওঠে কিন্তু অন্যান্য অঞ্চল অনুন্নত থাকিয়া যায়। তৃতীয়ত উন্নত অঞ্চলে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা করিলে উপকাঠামোগত সুবিধা (infrastructural advantages) যথা পরিবহন, বিদ্যুৎ, দক্ষ শ্রমিক, বাজার ইত্যাদি পাওয়া যায়। বেসরকারী উদ্যোক্তারা সাধারণত বাহ্যিক সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে উন্নত অঞ্চলে বিনিয়োগ করে। ইহার ফলে উন্নত অঞ্চল অধিকতর উন্নত হয় আর অনগ্রসর অঞ্চল আরও পিছিয়ে পড়ে। পরিশেষে, স্বাধীনতা লাভের পরও আঞ্চলিক বৈষম্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে এই কারণে যে কতকগুলি রাজ্য এ ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি দেয় নাই ; ইহা ব্যতীত কৃষিক্ষেত্রে উন্নত কৃষি-কৌশল প্রয়োগের দরুন যে সবুজ বিপ্লব সংঘঠিত হয় তাহা সর্বত্র প্রসারিত হয় নাই।

ন্যায়বিচারের দিক থেকে বলা যায় যে অসম উন্নয়ন ক্ষতিকারক। আয়-বৈষম্য যেমন অবাঞ্ছিত সেইরূপ উন্নত ও অনুন্নত অঞ্চলের সহাবস্থান অকাম্য।

আঞ্চলিক বৈষম্য ঘটিলে উহা অনগ্রসর অঞ্চলের জনগণের মধ্যে অসন্তোষ ও বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাবের সৃষ্টি করে যাহা পরিণামে দেশের দায়িত্বের পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়ায়। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার বিদ্রোহ এবং বিচ্ছিন্নতা সম্পূর্ণরূপে আঞ্চলিক বৈষম্যের বিষময় পরিণতি।

আঞ্চলিক বৈষম্য ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা: পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-সমূহের অন্যতম লক্ষ্য হইল আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস করা এবং সুসম আঞ্চলিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত করা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বলা হয় যে কোন ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনায় অনগ্রসর এলাকার বিশেষ প্রয়োজনগুলির প্রতি যথোচিত দৃষ্টি দিতে হইবে। বিনিয়োগকাঠামো এরূপ করিতে হইবে যাহার দরুন সুষম আঞ্চলিক উন্নয়ন হইতে পারে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনটি পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হইবে: প্রথমত, দেশের বিভিন্ন অংশের জনগণের প্রত্যক্ষ কল্যাণের সঙ্গে জড়িত কার্যসূচীর উপর জোর দিতে হইবে; দ্বিতীয়ত, কোন কারণে কোন অঞ্চলে উন্নয়ন ব্যাহত হইলে সেখানে বিশেষ কার্যসূচী গ্রহণ করিতে হইবে; তৃতীয়ত, বিকেন্দ্রীভূত শিল্প উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে যাহা পরে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উন্নয়নের অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করিবে।

তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যসূচী এরূপভাবে প্রস্তুত করা হয় যাহাতে বিভিন্ন অঞ্চলের উন্নয়ন বৈষম্য হ্রাস করা যায়, যদিও ইহা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। পরিকল্পনায় এরূপ কার্যসূচী গ্রহণ করা হয় যাহা অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর এলাকায় উন্নয়ন সম্ভাবনা বৃদ্ধি করিবে। কৃষির আত্যন্তিক উন্নয়ন, গ্রামীণ শিল্প স্থাপন, বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ, রাস্তা পরিবহন, জল সরবরাহ, শিক্ষার সুযোগ এবং তপশীল জাতির কল্যাণমূলক কার্যসূচী এই কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত। আঞ্চলিক বৈষম্য কমাইবার জন্য প্রথম তিন পরিকল্পনায় যে সকল উল্লেখযোগ্য কাজ করা হইয়াছে তাহা হইল: (১) অনগ্রসর অঞ্চলের জন্য অধিক পরিমাণে কেন্দ্রীয় সাহায্য প্রদান, (২) কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প স্থাপনে অনগ্রসর এলাকাকে অগ্রাধিকার প্রদান, (৩) নাগাভূমি এবং উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চলের মতো পশ্চাৎপদ অঞ্চলের জন্য বিশেষ সাহায্য প্রদান, (৪) অনগ্রসর অঞ্চলে বেসরকারী উদ্যোক্তাদের লাইসেন্স দানে অগ্রাধিকার দান এবং (৫) শহরাঞ্চলে শিল্পতালুক স্থাপন।

যদিও আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস ভারতে পরিকল্পনার একটি প্রধান উদ্দেশ্য, চতুর্থ পরিকল্পনায়ই সর্বপ্রথম এ ব্যাপারে সচেতনভাবে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া

হয়। ক্রমবর্ধমান আঞ্চলিক বৈষম্য সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে এই সময়ে সরকারের কাছে উদ্বেগের কারণ হইয়া দেখা দেয়। সমস্যাটি খুবই জটিল এবং কেন্দ্র, রাজ্য ও জেলা পর্যায়ে সুসম্বদ্ধ প্রয়াস চালাইয়া ইহার মোকাবিলা করিতে হইবে।

চতুর্থ পরিকল্পনায় এই সমস্যা সমাধানের জন্য কতকগুলি কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়।

প্রথমত, আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাসের জন্য কেন্দ্রীয় সাহায্য প্রদানের ব্যাপারে অনগ্রসর অঞ্চলকে অগ্রাধিকার প্রদান করা। মাথাপিছু আয় জাতীয় গড় অপেক্ষা কম হইলে সেই রাজ্যকে কেন্দ্রীয় সাহায্যের ১০ শতাংশ দিবার নীতি গ্রহণ করা হয়। এই ব্যবস্থায় বিহার, কেরল, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশ সুবিধা লাভ করে। পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ুর পার্বত্য অঞ্চলের জনগণও বিশেষ কেন্দ্রীয় সাহায্যের সুবিধা লাভ করে। দ্বিতীয়ত, অনগ্রসর অঞ্চলে কেন্দ্রীয় প্রকল্প স্থাপনের নীতি অব্যাহত থাকে। চতুর্থ পরিকল্পনায় অনগ্রসর অঞ্চলে কেন্দ্রীয় শিল্পপ্রকল্পে বিনিয়োগের জন্য মোট ব্যয়ের ৭৭ শতাংশ প্রদান করা হয়। তৃতীয়ত, পরিকল্পনা কমিশন রাজ্য সরকারগুলিকে জেলার উন্নয়নের জন্য জেলা পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে নির্দেশ দেয়। পরিশেষে, ২২৯টি অনগ্রসর জেলা চিহ্নিত করা হইয়াছে যাহারা সরকারী অর্থ-সরবরাহ-সংস্থা থেকে সুবিধাজনক সুদের হারে ঋণ পাইবে।

ভারতীয় শিল্পসংরক্ষণ (Protection of Indian Industries) : পৃথিবীর সকল দেশে শিল্পোন্নয়ন সমান নয়। পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও অনেক দেশে শিল্পোন্নয়ন হয় নাই; কারণ যাহারা শিল্পায়নে পথিকৃৎ হইয়াছিল তাহারাই অধিকতর শিল্পজ্ঞান ও দক্ষতার অধিকারী হইয়াছিল। এই সকল শিল্পোন্নত দেশগুলির সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া অনুন্নত দেশগুলি শিল্পপ্রসার করিতে পারে নাই। অর্ধোন্নত দেশগুলির উন্নয়নের প্রাথমিক অবস্থায় সংরক্ষণের সাহায্যে দেশীয় শিল্পকে বিদেশী সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পের প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিতে হইবে। প্রাথমিক পর্যায়ে যদি শিল্পকে সংরক্ষণ দেওয়া হয় তাহা হইলে কালক্রমে ইহারা বৈদেশিক শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় পাল্লা দিতে পারিবে। সুতরাং শৈশব অবস্থায় শিল্পগুলিকে লালন-পালন করিতে হইবে, বাল্যকালে তাহাদের রক্ষা করিতে হইবে এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে প্রতিযোগিতার সম্মুখে ছাড়িয়া দিতে হইবে।

সংরক্ষণের ফলে যে সাময়িক ক্ষতি হইবে শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে সে ক্ষতি পোষাইয়া যাইবে। ভারতের ন্যায় অর্ধোন্নত দেশ সম্পর্কে এই যুক্তি বিশেষ-ভাবে প্রযোজ্য।

১৯২১ সালে শিল্পসংরক্ষণের প্রশ্নটি বিবেচনার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার প্রথম ফিস্‌ক্যাল কমিশন (Fiscal Commission) নিয়োগ করে। ইতি-পূর্বে কোন ফিস্‌ক্যাল কমিশন নিযুক্ত হয় নাই।

স্বদেশী দ্রব্য ও শিল্পকে সুবিধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিদেশী পণ্য আমদানীর উপর বাধানিষেধ আরোপ করাকে সংরক্ষণ বলে; সংরক্ষণের নানা পদ্ধতি আছে, ইহাদের মধ্যে শুল্ক (duties) এবং অর্থসাহায্যই (subsidies) প্রধান। বিদেশী দ্রব্য আমদানীর উপর শুল্ক বসাইলে বিদেশী পণ্যের দাম বাড়িবে আর ইহার দরুন দেশীয় উৎপাদকেরা বিদেশী উৎপাদকের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হয়। দ্বিতীয়ত, যদি দেশীয় শিল্প বিদেশী প্রতিযোগিতার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে না পারে তাহা হইলে সরকার সংগৃহীত কর হইতে দেশীয় শিল্পকে অর্থ সাহায্য করিতে পারেন, ফলে অপেক্ষাকৃত কম দামে দেশীয় উৎপাদকেরা বিদেশী উৎপাদকের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে। উপযুক্ত শুল্কনীতির দরুণ বৈদেশিক প্রতিযোগিতার হাত হইতে দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করিয়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করা হয়।

১৯২১ সালে এগারোজন সদস্যবিশিষ্ট ফিস্‌ক্যাল কমিশনের সভাপতি ছিলেন স্যার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা। কমিশন ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে বিভেদমূলক সংরক্ষণনীতি (Discriminating protection) গ্রহণের সুপারিশ করে। ইহার অর্থ সকল শিল্পকেই সংরক্ষণ দেওয়া হইবে না, সংরক্ষণ দেবার সময় বিচার করিয়া দেখিতে হইবে কোন শিল্প সংরক্ষণ পাইবার যোগ্য। সংরক্ষণ লাভে যোগ্যতা বিচারের তিনটি মূলনীতি ছিল: প্রথমত, শিল্পটির পক্ষে স্বাভাবিক সুবিধা (natural advantage) থাকা প্রয়োজন অর্থাৎ পর্যাপ্ত পরিমাণে কাঁচামালের যোগান, যথেষ্ট পরিমাণ শ্রমিকের যোগান, বিস্তৃত বাজার প্রভৃতি থাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, শিল্পটি এরূপ হাওয়া চাই যে সংরক্ষণ ব্যতীত ইহার উন্নয়ন সম্ভব নয় অথবা জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে যত দ্রুত প্রসার লাভ করা প্রয়োজন বিনা সংরক্ষণে তাহা সম্ভবপর নয়। তৃতীয়ত, শিল্পটি এরূপ হাওয়া চাই যাহা সংরক্ষণ পাইয়া অদূর ভবিষ্যতে এমন উন্নত হইয়া উঠিবে যে তখন উহা বিনা সংরক্ষণেই বৈদেশিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে পারিবে।

ইহা ব্যতীত যদি আশা করা যায় যে শিল্পটি অদূর ভবিষ্যতে দেশের সমগ্র চাহিদা পূরণ করিতে পারিবে অথবা উহা দেশরক্ষা সংক্রান্ত শিল্প অথবা মূল শিল্প তাহা হইলে সংরক্ষণের দাবী অগ্রগণ্য হইবে।

এই শুল্কনীতিকে তীব্রভাবে সমালোচনা করা হইয়াছিল। এই নীতি অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং দেশে শিল্পায়নের আদৌ অনুকূল ছিল না। অবশ্য সরকার দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অংশ হিসাবে ইহাকে গ্রহণ করে নাই। সংরক্ষণ দানে ওই তিনটি মূলনীতির কঠোর প্রয়োগের ফলে অধিকাংশ শিল্পই সংরক্ষণের সুবিধা লাভ হইতে বঞ্চিত হয়। এই শুল্ক নীতিতে শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলিকেই সংরক্ষণ দেওয়া হয়, নূতন শিল্প স্থাপনের কোন প্রয়াস দেখা যায় না। অবশ্য আমরা আশা করিতে পারি না যে বিদেশী সরকার তাহার সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ সংকুচিত করিয়া ভারতীয় শিল্পের সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করিয়া দিবে। অবশ্য ইহা অনস্বীকার্য যে এই শুল্কনীতি কিছু পরিমাণে ভারতের শিল্প সম্প্রসারণে সহায়তা করিয়াছে। এই সর্তভিত্তিক ও সীমিত সংরক্ষণের দরুন লৌহ ও ইস্পাত, চিনি প্রভৃতি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প গড়িয়া ওঠে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় শিল্প সংরক্ষণের প্রয়োজনীতা প্রায় লোপ পায়। যুদ্ধের ফলে একপ্রকার স্বাভাবিক সংরক্ষণের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং তার সুযোগ লইয়া শিল্পপতিগণ নূতন শিল্প গড়িয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদের মনে আশংকা ছিল যে যুদ্ধোত্তর কালের অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে নবগঠিত শিল্পগুলি ধ্বংস হইয়া যাইবে। ১৯৪০ সালে ভারত সরকার ঘোষণা করেন যে যুদ্ধের সময় স্থাপিত সুসংগঠিত শিল্পগুলিকে যুদ্ধোত্তর যুগে সংরক্ষণ দিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

নূতন ফিস্‌ক্যাল নীতি, ১৯৪৯-৫০ (New Fiscal Policy, 1949-50) ১৯৪৮ সালে শিল্পনীতি ঘোষণায় উপযুক্ত ফিস্‌ক্যাল নীতি প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল এবং তদনুসারে ১৯৪৯ সালে ভি টি কৃষ্ণমাচারীর সভাপতিত্বে একটি ফিস্‌ক্যাল কমিশন গঠন করা হয়। ১৯৫০ সালে কমিশন তার রিপোর্ট পেশ করে।

পরিকল্পনার অগ্রাধিকার ও লক্ষ্য অনুযায়ী ভারতীয় শিল্পের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করিতে হইলে উপযুক্ত শুল্কনীতি প্রবর্তন করা প্রয়োজন। দেশের বৃহত্তর উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে সংরক্ষণ নীতিকে বিচার করিতে হইবে; অর্থাৎ সংরক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হইবে শিল্পের সামগ্রিক উন্নয়ন। শুল্কনীতি এরূপ হইবে

অর্থনৈতিক পরিবেশ এবং সামগ্রিকভাবে উৎপাদন ব্যবস্থা উন্নত হয়। মাত্র কয়েকটি বিশেষ শিল্পের বিচ্ছিন্ন উন্নয়ন ইহার লক্ষ্য হইবে না। এই পটভূমিকায় বিচার করিলে বলিতে হইবে যে সংরক্ষণ উদ্দেশ্য নয়—জাতীয় কল্যাণ বৃদ্ধির উপায় মাত্র।

প্রথম ফিস্‌ক্যাল কমিশনের বিভেদমূলক সংরক্ষণ নীতির উদ্দেশ্যে ছিল বৈদেশিক প্রতিযোগিতায় পর্যুদস্ত কয়েকটি বিক্ষিপ্ত শিল্পকে অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সহায়তা করা। অপরিকল্পিত পদ্ধতিতে দেশের শিল্পোন্নয়নের ভিত্তি প্রস্তুত করা ইহার লক্ষ্য ছিল না। পক্ষান্তরে এই নূতন ফিসক্যাল কমিশন সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ভারতীয় শুল্কনীতির বিচার করিয়াছে। এই কমিশন ভারতের শিল্পোন্নয়নের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া শিল্পসংরক্ষণ নীতি নির্ধারণ করিয়াছে। সংরক্ষণ যে দেশের শিল্পবিকাশের একটি উপায় এ সম্পর্কে কমিশন সচেতন ছিল। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে পূর্বতন ফিস্‌ক্যাল নীতি ছিল প্রতিরক্ষামূলক সংরক্ষণ নীতি (defensive protection), অপরপক্ষে নূতন সংরক্ষণ নীতি হইল উন্নয়নমূলক সংরক্ষণ নীতি (developmental protection); দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও স্বার্থ বিবেচনা করিয়া নূতন ফিস্‌ক্যাল নীতি নির্ধারিত হইয়াছে।

সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে নূতন সংরক্ষণ নীতিতে ভারতীয় শিল্পগুলিকে তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথমত, প্রতিরক্ষা শিল্পসমূহ: এই সব শিল্পগুলিকে সম্পূর্ণ সংরক্ষণ দিতে হইবে; ইহাতে ব্যয় যত বেশীই হোক না কেন, আর্থিক ক্ষতি যতই হোক না কেন, সরকারকে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। দ্বিতীয়ত, মূল ও ভারী শিল্প: এই শিল্পগুলিকে কি পরিমাণ সংরক্ষণ দিতে হইবে তাহা ট্যারিফ কমিশন কিছুকাল পর পর বিবেচনা করিয়া দেখিবে। এই শিল্পগুলিকে সংরক্ষণ দানের ব্যাপারে ট্যারিফ কমিশনকে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। সংরক্ষণ দানে কোন কঠোর নীতি অনুসরণ করিবার প্রয়োজন নাই। তৃতীয়ত, অন্যান্য শিল্প: মূল ও ভারী শিল্প ছাড়া অন্যান্য সকল শিল্প এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের মধ্যে যে সব শিল্প পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার পাইবে অথবা যাহারা মূল শিল্পের পরিপূরক বা সহায়ক তাহাদেরও সংরক্ষণ দেওয়া উচিত। শিল্পের অর্থনৈতিক সুবিধা, সংরক্ষণ ব্যয় এবং জাতীয় স্বার্থ বিবেচনা করিয়া সংরক্ষণ দেওয়া বা না দেওয়ার নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

সংরক্ষিত শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগী বৈদেশিক দ্রব্যের

উপর আমদানী শুল্ক স্থাপন করা হয়। এই আমদানী শুল্ক সঞ্চয় করিয়া একটি উন্নয়ন তহবিল গঠন করিতে হইবে এবং যেসব শিল্পকে অর্থ সাহায্য করা প্রয়োজন তাহাদিগকে এই তহবিল হইতে অর্থ সাহায্য করা হইবে।

শিল্পে সংরক্ষণ দিবার সকল সমস্যার বিচারবিশ্লেষণের জন্য একটি স্থায়ী ট্যারিফ কমিশন গঠনের সুপারিশও এই ফিস্‌ক্যাল কমিশন করিয়াছে। নূতন ট্যারিফ কমিশন কিভাবে কাজ করিবে তাহার স্পষ্ট নির্দেশ ফিস্‌ক্যাল কমিশন দিয়াছে। যে সব শিল্পে সস্তায় শ্রমিক পাইবার এবং অভ্যন্তরীণ বিস্তৃত বাজার লাভের সুযোগ আছে কিন্তু কাঁচামাল বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয় সেগুলিকেও সংরক্ষণ দিয়া বিকাশ করিতে হইবে। কোন শিল্পকে সংরক্ষণ দান করিলে যদি সেই শিল্পজাত সামগ্রী দেশের সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইতে না পাবে তথাপি সংরক্ষণদানে কোন প্রকার বাধা থাকিবে না। শিল্পকে সংরক্ষণ দিবার সময় অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা ছাড়াও বিদেশে সেই শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানী করার কোন সম্ভাবনা আছে কিনা তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে প্রভূত পরিমাণে মূলধন প্রয়োজন সেগুলিকে প্রথম হইতেই সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে নতুবা কেহই এ ধরনের শিল্প স্থাপনে অগ্রসর হইবে না। প্রয়োজন হইলে, জাতীয় স্বার্থের খাতিরে কৃষিজ দ্রব্যসামগ্রীকেও সংরক্ষণ দেওয়া যাইতে পারে; তবে এই ক্ষেত্রে সংরক্ষণ এক সঙ্গে পাঁচ বৎসরের অধিক কালের জন্য দেওয়া হইবে না। আরও বলা হইয়াছে যে, যখন কোন শিল্পকে সংরক্ষণ দেওয়া হইবে তখন সেই শিল্পের উপর কোন উৎপাদন শুল্ক ধার্য করা হইবে না।

যে সব শিল্প সংরক্ষণের সুবিধা পাইবে তাহাদের কতকগুলি বিশেষ দায়িত্ব পালন করিতে হইবে। তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যাদির মান উচ্চ এবং দাম ন্যায্য রাখিতে হইবে।

ভারত সরকার এই ফিস্‌ক্যাল কমিশনের সকল সুপারিশ গ্রহণ করে এবং ১৯৫২ সাল হইতে স্থায়ী ট্যারিফ কমিশন কাজ আরম্ভ করিয়াছে।

এই নূতন ফিস্‌ক্যাল নীতি সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে এই নীতি নূতন দৃষ্টিভংগী লইয়া সংরক্ষণের নূতন নীতি নির্ধারণ করিয়াছে। প্রথম ফিস্‌ক্যাল নীতির সঙ্গে নূতন ফিস্‌ক্যাল নীতির চারটি মূল পার্থক্য দেখা যায়। প্রথমত, পূর্বতন ফিস্‌ক্যাল কমিশন যে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছিল তাহাকে প্রতি-রক্ষামূলক সংরক্ষণ বলা হয়, অপর পক্ষে নূতন ফিসক্যাল নীতিকে উন্নয়ন-

মূলক সংরক্ষণ বলা হয়। পূর্বতন ফিস্‌ক্যাল নীতিতে সংরক্ষণকে দেখা হইয়াছিল একটি লক্ষ্য হিসাবে কিন্তু নূতন নীতিতে ইহাকে দেখা হইয়াছে একটি উপলক্ষ্য হিসাবে—যাহার মূল লক্ষ্য দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের বিকাশ সাধন। দ্বিতীয়ত, পূর্বতন ফিস্‌ক্যাল নীতি অনুসারে বিভিন্ন শিল্পকে পৃথক পৃথক ভাবে দেখা হইয়াছে কিন্তু নূতন ফিস্‌ক্যাল নীতির দৃষ্টিতে বিভিন্ন শিল্পকে এক অখণ্ড পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে দেখা হইয়াছে। তৃতীয়ত, পূর্বতন ফিস্‌ক্যাল নীতিতে কতকগুলি সর্ত পূরণ করিলে তবেই সেই শিল্পকে সংরক্ষণ দেওয়া হইত কিন্তু নূতন ফিস্‌ক্যাল নীতিতে এই সব সর্তকে মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করা হয় নাই। জাতীয় আর্থিক উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত সকল শিল্পকেই সংরক্ষণ দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। চতুর্থত, নূতন ফিস্‌ক্যাল নীতিকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলি হইতে পৃথক করিয়া দেখা চলে না। এই নূতন ফিস্‌ক্যাল কমিশন যখন তার রিপোর্ট পেশ করে তখনো অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গৃহীত হয় নাই সত্য, কিন্তু পরিকল্পিত অর্থনীতির আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া এই নূতন ফিসক্যাল নীতি গৃহীত হইয়াছিল।

নূতন ফিসক্যাল নীতিতে সংরক্ষণদানের কথাই বলা হইয়াছে কিন্তু সংরক্ষণ নীতির অবসান সম্পর্কে কমিশন কিছুই নির্দেশ দেন নাই। উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে সংরক্ষণ প্রয়োজনীয় হইতে পারে কিন্তু দীর্ঘকাল সংরক্ষণ চালু রাখা শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয়, উহা দেশের বৃহত্তর স্বার্থের পরিপন্থীও হইতে পারে। বেসরকারী শিল্পে দীর্ঘস্থায়ী সংরক্ষণ কায়েমী স্বার্থের সৃষ্টি করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, পরিকল্পনাধীন শিল্প হইলেই যে সংরক্ষণ দান করিতে হইবে এই নীতিও যুক্তিসঙ্গত নয় কারণ পরিকল্পনাধীন প্রতিটি শিল্পের সংরক্ষণের প্রয়োজন নাও থাকিতে পারে।

অনুশীলনী

১। সমালোচনা সহকারে ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতি ব্যাখ্যা কর।

২। ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতির বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি? ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতির সহিত ইহার কোন মূল পার্থক্য আছে কি?

৩। ১৯৭৭ সালের শিল্পনীতির বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

৪। ১৯৮০ সালেব শিল্পনীতি ব্যাখ্যা কর।

৫। বিকাশমান অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তার যুক্তিগুলি বর্ণনা কর।

৬। রাষ্ট্রীয় কারবার পরিচালনার পদ্ধতিগুলি কি কি? উহাদের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ বলিয়া তুমি মনে কর?

৭। বিকাশমানের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক মূলধনের ভূমিকা আলোচনা কর।

৮। বৈদেশিক মূলধন ব্যবহারের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি আলোচনা কর।

৯। বৈদেশিক মূলধন সম্পর্কে ভারতে সরকারী নীতি কি তাহা আলোচনা কর।

১০। ভারতীয় শিল্পে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের কারণগুলি কি কি? এ সম্পর্কে সরকারী নীতি কি?

১১। ভারতীয় অর্থনীতিতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের ভূমিকা আলোচনা কর।

১২। ভারতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির সমস্যাগুলি কি কি? ওইগুলি কি ভাবে সমাধান করা যায় তাহা আলোচনা কর।

১৩। ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলিতে ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নতির জন্য যে সব কার্যসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা উল্লেখ কর।

১৪। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যে বৈষম্য দেখা যায় তাহার কারণসমূহ ব্যাখ্যা কর। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহ আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাসে কতখানি কার্যকর হইয়াছে তাহা আলোচনা কর।

১৫। ভারতে নূতন ফিস্‌ক্যালনীতির বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। পুরাতন নীতির সহিত নূতন নীতির পার্থক্য কোথায়?

অষ্টম অধ্যায়

পরিকল্পনার অর্থ সংস্থান

(Financing the Plan)

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ করিবার মতো মূলধনের উৎস হইল দুইটি, একটি অভ্যন্তরীণ উৎস আর অপরটি বৈদেশিক উৎস।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল উৎস হইল অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত সৃষ্টি। অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত বলিতে বোঝায় মোট জাতীয় উৎপাদন এবং মোট ভোগের পার্থক্য। উন্নতিকারী দেশগুলিতে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত কম হওয়ার কারণ হইল মূলধনের স্বল্পতা। মূলধন অল্প বলিয়া বিনিয়োগ কম হয় আর বিনিয়োগ কম হওয়ার ফলে উৎপাদন কম হয়। অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি করিবার দুইটি উপায় আছে— বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা অথবা ভোগ হ্রাস করা। জাতীয় উৎপাদন প্রদত্ত ধরিয়া অগ্রসর হইলে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত সর্বাধিক করার উপায় হইল ভোগব্যয়কে সঙ্কুচিত করা। সোভিয়েত রাশিয়া ভোগকে কঠোর ভাবে হ্রাস করিয়া বিস্ময়জনকভাবে মূল ও ভারী শিল্পের দ্রুত সম্প্রসারণ করিয়াছিল। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ায় একনায়কতন্ত্রী শাসনে ভোগকে যতখানি হ্রাস করা সম্ভব হইয়াছিল, ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশে তাহা সম্ভব নয়। ইহা ছাড়া ভারতে মাথাপিছু আয় খুব কম এবং জীবনযাত্রার মান অবিশ্বাস্য রকমের নীচু; ভোগকে অধিক হ্রাস করিলে উহা দক্ষতা হ্রাসের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে।

শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত সৃষ্টিই যথেষ্ট নয়, সেই উদ্বৃত্ত দক্ষতার সঙ্গে ফিস্‌ক্যাল পদ্ধতির সাহায্যে একত্রীকরণ করিতে হইবে। জনগণের মধ্যে দেশপ্রেমের প্রভাব গভীর হইলে উদ্বৃত্ত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সরকারের ফিস্‌ক্যাল নীতির বিরুদ্ধে ন্যূনতম অসন্তোষ দেখা দেয় এবং উদ্বৃত্ত একত্রীকরণ অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। অর্ধোন্নত দেশে জাতীয় আয়ের অনুপাত কৃষি হইতে আগে আর সেই কারণে কৃষি হইতে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তও বেশী হয়। দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন যত ত্বরান্বিত হইতে থাকিবে, শিল্পের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের পরিমাণ ও অনুপাত ততই বৃদ্ধি পাইতে ও কৃষির ক্ষেত্রে হ্রাস পাইতে থাকিবে। কৃষি হইতে যে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের সৃষ্টি হয় তাহার বৃহত্তর অংশ খাজনা, সুদ ইত্যাদি হিসাবে মহাজন, জমিদার, জোতদার ও ফড়িয়া প্রভৃতির হাতে চলিয়া যায়। এই অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত বিনিয়োজিত হইলে দেশের উন্নতি দ্রুততর হয় কিন্তু কার্যতঃ, তাহা না হইয়া ওই উদ্বৃত্তের অধিক অংশই ব্যয় হয়

অপ্রয়োজনীয় ভোগে। কৃষি উদ্বৃত্ত উৎপাদনশীল বিনিয়োগে ব্যবহৃত না হওয়ার কতকগুলি কারণ আছে: প্রথমত, কৃষিজাত দাম তীব্রভাবে ওঠানামা করে বলিয়া কৃষিতে উদ্বৃত্তের বিনিয়োগ ব্যাহত হয়; দ্বিতীয়ত, জমিতে বিনিয়োগ করিলে যতখানি প্রতিদান পাওয়া যায়, সুদে খাটাইলে অনেক বেশী এবং দ্রুত প্রতিদান পাওয়া যায়; তৃতীয়ত, কৃষকের জীবনযাত্রার মান এত নীচু এবং সেই তুলনায় খাজনার হার এতো বেশী যে সমবায়ের মাধ্যমে বৃহদায়তন চাষ প্রবর্তন না হইলে আর খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইবে না।

অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত সৃষ্টি ও একত্রীকরণের পর উহা ভোগ ও বিনিয়োগের মধ্যে এবং তারপর বিভিন্ন প্রকার বিনিয়োগের মধ্যে যথাযথভাবে বণ্টন করিতে হইবে। উদ্বৃত্ত বিনিয়োগের সময় নিয়োগ পছন্দ (occupational preference), সময়-পছন্দ (time preference) এবং ভৌগোলিক পছন্দ (territorial preference) এই তিনটির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। নিয়োগ-পছন্দ বলিতে বোঝায় সেই সকল কার্য বৃদ্ধির সুযোগ যাহা অতীতে উপেক্ষিত হইয়াছে কিন্তু দেশের দ্রুত উন্নয়নের জন্যে যাহাদের সম্প্রসারণ বিশেষভাবে প্রয়োজন। সময়-পছন্দ বলিতে বোঝায় কোন উৎপাদন খাতে বিনিয়োগ করিলে প্রতিদান পাইতে কতো সময় লাগিবে। বিনিয়োগের সময়সীমা জানিতে পারিলে বিনিয়োগের ঠিকমত বণ্টন সহজসাধ্য হয়। ভৌগোলিক পছন্দ বলিতে বোঝায় শিল্পের এরূপ বিন্যাসকরণ যাহাতে অনগ্রসর ও উপেক্ষিত অঞ্চল শিল্পস্থাপনে অগ্রাধিকার লাভ করে এবং শিল্পোন্নত অঞ্চলে নূতন শিল্পস্থাপনে বিধিনিষেধ ধার্য করা হয়, এইভাবে দেশে সুষম শিল্পায়ন সুনিশ্চিত করা যায়।

বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্ত সংগ্রহের অভ্যন্তরীণ উৎসগুলি হইল (১) কর, (২) ঋণ গ্রহণ এবং (৩) ঘাটতি ব্যয় এবং ইহাদের সামগ্রিকভাবে ফিস্‌ক্যাল অস্ত্র বলা হয়।

ফিস্‌ক্যাল নীতি (Fiscal Policy): সরকারের ফিস্‌ক্যাল নীতি (অর্থাৎ করধার্য, ঋণগ্রহণ বা সরকারী ব্যয় সংক্রান্ত নীতি) অর্থনীতির সংরক্ষণ অথবা উন্নয়নে সহায়তা করে। উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ফিস্‌ক্যাল নীতির প্রয়োগ খুবই সাম্প্রতিক কালের ঘটনা। কেন্‌স সমর্থিত ফিস্‌ক্যাল নীতি উন্নত দেশে প্রয়োগ করিয়া উন্নয়নের হারকে সংরক্ষণ করা হয়; পক্ষান্তরে অর্ধোন্নত দেশে ফিস্‌ক্যাল নীতি উন্নয়ন হার ত্বরান্বিত করিবে। কেন্‌সীয় অর্থব্যবস্থায় সঞ্চয়হার কমানো এবং ভোগপ্রবণতা বাড়ানোর অস্ত্র হইল

ফিস্‌ক্যাল নীতি ; কিন্তু অর্ধোন্নত দেশের সমস্যা ঠিক উহার বিপরীত ; এখানে সঞ্চয় কম এবং ভোগপ্রবণতা বেশী বলিয়া সঞ্চয় বৃদ্ধি করা এবং ভোগ-প্রবণতা কমানো প্রয়োজন।

অর্ধোন্নত দেশে উন্নয়নের জন্য ফিস্‌ক্যাল পদ্ধতির প্রয়োগ অপরিহার্য। ফিস্‌ক্যাল নীতি অর্থনৈতিক উন্নয়নকে চারভাবে প্রভাবিত করে ; (১) ইহা সম্পদ বণ্টনকে প্রভাবিত করে ; কোন একটি বিশেষ ক্ষেত্রে সরকার ব্যয় বৃদ্ধি করিলে সেই ক্ষেত্রে সম্পদসমূহ প্রবাহিত হইবে, অপর পক্ষে করধার্য করিলে সেখান হইতে সম্পদসমূহ বাহির হইয়া যাইবে ; (২) ইহা আয়-বণ্টনকে পরিবর্তিত করে ; করব্যবস্থাকে অধিকতর গতিশীল করিলে অথবা সরকারী ব্যয়ের অধিক অনুপাত নিম্নআয়-ব্যক্তিবর্গের কল্যাণের জন্য ব্যয় করিয়া আয়বণ্টনকে প্রভাবিত করা যায় ; শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি করিয়া শ্রমের পেশাগত গতিশীলতা বৃদ্ধি করা যায়. জমির উপর কর ধার্য করিয়া জমির মালিকানা বণ্টন প্রভাবিত করা যায় এবং শিল্পে সাহায্য (subsidy) প্রদান করিয়া বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে প্রতিযোগিতার তীব্রতার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটানো যায়। (৩) ইহা মূলধন গঠনে সহায়তা করে ; বেসরকারী বিনিয়োগ, সরকারী বিনিয়োগ বা বৈদেশিক বিনিয়োগের দ্বারা মূলধন গঠন হইতে পারে। ধনীদের অপচয়মূলক ভোগব্যয় হ্রাস করিবার ফিস্‌ক্যাল পদ্ধতি সরকার কর্তৃক মূলধন গঠন সুনিশ্চিত করিবে। (৪) ইহা মুদ্রাস্ফীতি রোধ করে ; ফিসক্যাল পদ্ধতির সাহায্যে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা যায়।

কর (Taxation): উন্নয়নের জন্য উদ্বৃত্ত সংগ্রহের সব কয়টি পদ্ধতির প্রয়োগ প্রয়োজনীয় হইলেও করধার্যের দ্বারা সম্পদ সংগ্রহই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রকৃষ্ট উপায়। নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে করব্যবস্থা উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে: (১) ইহা অপচয়মূলক ভোগকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া সম্পদকে ভোগ হইতে বিনিয়োগের দিকে প্রবাহিত করে, (২) করব্যবস্থা সম্পদ জনগণের কাছ হইতে সরকারের হাতে স্থানান্তরিত করিয়া সরকার কর্তৃক মূলধন গঠন সুনিশ্চিত করে, (৩) ইহা সঞ্চয়ও বিনিয়োগ উৎসাহিত করে, (৪) ইহা বিনিয়োগের গঠনকে প্রভাবিত করে, (৫) ইহা ধনবৈষম্য হ্রাস করে এবং (৬) অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত একত্রিত করে।

ভোগ্যপণ্যের জন্য ক্রমবর্ধমান চাহিদা হ্রাস করিবার একটি উপায় হইল করব্যবস্থা। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধি পায় আর সেই কারণে ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বাড়িয়া যায়। প্রত্যক্ষ কর ধনীদের

আয়ের একাংশ সরাইয়া লইয়া ভোগ হ্রাস করে আর পরোক্ষ কর ধনী ও দরিদ্র উভয় শ্রেণীর ভোগক্ষমতা হ্রাস করে। এইভাবে করব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পদ ব্যক্তিগত ভোগ হইতে সরকারী বিনিয়োগে স্থানান্তরিত হয়। ইহা ছাড়া, করের মাধ্যমে সরকার মুদ্রাস্ফীতির চাপ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন। করব্যবস্থা বর্ধিত আয়ের একাংশকে বাহির করিয়া দিয়া মোট চাহিদাকে হ্রাস করিয়া মোট যোগানের সমান করে।

করব্যবস্থা শুধুমাত্র রেভিনিউ অর্জনের পন্থা নয়, ইহা সঞ্চয় ও বিনিয়োগে প্রণোদনা দিবে। করব্যবস্থা অতিক্রমবর্ধনশীল হইলে উহা সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ব্যাহত করিবে। প্রত্যক্ষকর এরূপভাবে ধার্য করিতে হইবে যাহাতে উহা বর্ধিত আয়ের একাংশ কাটিয়া লইলেও যাহারা বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে সঞ্চয় করে তাহাদের হাতে যথেষ্ট অর্থ রাখিয়া দেয়। এই ব্যাপারে সম্পত্তি কর বা ব্যয়কর আয়কর অপেক্ষা শ্রেয়। সম্পত্তিকর বা ব্যয়কর ভোগ সংকুচিত করে কিন্তু উচ্চহারে আয়কর সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ ব্যাহত করে। কর অব্যাহতি, রিবেট, ও কনসেসানের ব্যবস্থা করিয়া করব্যবস্থা বিনিয়োগে প্রণোদনা দিয়া থাকে। অনুরূপভাবে পরোক্ষকর অপচয়মূলক ভোগ হ্রাস করিবে কিন্তু এরূপ হইবে না যে উহা দাম বাড়াইয়া উৎপাদন ব্যাহত করিবে।

বিকাশমান অর্থব্যবস্থায় করের সাহায্যে সম্পদ সরকারী ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করিয়া উহার অধিকতর উৎপাদনশীল ব্যবহার সুনিশ্চিত করা যায়। এইরূপ দেশে স্বল্প সঞ্চয় এবং স্বল্প বিনিয়োগের দুষ্টচক্র ভেদ করিয়া বাহিরে আসিবার উপায় হইল সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা। বেসরকারী উদ্যোগ প্রধানতঃ ক্ষুদ্র কারবার এবং ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রেই নিযুক্ত থাকে এবং পুনর্নিয়োগের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ সঞ্চয় সৃষ্টি করিতে পারে না। ইহা ছাড়া ব্যবসায়লব্ধ সঞ্চয় ফটকা, সোনা, সম্পত্তি প্রভৃতি অনুৎপাদনশীল কার্যে বিনিয়োজিত হইবার প্রবণতা দেখা দেয়। আয়, সম্পত্তি, ব্যয় এবং মুনাফার উপর কর বসাইয়া সরকার বর্ধিত আয়কে নিজ হস্তে স্থানান্তরিত করিয়া উৎপাদনশীল বিনিয়োগ সুনিশ্চিত করিবে।

করব্যবস্থার সাহায্যে বিনিয়োগের গঠন পরিবর্তন করা যায়। পূর্বেই বলা হইয়াছে অর্ধোন্নত দেশে করব্যবস্থার একটি কাজ হইল বেসরকারী উদ্যোগকে অধিকতর উৎপাদনশীল দিকে প্রবাহিত করিতে উৎসাহ প্রদান করিবে। কর অব্যাহতি, রিবেট এবং বিশেষ সুবিধাদানের ব্যবস্থা করিয়া সরকার নূতন নূতন স্থানে শিল্প স্থাপন করিতে শিল্পপতিদের উৎসাহ প্রদান করিবেন। ইহার

ফলে মুনাফা বৃদ্ধি পাইবে এবং উহা পুণর্বিনিয়োজিত হইবে। কর এরূপভাবে বসাইতে হইবে যাহাতে পুণর্বিনিয়োগযোগ্য মূলধন হ্রাসপ্রাপ্ত না হয়; করলব্ধ অর্থের একাংশ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, পরিবহন প্রভৃতি খাতে ব্যয় করিয়া সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ধার্য ব্যয় (overheads) বৃদ্ধি পাইলে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় বেসরকারী উদ্যোগ শিল্প স্থাপনে আগ্রহী হইবে।

অর্ধোন্নত দেশগুলিতে যে উৎকট ধনবৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায় গতিশীল প্রত্যক্ষ মাধ্যমে তাহা হ্রাস করা যায়। পূর্বে অর্থনীতিবিদদের ধারণা ছিল যে দেশে ধনবৈষম্য থাকিলে সঞ্চয়ের হার অধিক হইবে কিন্তু বর্তমানে এই ধারণা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

অর্ধোন্নত দেশে অবশ্য করপদ্ধতির কার্যকারিতা বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ। প্রথমত, এইসব দেশে গ্রামের এক বৃহত্তর অংশ প্রত্যক্ষ বিনিময় প্রথার দ্বারা অভাব পূরণ করে অর্থাৎ আর্থিক লেনদেন বহির্ভূত ক্ষেত্র (nonmonetised sector) ব্যাপক আর ইহা কর ধার্যের আওতার বাহিরে। দ্বিতীয়ত, দেশের অধিকাংশ লোকের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নীচু বলিয়া করের সাহায্যে অধিক অর্থসংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব। তৃতীয়ত, করধার্যের একটা সীমা আছে, সেই সীমা অতিক্রম করিলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সংকুচিত হইবে এবং কর ফাঁকির প্রবণতা বৃদ্ধি পাইবে।

সরকার যদি স্বয়ং বিনিয়োগের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া উন্নয়ন প্রবর্তন করিতে আগ্রহী হয় তাহা হইলে ঘাটতি ব্যয় অপেক্ষা কর আদায় অধিকতর বাঞ্ছনীয়; আবার বরাদ্দ ব্যবস্থার (rationing) মত প্রত্যক্ষ পদ্ধতির দ্বারা ভোগ সংকুচিত করা অপেক্ষা করধার্য শ্রেয় কারণ পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে ভোগকারীর স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় কিন্তু করব্যবস্থায় উহা অব্যাহত থাকে। ইহা ব্যতীত করের দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার সামর্থ্য অনুযায়ী উন্নয়নের ব্যয়ভার বহন করিতে বাধ্য করান যায়।

সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে করব্যবস্থার সাহায্যে এরূপভাবে অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে যাহাতে উন্নয়নের উপাদানসমূহ সরকারী মালিকানায় আসে এবং সেই সঙ্গে বেসরকারী বিনিয়োগের পথ সংকুচিত না হইয়া প্রসারিত হয়। শিল্পে পুনর্বিনিয়োজিত মূলধনের উপর কর অব্যাহতি দিলে বেসরকারী খাতে মূলধন গঠন উৎসাহিত হইবে এবং অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইবে। করব্যবস্থা এরূপভাবে গঠন করিতে হইবে যাহাতে উহা সঞ্চয়ে উৎসাহ সৃষ্টি করে, ধনীদের বিলাস সামগ্রী ও অপচয়মূলক ভোগ খর্ব করে এবং আয়বৈষম্য

হ্রাস করে। দেশে উন্নয়নের ফলে যে আয় বৃদ্ধি পায়, করের সাহায্যে উহার কিছু অংশ সরাইয়া না লইলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে ; করের সাহায্যে ব্যয়যোগ্য আয়ের (disposable income) পরিমাণ কমাইয়া মুদ্রাস্ফীতি-জনিত ফাঁককে সংকুচিত করা যায়। প্রত্যক্ষকর আয়বৈষম্য দূর করিতে এবং আদর্শ আয়বণ্টন সুনিশ্চিত করিতে পারে। অবশ্য শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ করের উপর নির্ভর করিলে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে না বলিয়া পরোক্ষ করও ধার্য করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

কর কাঠামো (Tax Structure)ঃ কর দুই ধরনের হয়—প্রত্যক্ষ কর এবং পরোক্ষ কর। উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে বিকাশমান অর্থনীতিতে করব্যবস্থা উৎপাদনশীল বিনিয়োগের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চয় সংগ্রহ করিবে ; অর্থাৎ ইহা গতিশীল হইবে এবং সঞ্চয়ও বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান করিবে। নিম্নে কয়েকটি প্রত্যক্ষ করের আলোচনা করা হইল :

১। **আয়কর** (Income Tax)ঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে গতিশীল আয়করের এক বিশেষ ভূমিকা আছে। আয়কর প্রত্যক্ষকর বলিয়া উহার ভার ধনী শ্রেণীর উপরই বেশি পড়ে। কর প্রদানের ক্ষমতার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ সামগ্রিক ত্যাগ স্বীকার নীতির ভিত্তিতে এই কর ধার্য হয়, অর্থাৎ যাহাদের কর প্রদানের ক্ষমতা অধিক তুলনামূলকভাবে তাহারাই অধিক কর দিবে। দ্বিতীয়:, প্রয়োজন হইলে এই কর সহজেই অধিকতর গতিশীল করা যায়। তৃতীয়ত, ইহা সংকোচন প্রসারণশীল রাজস্ব—জাতীয় আয় বৃদ্ধির সহিত সরকারের রাজস্ব বাড়িবে আবার জাতীয় আয় হ্রাস পাইলে রাজস্ব হ্রাস পাইবে। চতুর্থত, ভারতে ব্যক্তিগত আয়করলব্ধ অর্থ কেন্দ্র এবং রাজ্যসমূহের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয় বলিয়া ইহা কেন্দ্র ও রাজ্যসমূহের মধ্যে ভারসাম্য আনয়নে প্রভাব বিস্তার করে।

আয়কর স্থাপনের সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে উহা যেন কর্ম, সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের ইচ্ছার পথে বাধা না হইয়া দাঁড়ায়। যদি ধনীরা অপচয়মূলক ভোগে রত হয় অথবা ফটকা এবং জমিজমার উপর টাকা খাটায় তাহা হইলে উহাদের উপর অধিক হারে কর ধার্য করিলেও কর্মোদ্যম হ্রাস পাইবে না। ডানকান ব্ল্যাক (Duncan Black) বলেন আয়কর ধার্য করিয়া ধনীদের ব্যয় কমাইতে হইবে এবং করলব্ধ আয় দরিদ্র জনগণের সুবিধার্থে ব্যয় করিতে হইবে। কিন্তু যদি ধনীদের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ইচ্ছা প্রবল হয় তাহাহইলে অধিকহারে আয়-কর ধার্য করিলে উহা কর্মোদ্যম হ্রাস করিয়া উন্নয়নের পথে বাধার সৃষ্টি করিবে।

২। **মৃত্যুকর** (Death Duty): ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিলে তাহার সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টিত হইবার পূর্বে এই কর সরকারকে দিতে হয়। মৃত্যুকর কর-কাঠামোকে অধিকতর গতিশীল করিয়া আয়বৈষম্য হ্রাস করে, ব্যক্তি প্রভূত সম্পত্তি রাখিয়া মারা যাইলে মৃত্যুকর স্থাপন করিয়া তাহার সম্পত্তির একাংশ সরকারের হস্তে চলিয়া যায় বলিয়া আর্থিক বৈষম্য হ্রাস পায়। দ্বিতীয়ত, বিকাশমান দেশে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার জন্য প্রভূত অর্থ প্রয়োজন। মৃত্যুকর সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধির একটি নূতন উৎস। তৃতীয়ত, আয়কর ফাঁকি দেওয়া সহজ কিন্তু মৃত্যুকর ফাঁকি দেওয়া কঠিন এবং ইহা পরিচালনা করা অপেক্ষাকৃত সহজ। এই কর আয়কর অপেক্ষা কম পরিমাণে ব্যক্তির কর্মোদ্যম হ্রাস করে। পূর্বপুরুষ-উপার্জিত সম্পত্তির উপর নির্ভরশীল না থাকিয়া নিজেদের অধিকতর কর্মদক্ষ করিতে উৎসাহিত করিয়া এই কর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কর্মবিমুখতা রোধ করে। চতুর্থত, ইহা কর প্রদান ক্ষমতার উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ যাহাদের কর প্রদানের ক্ষমতা অধিক তাহাদের উপরই এই করের অধিক ভার পড়িবে। যাহাদের সম্পত্তির পরিমাণ কম তাহারা এই করের আওতা হইতে বাদ পড়িবে। বৃটেনের কলউইন কমিটি স্বীকার করিয়াছে যে আয়কর এবং মৃত্যুকর একই সঙ্গে স্থাপিত হইলে ব্যক্তির কর বহন করিবার ক্ষমতার সঠিক পরিমাপ করা সম্ভব হইবে। এই করের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখানো হয় যে ইহা সঞ্চয়ের ইচ্ছা হ্রাস করিয়া দেশে মূলধন গঠন ব্যাহত করিবে। যে ব্যক্তি সম্পত্তি অর্জন করিতেছে মৃত্যুকর তাহার সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি কমাইবে এবং ভোগপ্রবণতা বাড়াইবে; কিন্তু অনেক অর্থনীতিবিদের মতে এই ধারণা ঠিক নয়; সম্পত্তি অর্জনকারী ব্যক্তি ভবিষ্যতে মৃত্যুকর প্রদান করে না—উহা প্রদান করে উত্তরাধিকারী। পশ্চিমী দেশগুলির অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে সঞ্চয়ের উপর মৃত্যুকরের প্রভাব যতখানি ক্ষতিকর বলিয়া মনে করা হয়, কার্যতঃ উহা তদপেক্ষা অনেক কম;

৩। **মূলধনলাভ কর** (Capital Gains Tax): বিকাশমান অর্থনীতিতে আয়বৈষম্য হ্রাস করা, ব্যক্তিগত আয়করের কতকগুলি ত্রুটি সংশোধন করা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সম্পদ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে মূলধন লাভ কর ধার্য করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই কর থাকিলেও ভারত ব্যতীত অন্য কোন কমনওয়েলভুক্ত দেশে এই কর নাই; ইহার কারণ "আয়" সম্পর্কে বৃটেন প্রভৃতি রক্ষণশীল দেশের যে ধারণা মূলধন লাভ তাহার মধ্যে পড়ে না; আয় হইল কর দিবার ক্ষমতার মানদণ্ড এবং নিয়মিত ভাবে যাহা অর্জন করা হয় তাহাই আয় কিন্তু মূলধনলাভ সম্পূর্ণ আকস্মিক এবং গ্রোভস (Harold Groves)

মনে করেন যে উৎস হইতে আয় প্রবাহ রূপে ইহার উদ্ভব নয়—স্বয়ং উৎসকে বিক্রয় করায় ইহার উদ্ভব (it arises not as a flow of income from the fountain but from the sale of the fountain itself).

কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে মূলধন বিক্রয় হইতে যে অনিয়মিত আয় উদ্ভূত হয় তাহাও ব্যক্তির ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি করে ও কর প্রদানের ক্ষমতা বাড়ায়।

এই করের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বলা হয় যে মূলধনী লাভ অন্যান্য আয়ের মতো ব্যক্তির ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করে সুতরাং অন্যান্য আয়ের মতো মূলধনী লাভও করের আওতায় আসিবে ইহাই স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রভূত পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন মূলধনী লাভের উপর কর ধার্য করিয়া সরকার তাহার আয় বৃদ্ধির পথ প্রসারিত করিতে পারিবে। ডাঃ ক্যালডরের সুপারিশ অনুসারে ভারতে এই কর প্রবর্তিত হয়। অবশ্য কর অনুসন্ধান কমিশন ভারতে মূলধন লাভ কর স্থাপনের পক্ষপাতী ছিল না। কমিশন মনে করে যে এই কর হইতে সম্ভাব্য আয় অতি সামান্য এবং অপরপক্ষে উহা ব্যক্তির সঞ্চয় ও বিনিয়োগের উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করিবে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বেসরকারী বিনিয়োগকে উৎসাহিত করিবার অনুকূল আবহাওয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য মূলধন লাভ কর পুনঃস্থাপনের পরিবর্তে আয়করের হার বৃদ্ধি করার জন্য কমিশন সুপারিশ করে। দেশের শিল্পায়নের জন্য ঋণপত্রের অবাধ গতিশীলতার প্রয়োজন কিন্তু এই কর উহাতে বাধা প্রদান করে। কিন্তু ডাঃ ক্যালডর মনে করেন যে মূলধন লাভকে করের আওতার বাহিরে রাখা ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে সমর্থনযোগ্য নয় কারণ ইহার দরুন এক শ্রেণীর করদাতাদের প্রতি পক্ষপাতপূর্ণ ব্যবহার করা হয়।

৪। **সম্পদকর** (Wealth Tax)ঃ সম্পদকর ব্যক্তিগত আয়করের অনুপূরক। অর্ধোন্নত দেশে সম্পদ বণ্টন অসমান বলিয়া কর অব্যাহতি যথেষ্ট উচ্চসীমায় রাখিয়া সমানুপাতিক হারে সম্পদকর ধার্য করা হইলে উহা ব্যক্তিগত আয়কর অপেক্ষা গতিশীল হইবে; এই কর ন্যায্য কারণ ইহা করপ্রদানের ক্ষমতার নীতিতে প্রতিষ্ঠিত। সঞ্চয় ব্যবহার করিয়া সম্পত্তি গঠন করিতে এই কর ব্যক্তিকে প্রশ্রয় দেয় না; এক বিশেষ সীমার ঊর্ধ্বে ইহা সম্পত্তি অর্জনের পথে বাধা প্রদান করিবার হাতিয়ার।

এই করের সপক্ষে প্রধান যুক্তি যে ইহা সমতার (equity) ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কিন্তু উদ্যোগ ব্যাহত করে না। সঞ্চিত সম্পত্তির হিসাব হইতে ব্যক্তির কর

প্রদানের ক্ষমতা অনুমান করা যায়, ইহা এক লক্ষ টাকা অলঙ্কারের মালিক ও একজন নিঃস্ববিত্ত ব্যক্তি কখনই আর্থিক দিক হইতে তুলনীয় নয়, যদিও উভয়েরই আয় শূন্য এবং সেই দিক হইতে বিচারে উভয়েরই করপ্রদানের ক্ষমতা শূন্য। সম্পদকর কর প্রদানের ক্ষমতার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া গরীব লোকদের এই ধরনের কর দিতে হয় না। আয়করের হার অত্যধিক গতিশীল হইলে উহা ব্যক্তির কর্মোদ্যোগ ব্যাহত করে কিন্তু সম্পত্তির উপর কর ধার্য করা হইলে সেইরূপ কোন বাধার সৃষ্টি হয় না। দ্বিতীয়তঃ, আয়করের সহিত সম্পদকর ধার্য করা হইলে কর প্রবঞ্চনা কঠিন হইয়া পড়ে। শুধুমাত্র আয়কর থাকিলে লোকে অলঙ্কার ইত্যাদির মধ্যে আয় আবদ্ধ রাখিয়া কর ফাঁকি দেয়। আয় গোপন করা সহজ কিন্তু সম্পদ গোপন করা অসুবিধাজনক। অর্থনৈতিক ফলাফলের দিক থেকে বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে সম্পদ করের এমন এক সুবিধা আছে যাহা আয়করের নাই। আয়কর বিনিয়োগকারীর ঝুঁকি গ্রহণের মনোভাবকে নিরুৎসাহ করে কিন্তু সম্পদকর তাহা করে না। ঝুঁকিবিহীন আয়ের উপর সমানহারে আয়কর ধার্য করা হয় বলিয়া উহা ঝুঁকি গ্রহণের উৎসাহ নষ্ট করিয়া বিনিয়োগ ব্যাহত করে। কিন্তু সম্পদকর সম্পত্তির মূল্যের উপর ধার্য হয় বলিয়া উহা ঝুঁকি গ্রহণের উৎসাহ হ্রাস করে না।

এই করের বিরুদ্ধে বলা হয় যে ইহা ধার্য করিবার সময় উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল সম্পদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা না হইলে উহা ন্যায়সঙ্গত হয় না। অনুৎপাদনশীল সম্পদের মালিক সম্পদ থেকে কোনরূপ আয় লাভ করে না বলিয়া তাহার পক্ষে কর দেওয়া বিশেষ অসুবিধাজনক। অবশ্য ক্যালডর মনে করেন সকল প্রকার সম্পত্তিই উৎপাদনশীল। কোন সম্পত্তি থেকে অর্থ আয় না হইলেও "মানসিক আয়" অবশ্যই হয়। দ্বিতীয়ত, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উপর এই কর ধার্য করা হইলে দুইবার করদানের (double taxation) আশংকা থাকে; ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি সম্পদের উপর একবার কর দিবে, আবার অংশীদারগণ তাহাদের শেয়ারের উপর কর দিবে।

৫। **ব্যয়কর** (Expenditure Tax): অধ্যাপক ক্যালডর ব্যক্তিগত ব্যয়ের উপর কর স্থাপনের সুপারিশ করেন। ১৯৫৫ সালে ক্যালডর ব্যয়কর সমর্থন করিয়া তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ An Expenditure Tax রচনা করেন। গ্রেট বৃটেনে এই কর স্থাপনের জন্য তিনি বৃটিশ সরকারকে অনুরোধ করেন কিন্তু বৃটিশ সরকার উহা গ্রহণ করেন নাই। পরে তিনি এই করকে ভারতীয় কর ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করেন এবং স্থাপনের জন্য সুপারিশ করেন। ক্যালডর বলেন

যে বিকাশমান অর্থনীতির ক্ষেত্রে ন্যায়, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং অর্থনৈতিক প্রভাবের দিক থেকে বিচার করিলে আয়কর অপেক্ষা ব্যয়কর শ্রেয়। ব্যয়করের সমর্থনের প্রধান যুক্তি এই যে ব্যক্তির ব্যয়ই তাহার করপ্রদান ক্ষমতার মাপকাঠি আয় নয়। ডাঃ লিটল (Little) ব্যয়কর সমর্থন করিয়া বলেন "কাজের আকারে ব্যক্তি সামাজিক ভাণ্ডারে যাহা দিতেছে তাহার তুলনায় ভোগের আকারে সামাজিক ভাণ্ডার থেকে সে যাহা গ্রহণ করিতেছে তাহাকেই করপ্রদানের ভিত্তি করা উচিত।" তৃতীয়ত, ব্যয়কর ধার্য হইলে অপচয়মূলক ও বিলাস ব্যয় সঙ্কুচিত হইবে। সঞ্চয়ের ইচ্ছা বৃদ্ধি পাইবে এবং মূলধন গঠন উৎসাহিত হইবে। এই কর ব্যয়সংকোচ করিয়া মুদ্রাস্ফীতি দমন করিবে। ব্যয়কর ধার্য করা হইলে জনগণের অতিরিক্ত ব্যয় হ্রাস পাইবে বলিয়া মূলধন সঞ্চিত কিন্তু আয়কর ধার্য করিলে সঞ্চয়ের ইচ্ছা বৃদ্ধি পাইবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। ইহা ব্যতীত আর একদিক হইতে ব্যয়কর আয়কর অপেক্ষা শ্রেয় ; 'আয়' শব্দটির প্রকৃত অর্থ এবং ব্যাখ্যা সম্পর্কে মতভেদ আছে কিন্তু "ব্যয" শব্দটির ব্যাখ্যায় বিশেষ মতভেদ নাই।

মিসেস হিক্স (Hicks) বলেছেন, এই কর ন্যায়বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত কারণ বৃহৎ পরিবারের অধিক ব্যয় হইবে বলিয়া উহার উপর করের বোঝাও বেশী হইবে; অবশ্য ক্যালডর ইহার উত্তরে বলিয়াছেন যে পারিবারিক আয়তনের তারতম্য হিসাব করিয়া কর ধার্য করা সম্ভব। ইহা ছাড়া ব্যয়কর পরিচালনা করা বেশ কঠিন ; ইহা এক জটিল কর এবং আদায় করাও সহজ নয়

৮। **কৃষিকর** (Agricultural Tax) ঃ বিকাশমান দেশগুলি কৃষিপ্রধান এবং গ্রামকেন্দ্রিক বলিয়া কৃষিকরকে উন্নয়নের একটি হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করা যায়। কৃষকের ক্রমবর্ধমান আয়ের একাংশ করের সাহায্যে কাটিয়া লইয়া উহাকে মূলধন গঠনে ব্যবহার করা যাইবে। উন্নয়নের মূলধনের উৎস হিসাবে কৃষিকর একটি উত্তম ব্যবস্থা ; ১৯১৪ সালের পূর্বে জাপানে কৃষিকর অর্থনৈতিক উন্নয়নের এক বড় অস্ত্র বলিয়া গণ্য হয়েছিল ; ভূমিকরের কয়েকটি বিশেষ সুবিধাও আছে ; ইহা পরিচালনা করা সহজ ; ইহা জমির মালিকের উপর গতিশীল হারে ধার্য করা যায় ; ইহা ব্যক্তির ফটকা কারবারে বা ভূসম্পত্তিতে সঞ্চয় ব্যবহার করার প্রবণতা বোধ করিবে। এই কর ন্যায় বা সমতার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ; গ্রামীণ উৎস হইতে উদ্বৃত্ত সংগ্রহের ইহা এক কার্যকরী হাতিয়ার। সঞ্চয় ও বিনিয়োগে প্রণোদনা দেয় বলিয়া ইহা উৎপাদন ব্যাহত করে না। এই

কর স্থিতিস্থাপক, জাতীয় আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সরকারী রাজস্বও বৃদ্ধি পাইবে, এবং সেই সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতি সংকোচে সহায়তা করিবে।

১৯৭২ সালে কে. এন. রাজ কমিটি কৃষি জোতের উপর কর ধার্যের সুপারিশ করে। প্রস্তাবিত কর জোতের আয়তন এবং ফসলের প্রকৃতি অনুসারে গতিশীল হারে ধার্য করা হইবে। প্রথমে ৫০০০ টাকা ও তদপেক্ষা অধিক মূল্যের জোতের উপর কর ধার্য করা হইবে, পরে উহা কম মূল্যের জোতের উপর প্রসারিত হইবে। প্রস্তাবিত কর ধার্য করা হইলে বছরে ২০০ কোটি টাকা আয় হইবে।

পরোক্ষ কর (Indirect Taxation) ঃ পরোক্ষ কর বা পণ্য কর বিশেষভাবে উৎপাদনশীল বলিয়া ইহা বিকাশমান দেশগুলির উন্নয়নী মূলধনের একটি উৎস। উন্নয়নের জন্য প্রভূত অর্থের প্রয়োজন তাই প্রত্যেকেই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ত্যাগ স্বীকার করিবে ইহা কাম্য। পণ্যকর প্রত্যেককে স্পর্শ করে। এই কর হইতে প্রভূত পরিমাণ রাজস্ব আদায় করা যায়।

উচ্চহারে পণ্যকর বসাইয়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা যায়। অর্ধোন্নত দেশে দরিদ্র জনগণের ভোগপ্রবণতা খুব বেশী। জনগণের আয় বৃদ্ধি পাইলে উহার সমানুপাতে তাহাদের ভোগব্যয় বৃদ্ধি পাইবে। যদি অতিরিক্ত ভোগ দমন করা না যায় তাহা হইলে অতিরিক্ত উৎপাদন অতিরিক্ত ভোগে ব্যয়িত হইবে এবং মূলধন গঠনের জন্য কিছু অবশিষ্ট থাকিবে না। পণ্যের উপর উচ্চহারে কর বসাইয়া ভোগপ্রবণতা হ্রাস করা যায়। বিলাসদ্রব্য বা কম প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর কর বসাইয়া উহার উৎপাদন ও ভোগ হ্রাস করিয়া বিনিয়োগ হার বৃদ্ধি যায়।

ঋণ গ্রহণ (Borrowing): অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় সংগ্রহের দ্বিতীয় পদ্ধতি হইল ঋণ গ্রহণ যদি কররাজস্ব সরকারী ব্যয় অপেক্ষা কম হয় তাহা হইলে স্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয় সংগ্রহ করিয়া সেই ফাঁক বন্ধ করিতে হইবে। ঋণ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা ক্ষতিকারক নয় যদি সেই অর্থ উৎপাদনশীল প্রকল্পে বিনিয়োজিত হইয়া উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করে যাহা হইতে পরিশেষে মূলধন ও সুদ মিটানো যাইবে।

ঋণ গ্রহণ করাকে কর ধার্য করা অপেক্ষা শ্রেয় বলিয়া মনে করা হয়। কর ধার্যের অর্থ বাধ্যতামূলক সঞ্চয় কিন্তু ঋণ গ্রহণ হইল স্বেচ্ছামূলক সঞ্চয়। কর প্রদানের জন্য করদাতা কখনই খুশী হয়না কারণ করবাবদ সে যাহা দেয় তাহা আর ফেরৎ পাওয়া যায় না। কিন্তু ঋণদাতা স্বেচ্ছায় টাকা ধার দেয় কারণ

সে জানে যে নির্দিষ্ট সময়ান্তে উহা ফেরৎ পাইবে। ঋণ গ্রহণের মতো কর ব্যক্তিগত বিনিয়োগের ইচ্ছা ব্যাহত করে না কিন্তু কর উহা করে। ছাপাইয়া

ঋণ গ্রহণ ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে সঞ্চয়ের পরিমাণ এবং উহা সংগ্রহের পদ্ধতি ও প্রশাসনের উপর। উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের পরিমাণ স্বভাবতই স্বল্প হইবে বলিয়া প্রাথমিক অবস্থায় অভ্যন্তরীণ ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে খুব বেশি পরিমাণ সঞ্চয় সংগ্রহ করা যায় না। অবশ্য সঞ্চয়ের প্রধান দুইটি উৎস শিল্প এবং কৃষির দ্রুত সম্প্রসারণের ফলে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ও আশু বৃদ্ধি পাইবে। উদ্যোক্তার মুনাফা হইল সঞ্চয়ের প্রধান উৎস। বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র এরূপভাবে সম্প্রসারিত করিতে হইবে যাহাতে উদ্যোক্তা অধিক মুনাফা অর্জন করিতে পারে। সমাজের অন্য শ্রেণীর লোক অপেক্ষা উদ্যোক্তাদের সঞ্চয়াকাঙ্ক্ষা অধিকতর প্রবল। সঞ্চয়ের দ্বিতীয় উৎস হইল কৃষি, উন্নয়নের সঙ্গে কৃষি-উদ্‌বৃত্তের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে ইহার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। গ্রামীণ সঞ্চয় সংগ্রহ করিবার জন্য সারা দেশে গ্রামীণ ব্যাংক স্থাপন করা এবং সঞ্চয়ের অনুকূলে প্রচারকার্য চালানো প্রয়োজন।

অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের উৎস হইল তিনটি—ব্যক্তিগত সঞ্চয়, কোম্পানীগুলির প্রতিষ্ঠানগত সঞ্চয় এবং সরকারী সঞ্চয়। জনগণের ভোগ হ্রাস পাইলে ব্যক্তিগত সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইবে। কোম্পানীগুলি তাহাদের লাভের একাংশ উৎপাদনে পুনর্নিয়োগ করিয়া আয় বৃদ্ধি করিতে পারে। কিন্তু স্বেচ্ছামূলক সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট কম হয় বলিয়া সরকার উদ্‌বৃত্ত বাজেট সৃষ্টি করিয়া বাধ্যতামূলকভাবে সঞ্চয় করিয়া থাকে।

কর ধার্য বা ঋণগ্রহণ দুই-এরই উদ্দেশ্য ব্যক্তির আয়ের একাংশ সরাইয়া লওয়া যাহার ফলে ব্যক্তি তাহার বর্তমান ভোগ হ্রাস করিতে বাধ্য হইবে এবং কম পরিমাণ সম্পদ ভোগ্যবস্তু উৎপাদনে আর অধিক পরিমাণ সম্পদ মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে বিনিয়োজিত হইবে। করধার্যের একটা সীমা আছে; সেই সীমা অতিক্রম করিলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ হ্রাস পাইবে। সেইজন্য পুরোপুরি করের উপর নির্ভর না করিয়া ঋণগ্রহণ করাও প্রয়োজন হয়; জরুরী অবস্থায় স্বেচ্ছামূলক সঞ্চয় ছাড়াও বাধ্যতামূলক সঞ্চয় পরিকল্পনা প্রবর্তন করা যাইতে পারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় লর্ড কেনস গ্রেট বৃটেনের জন্য এই বাধ্যতামূলক সঞ্চয় পরিকল্পনার সুপারিশ করিয়াছিলেন; এই ব্যবস্থানুযায়ী সরকার ব্যক্তির আয় হইতে এক নির্দিষ্ট অর্থ বাধ্যতামূলক ভাবে কাটিয়া

কর স্থিতিস্থাপক

এবং সেই সূ

১৯৭

করে

রং দিবেন। ভারতে ১৯৬৩ সালে বাধ্যতামূলক য় কিন্তু পর বৎসর উহা তুলিয়া দেওয়া হয়। বদ্ধ আকারে প্রবর্তন করা হয়।

ধ্যে প্রভূত পরিমাণে উদ্বৃত্ত লুক্কায়িত আছে; ব অনুযায়ী ভারত ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার স্বর্ণের পরিমাণ জাতীয় আয়ের ১২ শতাংশ। এই লুক্কায়িত অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়কে সংগ্রহ করিয়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে লাগাতে পারিলে দেশের দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব হইবে। সরকারী করব্যবস্থা এবং প্রচারকার্যের মাধ্যমে প্রয়োজনাতিরিক্ত ভোগ কমাইবার চেষ্টা এবং জনগণের বিনিয়োগ চেতনার সৃষ্টি করিতে হইবে।

বৈদেশিক ঋণ (Foreign Loan)**:** অর্ধোন্নত দেশের অভ্যন্তরীণ উৎসগুলি হইতে যতই সঞ্চয় সংগ্রহ করা হউক না কেন, উহা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট হয় না, সেইজন্য উন্নয়নকালে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করা অপরিহার্য হইয়া পড়ে। এই সম্পর্কে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে বলিয়া উহার পুনরুক্তি করা হইল না।

বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে লাভ (Gains from Foreign Trade)**:** আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে যে উদ্বৃত্ত সঞ্চিত হয় তাহা উন্নয়নের একটি উৎস হইতে পারে। দেশটির বাণিজ্য ব্যালান্স যদি অনুকূল হয় তবেই উহা হইতে উদ্বৃত্ত সৃষ্ট হইতে পারে। বৈদেশিক বাণিজ্যের লাভ মূলধন গঠনের একটি উৎস হইলেও অর্থনৈতিক উন্নয়নে উহার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয় কারণ মধ্য প্রাচ্যের তৈলসমৃদ্ধ দেশগুলি ব্যতীত অধিকাংশ অর্ধোন্নত দেশেরই বাণিজ্য ব্যালান্স প্রতিকূল। দ্বিতীয়ত; এই সকল দেশে বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণও খুবই কম; উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে রপ্তানী বাণিজ্য ভারতের জাতীয় আয়ের মাত্র ৯ শতাংশ। বৈদেশিক বাণিজ্য হইতে যে উদ্বৃত্ত পাওয়া যায় তাহা দ্বারা সরাসরি যে দেশে মূলধন গঠিত হইবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। বৈদেশিক বাণিজ্য হইতে প্রাপ্ত উদ্বৃত্তকে মূলধন গঠনের উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে, অন্যথায় দেশে মূল্যস্তর উর্ধ্বগামী হইয়া মুদ্রাস্ফীতি ঘটাইবে।

ঘাটতি ব্যয় (Deficit Financing)**:** উন্নয়নের উদ্দেশ্যে মূলধন গঠনের নূতন এবং সর্বাধুনিক পদ্ধতি হইল ঘাটতি ব্যয়। মোট সরকারী ব্যয় মোট

চলতি রাজস্ব অপেক্ষা বেশী হইলেই বাজেট ঘাটতি হয়। এই ঘাটতি পূরণের জন্য সরকারকে ঋণ গ্রহণ করিতে হইবে অথবা কাগজী নোট ছাপাইয়া অতিরিক্ত ব্যয় মিটাইতে হইবে।

ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণের মতে সরকার প্রতিবৎসরই আয়ব্যয়ে সমতা রক্ষা করিয়া চলিবে। তাঁহাদের মতে বেসরকারী উদ্যোগেই দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠিত হয়—সরকার অর্থনৈতিক কাজকর্মের স্তর বৃদ্ধি করিতে পারে না। কিন্তু বর্তমানে এই ধারণা পরিত্যক্ত হইয়াছে। অধিকাংশ দেশেই পূর্ণ কর্মসংস্থান নাই, বরং প্রভূত সম্পদ অব্যবহৃত অবস্থায় রহিয়াছে। ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ্গণের মতে ভোগ ও সঞ্চয় একসঙ্গে বাড়িতে পারে না কারণ দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান বিদ্যমান। কিন্তু আধুনিক অ-পূর্ণনিয়োগ তত্ত্ব অনুসারে ভোগ এবং সঞ্চয় উভয়ই একসঙ্গে বৃদ্ধি পাইতে পারে। যদি দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান বহাল না থাকে সেই ক্ষেত্রে ঘাটতি ব্যয়ের দরুণ উৎপাদন-আয় এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাইবে কিন্তু মূল্যস্তর সমান থাকিয়া যাইবে। কেন্সের অভিমত এই যে শুধুমাত্র বেসরকারী বিনিয়োগের ফলে পূর্ণ নিয়োগের স্তরে পৌছান যায় না; সুতরাং অব্যাবহৃত জনশক্তি ও সম্পদকে কাজে লাগাইবার জন্য ঘাটতি ব্যয় সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। দেশে ব্যাপক আকারে বেকারসমস্যা দেখা দিলে সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে সরকারকে ঘাটতি ব্যয় করিতে হইবে। করধার্য অপেক্ষা ঘাটতি ব্যয় শ্রেয় কারণ করের পরিমাণ সর্বোচ্চ সীমা ছাড়াইয়া গেলে উৎপাদন ব্যাহত হইতে পারে। বিকাশমান দেশে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের অভাব থাকায় এই সব দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ঘাটতি ব্যয় অপরিহার্য। কর ও ঋণের মাধ্যমে যথেষ্ট সঞ্চয় সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না বলিয়া এই সকল দেশে দ্রুত শিল্প ও কৃষির উন্নয়ন ঘটাইয়া জাতীয় আয় বৃদ্ধি করিতে হইলে ঘাটতি বাজেটের পথ অনুসরণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

বিকাশমান দেশে মুদ্রাস্ফীতির চাপ উন্নয়নের সহযোগী। অর্থনৈতিক উন্নয়নে ঘাটতি ব্যয়ের ভূমিকা সম্পর্কে আধুনিক অর্থনীতিবিদেরা সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করেন। অধ্যাপক কুরিহারা ও অন্যান্য অর্থনীতিবিদেরা অর্ধোন্নত দেশে ঘাটতি ব্যয়ের সাহায্যে উন্নয়ন হার বৃদ্ধি করিবার সপক্ষে অভিমত পোষণ করিয়াছেন কারণ তাঁহারা মনে করেন যদি ঘাটতি ব্যয় উৎপাদনশীল বিনিয়োগে ব্যবহৃত হইলে "মোট প্রভাব" (Sigma Effect) গুণক প্রভাব (Multiplier Effect) অপেক্ষা বেশী হইবে ফলে দীর্ঘকালীন মুদ্রাস্ফীতির

কোন আশংকা থাকিবে না। অপরপক্ষে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অর্থনীতিবিদেরা ঘাটতি ব্যয়ের বিপক্ষে রায় দিয়াছেন কারণ তাহারা মনে করেন ঘাটতি ব্যয় সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ব্যাহত করে। উভয় পক্ষের যুক্তিতে যথেষ্ট সারবত্তা আছে ; উন্নয়ন হার, সঞ্চয় বৃদ্ধির হার, বিনিয়োগ যোগ্য সম্পদ সৃষ্টির ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিয়া ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করিলে অর্থনীতির উপর উহার ক্ষতিকারক প্রভাব পরিহার করা যায়।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে ঘাটতি ব্যয়ের ব্যবহার কেনসের হাতে সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে ; অবশ্য কেন উন্নত দেশের বাণিজ্যচক্রের পরিপ্রেক্ষিতে ইহার ভূমিকার উল্লেখ করেন, ইহা ছাড়া ঘাটতি ব্যয় যুদ্ধের সময় অর্থসংগ্রহের একটি অপরিহার্য পদ্ধতি। বিকাশমান দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ঘাটতি ব্যয়ের ব্যবহার সুরু হয় যুদ্ধোত্তর যুগ থেকে।

অর্ধোন্নত দেশে ঘাটতি ব্যয়ের সাহায্যে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা যায়। ইহা উন্নয়নকে দুইভাবে সাহায্য করিতে পারে : প্রথমত, দেশে যে সঞ্চয় রহিয়াছে তাহা ঘাটতি ব্যয়ের মাধ্যমে একত্রিত করা যায়, দ্বিতীয়ত, বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের সাহায্যে ইহা নূতন সম্পদ সৃষ্টির একটি পদ্ধতি। অর্ধোন্নত দেশে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংগঠনিক বাধার দরুন বেসরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ যথেষ্ট হয় না বলিয়া উন্নয়ন হার বৃদ্ধির দায়িত্ব সরকারের উপর আসিয়া পড়ে। সরকারী বিনিয়োগের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদের অভাবে সরকারের পক্ষে ঘাটতি ব্যয়ের আশ্রয় লওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

ঘাটতি ব্যয়ের সাহায্যে সড়ক, রেলপথ, বিদ্যুৎ, হাসপাতাল, বিদ্যালয় প্রভৃতি সামাজিক ধার্যব্যয় (social overheads) বৃদ্ধি করা যায়। ঘাটতি ব্যয় সামাজিক মূলধন সৃষ্টি করিয়া সাংগঠনিক অনমনীয়তা এবং যোগানের অচলতার বাধা দূর করিয়া উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করিতে পারে।

ঘাটতি ব্যয় বাধ্যতামূলক সঞ্চয় সৃষ্টির একটি কার্যকরী হাতিয়ার। ঘাটতি ব্যয়ের সাহায্যে সরকার জনসাধারণের হাত থেকে প্রকৃত সম্পদ সরাইয়া লয় সরকার তাহার প্রয়োজনে ঘাটতি ব্যয় করিয়া দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করিলে জনগণের ভোগের জন্য সামান্য অবশিষ্ট থাকে বলিয়া তাহারা অধিক পরিমাণে সঞ্চয় করিতে বাধ্য হয়। ইহা ছাড়া, উন্নয়নশীল প্রকল্পে ঘাটতি ব্যয় করিলে কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং আয় বৃদ্ধি পাইবে। বর্ধিত আয় ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি করে কিন্তু যোগান সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায় না বলিয়া মূল্যস্তর

বৃদ্ধি পায় এবং মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। এইরূপ অবস্থায় সরকার করের সাহায্যে বর্ধিত আয়ের একাংশ আত্মসাৎ করিয়া লইতে পারে।

অবশ্য যে দেশ তাহার প্রকৃত মূলধন বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছে সেই দেশে কিছু পরিমাণ মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইতে পারে। উন্নয়নের উপর মৃদু মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব শুভ; ইহা বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহিত করিবে।

ঘাটতি ব্যয়ের সপক্ষে যুক্তি এই যে ইহা উদ্যোক্তাদিগের আয় বৃদ্ধি করে আর ওই শ্রেণীর ব্যক্তিদের সঞ্চয়প্রবণতা খুব বেশী। মুদ্রাস্ফীতির সময় মূল্যস্তর যে হারে বৃদ্ধি পায় মজুরী ও অন্যান্য স্থির ব্যয় সেই হারে বাড়ে না। ইহার দরুন উদ্যোক্তাদিগের মুনাফা বৃদ্ধি পায় যাহা অধিকতর বিনিয়োগ এবং মূলধন গঠনে ব্যবহৃত হয়। মুদ্রাস্ফীতি নির্দিষ্ট আয়ের ব্যক্তিদিগের প্রকৃত আয় এবং সঞ্চয়প্রবণতা হ্রাস করে। কিন্তু নির্দিষ্ট আয়কারী ব্যক্তিদের সঞ্চয়প্রবণতা যে হারে হ্রাস পায় ব্যবসায়ীদের সঞ্চয়প্রবণতা তদপেক্ষা অধিক হারে বৃদ্ধি পায় বলিয়া দেশে মোট সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

ঘাটতি ব্যয়ের প্রভাব সর্বদাই সম্প্রসারণমূলক। উন্নয়ন যতই অগ্রসর হইতে থাকে বিনিয়োগ হার ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে বলিয়া প্রতিটি পর্যায়ে অধিক পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয়। প্রথমত, বিনিয়োগ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে আর সেইজন্য লেনদেন কার্যে অধিক পরিমাণ টাকার প্রয়োজন হইবে। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে অর্থ বর্হির্ভূত (non-monetised sector) ক্ষেত্রের পরিধি হ্রাস পাইবে এবং আর্থিক লেনদেন ক্ষেত্রের (monetised sector) পরিধি বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া টাকার চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে আয় বৃদ্ধি পাইলে জনগণের নিকট নগদ টাকার চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। চতুর্থত, যদি বৈদেশিক সাহায্যের দরুণ আমদানী উদ্বৃত্ত (import surplus) দেখা দেয় তাহা হইলে টাকার চাহিদা আরও বৃদ্ধি পাইবে। এই সকল ক্ষেত্রে সরকার ঘাটতি ব্যয়ের সাহায্যে ক্রমবর্ধমান টাকার চাহিদার পূরণ করিতে পারে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কিছু পরিমাণ ঘাটতি ব্যয় অপরিহার্য। কিন্তু ঘাটতি ব্যয়ের বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি হইল মুদ্রাস্ফীতি। বিকাশমান দেশে ভোগপ্রবণতা খুব বেশি, অপরদিকে যোগান অস্থিতিস্থাপক। মুদ্রাস্ফীতিকে এরূপ এক সুন্দরী বলিয়া মনে করা হয় যে তাহার নিজের প্রেমিককেই খাইয়া ফেলে।

ইহা স্বেচ্ছামূলক সঞ্চয়কে নিরুৎসাহিত করে। ইহা জনগণকে সঞ্চয় করিতে বাধ্য করে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই কিন্তু মূল্যস্তর বৃদ্ধির দরুণ তাহাদের সঞ্চয় করা অধিকতর কঠিন হইয়া পড়ে। একবার ঘাটতি ব্যয়ের অভ্যাস হইয়া গেলে সরকার আর উহা হইতে বিরত থাকিতে পারিবে না যাহার দরুণ সরকারী অমিতব্যয়িতা এবং পরিশেষে মুদ্রাস্ফীতি মারাত্মক আকারে দেখা দিবে। পরিমিত মদ্যপান অসুস্থ শরীরের পক্ষে শুভ হইতে পারে। কিন্তু একবার যদি সংকোচ কাটিয়া যায় তাহা হইলে উহা অভ্যাসে রূপান্তরিত হইয়া মারাত্মক পরিণতি ঘটাইতে পারে। সুতরাং অতি সাবধানতা সহকারে ঘাটতি ব্যয় করা প্রয়োজন; মনে রাখিতে হইবে যে মৃদু মুদ্রাস্ফীতি অবাঞ্ছনীয় নয় বরং উহা উন্নয়নের অনুকূল।

ঘাটতি ব্যয়ের নিরাপদ সীমা (Safe Limits of Deficit Financing): ঘাটতি ব্যয় "নিরাপদ সীমা" অতিক্রম করিবার পর মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে। যতক্ষণ পর্যন্ত ঘাটতি ব্যয় পরিমিত পরিমাণে করা হয় ততক্ষণ উহা নিরাপদ সীমার মধ্যে থাকে। প্রশ্ন হইতে পারে, ঘাটতি ব্যয়ের নিরাপদ সীমা কি এবং উহা কিভাবে স্থির করা হইবে? অন্যভাবে বলা যায়, কোন নীতি অনুসরণ করিলে ঘাটতি ব্যয় মূলধন গঠন বৃদ্ধি করিবে কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি ঘটাইবে না? ঘাটতি ব্যয়ের নিরাপদ সীমা নির্ধারণ করিবার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিতে হইবেঃ

১। **অর্থনীতির উন্নয়ন হার ঃ** অর্থনীতির উন্নয়ন হার নিরাপদ সীমা নির্ধারণের অন্যতম প্রধান বিষয়। অর্থনীতির উন্নয়ন হইলে ঘাটতি ব্যয় দরুণ মুদ্রাস্ফীতি ঘটিবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে অর্থনীতির বার্ষিক উন্নয়ন হার যদি ৬ শতাংশ হয় এবং দেশে টাকার যোগান ২০০০ কোটি টাকা হয় তাহা হইলে বৎসরে ১২০ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয় করা হইলে কোনরূপ প্রতিকূল প্রভাব দেখা দিবে না। যদি ওই পরিমাণ টাকা অর্থব্যবস্থায় অনুপ্রবিষ্ট না হয় তাহা হইলে মন্দা দেখা দিবে।

২। **অর্থলেনদেন ক্ষেত্রের বৃদ্ধি ঃ** বিকাশমান দেশে একটা বিরাট ক্ষেত্র রহিয়াছে যেখানে টাকার মাধ্যমে লেনদেন হয় না। উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে সরাসরি পণ্য বিনিময় ক্ষেত্রের পরিধি হ্রাস পাইবে এবং অর্থ লেনদেনের ক্ষেত্র বৃদ্ধি পাইবে এবং সেই কারণে টাকার চাহিদা বাড়িবে আর টাকার যোগান বাড়িলেও উহা মুদ্রাস্ফীতি ঘটাইবে না।

৩। **জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঃ** জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে ব্যক্তির নগদ টাকা কাছে রাখিবার জন্য টাকার চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। নগদ টাকা কাছে রাখিবার জন্য যে পরিমাণ টাকার চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে সেই পরিমাণ টাকা বাজারে ছাড়িলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে।

৪। **আমদানী উদ্বৃত্ত সৃষ্টি ঃ** বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করিয়া অথবা সঞ্চিত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহার করিয়া আমদানী উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করা যায় অর্থাৎ রপ্তানীর তুলনায় আমদানী বেশী করা যায়। সরকার যে পরিমাণ আমদানী উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করিতে পারে সেই পরিমাণ ঘাটতি ব্যয় করা হইলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিবে না।

৫। **পণ্যের যোগান বৃদ্ধি ঃ** উৎপাদনে স্থিতিস্থাপকতা যত বেশী হইবে, ঘাটতি ব্যয়ের দরুন উৎপাদন তত বেশী বৃদ্ধি পাইবে এবং মূল্যস্তর তত কম হারে বাড়িবে। ঘাটতি ব্যয়ের দরুন মুদ্রাস্ফীতির কারণ হইল অধিক টাকা স্বল্প দ্রব্যের প্রতি ধাবিত হয়। টাকার যোগান এবং পণ্যের যোগানের মধ্যে যে ফাঁক তাহা বন্ধ হইয়া গেলে ঘাটতি ব্যয় আর মুদ্রাস্ফীতি ঘটাইবে না। এই কারণে উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে সেই ধরনের প্রকল্পের উপর জোর দেওয়ার প্রয়োজন যেখানে বিনিয়োগ-উৎপাদন ব্যবধান (gestation period) খুব কম এবং দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে।

৬। **শ্রমিক সংঘের ক্ষমতা ঃ** মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইলে শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন সুরু করিবে। শ্রমিক সংঘ যত বেশী শক্তিশালী হইবে, মজুরী হার তত বেশী বৃদ্ধি পাইবে। যতই মজুরী বৃদ্ধি পাইবে মুদ্রাস্ফীতির চাপ ততই বেশী হইবে। ঘাটতি ব্যয়ের সাফল্য নির্ভর করে সরকারের মজুরী নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার উপর। মজুরী বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করিতে হইলে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে।

৭। **ভারতে ঘাটতি ব্যয়** (Deficit Financing in India) **ঃ** ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনায় ঘাটতি ব্যয়কে অর্থনৈতিক উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হইয়াছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২৯০ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয় করা হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছিল প্রথম পরিকল্পনার আয়তন খুব বড় ছিল না বলিয়া অর্থসংস্থানের জন্য অধিক পরিমাণ ঘাটতি ব্যয় করিবার প্রয়োজন দেখা দেয় নাই। অবশ্য প্রকৃতপক্ষে ব্যয়ের ঘাটতি পরিমাণ অনেক বেশী হয়। যে পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য

পাওয়া যাইবে বলিয়া ধরা হইয়াছিল তাহা না পাওয়ায় ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ হয় ৩৩৩ কোটি টাকা। যদিও ঘাটতি ব্যয় স্থিরীকৃত পরিমাণ অপেক্ষা বেশী হইয়াছিল তথাপি এই পরিকল্পনাকালে কোনরূপ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় নাই; বরং উহা অর্থনীতিতে গতিসঞ্চার করিয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার আয়তন বড় হওয়ায় এবং অন্যান্য উৎস থেকে অর্থ-সংস্থানের যথেষ্ট সুবিধা না থাকায় ১২০০ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয়ের সিদ্ধান্ত করা হয়। পরিকল্পনার মোট অর্থ সম্পদের এক-চতুর্থাংশ ঘাটতি ব্যয় হইতে সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু ঘাটতি ব্যয়ের প্রকৃত পরিমাণ স্থিরীকৃত পরিমাণ অপেক্ষা কম হয়—উহা দাঁড়ায় ৯৪৮ কোটি টাকা। অধ্যাপক ক্যালডরের মতে ভারতের অর্থব্যবস্থা ৭৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত (অর্থাৎ বৎসরে ১৫০ কোটি টাকা) ঘাটতি ব্যয়ের চাপ সহ্য করিতে পারিবে। অধ্যাপক সেনয়-এর মতে এই বিরাট পরিমাণ ঘাটতি ব্যয় মুদ্রাস্ফীতি ঘটাইয়া চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিবে। সমালোচকদিগের আশংকা যে অমূলক নয় তাহা মূল্যস্তরের অবাধ ঊর্ধ্বগতি হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। মুদ্রাস্ফীতির দরুণ পরিকল্পনা ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং পরিকল্পনার দুই বৎসর পরে উহার কাটছাঁট করা হয়। তৎকালীন অর্থমন্ত্রী যথার্থই বলিয়াছিলেন, ঘাটতি ব্যয় খাদ্য নয়—ঔষধ এবং ঔষধের মত সামান্য পরিমাণে উহা গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসর ইহাকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয় কিন্তু দুর্বল ভারতীয় অর্থনীতি উহাকে হজম করিতে পারে নাই।

তৃতীয় পরিকল্পনায় ৫৫০ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয় করা হইবে বলিয়া স্থির করা হয়। কিন্তু ঘাটতি ব্যয়ের প্রকৃত পরিমাণ হয় ১১৩৩ কোটি টাকা। যে পরিমাণ ঘাটতি ব্যয় করা হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছিল প্রকৃতপক্ষে ঘাটতি ব্যয় উহার দ্বিগুণ হয়। তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনায় ৩৩৫ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয় করা হইবে বলিয়া স্থির করা হয় কিন্তু উহার প্রকৃত পরিমাণ ৬৮২ কোটি টাকা হয়।

মূল্যস্তরের ঊর্ধ্বগতি রোধ করিবার জন্য চতুর্থ পরিকল্পনায় ৮৫০ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয় করা হইবে বলিয়া স্থির করা হইলেও কার্যত: ওই পরিকল্পনাকালে ২৮৮৯ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয় হয়। খসড়া পঞ্চম পরিকল্পনায় ১০০০ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয়ের পরিকল্পনা করা হয় কিন্তু সংশোধিত পঞ্চম পরিকল্পনায় ঘাটতি ব্যয় ১৩৫৪ কোটি টাকায় স্থির করা হয়। পরিকল্পনার প্রথম চার বৎসরে ১৩৫৪ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয় করা হয়।

অনুশীলনী

১। উন্নয়নের জন্য সম্পদ সংগ্রহের উৎস হিসাবে করব্যবস্থার ভূমিকা আলোচনা কর।

২। উন্নয়নের জন্য সম্পদ সংগ্রহের উৎস হিসাবে অভ্যন্তরীণ ঋণের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

৩। ঘাটতি ব্যয় বলিতে কি বুঝ? উহার সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি কি কি?

৪। ঘাটতি ব্যয়ের নিরাপদ সীমা নির্ধারণ করিবার সময় কোন্ কোন্ বিষয়গুলি বিবেচনা করিবে?

৫। ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলিতে ঘাটতি ব্যয়ের ভূমিকা আলোচনা কর।

৬। ঘাটতি ব্যয় কি সকল ক্ষেত্রেই মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি করে? কোন কোন ক্ষেত্রে উহা মুদ্রাস্ফীতি ঘটাইবে না তাহা আলোচনা কর।

নবম অধ্যায়

পরিকল্পনা কালে বাণিজ্য ও আমদানী-রপ্তানী নীতি

(Trade and Balance of Payment Policies during the Plan periods)

বাণিজ্যের গুরুত্ব : অর্ধোন্নত দেশে আয় ও চাহিদার স্বল্পতার দরুণ উৎপাদন যেমন দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে পারে না সেইরূপ বহির্বাণিজ্যের পরিধিও সংকুচিত থাকে। প্রাচীনকালে ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দেশের বাণিজ্য-সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। মুসলমান যুগেও বিদেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য অব্যাহত ছিল। বৃটিশ যুগে ভারত বৃটেনকে সুলভে কাঁচামাল যোগান দিত আর এই সময় হইতে ভারতের বাণিজ্য ঔপনিবেশিক প্রকৃতির রূপগ্রহণ করে অর্থাৎ যে সব কাঁচামাল এদেশ হইতে রপ্তানী হইয়া বিদেশে যাইত তাহারাই আবার শিল্প দ্রব্যে রূপান্তরিত হইয়া এদেশে আমদানী হইত। পরিকল্পনাকাল হইতে ভারতের বহির্বাণিজ্যের ঔপনিবেশিক রূপের অবসান ঘটিয়াছে এবং ধীরে ধীরে উহা উন্নত দেশের বাণিজ্যের রূপ গ্রহণ করিতেছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন শুরু হইলে প্রধানতঃ তিনটি কারণে আমদানী বৃদ্ধি পাইতে থাকে : প্রথমতঃ, উন্নয়নের জন্য যন্ত্রপাতি, কলকব্জা ও অন্যান্য মূলধনী দ্রব্য ব্যাপক হারে বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। অর্ধোন্নত দেশে এগুলি তৈয়ারী হয় না ; এই শ্রেণীর আমদানীকে উন্নয়নমূলক আমদানী বলে। দ্বিতীয়তঃ, বিকাশমান দেশে শিল্পের যে উৎপাদন ক্ষমতার সৃষ্টি হয় তাহা বজায় রাখিবার জন্যে প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম আমদানী করার দরকার হয়। মূলধনী দ্রব্য চিরস্থায়ী নয় বলিয়া ব্যবহারের দরুন উহার যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তাহা পূরণ করিবার জন্য বিদেশ হইতে সাজসরঞ্জাম আমদানী করিতে হয়। উৎপাদন ক্ষমতা সংরক্ষণ করিবার জন্য এইরূপ আমদানী করা হয় বলিয়া ইহাকে সংরক্ষণমূলক আমদানী বলে ; তৃতীয়তঃ, শিল্পায়নের জন্য যে বিপুল পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করা হয় তাহা দেশে আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে। আয় ও কর্মসংস্থান যে হারে বাড়ে ভোগ্যপণ্যের যোগান সেই হারে বাড়ে না বলিয়া বর্ধিত চাহিদা মিটাইবার জন্য বিদেশ হইতে ভোগ্যপণ্য আমদানী করা হয় ; অনেক সময় বিদেশ হইতে ভোগ্যপণ্য আমদানী করিয়া মুদ্রাস্ফীতির চাপ দমন করিবার চেষ্টা করা হয়।

উল্লিখিত কারণসমূহের জন্য বিকাশমান দেশে আমদানীর পরিমাণ দ্রুতহারে বাড়িতে থাকে ও রপ্তানীর তুলনায় আমদানী বেশী হওয়ায় বাণিজ্য

ব্যালেন্স প্রতিকূল হয়। বাণিজ্য ব্যালেন্সের প্রতিকূলতা দূর করিবার জন্য রপ্তানীর পরিমাণ বাড়াইবার চেষ্টা করিতে হইবে। বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমে সাময়িকভাবে সমস্যার কিছুটা সুরাহা হইলেও স্থায়ী ও দীর্ঘকালীন সমাধানের জন্য রপ্তানী বৃদ্ধি অপরিহার্য। সাহায্যের দ্বারা নয়—বাণিজ্যের মাধ্যমে উন্নয়নই (development by trade not by aid) তাই অর্ধোন্নত দেশগুলির মূলমন্ত্র।

পরিকল্পনাকালে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য (Chief Features of India's Foreign Trade during the Plan periods): পরিকল্পনাকালে ভারতের বহির্বাণিজ্যের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিতে পাওয়া যায়:

সাম্প্রতিক কালে ভারতের বহির্বাণিজ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ ও মূল্যের অভূতপূর্ব বৃদ্ধি। ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের মোট পরিমাণ ছিল মাত্র ৩২১ কোটিটাকা। ১৯৭৭-৭৮ সালে উহার পরিমাণহয় ১১,৭৪৪ কোটি টাকা; ইহার মধ্যে আমদানীর মূল্য ছিল ৬০২৮.৬০ কোটি টাকা আর রপ্তানীর মূল্য ছিল ৫৭১৫.০৮ কোটি টাকা। যদিও বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্তু এখনো উহা জাতীয় আয়ের মাত্র ৯ শতাংশ।

দ্বিতীয়ত, পরিকল্পনাকালে ভারতীয় বহির্বাণিজ্য, ঔপনিবেশিক রূপ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। ভারত এখন বিদেশে কেবল কাঁচামালই সরবরাহ করে না বহু শিল্পজাত পণ্যও রপ্তানী করিয়া থাকে। আমদানীর ক্ষেত্রেও বিদেশী শিল্পজাত পণ্যের অনুপাত হ্রাস পাইয়াছে এবং যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের আমদানী বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমদানী দ্রব্যের মধ্যে খাদ্যদ্রব্য, সার, যন্ত্রপাতি, কাঁচা পাট, কাঁচা রবার, পরিবহনের যন্ত্রপাতি, কাঁচাতুলা, খনিজ তেল, রাসায়নিক পদার্থ, পশম, তামা ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি প্রধান। রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে পাটজাত দ্রব্য, চা, সূতীবস্ত্র, লৌহ আকরিক, ম্যাংগানিজ, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি, লৌহ ও ইস্পাত, চামড়ার দ্রব্য, মদ ও কফি প্রধান।

তৃতীয়ত, সাম্প্রতিক কালে ভারতের বহির্বাণিজ্যে দেশানুযায়ী গতির লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পূর্বে ভারতের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যে যুক্তরাজ্যের সর্বপ্রধান স্থান ছিল। ১৯৬৮-৬৯ সাল পর্যন্ত যুক্তরাজ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের প্রধান ক্রেতা ছিল কিন্তু পরে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। বর্তমানে পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিতে ভারতের রপ্তানী বিশেষভাবে বৃদ্ধি

পাইতেছে। ১৯৭৭-৭৮ সালে আমদানী বাণিজ্যের গতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে ভারতের যোগানদার হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম, ইরান দ্বিতীয় ও পশ্চিম জার্মানী তৃতীয় স্থান অধিকার করে। সোভিয়েত রাশিয়া, জাপান, ইতালী, সৌদি আরব এবং বেলজিয়াম হইতে আমদানী বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মুদ্রাঞ্চল হিসাবে ভারতের আমদানী বাণিজ্যের গতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা দেখা যায় যে সর্বপ্রধান স্থান অধিকার করে ডলার অঞ্চল। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করে যথাক্রমে স্টার্লিংঅঞ্চল বহির্ভূত দেশ, স্টার্লিং অঞ্চল এবং ওইসিডি দেশসমূহ (OECD).

চতুর্থত, পূর্বে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের ভিত্তি সংকীর্ণ ছিল কিন্তু বর্তমানে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের ভিত্তি ব্যাপক নয়, এই অভিযোগ আর করা চলে না। পূর্বে ভারতের বহির্বাণিজ্য মাত্র কয়েকটি দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল ছিল আর চা, পাট ও স্তূতীবস্ত্র দ্বারাই ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের মাত্র ২৫ শতাংশ এবং লৌহ আকরিক, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য, লৌহ ও ইস্পাত, চামড়া ও চামড়ার দ্রব্যের গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে।

পঞ্চমত ভারতের বহির্বাণিজ্যে স্থলবাণিজ্যের অনুপাত খুবই কম। আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের অধিকাংশই জলপথে পরিচালিত হইয়া থাকে। ১৯৪৭ সালের পূর্বে ভারতের মোট বহির্বাণিজ্যের ৯৮ শতাংশ সমুদ্রপথে চলিত। অবশ্য পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে যাহা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ছিল পরে তাহা বহির্বাণিজ্যে রূপান্তরিত হওয়ায় বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক না হওয়ায় দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ খুবই কম ছিল। আবার নয়া চীনের সঙ্গে সংঘর্ষ সুরু হওয়ার পর হইতে তিব্বতের সঙ্গে ভারতের স্থল বাণিজ্যের অবসান ঘটে। ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুত্থান হওয়ায় ভারতের স্থলবাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ষষ্ঠত, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত অনুকূল ছিল। কিন্তু পরিকল্পনা সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপুল পরিমাণ যন্ত্রপাতি আমদানী সুরু হইলে বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত প্রতিকূল হইতে থাকে। কিন্তু ১৯৬৬-৬৭ সালের পর থেকেই বাণিজ্য-উদ্বৃত্তে ঘাটতির পরিমাণ কমিতে থাকে, এবং ১৯৭২-৭৩ সালে ২৫ বছর পরে বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত অনুকূল হয়। অবশ্য ১৯৭৩-৭৪ সালে আমদানী বৃদ্ধি হেতু পুনরায় বাণিজ্য-উদ্বৃত্তে ৪৩২ কোটি

টাকা ঘাটতি হয়। ১৯৭৬-৭৭ সালে ৭১·৮৩ কোটি টাকা বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত হয় কিন্তু পর বৎসর ১৯৭৭-৭৮ সালে আবার ৬২৪ কোটি টাকা ঘাটতি হয়।

সপ্তমত,, বহির্বাণিজ্যে রাষ্ট্র বর্তমানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেছে। ১৯৬৫ সালে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন গঠিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত বেসরকারী সংস্থার দ্বারাই ভারতের বহির্বাণিজ্য পরিচালিত হইত। বহির্বাণিজ্যের কাঠামোকে শক্তিশালী করা, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজন অনুসারে বাণিজ্য পরিচালনা করা এবং রপ্তানী সম্প্রসারণের জন্য ভারত সরকার বহির্বাণিজ্যে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করিতেছে।

অষ্টমত, রপ্তানী বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সরকার অগ্রণী হইয়া বিভিন্ন দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করিতেছে। অদ্যাবধি ভারত যে সকল দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে তাহার মধ্যে আছে জাপান, সোভিয়েত ইউনিয়ন, পাকিস্থান, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, পোল্যাণ্ড এবং ফ্রান্স। ইহা ব্যতীত রপ্তানী প্রসার ও আমদানী হ্রাসের জন্য যে কঠোর প্রয়াস চলিয়াছে তাহাও ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের একটি বৈশিষ্ট্য।

পরিশেষে, বিশ্বরপ্তানী বৃদ্ধির তুলনায় ভারতের রপ্তানী বৃদ্ধির হার ক্রমশই হ্রাস পাইতেছে। ১৯৫০ সালে ভারতের রপ্তানী বিশ্বরপ্তানীর ২ শতাংশ ছিল। ১৯৭৮ সালে সালে উহা হ্রাস পাইয়া ০·৫ শতাংশে আসিয়া দাড়াইয়াছে।

ভারতের লেনদেন-উদ্বৃত্তে সমতাহীনতা ও বৈদেশিক মুদ্রা সংকট (Imbalances in India's Balance of Payments and Foreign Exchange Crisis) : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দেশের মোট দৃশ্য ও অদৃশ্য দেনা-পাওনাকে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বলে। যদি কোন দেশের দেনা অপেক্ষা বৈদেশিক পাওনা বেশী হয় তাহা হইলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত অনুকূল হইবে আর যদি কোন দেশের পাওনা অপেক্ষা বৈদেশিক দেনা বেশী হয় তাহা হইলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত প্রতিকূল হইবে। আন্তর্জাতিক লেনদেন-উদ্বৃত্ত অনুকূল হইলে বিদেশের কাছে নীট পাওনা হয়, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয় এবং দেশের বৈদেশিক মুদ্রা-ভাণ্ডার বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে দেশটির ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি পায় ও অর্থনৈতিক বনিয়াদ দৃঢ়তর হয়। পক্ষান্তরে, আন্তর্জাতিক লেনদেন-উদ্বৃত্ত প্রতিকূল হইলে বিদেশের কাছে দেশটির দেনা হয় আর সেই দেনা মিটাইতে বৈদেশিক মুদ্রাভাণ্ডার হ্রাস পায় ও বৈদেশিক মুদ্রাসংকট দেখা দেয়। ইহার ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে দেশটির ক্রয়শক্তি হ্রাস পায় এবং লেনদেন-উদ্বৃত্ত ক্রমাগত

প্রতিকূল হইতে থাকিলে উহাকে অর্থনৈতিক কাঠামোর দুর্বলতার লক্ষণ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্যন্ত ভারতের আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী বেশী ছিল অর্থাৎ ভারতের বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত অনুকূল ছিল। অন্য দেশের ক্ষেত্রে এইরূপ রপ্তানী বৃদ্ধির আধিক্য দেশের সম্পদ বৃদ্ধির সহায়তা করে কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে তাহা হয় নাই। এই অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত হইতে ইংলণ্ডকে প্রতি বৎসর হোমচার্জ মিটাইতে হইত; অবশ্য হোমচার্জ মিটাইয়াও ভারত মোটা অংকের স্টার্লিং জমাইতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের পর হইতে ভারতের বহির্বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত ক্রমাগত প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া চলিয়াছে। আলোচনার সুবিধার জন্য ভারতের বহির্বাণিজ্যের প্রতিকূল লেনদেন-উদ্বৃত্তের সময়কে দুইভাগে ভাগ করা যায়: ১৯৪৮-৪৯ সাল হইতে ১৯৫৫-৫৬ সাল এই আট বৎসর এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরু হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত।

লেনদেন-উদ্বৃত্তের প্রতিকূল অবস্থার প্রথম পর্যায়: ১৯৪৮-১৯৫৬: ১৯৪৮-৪৯ সাল হইতে ১৯৫৫-৫৬ পর্যন্ত এই আট বছরে ভারতের প্রতিকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের পরিমাণ ৮০২·৭ কোটি টাকা হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ হইলে খাদ্য, পাট, তুলা প্রভৃতির প্রধান উৎপাদক অঞ্চলগুলি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে; ফলে স্বভাবতঃই ভারতকে এইসব কাঁচামাল আমদানী করিতে হয়; দেশবিভাগের দরুন ভারত খাদ্যশস্যে ঘাটতি অঞ্চলে পরিণত হয় এবং উদ্বাস্তুদের আগমনে খাদ্যাভাব অধিকতর বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতকে রপ্তানীর তুলনায় অধিক আমদানী করিতে হয়। দ্বিতীয়ত, ১৯৫১ সাল হইতে ভারতে পরিকল্পনার কাজ সুরু হয়। পরিকল্পনাকে কার্যকর করিতে বিদেশ হইতে প্রভূত পরিমাণে কাঁচামাল, মূলধনী দ্রব্য এবং যন্ত্রপাতি আমদানী করিতে হয়। তৃতীয়ত, ১৯৫১-৫২ সালে কোরিয়ার যুদ্ধের সময় একদিকে যেমন মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়, অন্যদিকে ঠিক সেইরকম ভোগ্যপণ্যের যোগান হ্রাস পায়; চাহিদা ও যোগানের প্রতিকূল প্রভাবে দেশে মূল্যস্তর বৃদ্ধি পায় আর ইহার দরুন রপ্তানী ব্যাহত হয়। চতুর্থত, এই সময় হইতে জনসংখ্যার প্রবল চাপের দরুন প্রচণ্ড খাদ্য-ঘাটতি দেখা দেয় এবং খাদ্য-ঘাটতি পূরণের জন্য ১০০ কোটির বেশী টাকার খাদ্য বিদেশ হইতে আমদানী করা হয়।

প্রথম পরিকল্পনার প্রথম বৎসর লেনদেন উদ্বৃত্তের ঘাটতি হয়েছিল সর্বাধিক

কিন্তু প্রথম পরিকল্পনায় যে বাণিজ্য নীতি গ্রহণ করা হয় তাহাতে রপ্তানী প্রসার ও আমদানী হ্রাসে বিশেষ সাফল্য অর্জিত হওয়ায় পরিকল্পনার পরবর্তী চার বৎসরে অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়। সামগ্রিকভাবে প্রথম পরিকল্পনাকালে চলতি হিসাবখাতে লেনদেন-উদ্বৃত্তের ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১২৩ কোটি টাকা। কিন্তু ওই সময়ে সরকারী দানের পরিমাণ বাদ দিলে লেনদেন-উদ্বৃত্তে অনুকূল দেখা যায়।

লেনদেন-উদ্বৃত্তের দ্বিতীয় পর্যায়ঃ সাম্প্রতিক অবস্থাঃ দ্বিতীয় পরিকল্পনা কাল হইতে ভারতের লেনদেন-উদ্বৃত্তের প্রতিকূলতা চরম সংকটের আকার ধারণ করে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে লেনদেন ঘাটতির পরিমাণ হয় ১৯২০ কোটি টাকা—উহা পরিকল্পনার হিসাব অপেক্ষা ৮০০ কোটি টাকা বেশী। এই লেনদেন ঘাটতির কারণ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন: প্রথমত, মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন সম্পর্কে যে হিসাব করা হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে ভুল প্রতিপন্ন হইয়াছে। হিসাব করা হইয়াছিল যে এই সময়ে ১১০০ কোটি টাকা ঘাটতি হইবে, সঞ্চিত স্টার্লিং হইতে ২০০ কোটি টাকা আর বাকী ৯০০ কোটি টাকা বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যের দ্বারা পূরণ করা হইবে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঘাটতির পরিমাণ হয় ১৯২০ কোটি টাকা। অন্যভাবে বলা যায় যে আমদানী অনুমান অপেক্ষা বেশী আর রপ্তানী অনুমান অপেক্ষা কম হওয়ায় লেনদেন-উদ্বৃত্তের সংকট দেখা দেয়। দ্বিতীয়ত, পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থায় বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে চরম অব্যবস্থা ও সমন্বয়ের অভাব দেখা যায়। পরিকল্পনা কমিশন, রিজার্ভ ব্যাংক এবং বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রিদপ্তর—সরকারের এই তিন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকিলে বৈদেশিক মুদ্রা-সংকট এরূপ তীব্র আকার ধারণ করিত না। তৃতীয়ত, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকাল হইতে দেশে খাদ্যাভাব দেখাদেয় এবং খাদ্যঘাটতি পূরণের জন্য বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী বৃদ্ধি পায়। চতুর্থত, এই সময় পশ্চিমী দেশগুলিতে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেওয়ায় উহাদের নিকট হইতে যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে অনুমিত দাম অপেক্ষা অনেক বেশী দাম দিতে হইয়াছে; এই সময় সুয়েজবিবাদের জন্য আমদানী পণ্যের জাহাজ ভাড়া বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পঞ্চমত, দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রকাশের পরও কতকগুলি নূতন কার্যসূচী গ্রহণ করা হয় আর ইহার দরুন বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজনবৃদ্ধি পায়। ষষ্ঠত, দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসর আমদানী নীতি বেশ উদার ছিল আর সেই সুযোগে বহু অপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানী

হওয়ায় আমদানীর পরিমাণ নির্ধারিত অংক ছাড়াইয়া যায়। সপ্তমত, এই সময় সহসা চীনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটায় প্রতিরক্ষাখাতে ব্যয় বৃদ্ধি করিয়া বিদেশ হইতে অধিক পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করিতে হয়। পরিশেষে, বৈদেশিক মুদ্রাসংকটের জন্য রপ্তানী প্রসারের যে প্রয়োজন ছিল তাহাও সাফল্য লাভ করে নাই। আন্তর্জাতিক বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতা, ইউরোপ ও আমেরিকার ব্যবসায়ে মন্দা, রপ্তানী পণ্যের গুণগত উৎকর্ষের প্রতি অবহেলা, রপ্তানী বাণিজ্যে বৈচিত্র্যের অভাব ইত্যাদি কারণে রপ্তানী প্রসার আশানুরূপ হয় নাই। পরিকল্পনার প্রথম দশ বৎসরে বিশ্বের রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া দ্বিগুণ হয় কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে ১৯৫০ সালের তুলনায় ১৯৬০ সালে রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ বিশ্বের রপ্তানী বাণিজ্যের ২·১ শতাংশ হইতে হ্রাস পাইয়া ১·১ শতাংশে আসিয়া দাঁড়ায়।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে (১৯৬১-৬৬) লেনদেন-উদ্বৃত্তের ক্ষেত্রে মোট ঘাটতির পরিমাণ হয় ২৪১৬ কোটি টাকা। অনুমান করা হইয়াছিল ঘাটতি হইবে ২০৫০ কোটি টাকা কিন্তু প্রকৃত ঘাটতি ৩৬৬ কোটি টাকা বেশী হয়। অর্থমন্ত্রী তৃতীয় পরিকল্পনাকালে বৈদেশিক মুদ্রাসংকটের ছয়টি কারণ উল্লেখ করেন : (১) বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে দেশের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাকে জোরদার করিবার জন্য বিদেশ হইতে অধিক পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করা হয় ; (২) খাদ্য সীমান্তে ব্যর্থতার দরুন বিদেশ হইতে অধিক পরিমাণে খাদ্য আমদানী করিতে হয় ; (৩) দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করা হয় উহা বাবদ সুদ ও ঋণের আসল শোধের কিস্তি দিতে গিয়া অধিক পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়, (৪) রপ্তানী বৃদ্ধি আশানুরূপ হয় নাই ; (৫) যেসব দেশের সঙ্গে ভারতীয় মুদ্রায় লেনদেন চলে সেইসব দেশে রপ্তানী হ্রাস পায় এবং (৬) বহু ইউরোপীয় দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেওয়ায় ওই সব দেশ হইতে অধিক ব্যয়ে পণ্য আমদানী করার দরুন অধিক পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়।

চতুর্থ পরিকল্পনাকালে (১৯৬৯-৭৩) মোট আমদানী ৯৫৩০ কোটি টাকা হইবে বলিয়া হিসাব করা হয়। আমদানীর প্রয়োজন পূরণের জন্য রপ্তানীর পরিমাণ বার্ষিক ৭ শতাংশ চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়াইতে হইবে। ১৯৬৯-৭০ সালে রপ্তানীর পরিমাণ হইবে ১৪০০ কোটি টাকা, পরিকল্পনার শেষ বৎসরে উহা বাড়িয়া ১৯০০ কোটি টাকা হইবে। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে মোট রপ্তানীর

পরিমাণ হইবে ৮৩০০ কোটি টাকা অর্থাৎ ওই সময়ও লেনদেন ঘাটতির পরিমাণ হইবে ১৪৩০ কোটি টাকা। ১৯৫০-৫১ সাল হইতে ১৯৬৬-৬৭ সাল পর্যন্ত ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে লেনদেন ঘাটতি বৃদ্ধি পাইয়া ৯২১·৮০ কোটি টাকা হয় কিন্তু ১৯৬৭-৬৮ সাল হইতেই উহা গতি পরিবর্তন করিয়া হ্রাস পাইতে থাকে ; ১৯৭০-৭১ সালে ঘাটতির পরিমাণ হ্রাস পাইয়া ৯৭·৫২ কোটি টাকা হয় কিন্তু পুনরায় ১৯৭৩-৭৪ সালে ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৪৩৭·৬৯ কোটি টাকা হয়।

ভারতের বহির্বাণিজ্যের লেনদেন ঘাটতি কাঠামোগত ভারসাম্যহীনতা (structural disequilibrium) এবং মূল্যগত ভারসাম্যহীনতার (price disequilibrium) ফল আর এই লেনদেন ঘাটতি অস্থায়ী বা আকস্মিক নয় —ইহা ভারতের উন্নয়নমূলক কার্যসূচীর সহিত জড়িত ; এই লেনদেন ঘাটতি ধীরে ধীরে মিটাইতে হইবে।

বৈদেশিক মুদ্রাসংকট বা লেনদেন ঘাটতি প্রতিরোধের ব্যবস্থা (Measures to fight Imbalance) : বৈদেশিক মুদ্রাসংকট তথা লেনদেন ঘাটতি প্রতিরোধের তিনটি পদ্ধতি আছে—আমদানী হ্রাস, রপ্তানী বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ।

আমদানী হ্রাস করিবার জন্য আমদানী পরিবর্ততা (import substitution) এবং আমদানী কোটা (quota) ধার্য করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অপরিহার্য পণ্য ব্যতীত অন্য সকল সামগ্রীর চাহিদা দেশীয় পণ্যের দ্বারা মিটাইতে হইবে। ইহা ছাড়া আমদানী হ্রাস করিবার জন্য আমদানী কোটা ধার্য করা হয়। অবশ্য আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিয়া লেনদেন ঘাটতির খুব বেশী পূরণ করা সম্ভব হইবে না। বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বিলম্বে পাওনা মেটানোর ভিত্তিতে (deferred payment system) আমদানী নীতিকে উৎসাহ দেওয়া ও বিদেশ ভ্রমণ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হইতেছে।

বৈদেশিক মুদ্রাসংকট সমাধানের দ্বিতীয় উপায় হইল বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করা। অর্ধোন্নত দেশের দ্রুত উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য গ্রহণ অপরিহার্য বলা যায়। বৈদেশিক সাহায্য ঋণ হিসাবে, অনুদান বা সরকারী দান হিসাবে, কারিগরী সাহায্য হিসাবে অথবা দেশীয় শেয়ার মূলধনে অংশ গ্রহণ হিসাবে পাওয়া যায়। এতদিন পর্যন্ত আমরা আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার, বিশ্ব ব্যাংক, ভারত সাহায্যকারী ক্লাব (Aid India Club) প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থা হইতে প্রভূত পরিমাণ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। প্রথম, দ্বিতীয়

ও তৃতীয় পরিকল্পনায় যথাক্রমে ১৮৮ কোটি টাকা, ১০৯০ কোটি টাকা ও ২৪৫৫ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে ৪১৩০ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন হইবে। কিন্তু ওই পরিকল্পনার প্রথম চার বৎসরে ৩১০৮ কোটি টাকা সাহায্য পাওয়া যায় আর শেষ বৎসরে (১৯৭৩ ৭৪ সালে) ৭১২ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া হিসাব করা হয় অর্থাৎ মোট সাহায্য অনুমিত হিসাব অপেক্ষা ৩১০ কোটি টাকা কম হইয়াছে। পঞ্চম পরিকল্পনাকালে ৪০০৮ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে।

এইরূপ অবস্থায় স্থায়ীভাবে বৈদেশিক মুদ্রা সংকট প্রতিরোধ করিতে হইলে রপ্তানী প্রসার অপরিহার্য। রপ্তানী প্রসার করিতে হইলে রপ্তানী বৃদ্ধির পথে যে সকল বাধা আছে তাহা অপসারণ করিবার জন্য কার্যসূচী গ্রহণ করিতে হইবে; দেশে উৎপাদন বৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ রপ্তানী প্রসাবের অন্যতম প্রধান শর্ত। রপ্তানী প্রসারের উদ্দেশ্য রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন ও রপ্তানী উন্নয়ন কাউন্সিল গঠন করা হইয়াছে। কাউন্সিলগুলি ভারতীয় পণ্যের বৈদেশিক বাজার সম্পর্কে গবেষণা চালাইতেছে। বিদেশে নূতন নূতন বাজার অবিষ্কারের জন্য সরকার ব্যাপক প্রয়াস চালাইতেছেন। রপ্তানী প্রসারের জন্য বিভিন্ন দেশের সহিত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করা হইতেছে। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করিয়া বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণ করা হইতেছে। রপ্তানী প্রসারের জন্য রপ্তানীকারীদের উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে শুল্ক সংক্রান্ত বিশেষ সুবিধাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রপ্তানী প্রসারের উদ্দেশ্যে ১৯৬৬ সালে টাকার অবমূল্যায়ন (devaluation) করা হয়।

ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য (Export Trade of India, ঃ রপ্তানী বাণিজ্যকে উন্নয়নের চালক বা engine of growth বলিয়া বর্ণনা করা হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের বাহক হিসাবে সাম্প্রতিককালে রপ্তানী বাণিজ্যের গুরুত্ব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করিবার জন্য দ্রুত শিল্পায়ন প্রয়োজন। শিল্পোন্নতিকে দ্রুততর এবং সফল করিতে হইলে প্রাথমিক পর্যায়ে বিদেশ হইতে বিপুল পরিমাণে যন্ত্রপাতি ও উন্নত কৃৎকৌশল আমদানী করা প্রয়োজন আর পাওনা মিটাইবার জন্য প্রয়োজন প্রভূত পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার, রপ্তানীর তুলনায় আমদানী অধিক হওয়ায় ভারতের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ১৯৫১ সাল হইতে অদ্যাবধি নিয়মিতভাবে (১৯৭২-৭৩ সাল বাদ) প্রতিকূল

হইয়াছে। বৈদেশিক মুদ্রার উৎস তিনটি—বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চিত তহবিল ও স্বর্ণভাণ্ডার, বৈদেশিক সাহায্য এবং রপ্তানী প্রসার। বিভিন্ন বৈদেশিক পাওনা মিটাইতে আমাদের সঞ্চিত স্টার্লিং মুদ্রা প্রায় নিঃশেষিত; বৈদেশিক ঋণ বাবদ বৈদেশিক মুদ্রালাভ করা যায় বটে তবে এই সাহায্য নানারূপ শর্ত জড়িত থাকায় উহা যত কম গ্রহণ করা যায় ততই মঙ্গল। তাহা ছাড়া ইহা সমস্যার স্থায়ী সমাধানও নয়। সেইজন্য বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের শ্রেষ্ঠ এবং নিশ্চিত পন্থা হইল রপ্তানী সম্প্রসারণ। রপ্তানী বৃদ্ধি করিয়া দেশ প্রয়োজনীয় মুদ্রা অর্জন করিয়া পরিকল্পিত পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। আমদানীর মূল্যশোধ ও বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের ঘাটতি দূর করিবার জন্য রপ্তানী বৃদ্ধি অপরিহার্য।

রপ্তানী বৃদ্ধির গুরুত্ব খুব বেশী হইলেও উহার সম্প্রসারণ খুব ধীর গতিতে হইতেছে। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতীয় রপ্তানীর মূল্য ছিল ৬০০.৬৪ কোটি টাকা, ১৯৭৩-৭৪ সালে রপ্তানী বাণিজ্যের মূল্য হয় ২৫২৩.৪০ কোটি টাকা; ১৯৭৭-৭৮ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া হয় ৫৩৭৫.০৮ কোটি টাকা।

রপ্তানী বৃদ্ধির পথে বাধা (Obstacles to Export Promotion): সাম্প্রতিককালে ভারতের রপ্তানী প্রসার লাভ করিলেও উহার বৃদ্ধির হার সন্তোষজনক নয়। ১৯৫০-৫১ সালে রপ্তানী বাণিজ্যের মূল্য ছিল ৬০০.৬৪ কোটি টাকা, ১৯৭৭-৭৮ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৫৩৭৫.০৮ কোটি টাকা হয়। রপ্তানী প্রসারের জন্য কঠোর প্রয়াস চালাইলে কতকগুলি প্রতিবন্ধক থাকায় উহা আশানুরূপ হইতেছে না। প্রথমত, জনসংখ্যা ও আয়বৃদ্ধির দরুণ দেশে ভোগ্যপণ্যের চাহিদাও বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই ক্রমবর্ধমান অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করিতেই উৎপাদনের অধিকাংশ ব্যয়িত হওয়ায় রপ্তানীযোগ্য উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পাইতেছে না। দ্বিতীয়ত, দেশে যে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়াছে তাহার দরুণ উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বৈদেশিক প্রতিযোগিতার বাজারে ভারতীয় পণ্যের চাহিদা হ্রাস পাইয়াছে, ইহা ছাড়া দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঘটায় দেশীয় শিল্পপতিদের কাছে রপ্তানীর পরিবর্তে দেশের বাজারে বিক্রয়ই লাভজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তৃতীয়ত, বহু ক্ষেত্রে ভারতের রপ্তানী পণ্য আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী না হওয়ায় উহারা বৈদেশিক বাজারে সুনাম অর্জনে ব্যর্থ হইয়াছে। চতুর্থত, বিদেশের বাজারে ভারতীয় পণ্যসমূহের উপযুক্ত প্রচারের অভাবে উহাদের বাজার সংগঠিত হইতে পারিতেছে না। পঞ্চমত,

সরকারী নীতিও যথেষ্ট পরিমাণে স্ববিরোধী। রপ্তানী বৃদ্ধি সরকারী নীতি হইলেও ক্রমাগত রপ্তানী শুল্ক বৃদ্ধি করিয়া সরকার রপ্তানী প্রসারের পথে বাধার সৃষ্টি করিতেছে।

উল্লিখিত অভ্যন্তরীণ কারণ ছাড়াও কতকগুলি বাহ্যিক শক্তি আমাদের রপ্তানী বৃদ্ধির পথে বাধার সৃষ্টি করিতেছে। ইহার মধ্যে বিদেশে পরিবর্ত সামগ্রীর ক্রমাগত ব্যবহার বৃদ্ধি, আমদানীকারী দেশগুলিতে উচ্চহারে শুল্ক প্রাচীর স্থাপন, মার্কিন ডলারের সংকট, বৃটেনের সাধারণ বাজারে যোগদান এবং আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদার আকস্মিক পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য।

রপ্তানী প্রসারের সম্ভাবনা (Prospects for Exports) : রপ্তানী বৃদ্ধির পথে উল্লিখিত বাধাসমূহ থাকা সত্ত্বেও রপ্তানী প্রসারের বিপুল সম্ভাবনা আছে। রপ্তানী বৃদ্ধির পথে যে সব বাধা রহিয়াছে সেগুলিকে অপসারণ করিতে পারিলে রপ্তানী সম্প্রসারণের বিরাট সম্ভাবনা আছে। প্রথমত, উৎপাদন বৃদ্ধির পথে যে সব বাধা রহিয়াছে সেগুলিকে দূর করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, কর ও অন্যান্য ফিস্‌ক্যাল হাতিয়ার ব্যবহার করিয়া অভ্যন্তরীণ ভোগকে কঠোরভাবে হ্রাস করিতে হইবে। তৃতীয়ত, অভ্যন্তরীণ বাজারের তুলনায় বৈদেশিক বাজারে পণ্য যাহাতে অধিকতর লাভজনক হয় সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে আর ইহার দরুন রপ্তানী বৃদ্ধি পাইবে। চতুর্থত, রপ্তানীযোগ্য পণ্যের উৎপাদন ব্যয় যাহাতে না বাড়ে সেই উদ্দেশ্যে মুদ্রাস্ফীতি বিরোধী কর্মসূচী গ্রহণ করিতে হইবে। পঞ্চমত, দেশে যেসব রপ্তানী শিল্পের অতিরিক্ত উৎপাদনক্ষমতা আছে তাহার পরিপূর্ণ ব্যবহার করিতে হইবে। ষষ্ঠত, রপ্তানী শুল্কে রেয়াৎ দিয়া এবং রপ্তানীর উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ শিথিল করিয়া রপ্তানী বৃদ্ধি করিতে হইবে। পরিশেষে, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি এরূপ ভাবে সম্পাদন করিতে হইবে যাহাতে ভারতীয় টাকায় বৈদেশিক পাওনার একাংশ মেটানো যায়। ইহা ছাড়া, রপ্তানী পণ্যের মান উন্নত করিতে হইবে এবং ব্যাপক প্রচার কার্য চালাইয়া ও বাজার সংক্রান্ত গবেষণার মাধ্যমে বৈদেশিক বাজার সংগঠিত করিতে হইবে।

ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে রপ্তানী বৃদ্ধির সম্ভাবনা খুব উজ্জ্বল না হইলেও পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহ এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে রপ্তানী সম্প্রসারণের অফুরন্ত সম্ভাবনা আছে।

রপ্তানী নীতি (Export Policy) : রপ্তানী প্রসার করিয়াই প্রতিকূল লেনদেন উদ্বৃত্তের মোকাবিলা করা সম্ভব। স্বাধীনতা লাভের পর ভারত সরকারের রপ্তানী নীতি দুইটি মূল উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত হইয়া আসিতেছে—রপ্তানী নিয়ন্ত্রন ও পরবর্তী পর্যায়ে রপ্তানী সম্প্রসারণ। ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য প্রসারের পথে দুই প্রধান বাধা ছিল : (১) ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের সাংগঠনিক কাঠামোর দুর্বলতা এবং (২) সরকারী নীতির সুনির্দিষ্টতা ও দীর্ঘকালীন দৃষ্টিভংগীর অভাব। সাধারণভাবে বলা যায় যে এই ত্রুটিগুলি দূর করিয়া রপ্তানী প্রসাব করাই রপ্তানী নীতির লক্ষ্য। যুদ্ধ ও দেশবিভাগের অব্যবহিত পরে দেশে যে মুদ্রাস্ফীতি ও খাদ্যসংকট দেখা দেয় তাহার মোকাবিলা করিবার জন্য রপ্তানী নীতি গ্রহণ করা হয়। দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের জন্য কতকগুলি পণ্যের রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে বপ্তানীর উপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা হয় এবং বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি পূরণের জন্য রপ্তানী প্রসারেব নীতি গ্রহণ করা হয়।

বপ্তানী প্রসারেব নূতন উপায় উদ্ভাবনের জন্য ১৯৪৯ সালে সরকার প্রথম রপ্তানী প্রসার কমিটি বা গোরওয়ালা কমিটি গঠন করে। কমিটির প্রধান প্রধান সুপারিশগুলি এইরূপ : (১) ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বৈদেশিক বাজারের চাহিদা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হইতে হইবে ; (২) ভারতীয় পণ্যের মান উন্নত করিতে হইবে, (৩) ভারতীয় পণ্যের দাম হ্রাস করিয়া প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বাড়াইতে হইবে এবং (৪) ফটকা কারবারীদের কাযকলাপের দরুন যাহাতে রপ্তানী বাণিজ্যের প্রসার ব্যাহত না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সরকার এই কমিটিব সমস্ত সুপাবিশ গ্রহণ কবিয়া রপ্তানী প্রসারের প্রয়াস চালান।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বৈদেশিক মুদ্রা সংকট তীব্র আকার ধারণ করিলে সামগ্রিকভাবে বপ্তানী প্রসারের প্রশ্নটিকে বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য ১৯৫৭ সালে দ্বিতীয় রপ্তানী প্রসার কমিটি বা ডি সুজা কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির প্রধান প্রধান সুপারিশগুলি এইরূপ : (১) দেশের সকল ক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়া কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে, (২) ভারতের চিরাচরিত ও নূতন পণ্যের জন্য নূতন নূতন বৈদেশিক বাজারের অনুসন্ধান করিতে হইবে, (৩) অভ্যন্তরীণ ভোগকে যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রণ করিয়া রপ্তানী প্রসার করিতে হইবে, (৪) মূল্যকে প্রতিযোগিতার স্তরে রাখিতে হইবে. ইহার জন্য একদিকে

রপ্তানী শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে হইবে আর অপরদিকে রপ্তানী পণ্যের উপর হইতে রপ্তানী শুল্ক হ্রাস করিতে হইবে, (৫) অন্যান্য দেশের সঙ্গে এমনভাবে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে যাহাতে বিদেশী পাওনার একাংশ ভারতীয় টাকায় পরিশোধ করা যায়।

তৃতীয় পরিকল্পনায় রপ্তানীর লক্ষ্যমাত্রা ৩৮০০ কোটি টাকা ধার্য করা হয়। ইহা দ্বিতীয় পরিকল্পনার তুলনায় ৮০০ কোটি টাকা অধিক। কিভাবে রপ্তানীর এই লক্ষ্যমাত্রায় পৌছান যাইবে সে সম্পর্কে উপায় নির্ধারণের জন্য ১৯৬২ সালে মুদালিয়র কমিটি নিয়োগ করা হয়। কমিটির প্রধান প্রধান সুপারিশগুলি হইল: (১) চিরাচরিত প্রথায় রপ্তানী বৃদ্ধির চেষ্টা করিলে চলিবেনা, সারা দেশে রপ্তানী বৃদ্ধির অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করিবার জন্য আপ্রাণ প্রয়াস চালাইতে হইবে, (২) একটী রপ্তানী প্রসার রিজার্ভ তহবিল গঠন করিতে হইবে, রপ্তানী হইতে উপার্জিত আয়ের উপর কিছু কিছু কর অব্যাহতি দিয়া এই রিজার্ভ তহবিল গঠন করা যাইতে পারে, (৩) দেশের ভিতর বিক্রীত পণ্য-সামগ্রীর উপর সামান্য হারে সেস ধার্য করিতে হইবে, (৪) ২০ হইতে ২৫ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার একটি আবর্তনমূলক তহবিল (revolving fund) গঠন করিয়া রপ্তানী দ্রব্য উৎপাদনের জন্য অতিরিক্ত কাঁচামাল আমদানীর উদ্দেশ্যে টাকার ব্যবস্থা করিতে হইবে, (৫) আমদানী লাইসেন্স দানের ব্যবস্থাটিকে অধিকতর সহজ করিবার উদ্দেশ্যে বার্ষিক ভিত্তিতে আমদানী লাইসেন্স প্রদান করিতে হইবে এবং (৬) অতিরিক্ত মাত্রায় করধার্য করিয়া রপ্তানী প্রসার ব্যাহত করা চলিবে না।

মুদালিয়র কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে রপ্তানী প্রসারের জন্য নিম্নলিখিত কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়: (১) উৎপাদন বৃদ্ধি ও অভ্যন্তরীণ ভোগ হ্রাস করিয়া রপ্তানীযোগ্য উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি, (২) বিদেশী বাজারে বিক্রয়ের উপর অধিকতর গুরুত্ব দান, (৩) উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করিয়া বিদেশী প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হওয়া, (৪) রপ্তানী পণ্যের গুণগত উৎকর্ষ বজায় রাখা (৫) রপ্তানী দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পসমূহকে কাঁচামাল, ঋণ ও বৈদেশিক মুদ্রার সুযোগসুবিধা দেওয়া, (৬) রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য ব্যাপকভাবে প্রসার করা, (৭) রপ্তানী বাণিজ্যের ঝুঁকি হ্রাস করিবার জন্য একটি রপ্তানী বাণিজ্য গ্যারান্টি কর্পোরেশন গঠন করা, (৮) অধিক সংখ্যক দেশের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করা, (৯) ৩ থেকে ৫ বছরের বিলম্বে পাওনা আদায়ের ভিত্তিতে

রপ্তানী পণ্য বিদেশের বাজারে বিক্রয় করা এবং (১০) বিভিন্ন দেশে অবস্থিত ভারতীয় দুতাবাসগুলির মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার কার্য চালান। এই সকল প্রয়াস সত্ত্বেও ভারতের রপ্তানী বিশ্বের মোট রপ্তানীর ১·২ শতাংশ হইতে হ্রাস পাইয়া ১ শতাংশে আসিয়া দাঁড়ায়।

১৯৬৪ সালে স্বামীনাথন কমিটি রপ্তানী প্রসারের জন্য দুইটি প্রধান সুপারিশ করে: (১) যে সকল শিল্প আমদানী হ্রাস ও রপ্তানী প্রসারের সহায়ক সেগুলির উন্নয়নেব উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হইবে। (২) আমদানী প্রতিযোগী শিল্পগুলিকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতে হইবে। সরকার স্বামীনাথন কমিটির সুপারিশগুলি সামান্য পরিবর্তন করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের জন্য চতুর্থ পরিকল্পনায় রপ্তানী বৃদ্ধি ও আমদানী হ্রাসের উপর যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনা কালে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৫০০ কোটি টাকা, চতুর্থ পরিকল্পনা-কালে উহা হ্রাস করিয়া ১৮৫০ কোটি টাকা করা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় রপ্তানীর লক্ষ্যমাত্রা ৩৮০০ কোটি টাকা ধার্য করা হয়, চতুর্থ পরিকল্পনায় মোট রপ্তানী ৮৩০০ কোটি টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

চতুর্থ পরিকল্পনায় সামগ্রিকভাবে রপ্তানী বাণিজ্যকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্র বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হয়।

পঞ্চম পরিকল্পনায় বলা হয় যে রপ্তানী প্রসারের জন্য শুধুমাত্র রপ্তানী-যোগ্য পণ্য উৎপাদন করিলেই চলিবে না, উহারা যাহাতে দেশের চাহিদা মিটাইতে ব্যবহৃত না হইয়া বিশ্বের বাজারে বিক্রীত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে অর্থ সাহায্য, রপ্তানী পণ্যের জন্য কাঁচামাল আমদানী, করসংক্রান্ত সুবিধা, শিল্প লাইসেন্স প্রদানে অগ্রাধিকার ও উৎপাদনের একাংশ রপ্তানী করা বাধ্যতামূলক করা হয়। রপ্তানী প্রসারের উদ্দেশ্যে ট্যাণ্ডনের সভাপতিত্বে এক উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি রপ্তানী প্রসারের জন্য বিশ্বের প্রধান প্রধান বাজারে ২০টি অফিস খুলিবার জন্য পরামর্শ দেয়। ট্যাণ্ডন বলেন ভারত উৎপাদনে উন্নত কৃৎকৌশল প্রয়োগ না করায় দেশের রপ্তানী প্রসার ব্যাহত হইতেছে। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন যে বিশ্বের বাজারে ভারতীয় মোটর গাড়ীর চাহিদা নাই কারণ

উহার কৃৎকৌশল অনুন্নত। পেট্রোল ইঞ্জিনের পরিবর্তে ডিজেল ইঞ্জিন প্রবর্তন করা প্রয়োজন।

রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য গৃহীত কার্যসূচী (Measures for Export Promotion): সাম্প্রতিক কালে রপ্তানী প্রসারের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা-গুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ (১) প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থা, (২) রপ্তানীর বৈচিত্র্যসাধন ও নূতন নূতন বাজারের আবিষ্কার, এবং (৩) রপ্তানীকারকদের অধিক সুযোগসুবিধা ও উৎসাহ প্রদান করা।

প্রথম শ্রেণীর ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে রপ্তানী উন্নয়ন কাউন্সিল, রপ্তানী ক্রেডিট ও গ্যারান্টি কর্পোরেশন, বোর্ড অফ ট্রেড, পণ্য বোর্ড, রপ্তানী পরিদর্শন কাউন্সিল, ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ফরেন ট্রেড, এক্সপোর্ট হাউস ও ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ প্যাকেজিং উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৭-৭৮ সালে ১৭টি রপ্তানী উন্নয়ন কাউন্সিল গঠিত হইয়াছে আর এই সকল কাউন্সিলের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ান এক্সপোর্ট অরগানাইজেশান নামক একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠিত হইয়াছে। রপ্তানী বাণিজ্যে ঋণ ও গ্যারান্টি দেওয়া এবং ঝুঁকি গ্রহণের উদ্দেশ্যে ১৯৬৪ সালে রপ্তানী ঋণ ও গ্যারান্টি কর্পোরেশন গঠিত হয়। শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া রপ্তানী প্রসার নীতির সংশোধনের উদ্দেশ্যে ১৯৬২ সালে বোর্ড অফ্ ট্রেড গঠিত হয়। বর্তমানে চা, কফি, রবার, নারিকেল কাতা, সিল্ক এবং এলাচ এই সকল পণ্যের জন্য পৃথক পৃথক পণ্য বোর্ড গঠিত হইয়াছে। এই বোর্ডগুলি সংশ্লিষ্ট পণ্য উৎপাদন, উন্নয়ন এবং রপ্তানীর জন্য দায়ী। প্রাক-জাহাজ বোঝাই পণ্য পরিদর্শন বাধ্যতামূলক করিয়া উহার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হইয়াছে রপ্তানী পরিদর্শন কাউন্সিলের উপর। বৈদেশিক বাণিজ্যে গবেষণার উদ্দেশ্যে ১৯৬৭ সালে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ফরেন ট্রেড স্থাপিত হয়। মোড়ক বাঁধাই সম্পর্কে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ১৯৬৬ সালে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ প্যাকেজিং গঠন করা হয়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে আছে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য, দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন এবং ব্যাপক প্রচার কার্য। প্রধানতঃ, রপ্তানী বাণিজ্যের সম্প্রারণ ও বৈচিত্র্য সাধনের উদ্দেশ্যে ১৯৫৬ সালে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন স্থাপিত হয়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক প্রসার এই সংস্থার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। নূতন নূতন দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক

চুক্তির মাধ্যমে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে ; ভারত বিভিন্ন দেশের সঙ্গে পণ্য বিনিময় চুক্তি সম্পাদন করিতেছে ; পণ্য বিনিময় চুক্তি অনুসারে এক দেশের আমদানীর পরিবর্তে অন্য দেশের রপ্তানীর দ্বারা দেনা পাওনা মেটান হয়—এই ব্যবস্থায় টাকা লেনদেনের প্রয়োজন না থাকায় বৈদেশিক মুদ্রা তহবিলের উপর চাপ পড়ে না।

নূতন নূতন বৈদেশিক বাজার আবিষ্কারের জন্য সরকার ব্যাপক গবেষণা ও প্রচারকার্য চালাইতেছে। সরকার বিশ্বের নানা দেশে শিল্প বাণিজ্য মিশন প্রেরণ করিয়া, ভারতীয় পণ্যের বাজার সৃষ্টি করিয়া, রপ্তানী বৃদ্ধির প্রয়াস চালাইতেছে। ইহা ছাড়া, আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী ও মেলার মাধ্যমে ভারতীয় পণ্যসামগ্রীকে বিদেশের বাজারে জনপ্রিয় করিয়া তোলার জন্য একটি প্রদর্শনী ডাইরেক্‌টরেট কাজ করিতেছে।

তৃতীয় শ্রেণীর ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে আছে সহজ সর্তে ঋণ প্রদান, আর্থিক সাহায্য ও প্রেরণাদান, পরিবহনের সুবিধা, প্রশিক্ষণের সুবিধা ইত্যাদি। অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে আছে রপ্তানী শিল্পগুলির বৈদেশিক কাঁচামালের জন্য বিদেশীমুদ্রা প্রদান, দুষ্প্রাপ্য কাঁচামাল বণ্টনের ক্ষেত্রে রপ্তানী শিল্পগুলিকে অগ্রাধিকার প্রদান, রেলভাড়ার ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধাদান ও অন্যান্য দেশে রপ্তানীকারীরা যেসব সুবিধা ভোগ করে তাহা প্রদান করা ; দেশের রপ্তানী শিল্পের অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতার যাহাতে পরিপূর্ণ ব্যবহার হয় সে সম্পর্কে সরকার সম্পূর্ণ সজাগ আছেন। উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহ দানের জন্য সাহায্য দানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

সরকার ও রিজার্ভ ব্যাংক রপ্তানীকারীদের সুবিধাজনক সর্তে ঋণদান করিতেছে। রপ্তানীকারীরা বাণিজ্য ব্যাংক হইতে সুবিধাজনক হারে ঋণ পাইতেছে। শিল্প উন্নয়ন ব্যাংক বাণিজ্য ব্যাংকগুলির সহায়তায় মূলধনী দ্রব্য রপ্তানীকারীদের সরাসরি ঋণদান করিতেছে। ইহা ছাড়া, ১৯৬৮ সাল হইতে রপ্তানী বাণিজ্যে উৎসাহ প্রদানের জন্য এক্সপোর্ট হাউস নামক সংস্থা স্থাপনে উৎসাহ প্রদান করা হইতেছে।

কিন্তু এই সকল প্রয়াস সত্ত্বেও বাণিজ্যিক ব্যবধান (Trade Gap) অর্থাৎ আমদানী ও রপ্তানীর পার্থক্য ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯৭৯-৮০ সালে যথাক্রমে মোট আমদানী মূল্য ৮২৩১·৩২ কোটি টাকা আর রপ্তানী মূল্য ৫৯৯৮·৬৪ কোটি টাকা ছিল আর ঘাটতির পরিমাণ হয় ২২৩১·৭৮ কোটি টাকা।

১৯৮০-৮১ সালে এই ঘাটতির পরিমাণ ৩০০০ কোটি টাকা হইবে বলিয়া আশংকা করা হইতেছে।

১৯৭৯ সালে বিশ্বের রপ্তানী ২৬·৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। শিল্পোন্নত দেশগুলির রপ্তানী মোট বিশ্ব রপ্তানীর ৭০ শতাংশ আর অর্ধোন্নত দেশগুলির (তৈল রপ্তানীকারীদেশ বাদে) রপ্তানী বৃদ্ধির হার হইল ১৬·২ শতাংশ। বর্ধিত আমদানীমূল্য পরিশোধ করিতে হইলে ভারতকে ২৫ শতাংশ রপ্তানী বৃদ্ধি করিতে হইবে।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন (State Trading Corporation): ১৯৫৬ সালে ভারত সরকারের উদ্যোগে ভারতীয় কোম্পানী আইনের অধীনে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীরূপে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন স্থাপিত হয়, ইহা একটি প্রাইভেট যৌথ প্রতিষ্ঠান এবং প্রথমে ইহার অনুমোদিত মূলধন ছিল এককোটি টাকা আর আদায়ীকৃত মূলধন পাঁচ লক্ষ টাকা, পরে কর্পোরেশনের অনুমোদিত মূলধন বৃদ্ধি করিয়া পাঁচ কোটি এবং আদায়ীকৃত মূলধন দুই কোটি টাকা করা হয়। ইহার মূলধনের সমস্তটাই ভারত সরকার দিয়াছেন। কর্পোরেশন পরিচালনার ভার একটি পরিচালক মণ্ডলীর উপর ন্যস্ত আছে। পরিচালকগণ সকলেই ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন।

কর্পোরেশনের উদ্দেশ্য হইল আমদানী রপ্তানী বাণিজ্য পরিচালনা করা এবং দেশাভ্যন্তরে বা দেশের বাহিরে দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়বিক্রয় করা। ইহার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়া ভূতপূর্ব অর্থমন্ত্রী কৃষ্ণমাচারী বলিয়াছিলেন যে প্রধানতঃ রপ্তানী বাণিজ্যের সম্প্রসারণের জন্যই এই কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সহিত ভারতের বাণিজ্যের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সকল দেশে বাণিজ্য পরিচালনার একচেটিয়া অধিকার রাষ্ট্রের এবং লাভজনকভাবে উহাদের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে হইলে ভারতেও ওইরূপ রাষ্ট্রীয় সংস্থা থাকা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, ভারতের বহির্বাণিজ্যের পরিচালনা ক্রটিপূর্ণ। এতদিন পর্যন্ত বেসরকারী উদ্যোগেই ভারতের বহির্বাণিজ্য পরিচালিত হইয়াছে। কিন্তু বেসরকারী উদ্যোগের উপর নির্ভরশীলতার জন্য বহির্বাণিজ্যের সম্প্রসারণ হইতেছে না। বহির্বাণিজ্যের কাঠামো শক্তিশালী করিবার জন্য এবং আমদানী নিয়ন্ত্রণ ও রপ্তানী সম্প্রসারণের জন্য একচেটিয়া ব্যবস্থাই অধিকতর

কাম্য। বহির্বাণিজ্যে নিযুক্ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে হটাইয়া দেওয়া এই সংস্থার উদ্দেশ্য নয়—উহাদের পাশে থাকিয়া ইহা ভারতের বহির্বাণিজ্যের সম্প্রসারণ করিবে।

ভারতের মতো বিকাশমান দেশে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সপক্ষে বহু যুক্তি আছে। প্রথমত, ভারতে খাদ্যশস্যের ঘাটতি রহিয়াছে; এইজন্য রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের প্রয়োজন। এই সংস্থা যদি খাদ্যশস্য বণ্টনের ভার গ্রহণ করে তাহা হইলে অপ্রচুর খাদ্যশস্যের যথাসম্ভব ন্যায্য বণ্টন সম্ভব হইবে আর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যস্তরও স্থির রাখা যাইবে। এইরূপ অবস্থা সম্পূর্ণ-রূপে বেসরকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের হাতে থাকিলে দেশে কালোবাজারী, ফাটকাবাজী প্রভৃতি সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাইবে। দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমাজতান্ত্রিক কাঠামোয় রাষ্ট্র গঠনের নীতিকে স্বীকার করা হইয়াছে। রাষ্ট্রের এই আদর্শকে কার্যকর করিয়া তোলার জন্যও রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রয়োজন। তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এক-চেটিয়া অবস্থা ক্রমশই প্রসার লাভ করিতেছে। এইরূপ অবস্থায় বেসরকারী কারবারের স্থলে রাষ্ট্রের একচেটিয়া ব্যবসায় অধিকতর কাম্য বলিয়া বিবেচিত হয়। চতুর্থত, উন্নতিকামী বিকাশমান দেশগুলিতে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের বিশেষ প্রয়োজন আছে। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের ফলে যে মুনাফা হইবে সরকার তাহা উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করিতে পারিবেন। বহির্বাণিজ্যের সম্প্রসারণ করিতে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের ভূমিকা অনস্বীকার্য। পঞ্চমত, সাম্প্রতিক কালে দেখা যাইতেছে যে বিভিন্ন দেশ অধিক মাত্রায় দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করিতেছে। চুক্তির সর্ত কার্যকর করিতে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের বিরুদ্ধেও যুক্তি আছে। প্রথমতঃ, ইহার ফলে এক-চেটিয়া কারবারের সকল কুফল দেখা দিবে। দ্বিতীয়তঃ, কর অনুসন্ধান কমিশন তার রিপোর্টে বলিয়াছে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের দ্বারা পর্যাপ্ত রাজস্ব পাওয়া যাইবে না। অধিকন্তু যদি রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে তাহা হইলে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি কারবারে মূলধন খাটাইতে সাহসী হইবে না এবং বেসরকারী ব্যবসায়বাণিজ্য ব্যাহত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য পরিচালনা করিবার মত শিক্ষণপ্রাপ্ত লোকের যথেষ্ট অভাব আছে, উহাদের বাণিজ্যিক কাজকারবার সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা নাই;

বলিয়া ব্যর্থ হইবার আশংকাই বেশী। তৃতীয়তঃ, সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে দক্ষতাও ও উদ্যোগের অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় আর বহির্বাণিজ্যে আমলাতন্ত্র প্রসার লাভ করিবে এবং পণ্যসামগ্রীর দাম বাড়িবে। অধ্যাপক ভাইনার বলেন যে, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে রাজনৈতিক শক্তিসমূহ প্রভাব বিস্তার করিবে। ইহার দরুন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রতিযোগিতামূলক ভিত্তি হইতে একচেটিয়ামূলক ভিত্তিতে আসিয়া দাঁড়াইবে এবং ব্যবসায়সংক্রান্ত বিবাদ আন্তর্জাতিক সংঘাতের সৃষ্টি করিবে। দুর্বল দেশগুলিকে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য শক্তিশালী দেশগুলির সহিত প্রচণ্ড অর্থনৈতিক অথবা রাজনৈতিক মূল্যের বিনিময়ে মিতালী করিতে হইবে।

কর্পোরেশন স্থাপনের পর হইতেই উহা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে রপ্তানী প্রসার করিয়া তাহাদের কাছ হইতে ইস্পাত, সিমেণ্ট ও যন্ত্রপাতি আমদানীর চেষ্টা করিতেছে। দ্বিতীয়ত ইহা ভারতের বহির্বাণিজ্যের বৈচিত্র্যসাধন এবং সম্প্রসারণের চেষ্টা করিতেছে আর এই উদ্দেশ্যে চিরাচরিত দ্রব্যগুলির ও নূতন নূতন বাজার উদ্ভাবনার চেষ্টা চলিতেছে। তৃতীয়ত, যে সকল দ্রব্যের যোগানে ঘাটতি আছে কর্পোরেশন সেই দ্রব্যগুলি আমদানী ও দেশাভ্যন্তরে বণ্টনের ব্যবস্থা করিয়া উহাদের দামের ঊর্ধ্বগতি রোধ করে। চতুর্থতঃ আমদানী রপ্তানীর কাজ যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায় সেজন্য কর্পোরেশন বন্দর-যান এবং পরিবহন উন্নয়নে সহায়তা করিতেছে।

কর্পোরেশনের রপ্তানী কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত পণ্যগুলিকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: (১) রেলপথ সরঞ্জাম, (২) ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি (৩) রাসায়নিক দ্রব্য ও ঔষধপত্র, (৪) চামড়ার দ্রব্য, জুতা, বস্ত্র, পরচুল, পশম ইত্যাদি ভোগ্যপণ্য এবং (৫) কৃষিপণ্য, মাছ, তাজা ফল ইত্যাদি।

১৯৬৩ সালে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশনকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া খনিজ ও ধাতব দ্রব্য বাণিজ্য কর্পোরেশন (Minerals and Metals Trading Corporation) নামে একটি নূতন কর্পোরেশন গঠন করা হয়। এই নূতন কর্পোরেশনটি ৫ কোটি টাকা অনুমোদিত ও দুই কোটি টাকা আদায়ীকৃত মূলধন লইয়া কাজ আরম্ভ করে। ১৯৭৭-৭৮ সালে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশনের রপ্তানী মূল্য ছিল ৫৫৭ কোটি টাকা। ওই বছর খনিজ ও ধাতব দ্রব্য বাণিজ্য কর্পোরেশনের লেনদেনের পরিমাণ ছিল ৯৩৯ কোটি টাকা।

রপ্তানী ঝুঁকি বীমা কর্পোরেশন (Export Risk Insurance Corporation) : ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে ৫ কোটি টাকা অনুমোদিত এবং ২½ কোটি টাকা আদায়ীকৃত মূলধন লইয়া রপ্তানী ঝুঁকি বীমা কর্পোরেশন কোম্পানী আইনানুসারে প্রাইভেট কোম্পানীরূপে গঠিত হয়। কর্পোরেশনের মূলধনের সমস্তটাই ভারত সরকারের। ইহার পরিচালনার দায়িত্ব সরকার-মনোনীত ৭জন ডাইরেক্টর লইয়া গঠিত একটি পরিচালক মণ্ডলীর উপর ন্যস্ত আছে। কর্পোরেশনকে পরামর্শ দিবার জন্য ২১ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি পরামর্শদানকারী কাউন্সিল রহিয়াছে। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাসে এই কর্পোরেশনটির নাম পরিবর্তন করিয়া রপ্তানী ক্রেডিট ও গ্যারান্টি কর্পোরেশন করা হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সরকার রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তাহার মধ্যে রপ্তানী ঝুঁকি বীমা কর্পোরেশন গঠন অন্যতম। রপ্তানী বাণিজ্যে কতকগুলি রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক ঝুঁকি আছে যাহা সাধারণ বীমা কোম্পানীগুলি দূর করিতে অক্ষম। অন্যান্য বহু দেশে এই ধরণের ঝুঁকি বীমা কর্পোরেশন আছে। ভারতের রপ্তানীকারীদের ওই ধরনের সুযোগসুবিধা থাকলে প্রতিযোগিতায় অসুবিধা হইবে। অবশ্য এই কর্পোরেশন রপ্তানী বাণিজ্যের সকল ঝুঁকি নিজে বহন না করিয়া কর্পোরেশন ও রপ্তানীকারকদের মধ্যে উহা বণ্টনের ব্যবস্থা করিয়াছে।

ভারত সরকার রপ্তানী বীমা পরিকল্পনা রচনার জন্য ১৯৫৫ সালে টি. সি. কাপুরের সভাপতিত্বে রপ্তানী বাণিজ্য ঝুঁকি পরিকল্পনা কমিটি গঠন করে। কমিটি রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত ঝুঁকি বীমা কর্পোরেশন গঠনের সুপারিশ করে। কমিটি এই কর্পোরেশনকে স্বেচ্ছামূলক রাখার নির্দেশ দেয়। কমিটি বলে যে রপ্তানী প্রসারের জন্য অধিকতর অর্থের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলি রপ্তানী বাণিজ্যে ক্রমশই অধিকতর অংশ গ্রহণ করিতেছে আর ইহাদের জন্য রপ্তানী বীমা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা বিশেষ প্রয়োজন। রপ্তানী বীমা পরিকল্পনার দরুন রপ্তানী বাণিজ্যের জন্য অধিকতর অর্থ পাওয়া যাইবে, বীমা ব্যবস্থার সুবিধা ভোগকারী বিদেশী রপ্তানীকারকের অনুরূপ সুবিধা পাইলে ভারতীয় রপ্তানী ব্যবস্থার প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে।

রপ্তানী বাণিজ্যের ঝুঁকিগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় বাণিজ্যিক ঝুঁকি

এবং রাজনৈতিক ঝুঁকি—কর্পোরেশন দুই প্রকার ঝুঁকিই গ্রহণ করে। কর্পোরেশন বাণিজ্যিক ঝুঁকির শতকরা ৮০ শতাংশ এবং রাজনৈতিক ঝুঁকির ৮৫ শতাংশ গ্রহণ করে। ঝুঁকির বাকী অংশ রপ্তানীকারককেই বহন করিতে হয়।

বৈদেশিক আমদানীকারী দেউলিয়া হইয়া যাইতে পারে অর্থাৎ মূল্য পরিশোধে অসমর্থ হইতে পারে বা নির্দিষ্ট সময়ে মূল্য পরিশোধে অসমর্থ হইতে পারে। আমদানীকারীর দেশে যুদ্ধ বা গৃহবিবাদ বা প্রতিকূল রাজনৈতিক অবস্থার উদ্ভব, আমদানী নীতি বা মুদ্রার বহির্মূল্যের পরিবর্তন, নূতন আইন প্রবর্তনের দরুণ অর্থপ্রেরণে বাধা, জাহাজের গতিপথে বাধা এই সকল রাজনৈতিক ঝুঁকির ৮৫ শতাংশ কর্পোরেশন গ্রহণ করে।

রপ্তানী ক্রেডিট ও গ্যারান্টি কর্পোরেশন (Export Credit and Guarantee Corporation) : ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাসে রপ্তানী ঝুঁকি বীমা কর্পোরেশন নাম পরিবর্তন করিয়া রপ্তানী ক্রেডিট ও গ্যারান্টি কর্পোরেশন গঠিত হয়। এই নবগঠিত কর্পোরেশনের অনুমোদিত মূলধন পাঁচ কোটি টাকা এবং আদায়ীকৃত মূলধন দুই কোটি টাকা। রপ্তানী বাণিজ্যে ঋণ গ্যারান্টি দেওয়া এবং ঝুঁকি গ্রহণ করা এই কর্পোরেশনের কাজ। রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণে এই কর্পোরেশন এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

আমদানী নীতি (Import Policy) : দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সুরু হইলে স্বাভাবিক ভাবেই আমদানীর পরিমাণ বাড়িবে। প্রধানতঃ, তিনটি কারণে বিদেশ হইতে আমদানী বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন দেখা দেয় ; প্রথমতঃ, শিল্পোন্নয়নের জন্য বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি আমদানী করিতে হয়, এইগুলি উন্নয়নমূলক আমদানী। দ্বিতীয়তঃ, শিল্পের যে উন্নয়ন ক্ষমতা সৃষ্টি হইল তাহা বজায় রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম আমদানীর প্রয়োজন হয় ; উহাদের সংরক্ষণমূলক আমদানী বলে। তৃতীয়তঃ, শিল্পায়নের সুরুতে যে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ করা হয় তাহার দরুন জনগণের আয় বৃদ্ধি পাইয়া ভোগ্যপণ্যের উপর যে চাপ সৃষ্টি করে সেজন্যও বিদেশ হইতে আমদানী করার প্রয়োজন দেখা দেয়।

প্রথম দুই শ্রেণীর আমদানী সংকোচ করিলে উন্নয়নই ব্যাহত হইবে বলিয়া উন্নয়নমূলক এবং সংরক্ষণমূলক আমদানীর ওপর কোন বিশেষ বিধিনিষেধ

আরোপ করা হয় না কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর আমদানী কঠোরভাবে দমন করা হয়।

সাধারণভাবে বিকাশমান দেশগুলি বাণিজ্য ব্যালান্সে ঘাটতি দূর করিবার জন্য আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য আমদানী পরিবর্ততা (import substitution) এবং আমদানী কোঠা ধার্য করা হয়। আমদানী পরিবর্ততা বলিতে বোঝায় বিদেশ হইতে ভোগ্যপণ্যের আমদানী বন্ধ করিয়া দেশে উহার উৎপাদন করা।

প্রথম পরিকল্পনা কালে উদার আমদানী নীতি অনুসরণ করা হয়। কিন্তু এই আমদানী নীতির দরুন অনেক অনাবশ্যক পণ্য ও ভোগ্যপণ্য দেশে আমদানী হয় আর উহার ফলে বিদেশী মুদ্রার অপচয় ঘটে। এইজন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আমদানী নীতি কঠোর করা হয় এবং শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি ছাড়া অন্য প্রকার দ্রব্যের আমদানী নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ১৯৬৬ সালে রপ্তানী বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে টাকার অবমূল্যায়ন করা হইলে আমদানী নীতির কঠোরতা কিছুটা শিথিল করা হয়। শিল্পের অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতার পরিপূর্ণ ব্যবহার করিবার জন্য ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পের কাঁচামাল ও সাজ সরঞ্জাম আমদানীর জন্য আমদানী নীতি উদার করা হয়। পরবর্তীকালে ছোট ছোট শিল্পগুলিকেও তাহাদের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও সাজসরঞ্জাম আমদানীর অনুমতি দেওয়া হয়। সাম্প্রতিক কালে কিছু কিছু ভোগ্যপণ্য দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় সরকার চিনি, ইস্পাত ও কাগজের মত দুষ্প্রাপ্য ভোগ্যপণ্যও বিদেশ হইতে আমদানীর নীতি গ্রহণ করিয়াছে।

ল্যাটিন আমেরিকান দেশগুলির অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে আমদানী পরিবর্ততার মাধ্যমে দেশীয় শিল্পকে সংরক্ষণ প্রদান করিয়া উহা অদক্ষ উৎপাদন ব্যবস্থা এবং অধিক উৎপাদন ব্যয়ের সহায়ক হইয়াছে। দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের পরিবর্তে উহাদের তীব্রতর করিয়া তুলিয়াছে। আমদানী পরিবর্ততার মাধ্যমে দেশীয় শিল্পকে যে সংরক্ষণ দান করা হয় তাহা পরিণামে দেশের ক্ষতিই করে। ইহার দরুন উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়, পণ্যের গুণগত অবনতি ঘটে এবং পুরানো দিনের কৃৎকৌশলের পরিবর্তে আধুনিক কৃৎকৌশল গ্রহণের কোন তাগিদ থাকে না। বর্তমানে সরকারী চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটিয়াছে বলিয়া আমদানী নীতি উত্তরোত্তর উদার হইতেছে।

অনুশীলনী

১। পরিকল্পনা কালে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

২। সাম্প্রতিক কালে ভারতের লেনদেন উদ্বৃত্ত প্রতিকূল হইবার কারণ কি কি?

৩। সাম্প্রতিক কালে ভারতের লেনদেন উদ্বৃত্তে যে ঘাটতি দেখা দিয়াছে তাহা প্রতিরোধ করিবার জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহা ব্যাখ্যা কর।

৪। ভারতের রপ্তানী নীতি ব্যাখ্যা কর; রপ্তানী বৃদ্ধির পথে কি কি বাধা আছে?

৫। পরিকল্পনাকালে রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য যে সকল কার্যসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা বর্ণণা কর।

৬। বিকাশমান দেশে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি আলোচনা কর।

৭। সাম্প্রতিক কালে ভারত যে আমদানী নীতি গ্রহণ করিয়াছে তাহা ব্যাখ্যা কর।

গ্রন্থপঞ্জী

BIBLIOGRAPHY

1. Aggarwal and Singh (ed) : **THE ECONOMICS OF UNDER DEVELOPMENT.**
2. Baran, P.A. The Political Economy of Growth.
3. Bauer and Yamey. The Economics of Under-developed Countries.
4. Clark, C. The Conditions of Economic Progress.
5. Dasgupta, A. K. Planning and Economic Growth.
6. Datta, B. The Economics of Industrialisation.
7. Dobb, Maurice An Essay on Economic and Growth Planning.
8. Myrdal, G. Asian Drama
9. Nurkse, R. Problems of Capital Formation inUnder developed Countries.
10. Reddaway, W. B. The Development of Indian Economy.
11. Robinson, Joan. The Accumulation of Capital.
12! Rostow, W,W. The Stages of Economic Growth.
13. Sen, A.K. Choice of Techniques.
14. Singer, H.W. Economic Progress in Underdeveloped Countries.

16. Ghosh, Alak — New Horizons in Planning

17. Ghosh, Biswanath — Changing Profile of India's Industrial Economy.

18. Harrod, R.F. — Towards a Dynamic Economics

19. Kindleberger, C.P. — Economic Development

20. Kuznets. S. — Modern Economic Growth,

21. Leibeustein, H. — Economic Backwardness and EconomicGrowth.

22. Lewis, W.A. — The Principles of Economic Planning, The Theory of Economic Growth.

23. Malenbaum, W. — Prospects for Indian Development

24. Myint, H. — The Economics of Developing Countries.

25. Meier, G.N. — Leading Issues in Economic Development.